ইতিহাস ও সংস্কৃতি



পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৬

ভূমিকা

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের জন্মশতবর্ষে তাঁর মনীষাকে স্মরণ করে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামে। এই নামের তাৎপর্য এই যে, প্রবোধচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর দীর্ঘ ঊননব্বই বছরের জীবনকালে চর্চা করে গিয়েছেন। বাংলা ছন্দতত্ত্ব রচনায় তিনি শুধু পথিকৃৎই ছিলেন না, আজ পর্যন্ত ছন্দতত্ত্ব ও বাংলা ছন্দের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও তাঁর মতো কেউ করেননি।

প্রবোধচন্দ্র মূলত ঐতিহাসিক হলেও তাঁর ইতিহাসচর্চা কেবল তথ্যনির্দেশে পর্যবসিত ছিল না। ভারতবর্ষের অতীত জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনাতে তিনি একটি স্বাধীন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

তাঁর মনীষার এই প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই স্মারকগ্রন্থের পরিকল্পনা। এতে যাঁরা লেখা দিয়েছেন তাঁরা আগ্রহের সঙ্গেই দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

প্রসঙ্গত জানাই, লেখকদের নিজস্ব বানানরীতিই লেখাগুলিতে রক্ষিত হয়েছে।

সূচিপত্র

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন

আত্মদীপ প্রবোধচন্দ্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রবোধচন্দ্র সেন ছিলেন ফরাসিতে যাঁদের বলা হয় savant তাঁদেরই একজন। তেমন মানুষ আমি বাঙালিদের মধ্যে কমই দেখেছি। তাঁরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তো করতেনই, তাঁদের জীবনদর্শন ছিল তাঁদের মনোনীত সাধনায় নিমগ্ন থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের জ্ঞান বর্ধন করা। বিষয় বৈভবের প্রতি তাঁরা উদাসীন। তবে পরিবারের জন্য যেটুকু না হলে নয় সেটুকু তাঁরা পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করেন।

প্রবোধচন্দ্রকে আচার্য বলে অভিহিত করলে যথেষ্ট হয় না। আমার মতে তিনি ছিলেন আত্মদীপ। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন আত্মদীপো ভব। প্রবোধচন্দ্র আমার মনে হয় একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রথম দুটি সন্তানের নাম অপালা ও গার্গী। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী। পরবর্তী সন্তানদের নাম দীপঙ্কর, শীলভদ্র, সঙ্ঘমিত্রা ও সুগতা। এর থেকে মনে হয় তিনি বৈদিক ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে আস্থাবান হয়েছিলেন।

তাঁর 'ইচ্ছাপত্র' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, আত্মায় বিশ্বাস করতেন না, পরলোকে বিশ্বাস করতেন না, পরজন্মে বিশ্বাস করতেন না, মৃত্যুর পর কোনও রকম অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। শ্রাদ্ধ চান না, উপাসনা চান না, প্রার্থনা চান না, স্মরণসভা চান না, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন চান না, তবে তাঁর বিবাহের দিন পালন করতে স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 'আমার পত্নী যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি যেন প্রতি বৎসর আমাদের বিয়ের দিনে (২ আষাঢ়) আমার একটা ছবির সামনে দুটি ফুল সাজিয়ে রাখেন এবং নিজে একটা লালপেড়ে শাড়ী পরে থাকেন। আর যদি গান গাওয়ার কোনো লোক পাওয়া যায় তবে সন্ধ্যার পরে ''বহু যুগের ওপার হতে'' ইত্যাদি কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যেতে পারে।' তাঁর স্ত্রীর নাম 'রুচিরা'। তাঁর বাড়ির নাম 'রুচিরা'। 'রুচিরা' নামক বাসভবনটি তিনি বিশ্বভারতীকে দেবার ইচ্ছা করেছেন। কিন্তু 'রুচিরা' নামক মানুষটি কোথায় বাস করবেন, কেমন করে তাঁর ভরণপোষণ বা চিকিৎসা ইত্যাদি হবে তার কোনও ব্যবস্থাই করে যাননি। সেসব ছেড়ে দিয়েছেন পুত্রকন্যাদের উপরে। কন্যারা বিবাহিতা আর পুত্ররা আমেরিকাবাসী। তাঁর স্ত্রীর ভাগ্য নির্ভর করবে মাতার প্রতি পুত্রকন্যার কর্তব্যের উপরে। কিন্তু স্বামীর কোনও কর্তব্য নেই। তাঁর যে কর্তব্য তা বিশ্বভারতী

মারফত বাংলাদেশের একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা। কাজটি তিনি নিজে সম্পাদন করে যেতে পারেননি। সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ ইতিহাস রচনার জন্য তাঁর নিজের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করেননি। বিশ্বভারতী যথাকর্তব্য করেছে। আর কারও মাথাব্যথা আছে বলে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

তাঁর বইগুলি তিনি দিয়ে গেছেন বিশ্বভারতীকে। এর মধ্যে আছে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই। তার একটা আনুমানিক মূল্য ধরে নিয়ে তিনি আশা করছেন বিশ্বভারতী যেন একটি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেন যার বিষয় হবে বাংলাদেশের ইতিহাস। তিনি না চাইলেও তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্‌যোগ নিয়েছেন তাঁর আত্মীয় ও ভক্তরা। তিনি না চাইলেও তাঁকে স্মরণ করা হবে ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু তার পরে কি তাঁর জন্যে আর কিছু করণীয় থাকবে না?

একবার আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে আপনি বাংলার বৌদ্ধযুগের ইতিহাস লিখুন। বৌদ্ধযুগ আমাদের ইতিহাসের একটি গৌরবময় যুগ। কিন্তু আমরা কেউ বৌদ্ধ নই, তাই কারও অন্তরের তাগিদ নেই। অথচ আমাদের পদবী থেকে অনুমান করতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষরা বৌদ্ধ ছিলেন। এই যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, কর, পালিত, সেন, গুপ্ত, নাথ, নন্দী, পাল, ভদ্র, রক্ষিত, শীল প্রভৃতি। এইসব বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী বৌদ্ধ নামগুলির শেষাংশ। আমার নিজের ধারণা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সব জাতই বৌদ্ধ ছিল। এখনও তার রেশ রয়েছে পদবীগুলোতে। এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

প্রবোধচন্দ্র না চাইলেও তাঁর বন্ধুরা ও ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করবেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি বক্তৃতামালা প্রবর্তন করা হয়েছে। সেটার জন্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত 'বাংলাদেশে বৌদ্ধযুগ'। বৌদ্ধযুগের সাহিত্য, বৌদ্ধযুগের শিল্প, বৌদ্ধযুগের গীতি ও পদ, বৌদ্ধযুগের সমাজ, বৌদ্ধযুগের সমুদ্রযাত্রা ও সমুদ্রপারের উপনিবেশ, বৌদ্ধযুগের ভূমিব্যবস্থা, বৌদ্ধযুগে বাণিজ্য ইত্যাদি বিস্মৃত প্রসঙ্গ। আশা করি এর জন্যে বক্তার অভাব হবে না। প্রথম সুযোগ দিতে হবে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসতে পারেন ভারতের বাইরে থেকেও আসতে পারেন। বিশ্বভারতীকেই তাঁদের আমন্ত্রণ পূর্বক যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। এই আমার সবিনয় নিবেদন।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৫ বৈশাখ, ১৩০৪, ২৭ এপ্রিল ১৮৯৭-২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) যখন প্রবাসীতে ছন্দবিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তখনও তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন কুমিল্লাতে। প্রবাসীতে প্রেরিত তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধটি পড়ে তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠেন এবং এ বিষয়ে কিছু লিখবেনও স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা আর সম্ভব হয়নি। প্রবন্ধ মুদ্রিত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাংলা ভাষা বিষয়ক সুবিখ্যাত বইতে এর বিস্তৃত উল্লেখ করলেন, মোহিতলাল চিঠি লিখে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

প্রবোধচন্দ্র কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন না। এম.এ.-তে তাঁর বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। শতকরা উনাশি নম্বর পেয়ে ১৯২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পরে গবেষক ছাত্র হিসাবে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় প্রাচীন বাংলায় আর্য সভ্যতার বিস্তার নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতিবশত তিনি পরবর্তী কালে বাংলা ভাষাতেই ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। 'ধর্মবিজয়ী অশোক' 'ধম্মপদ-পরিচয়' 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' 'রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি' প্রভৃতি বই তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অনূদিত মেঘদূত কাব্যের বিস্তৃত টীকা তিনি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। কালিদাস বিষয়ে তাঁর মৌলিক বক্তব্য প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একখানি বাংলার ইতিহাস রচনা করতেও বলেছিলেন।

ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যে পারঙ্গমতার জন্য প্রবোধচন্দ্র দৌলতপুর কলেজে ওই দুই বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মবর্ষ উপলক্ষে যে জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি লিখলেন 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান'। এই প্রবন্ধটিই পরে তাঁর বিখ্যাত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিরিশের দশকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ নিয়ে আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রবোধচন্দ্র ছন্দ নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর প্রায় সব প্রবন্ধই গ্রন্থাকারে সংকলিত করে গিয়েছেন। তিনি ছন্দচর্চায় যুক্তিসঙ্গত পরিভাষা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তেমনি বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও ছন্দের

ইতিহাসেরও সুসঙ্গত পদ্ধতি নির্দেশ করে গিয়েছেন। তাঁব সর্বশেষ গ্রন্থ 'নূতন ছন্দপরিক্রমা' মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর সারাজীবনের ছন্দচিন্তার পরিণত রূপ। কিন্তু তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইটির সম্পাদনাকেই তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করতেন।

ছন্দচর্চার সূত্রেই প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর স্নেহ লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে তিনিই হন বাংলা বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান, রবীন্দ্রভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ও ববীন্দ্র-অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনা ও অন্যান্য কয়েকটি দিকেব মৌলিক গবেষণার ফলে অচিরেই প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত হন।

প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন, তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখনই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমে তাঁর চিত্ত উদ্‌বেলিত হয়েছিল। পরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন দলে। বেশ কিছুদিন তিনি ছিলেন অন্তরীণ। ফলে অত্যন্ত কৃতী ছাত্র হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করতে বিলম্ব হয়েছিল। গান্ধীজির আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শও তাঁকে আকৃষ্ট করে। প্রবোধচন্দ্র কলেজের শিক্ষায় ফিরে এলেন। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে না থাকলেও তাঁর সমগ্র রচনায় স্বদেশ ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। জীবনের শেষেব দিকেও চীন-ভারত যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্বর্ণপদক তিনি দান করেছিলেন যুদ্ধের ভাণ্ডারে। 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চেতনার অনুপ্রেরণাদাতা-রূপটিকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এ-বই লেখার প্রেরণা এসেছিল নিজের জীবন থেকেই। বাংলার উনিশ শতকের উদারনৈতিক চিন্তার তিনি উত্তরাধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গভীর দেশচেতনা—এই দুইই ছিল প্রবোধচন্দ্রের মননের বীজমন্ত্রস্বরূপ। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ রামায়ণ, মহাভারত, ধম্মপদ, গীতা, বুদ্ধ, অশোক, কালিদাস, আকবর, শিবাজীর মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি সেই সূত্রেই ব্যাখ্যা করেছেন ইতিহাসের দষ্টিতেই। এর একটি প্রধান নিদর্শন 'জনগণমন' গানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। রাজপুরুষের প্রশস্তি বলে এই গানটির যে কলঙ্ক ছিল, প্রবোধচন্দ্রের অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগেই তার নিরসন হয়। ভারতবর্ষেব অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হতে এর আর কোনো বাধাই থাকেনি।

ভারতবর্ষের মতো বাংলাদেশকেও তিনি সমানভাবেই ভালোবেসেছেন। তাঁর মধ্যে এ দুয়ের প্রতি ভালোবাসায় কোনো বিরোধ ছিল না। বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি লিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু বঙ্গেতিহাসপ্রীতি থেকেই তিনি লিখেছিলেন 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা'। ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে তাঁর আজন্মলালিত ভারতবোধ পীড়িত হল, কিন্তু তাঁর মনের জগতে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে যায়নি। তাঁর বঙ্গপ্রীতি ধর্ম ও রাজনীতিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ তাঁকে সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে নিয়েছে। তাঁর স্বদেশবোধের মতো ধর্মবোধও ছিল উদার। হিন্দু-মুসলমান তাঁর কাছে সমান, আপনজন। তাঁর সর্বশেষ রচনা অসমাপ্ত 'আমার অন্তিম ইচ্ছাপত্র'। তাতে দেখা যায় তিনি প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী নন। তিনি বিশ্বাস করেছেন মানুষ ও তার বাস্তব পরিবেশকে। অন্তিম ইচ্ছাপত্রে তিনি লিখে গেছেন—

'সমাজনিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা মানুষের থাকে না। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক সত্তারূপেই তার উদ্‌ভব, বিকাশ ও পরিণতি। সামাজিক সত্তা হিসাবেই এক একজনের যে বিশিষ্ট রূপ তাকেই বলি তার ব্যক্তিত্ব। মানুষের পক্ষে বিশেষতঃ অল্প বয়সে তাঁর পারিবারিক সত্তাও সামাজিক সত্তায় উত্তরণের পাদপীঠ মাত্র। তার পরিণতি সামাজিক সত্তাতেই। মানুষ একান্তভাবে পারিবারিক জীব নয়। সে আসলে সামাজিক জীব। আমাদের জীবনের খেলাটা আসলে সমাজেরই খেলা। এ খেলায় যে সব সাজসরঞ্জাম (যাকে লোকে বলে বিষয়সম্পদ) লাগে তাও পাই সমাজের কাছেই। তাই খেলা শেষে সেই খেলনাগুলিও ফিরিয়ে দিতে হবে সমাজকেই।'

প্রবোধচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে তাঁর অম্লান আধুনিকতা স্মরণ করে তাঁর অনুশীলিত বিষয় অবলম্বনেই শ্রদ্ধার্ঘ্যও রচনা করা হল।

প্রবোধচন্দ্র সেনের জীবন ও কীর্তি এই বইগুলিতে আলোচিত হয়েছে-- 'বাংলা ছন্দ শাস্ত্রের রূপকার প্রবোধচন্দ্র সেন' (মুখ্য সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩)। 'প্রবোধচন্দ্র সেন' (আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা)। 'ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন' প্রবন্ধ। কীর্তির্যস্য (ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩)। 'প্রবোধচন্দ্র সেন' (ভবতোষ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী)।

প্রবোধচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা

আমার অন্তিম ইচ্ছাপত্র

প্রথম পর্যায়

১। আমার মৃত্যুকালে আমার কপালে যেন খানিকটা মাটি মাখিয়ে দেওয়া হয়। তখন গাওয়া হবে 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' গানটি। আর শ্মশানযাত্রার সময় গাওয়া হবে 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারই দলে'। আব শ্মশানে গান হবে 'আগুনে হল আগুনময়' এবং 'ওরে আগুন আমার ভাই'।

২। আমার শবদেহে যেন কোনো নূতন বস্ত্র পরানো না হয়। আমার ব্যবহৃত যে কোনো একটি পরিষ্কার ধুতি ও জামা পরিয়ে দিলেই হবে। আমার শবদেহের কোনো ছবি যেন তোলা না হয় আর দাহসমাপ্তির পরে যেন সামান্যতম কিছুমাত্র ভস্মাবশেষও রাখা না হয়।

৩। প্রচলিত প্রথায় আমার যেন 'মুখাগ্নি' না করা হয়। 'মুখাগ্নি' মানে প্রথম অগ্নি-সংযোগ, মুখে আগুন দেওয়া নয়। আমার শবদেহের মাথায় ও বুকে প্রথম অগ্নি-সংযোগ করা যেতে পারে। দেবীপদকে আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মেনে নিয়েছি। সে-ই প্রথম অগ্নি-সংযোগ করতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে আমার যে কোনো কন্যা বা জামাতা অথবা হারাধন যে কোনো ছাত্র সে কাজ করতে পারে। পরে তো অনেকে মিলেই সে কাজ সম্পন্ন করবে।

৪। আমার একান্ত [ইচ্ছা] ছিল আমার শবদেহটা পুড়িয়ে নষ্ট না করে সেটাকে যে-কোনো চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে দান করে যাব, যাতে আমার দেহের যে কোনো অংশ এবং কঙ্কাল যে কোনোভাবে রোগী বা শিক্ষার্থীর কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু আমি সে-ব্যবস্থা করে যেতে পারিনি। যদি আমার অন্তিম কালেও সে ব্যবস্থা করা যায় তবে শবদাহের আর প্রয়োজনই থাকবে না।

৫। যদি কোনো কারণে আমার মৃত্যু হয় কলকাতায়, তবে সেখানে প্রথম চেষ্টা করতে হবে যাতে শবদেহকে চিকিৎসাদি কোনো সৎকাজে লাগানো যায়। শবদেহকে পুড়িয়ে নষ্ট করাকে আমি 'সৎকার' বলে মনে করি না। যদি একান্তই তা অসম্ভব হয়, তবে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পোড়াবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে সময় বাঁচবে, মুখাগ্নি প্রভৃতি ঝামেলা থাকবে না এবং তাতে অযথা গাছ-কাটা ও কাঠ-পোড়ানোর অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

৬। যদি প্রচলিত নিয়মে শবদাহ করতেই হয় তবে বিনা দ্বিধায় যেন পেট্রোল বা কেরোসিনের সহায়তা নেওয়া হয়। তাতে কাঠ পোড়ানোর অপরাধ কমবে। মৃতদেহের প্রতি আবার মায়া মমতা কেন? নজর রাখতে হবে জীবিতদের কল্যাণের প্রতি।

৭। আমার মৃত্যুর পর যেন কোনো শাস্ত্রীয় বিধিবিধান বা প্রচলিত লোকাচাব না মানা হয় এবং কোনো প্রকার প্রার্থনা বা শ্রাদ্ধাদি ধর্মানুষ্ঠান না করা হয়। আমি যথেষ্ট দীর্ঘায়ু হয়ে শান্তিতে ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে গিয়েছি। আমার মৃত্যুতে শোকের কোনো কারণ নেই বরং আনন্দেরই কারণ আছে।

৮। আমার মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে (বা অন্যত্র) যেন আমার আত্মার শান্তি বা কল্যাণ কামনা করে কোনো প্রার্থনা না করা হয়, কোনো মন্ত্র উচ্চারিত না হয় অথবা 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' ইত্যাদি রকমের কোনো ভক্তিসংগীত গাওয়া না হয়। আমি দেহাতীত আত্মায় বিশ্বাসী নই এবং বিশ্বস্রষ্টা ভগবান বা পরম ব্রহ্মেও বিশ্বাসী নই। ইহজীবনে আমি যা ছিলাম বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে তাকেই স্মরণ করা যেতে পারে। ইহলোক থেকে তিরোহিত হলেও মানুষের স্মৃতি থেকে তিরোহিত হতে আরও কিছু সময় লাগবে।

৯। আমার মৃত্যুর পরে আমার ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন চলছে তেমনি চলবে। আহারাদি নিত্যকর্মে কোনো পরিবর্তন যেন না হয়। অর্থাৎ পিতৃবিয়োগের নিদর্শন হিসাবে লোকাচার বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোনো নিয়মই যেন তারা পালন না করে।

১০। অনুরূপ ভাবে আমার পত্নীও যেন বৈধব্যের নির্দশন হিসাবে কোনো প্রকার লোকাচার মেনে না চলেন। পত্নীবিয়োগে পতির আহারে এবং বেশভূষায় কোনো বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হয় না। পতিবিয়োগে আমার পত্নীও অনুরূপ আচরণ করুন এই আমাব বিশেষ ইচ্ছা। তবে সধবাদের যে বিশেষ কয়েকটি চিহ্ন (অর্থাৎ সিঁদুর শাঁখা ও লোহা) বহন করতে হয় সেগুলি বর্জন করাই ভাল।

প্রচলিত প্রথায় বিধবারা লালপেড়ে শাড়ী পরেন না। এই প্রথা না মানাই বাঞ্ছনীয়। বরং তিনি লালপেড়ে শাড়ীই যেন বেশি পরেন এই আমার বিশেষ ইচ্ছা। তিনি চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরলেই আমার ভাল লাগে এখনও। তাই আমার এই মনোভাবের কথা স্মরণ করেই তিনি যেন লালপেড়ে শাড়ী বর্জন না করেন।

আহারেও আমিষ-নিরামিষ সবই খাবেন। কেবল স্বাস্থ্যের পক্ষে যা ক্ষতিকর শুধু সেগুলিই বর্জনীয়। তাঁর পান খাবার অভ্যাস আছে। এটা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই আমার বিশেষ ইচ্ছা তিনি যেন পান খাওয়া বর্জন করেন।

প্রচলিত প্রথায় বিধবাদের একাদশী, অম্বুবাচী প্রভৃতি উপলক্ষে কতকগুলি নিয়ম মানতে হয়। এসব নিয়ম অবশ্যবর্জনীয়।

১১। আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্মদিন বা মৃত্যুদিন যেন 'পালন' করা না হয়। যাঁরা ইতিহাসে স্থায়ী আসনের অধিকারী, তাঁদেরই জন্মদিন বা মৃত্যুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকে। এই স্মরণ জাতীয় কর্তব্য। যারা ক্ষণজীবী যাদের জীবন দুদিন পরেই মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে তাদের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন পালন তো শিশুদের পুতুলখেলা মাত্র।

তবে আমার পত্নী যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি যেন প্রতিবৎসর আমাদের বিয়ের দিনে (২ আষাঢ়) আমার একটা ছবির সামনে দুটি ফুল সাজিয়ে রাখেন এবং নিজে একটা লালপেড়ে শাড়ী পরে থাকেন। আর যদি গান গাওয়ার কোনো লোক পাওয়া যায় তবে সন্ধ্যার পরে 'বহু যুগের ওপার হতে' ইত্যাদি কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যেতে পারে। তিনি যদি অসুস্থ থাকেন বা অন্য কোনো অসুবিধা থাকে তবে এসব কিছুই করতে হবে না। শুধু ১৩৩২ (ইং ১৯২৫) সালের ২রা আষাঢ়ের কথা মনে মনে স্মরণ করবেন। আমি লিখে না গেলেও করবেন জানি। তবু আমার ইহজীবনের একটা আকাঙ্ক্ষার কথা লিখে গেলাম। আশা করি এটা তাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদই হবে। ভবিষ্যৎ কালের উপরে আমার কোনো অধিকারও নেই, দাবিও নেই। তবে আমার এই দুর্বলতাটুকুর কথা জানিয়ে যেতেই বা দোষ কি?

তৃতীয় পর্যায়

মানুষ এই দুনিয়ায় আসে বিশেষ কালে ও বিশেষ সামাজিক পরিবেশে। ওই কাল ও পরিবেশের মধ্যেই তাকে নিজের জীবন গড়ে তুলতে হয় নিজের ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে। জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেলে ফলাফল ও তার খেলার সাজসরঞ্জাম সবই চলে যায় ভবিষ্যৎ কাল ও সমাজের হাতে। ভবিষ্যতের উপর তার আর কোনো অধিকারই থাকে না, থাকতে পারে না। যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তার আবার অধিকার কি?

সমাজনিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা মানুষের থাকে না। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক সত্তারূপেই তার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি। সামাজিক সত্তা হিসাবেই এক-একজনের যে বিশিষ্ট রূপ, তাকেই বলি তার ব্যক্তিত্ব। মানুষের পক্ষে বিশেষতঃ অল্প বয়সে তার পারিবারিক সত্তাও সামাজিক সত্তায় উত্তরণের পাদপীঠ মাত্র। তার পরিণতি সামাজিক সত্তাতেই। মানুষ একান্তভাবে পারিবারিক জীব মাত্র নয়। সে আসলে সামাজিক জীব। আমাদের জীবনের খেলাটা আসলে সমাজেরই খেলা। এ খেলায় যে সব সাজসরঞ্জাম (যাকে লোকে বলে বিষয়সম্পদ) লাগে তাও পাই সমাজের কাছেই। তাই খেলাশেষে সেই খেলাগুলিও ফিরিয়ে দিতে হবে সমাজকেই। আর সারাজীবনের খেলার যা ফলাফল (চলতি কথায় যাকে বলা হয় কর্মফল) তাও তো স্বভাবতঃই সমাজেরই প্রাপ্য। এই নীতিকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি আমার কর্মজীবনের প্রথম পর্বেই। তখনই মনে মনে যে সংকল্প করেছিলাম আজও তাতে অবিচল আছি।

তদনুসারে আমি আমার এই ইচ্ছা জানাচ্ছি—

(১) আমার মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীস্থিত 'রুচিরা' বাড়িটি (দুই বিঘা জমি এবং গাছপালা সহ) হবে পুরোপুরি ভাবে হবে বিশ্বভারতীর সম্পত্তি। এ বিষয়ে আমার পত্নী শ্রীমতী রুচিরা সেনেরও পূর্ণ সম্মতি আছে।

শুধু বাড়ির নামটুকু অপরিবর্তিত রেখে বাড়ি ও বাড়ির দেয়াল ভেঙে নতুন করে গড়া যেতে পারে।

বিশ্বভারতী এই বাড়ি ও জমি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবেন ; কিন্তু ছাত্র শিক্ষক বা আর কারও বাসগৃহ রূপে যেন ব্যবহৃত না হয় এই আমার ইচ্ছা।

যদি আইনগত বা অন্যবিধ বাধা না থাকে তবে এই বাড়ি ও জমির মালিকানা আমার মৃত্যুর পূর্বেই বিশ্বভারতী গ্রহণ করতে পারে। শুধু দখল নেবার কাজটুকু সম্পন্ন হবে আমার মৃত্যুর পরে।

(২) আমার সংগ্রহে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় লিখিত ইতিহাস, সাহিত্য, ছন্দ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বেশ কিছু সংখ্যক বই অবিন্যস্ত অবস্থায় আছে। তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সংখ্যাও খুব কম হবে না। কিন্তু আমার অক্ষমতার ফলে এই গ্রন্থসংগ্রহের কোনো শ্রেণীবদ্ধ তালিকা (Inventry) তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এই কাজটা অচিরেই সম্পন্ন করতে হবে। এই দায়িত্বটা দিতে চাই জামাতা দ্বিজদাসকে।

আমার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থসংগ্রহও হবে বিশ্বভারতীর সম্পত্তি, অবশ্য কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিবাহী পুস্তক বাদে। কিছু বই য়াবে রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে আর বাকি বই যাবে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে। যদি সম্ভব হয় তবে বিশ্বভারতীর সম্মতিক্রমে আমার মৃত্যুর পূর্বেই এই কাজটুকু সম্পন্ন করে যাওয়াই আমার ইচ্ছা। এই কাজের দায়িত্বও রইল জামাতা দ্বিজদাসের উপর।

বাড়ি জমি ও গ্রন্থসংগ্রহের বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। কিন্তু এ সবের কিছু অর্থমূল্য অবশ্যই আছে। সে অর্থমূল্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের কোনো ইতিহাস নেই বলে তাঁর মনে একটা দুঃখ ছিল। তিনি চাইতেন বাঙালি জাতি আত্মসচেতন হোক ; নিজের অতীত ইতিহাস জানুক। তিনি যে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই গ্রন্থমালায় বাংলার ইতিহাস রচনার ভার দিয়েছিলেন আমাকে। এ কাজ দীর্ঘ গবেষণাসাপেক্ষ, তার জন্য তাই অখণ্ড মনোযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফলে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বাংলার ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। বিশ্বভারতী যদি উক্ত জমি, বাড়ি ও গ্রন্থসংগ্রহের অর্থমূল্যের সঙ্গে নিজের অর্থভাণ্ডার থেকে আরও অর্থ দিয়ে তার সহায়তায় প্রতি বৎসর বাংলার ইতিহাস বিষয়ে একটি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দানেব ব্যবস্থা করেন তবে রবীন্দ্রনাথের একটা ইচ্ছাপূরণের সহায়তা হবে।

আসলে আমার ইচ্ছা আমার দেওয়া সম্পদটুকুকে শুধু token হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বভারতী নিজেই এগিয়ে এসে এবং যথেষ্ট অর্থবিনিয়োগ করে উক্ত রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করুন।

আমার সঞ্চিত অর্থ কিছুই নেই। দীর্ঘকাল যাবৎ আমার জীবনযাত্রা চলছে আমার পুত্রকন্যাদের সহায়তায়। এক সময়ে ভেবেছিলাম আমার অনর্জিত এগারো হাজার টাকা (আনন্দবাজার পুরস্কার এক হাজার ও বঙ্কিম পুরস্কার দশ হাজার) এর সঙ্গে যোগ করে দেব। কিন্তু অনটনের সংসারে তা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে গেল। আর প্রতি বৎসর বইয়ের রয়েলটি হিসাবে যে সামান্য অর্থলাভ হয়, তা তো 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' নিমেষেই উবে যায়। যা হোক তবু আশা করি আমার এই কাজ অকিঞ্চনের সর্বস্বদান বলে উপেক্ষিত হবে না।

যদি বিশ্বভারতী আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হন তবে রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দানের প্রণালীটা হতে পারে এ রকম। বাংলা ইতিহাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল দু-রকম। প্রথমতঃ তিনি [চেয়েছিলেন] বাংলার ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান স্বল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক। কিন্তু সে ইতিহাস হবে বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সব অঙ্গের ইতিহাস

যাতে লোকশিক্ষার সহায়তা হয়. তিনি আসলে সেই ইতিহাসই চাইতেন। কিন্তু তিনি জানতেন বাংলার ইতিহাস রচনা বহু গবেষণাসাপেক্ষ। সে কাজেও তিনি নানা সময়ে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার পরিচয় পেয়েছি। যা হোক রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এই দু-রকম ইচ্ছাই যাতে পূর্ণ হয় সে চেষ্টা করতে হবে।

টীকা

প্রবোধচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বদিন ইচ্ছাপত্র রচনা করতে করতে শয্যাগ্রহণ করেন। এতে পর্যায় ভাগ করতে গিয়ে 'দ্বিতীয়' স্থলে 'তৃতীয়' লিখে ফেলেছেন। এখানে যথাযথ মুদ্রিত হল।

দেবীপদ প্রবোধচন্দ্রের ছাত্র পরে রবীন্দ্র ভাবতীর উপাচার্য। হারাধন প্রবোধচন্দ্রের আর এক ছাত্র হারাধন রক্ষিত বিশ্বভারতীর অবসবপ্রাপ্ত কর্মী। দ্বিজদাস রবীন্দ্রভবনের প্রাধিকাবিক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বুদ্ধ ও বুদ্ধভাবনা

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবজাতির ইতিহাসে সিদ্ধার্থ গৌতমের আবির্ভাব এবং বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি এক বিরাট ঘটনা। সাধারণভাবে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বুদ্ধ-গৌতমের আবির্ভাব কাল বলে মনে করা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে সময়টি সুদূরপ্রসারী ধর্ম-সংস্কার কার্যের জন্য পরিচিত এবং ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বহুদেশে ঐ সময়ে আধ্যাত্মিক ও যুক্তিবাদী আলোড়ন অনুভূত হচ্ছিল। মানবজাতির পক্ষে সময়টিকে জ্ঞানান্বেষণের যুগ বলা যেতে পারে। মুক্তচিন্তার জন্য তীব্র আবেগ এবং সত্যান্বেষণের জন্য গভীর প্রেরণা যুগটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কোন চিন্তানায়ক বা ধর্মীয় শিক্ষক যত উচ্চ আদর্শ বা মৌলিক নীতির প্রবক্তা হোন না কেন, তিনি বোধ হয় কোনমতেই তাঁর সময়ের প্রভাবকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না। বুদ্ধ-বচনের ভাবগত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে, তাঁর উপদেশের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, মানুষের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া যথাযথভাবে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে হলে বুদ্ধ-গৌতমের আবির্ভাবকালের পৃষ্ঠভূমি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষ নানা কুসংস্কার, বিভিন্ন ধর্মীয় ও বস্তুগত চিন্তাধারা এবং তদনুসারী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসেছিল এক আধ্যাত্মিক আলোড়ন। সনাতন ধর্ম ও দর্শনের প্রবক্তা, আজীবিক-পরিব্রাজক বা জৈন-সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতবাদ ও যুক্তিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হলেও তত্ত্বগতভাবে এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ ছিল না যে মানুষের অস্তিত্ব বা জীবন একটি প্রবহমান ধারা। একটি জন্মেব সঙ্গেই জীবনের শুরু নয় বা মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না। এই বিশ্বাস ছিল যে একজন্মের সুকর্ম পরজন্মে মঙ্গলজনক হয়, আবার এক জীবনের কুকর্ম অন্য জন্মে অমঙ্গলের সূচনা করে থাকে। তখনই মানুষ অমৃতপদ লাভ করবে যখন সে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে জন্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারবে। পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাবার পথ হিসেবে তখন যে মতগুলি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে চারটি মত উল্লেখযোগ্য। এক মতে পূজা-অর্চনাই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল, সন্ন্যাস অবলম্বন ছিল আর এক মতে শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং বাসনাদি দমনের উদ্দেশ্যে ঐ মতাবলম্বীরা চরম কৃচ্ছ্র সাধনে তৎপর হতেন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই মানুষের মুক্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এই মতই ছিল সে সময় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। জ্ঞানের পথে মুক্তিলাভের সন্ধান করতেন অন্য এক দল। বাসনার নিবৃত্তি দ্বারা শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে এই পক্ষের অনুবর্তীরা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন।

সে সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মীয় শিক্ষক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্যই মুখ্য ছিলেন বেদবিদ ও বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ্য ঋষিগণ। তখন বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিমত প্রচলন ছিল এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ ঋষিগণ এইসব অনুষ্ঠান করার জন্য আহূত হতেন। যজ্ঞকর্তা ব্যতীত বহু ব্রাহ্মণ শিক্ষকও সে সমাজে ছিলেন এবং দেশের রাজা ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের ঋষি ও শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন শিক্ষকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ছয়জনের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বক্তব্য ছিল এবং পরম সত্য ও মুক্তিলাভ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যাও ছিল। এই ছয়জন শিক্ষক হলেন পুরাণ কাশ্যপ, মস্করিন্ গোশাল, অজিত কেশকম্বলিন, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র, নির্গ্রন্থ নাটপুত্র। এঁরা প্রত্যেকেই সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং তাঁদের অনুগামীদের সংখ্যাও কম ছিল না। পুরাণ বা পূর্ণ কাশ্যপের মতে আত্মা কর্মবর্জিত এবং দেহ ক্রিয়াশীল। সু বা কু কোন কর্মের ফলই তাই আত্মাকে স্পর্শ করে না, সব কিছুই দৈবক্রমে সংঘটিত হয়। এই মতকে অ-হেতুবাদ (non-causation) বা অ-ক্রিয়াবাদ (non-action) বলা হয়ে থাকে। আজীবিক সম্প্রদায়ের তৃতীয় তীর্থংকর রূপে মস্করিন্ গোশালের প্রসিদ্ধি। গোশালের মূল বক্তব্য ছিল নিয়তি বা অদৃষ্টই সর্বনিয়ন্তা। পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি কর্মের কোন প্রাধান্য স্বীকার করেননি। ভারতীয় জড়বাদ বা Materialism-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অজিত কেশকম্বলিন্-কে একটি বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। কেশকম্বলিনের মতবাদ উচ্ছেদবাদ রূপে চিহ্নিত। তাঁর মতে মৃত্যুর পর আর সত্তার কোন অস্তিত্ব থাকে না, ভৌতিক অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই বাস্তব নয়। ককুদ কাত্যায়নের মত একদিকে অ-ক্রিয়াবাদ আর অন্যদিকে শাশ্বতবাদ। এই মতে, যে কোন সত্তা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ এবং জীব, এই সপ্ত পদার্থের সমন্বয়। এই পদার্থগুলি শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় এবং সৃষ্টিরহিত। ভাল অথবা মন্দ কোন প্রকার কর্মই এদের প্রভাবিত করে না। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীতে শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ একই পর্যাযভুক্ত, কারণ উভয় মতের দ্বারাই মানুষ কু-কর্মে প্ররোচিত হতে পারে। সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র ছিলেন অজ্ঞানবাদিন বা নাস্তিক। এই জীবনের পর আর কোন অস্তিত্ব থাকে কি না, সু বা কু কোন কর্মের ফল পাওয়া সম্ভব কি না ইত্যাদি রূপ সমস্যার কোন সমাধান পরিব্রাজক সঞ্জয়ের ব্যাখ্যানে পাওযা যায না। নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের স্যাদ্‌বাদ বুদ্ধ-কথিত ক্রিয়াবাদের অনুরূপ এবং অন্য শিক্ষকদের অ-ক্রিয়াবাদের বিপরীত। দার্শনিক চিন্তাধারায় বৌদ্ধমত এবং নির্গ্রন্থ বা জৈন মতে বিশেষ পার্থক্য থাকলেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে উভয় মতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই ধরনের বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধ-প্রদর্শিত মধ্যম-পন্থা মানুষকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল।

নানা ধর্মীয় বিচ্যুতি ও বিকৃতির ফলে সেই সময় আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এমনই এক জটিল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল যে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোকের মনেই ঐ সব ক্রিয়াকলাপের কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। অনুষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্যে করা হত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাদের কোন সার্থকতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে তাদেব মনে সংশয় উপস্থিত হল। নিষ্ঠুর পশুবলি-প্রথা এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড-বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত হতে থাকল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলস্রোতের মধ্যেই এখন বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করছিল এবং তার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রিয়াকলাপগুলোর বিরুদ্ধে অনেক অভিমত প্রতিফলিত

হয়েছিল। এই সমালোচকগণ বা বিরুদ্ধ-অভিমত প্রকাশকারীরাও কিন্তু বেদের প্রামাণ্য, বর্ণাশ্রমধর্মের মূলনীতিগুলির সারবত্তা বা ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন ভিন্নমত পোষণ করেননি। বুদ্ধ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সমস্ত সংস্কার এবং আচার-অনুষ্ঠানের সরাসরি বিরোধিতা করলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পরামর্শ দিলেন বেদের প্রামাণ্য ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করার জন্য। কোন প্রকার বাহ্য-উপদেশ বা কর্তৃত্বের অধীন না হয়ে বুদ্ধ শিষ্যরা যেন আত্মচর্যার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের শ্রেয়োলাভের পথ খুঁজে নেন, এমনই ছিল শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধের নির্দেশ।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এমন এক সময় যখন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষ ক্রমশ বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল এবং নানা মতবাদ ও ভাবধারার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও বিচাববুদ্ধি-গ্রাহ্য পথের সন্ধান চাইছিল। বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং মৈত্রী, করুণা, অহিংসার বাণী অসংখ্য তাপিত হৃদয়ে যেন অমৃতবারি সিঞ্চন করে দুঃখ-মুক্তির উদ্দেশ্যে মানুষকে একটি ইতিবাচক পথের সন্ধান দিল।

যে শিক্ষা, উপদেশ ও দর্শন-চিন্তা আজ বৌদ্ধ ধর্ম বলে পরিচিত তার প্রতিষ্ঠাতা যে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ সে সম্পর্কে কোন মতভেদ না থাকলেও তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে কিছু বিতর্ক বর্তমান।

সম্যক সম্বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম বারাণসীর ১০০ মাইল উত্তরে নেপাল সীমান্তে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যবংশীয় সামন্ত নরপতি শুদ্ধোদন ছিলেন তাঁর পিতা এবং তাঁর মা ছিলেন মায়াদেবী। একমাত্র পুত্রের জন্মের সাতদিন পরই মায়াদেবীর মৃত্যু হলে সিদ্ধার্থ তাঁর মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতির তত্ত্বাবধানে পালিত হন। কপিলবস্তুর উপকণ্ঠে লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থের জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক একটি স্তম্ভ-লেখ (Pillar edict) স্থাপন করে জন্মস্থানটি চিহ্নিত করে দেন। ঐখানে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হওয়ার জন্য লুম্বিনী গ্রামটিকে করমুক্ত করা হল বলে অশোক ঐ স্তম্ভ-লেখে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Piprahwa vase Inscription আবিষ্কৃত হবার পর আধারটিতে উৎকীর্ণ বাক্যটির ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতমহলে যত বিতর্কই দেখা দিক না কেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ যে শাক্যবংশোদ্ভূত তা প্রমাণিত। জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও তাদের পরিচিতি ছিল ব্রাহ্মণ্য গোত্র গৌতম।

সিদ্ধার্থ গৌতমের শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ নিয়ে কোন সংশয় না থাকলেও তাঁর আবির্ভাবসময় ও মহাপরিনির্বাণের কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুসারে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং আশি বছর বয়সে তাঁর মহাপরিনির্বাণ ঘটে। ভারতীয় এবং সিংহলী সূত্র ও মতানুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হয় খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দে এবং সেজন্য তাঁর জন্মসময় খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দ বলে মনে করা হয়। আধুনিক কালের প্রধান বুদ্ধ-জীবনীকার Hermann Oldenberg তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময়টিই প্রাচীন ভারতের স্থিরভাবে নির্দিষ্ট সময়গুলির অন্যতম এবং তাঁর বিচারে খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দের কিছু আগে-পরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছিল। সাধারণভাবে Oldenberg-নির্দিষ্ট সময়টিকেই বুদ্ধের সময় বলে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। সাম্প্রতিককালে জাপানী পণ্ডিত Hajime Nakamura বুদ্ধ-সময়ের সমস্যাটি আলোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন যে বুদ্ধের জন্ম খৃঃ পূঃ ৪৬৩ অব্দ এবং তাঁর নির্বাণের সময় খৃঃ পূঃ ৩৮৩ অব্দ। Nakamura তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায়

এমন কোন তথ্যনির্ভর যুক্তি দিতে পারেননি যাতে তাঁর নির্দিষ্ট এই সময়কে বুদ্ধের সময় বলে স্বীকার করা যায়। বেল্‌জিয়ন্‌ বিশেষজ্ঞ Etienne Lamotte বুদ্ধ-সময়ের সমস্যাটি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সাধারণভাবে স্বীকৃত বুদ্ধ-সময়টি বিশেষ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে, এবং সম্ভবত বুদ্ধের নির্বাণের সময়টিকে আরো পরেই স্থির করতে হবে। Lamotte এর সূত্র অনুসরণ করেই বিভিন্ন তথ্যবিশ্লেষণ ও আলোচনার পর জার্মান পণ্ডিত Heinz Bechert এই অভিমত দিয়েছেন যে বুদ্ধের নির্বাণ সম্রাট অশোকের অভিষেকের ৮৫ থেকে ১০৫ বছর আগে অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ৩০ থেকে ৫০ বছর আগে হয়েছিল। Bechert-এর মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় হল খৃঃ পূঃ ৩৬৭ থেকে ৩৭০ অব্দ। Bechert-এর আলোচনার মধ্যে বেশ কিছু 'যদি' এবং 'সম্ভবতঃ' স্থান পেয়েছে এবং তাঁর নির্ণীত সময় স্বীকার করতে গেলে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, আলেকজাণ্ডার প্রমুখের ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সিদ্ধান্তটি Bechert তাঁর নিজস্ব বলে কোন কৃতিত্ব দাবী করেননি, নতুন কিছু যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর পূর্বসূরীর অভিমত সমর্থন করেছেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রায় আশি বছর আগে Oldenberg যে সময়টিকে ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত সময় বলে মন্তব্য করেছিলেন, পরিবর্তিত অবস্থায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই সময়টিই এখন নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

পালি-সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় গ্রথিত প্রামাণ্য বৌদ্ধ শাস্ত্রের (Canon) কোথাও আমরা বুদ্ধের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত (Biography) পাই না। সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত পরিব্রাজক গৌতমের কিছু বিক্ষিপ্ত কাহিনী, বোধিলাভের পরবর্তী দিনগুলির কিছু কথা এবং তাঁর পার্থিব জীবনের অন্তিম দিনগুলির কিছু বৃত্তান্ত পালি সুত্তপিটকের নিকায়গুলিতে এবং বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গ অংশে পাওয়া যায়। প্রাচীনতর আর কোন গ্রন্থে বা গ্রন্থাংশে বুদ্ধ-জীবনীর আর কোন বিবরণ আমরা পাইনি। পরবর্তীকালের অন্তত পাঁচটি গ্রন্থে অবশ্য বুদ্ধ-জীবনী পাওয়া যায়, এবং গ্রন্থগুলি হল, মহাসাংঘিক বিনয়ের সঙ্গে যুক্ত মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাবস্তু, সর্বাস্তিবাদীদের মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত ললিতবিস্তর, সাবলীল সংস্কৃত কাব্যরীতিতে রচিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মহাকাব্য, এবং ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র। শেষোক্ত গ্রন্থটি মূলরূপে এখনও পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটির চীনা অনুবাদ থেকে Samuel Beal ইংরাজী ভাষান্তর করেছেন The Romantic Legend of Sakya Buddha নামে। পঞ্চম গ্রন্থটি হল পালিভাষায় রচিত বুদ্ধজীবনীর একমাত্র গ্রন্থ 'নিদান কথা'। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ রচিত জাতক অট্‌ঠকথা-র মুখবন্ধরূপেই নিদান-কথার প্রসিদ্ধি। ললিতবিস্তর গ্রন্থেই প্রথম আমরা বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ একটি আনুপূর্বিক বিবরণ পাই। শিক্ষক-উপদেষ্টা রূপে প্রচারক বুদ্ধের কার্যাবলীর কিছু পরিচয় আমরা পালি মহাবগ্‌গ এবং নিকায়গুলিতেও পাই। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কেবল বুদ্ধের বংশপরিচয়ই নয়, তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধানকে ঘিরেও বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলী তথা নানা কাহিনী, উপকথা ও কল্পনার মিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে তথ্য-নির্ভর একটি বুদ্ধ-জীবনী বা বিশ্বাসযোগ্য একটি ঐতিহাসিক জীবন-বৃত্তান্ত ও সময় স্থির করা দুরূহ বলেই মনে হয়।

বুদ্ধ-জীবনীর ধারাবাহিক কোন বিবরণ প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে না পাওয়ার জন্য মনে হয়, বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও নিকটবর্তী সময়ের শিষ্যবর্গ তাঁদের গুরুর শিক্ষা ও উপদেশের চর্চাতেই বিশেষ

তৎপর ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনবৃত্তান্ত যথাযথভাবে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধ-কাহিনীর যে বিক্ষিপ্ত অংশগুলি পাওয়া যায় তাও সম্ভবতঃ বৃহদংশে পরবর্তী টীকাকার আচার্যগণ রচনা করে অতিরিক্ত ঘটনাবলী সহ দীর্ঘতর বিবরণের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। পালি নিদানকথায় বুদ্ধ জীবনের যে পূর্ণতর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তা বুদ্ধের সহস্রাধিক বৎসর পর রচিত হওয়ার জন্য গ্রন্থটিতে উপলব্ধ কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। ললিতবিস্তরে উপকথা এবং পৌরাণিকতা মূলক ঘটনার আধিক্য দেবত্ব আরোপ করে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধকে এমন একটি অলৌকিক রূপে প্রকাশ করেছে যে গ্রন্থটির কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। বুদ্ধচরিতে অশ্বঘোষের সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত বুদ্ধ-কাহিনীর মধ্যে কাব্যরীতির উৎকর্ষ ও কবিকৃতির মাধুর্যই উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষের কবিকল্পনা প্রচলিত ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করা গেলেও অশ্বঘোষের বুদ্ধ-কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতার সন্ধান না করাই যুক্তিযুক্ত। সিদ্ধার্থ গৌতমের ঐতিহাসিক সত্তা এবং নিদানকথায় বুদ্ধজীবনীর সর্বশেষ রূপান্তরের মধ্যে যে সহস্রাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে বুদ্ধকাহিনীর অসংখ্য পরিবর্তন, অলঙ্করণ ও অতিরঞ্জন হয়েছে। যে কোন ধর্মীয় ঐতিহ্যে ও পরম্পরায় এটি অবশ্যই একটি স্বাভাবিক ঘটনা যে শিষ্যরা তাঁদের পূজার্হ গুরুকে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও কীর্তি-সিদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর একটি প্রভাবশালী ভাস্বর মূর্তি তুলে ধরতে প্রয়াস পান। বুদ্ধ-জীবনের বিন্যাস এবং সংগঠনেও এই প্রবণতা অবশ্যই সক্রিয় ছিল বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। বহু প্রক্ষিপ্ত কাহিনী, কল্পনাশ্রিত বিবরণ এবং প্রতীকতার আড়ালে ঐতিহাসিক বুদ্ধকে আমরা একরকম হারিয়েই ফেলেছি!

কল্পনা, উপকথা, পৌরাণিকতা বা অন্যান্য অতিরঞ্জন মিশ্রিত ঘটনাবলীকে আলাদা করে চিহ্নিত করে ঐতিহ্যানুসারী অথচ মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক একটি বুদ্ধজীবনী অবশ্যই রচনা করা সম্ভব, এবং এই প্রয়াসে আমরা Hermann Oldenberg কে পথিকৃৎ বলে মেনে নিতে পারি। Oldenberg তাঁর বুদ্ধকে মানুষ হিসেবেই তুলে ধরেছেন, তাঁর পূর্বসূরীদের মত বুদ্ধের মধ্যে অলৌকিকত্বের সন্ধান করে দেবত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেননি!

সম্পন্ন অবস্থার ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারী বা সামন্ত-রাজের একমাত্র পুত্র হিসেবে সিদ্ধার্থ গৌতমের শৈশব স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের মধ্যে কাটলেও সে সময়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশের সন্তানদের উপযোগী বিভিন্ন বিদ্যা ও কলায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ষোল বছর বয়সে যশোধরা গোপা নাম্নী শাক্যবংশীয়া এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর অভিনিষ্ক্রমণ বা গৃহত্যাগের দিনই তাঁর পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। বিবাহোত্তর দিনগুলি যখন তিনি নানা ভোগবিলাসের উপকরণের মধ্যে অতিবাহিত করছিলেন তখন একদিন তাঁর ইচ্ছা হল নগর-পরিভ্রমণের। এমন ঘটনার কথা বলা হয় যে নগরদর্শনের সময় পর পর চারদিন তিনি তাঁর অদৃষ্টপূর্ব মানুষের চারটি বিশেষ লক্ষণসূচক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন। পর পর একজন করে জরাজীর্ণ, রোগগ্রস্ত এবং মৃত ব্যক্তিকে দেখার পর চতুর্থ দিনে তিনি একজন সংসারত্যাগী, শান্তদর্শন সন্ন্যাসীর দর্শন পেলেন। সিদ্ধার্থ জানলেন যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু যে কোন মনুষ্যজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই তিন অবস্থা অতিক্রম করা বা এড়িয়ে যাবার সাধ্য কোন জাত ব্যক্তির নেই, এমনকী স্বয়ং সিদ্ধার্থের পক্ষেও তা সম্ভব হবে না। সংসারী মানুষের দুঃখদুর্দশা জীবনের নশ্বরতা অসহায় মানুষের অবশ্যম্ভাবী অবস্থাগত শোক-বেদনা প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কোন কিছুই আর তাঁকে স্বস্তি বা শান্তি দিতে পারে

না। গৃহত্যাগী পর্যটক সন্ন্যাসীর শান্তভাব ও প্রসন্নতা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল, তাঁর মনে আশার উদয় হল, তিনি অনুপ্রাণিত হলেন সন্ন্যাসজীবন অবলম্বনের জন্য। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মানুষকে রক্ষা করার উপায় সন্ধানের উদ্দেশ্যে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। সকল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সিদ্ধার্থের বয়স তখন উনত্রিশ বৎসর।

গৃহত্যাগের পর যোগ্য গুরুর সন্ধান করতে করতে সিদ্ধার্থ কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি তখনকার দু'জন প্রসিদ্ধ আচার্য আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের উপদেশের দ্বারা তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখে তিনি পাঁচজন সতীর্থ সহ পৃথকভাবে তাঁর প্রয়াস শুরু করলেন। ঐ পাঁচ ব্রাহ্মণ সতীর্থও রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্য ছিলেন। তাঁরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপশ্চর্যায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সিদ্ধার্থও তাঁদের সঙ্গে অনুরূপ কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত হয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলেন ঐ সাধনাও তাঁকে পথের সন্ধান দিতে পারবে না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে আত্ম-নিপীড়ন করে ইষ্টলাভ সম্ভব নয় এবং পরম সত্য-জ্ঞান লাভের জন্য এই মাধ্যমের কোন সার্থকতা নেই। প্রাক্তন শিক্ষক ও সতীর্থদের পথ ও সাধনা তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথার্থ ও যথেষ্ট নয় এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধার্থ নিজের প্রচেষ্টাতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধানে রত হলেন। অধুনা বোধগয়া নামে পরিচিত উরুবিল্ব নগরে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। বৌদ্ধ পরম্পরা অনুসারে ধ্যানরত সিদ্ধার্থকেএই সময় 'মার' নানাভাবে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মারের সঙ্গে সিদ্ধার্থের এই সংঘর্ষ পৌরাণিক-প্রবণতাযুক্ত এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফল বলে মনে করা হয়।[৫] সমগ্র বুদ্ধ-মার ঘটনা একটি বস্তুগত সত্যতার আবরণে মানসিক প্রক্রিয়ার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র বলে মনে করা যেতে পারে। উচ্চতর জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভের পথে যে সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেগুলোর প্রতীকই হচ্ছে 'মার'। অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থ এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে 'বোধি' বা জ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' হন। অশ্বত্থ বৃক্ষটি বোধিবৃক্ষ আর তাঁর ধ্যানের আসন যে স্থানে স্থাপিত হয়েছিল তা 'বজ্রাসন' বলে পবিচিতি লাভ করে। বোধিলাভের দ্বারা তিনি পৃথিবীতে জন্ম এবং দুঃখের নিদানভূত চক্রের সঞ্চাব-উপলব্ধি কবলেন এবং দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চার আর্যসত্য তাঁর জ্ঞানগোচর হল। জগতে দুঃখের উৎপত্তি হয় একটি কার্য-কারণনীতির জন্য। এই নীতি দ্বাদশ-আকারবিশিষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি। নানাভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন 'ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে তাহা উৎপন্ন হয়।' অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন হয় সংস্কার, সংস্কাব থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হ'তে নামরূপ, নামরূপ হ'তে ষড়ায়তন। ষড়ায়তন হ'তে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা হ'তে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান হ'তে ভব, ভব হ'তে জাতি, জাতি হ'তে জরামরণ, শোক, দুঃখ প্রভৃতির উৎপত্তি। এর পর তাঁর উপলব্ধি হ'ল কীভাবে এই দুঃখ প্রভৃতির বিনাশ হ'তে পারে, 'ইহা বিদ্যমান না থাকিলে তাহা থাকে না, ইহার নিরোধে তাহা নিরুদ্ধ হয়।' অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞানের অবিদ্যমানে নামরূপ থাকে না, এবং এইভাবে পর পর ভবের নিরোধে জাতি বা জন্ম নিরুদ্ধ হয় এবং জন্ম নিরুদ্ধ হলে আর জরা-মরণ, শোক দুঃখ প্রভৃতি উৎপন্ন হ'তে পারে না। তা হলে দেখা যায় যে জগতে দুঃখ-শোকের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রকৃতি যা' নয় সেই ভাবে সেই বস্তুকে জানা। জরা-মরণ, দুঃখ প্রভৃতির নিরোধের জন্য অবিদ্যার দূরীকরণ অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধ তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান প্রথম প্রকাশ করেন

বারাণসীর কাছে ঋষিপতনের (সারনাথ) মৃগদাব নামক ক্ষেত্রে তাঁর প্রাক্তন সহচর্যাকারী ভিক্ষু পঞ্চকের কাছে। বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনে'র স্থানটিতে একটি স্তূপ নির্মাণ করে চিহ্নিত করে দেন।

ধর্মচক্রপ্রবর্তনের পর নানা দিক থেকে নানা শ্রেণী ও প্রকৃতির লোক বুদ্ধের উপদেশ শোনার জন্য আসতে লাগল এবং তাঁর শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকল। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে কোন জাতিবিচার ছিল না, কোন রকম সামাজিক বাধা নিষেধের বেড়াজাল ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক, দুর্দান্ত দস্যু, রূপসী বারবণিতা কেউই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে পিছিয়ে ছিলেন না। বুদ্ধ তাঁর প্রধান শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ধর্ম, শিক্ষা বা তত্ত্ব বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে। তিনি নিজেও গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাঁর দুঃখজয়ের অমৃতবাণী দূর-দূরান্তরে প্রচার করার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বুদ্ধ তাঁর শিক্ষা নিরলসভাবে সকলের জন্য বিতরণ করেছেন ; প্রেম, মৈত্রী, অহিংসামূলক তাঁর উপদেশে অগণিত মানুষ তাঁদের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, দুঃখ-জয়ের পথের সন্ধান পেয়েছেন। মধ্য ভারতে মগধ-কোশল অঞ্চলেই মোটামুটিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত পবিক্রমা সীমাবদ্ধ ছিল।

দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর অমূল্য শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচার করে তিনি সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে দুঃখজয়ের পথ দেখিয়েছেন। যোগ্য শিষ্যবর্গও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। আশী বছর বয়সে তিনি এই জগত থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আনন্দ প্রমুখ প্রধান শিষ্যদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে আনন্দকে সঙ্গী করে বৈশালী থেকে কুশীনগর অভিমুখে তিনি তাঁর শেষ পরিক্রমা শুরু করলেন। পথিমধ্যে পাবা-নগরীতে কর্মকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য স্বীকার করেন এবং চুন্দ কর্তৃক পরিবেশিত 'সূকর-মদ্দব' ভোজন করে কঠিন আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হন। 'সূকর-মদ্দব' বস্তুত কী ভোজ্য-পদার্থ সে বিষয়ে মতভেদ আছে। রোগের যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও তিনি কুশীনগরের দিকে যাত্রা করলেন। কুশীনগরে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ নির্দেশ দিলেন দু'টি শাল-বৃক্ষের মধ্যে কাপড় বিছিয়ে তাঁর শয্যা প্রস্তুত করতে, তিনি উত্তর দিকে মাথা করে শয্যাগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লুম্বিনী উদ্যানে যেমন দুটি শালবৃক্ষের মধ্যে তিনি মাতৃ-কুক্ষি থেকে অবতরণ করেন তাঁর প্রয়াণও হবে অনুরূপ ভাবে। শেষ শয্যা গ্রহণ করার পর বহু ভক্ত শিষ্য ও ভিক্ষুরা তাঁকে দেখতে এলে তিনি শেষবারের মত তাঁদের উপদেশ দেন : যা কিছু উৎপন্ন হয় সবই ধ্বংস হয়, দুঃখ-মুক্তির জন্য অপ্রমত্তভাবে চেষ্টা কর। উপদেষ্টা বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কাউকেই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করেননি, শোক-বিহ্বল আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন যে তাঁর ব্যাখ্যাত ধর্ম-উপদেশই তাঁর শিষ্যবর্গকে পথের নির্দেশ দেবে। আনন্দকে তিনি আরও বলেন যে তাঁরা যেন 'অত্তদীপা, অত্তসরণা' হয়। 'অত্তদীপ' শব্দটি আত্মদীপ ও আত্মদ্বীপ এই দু'রকম অর্থই প্রকাশ করতে পারে। প্রথম যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'দীপ' অর্থাৎ প্রদীপ অর্থেই শব্দটির ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে নানা তথ্যের ভিত্তিতে শব্দটিকে 'দ্বীপ' অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থে বুদ্ধের উক্তিটির ব্যাখ্যা হবে,— ভিক্ষুগণ যেন নিজেদের দ্বীপের মত দৃঢ় করে। সমুদ্রের জলপ্লাবন যেমন দ্বীপস্থিত ব্যক্তিদের বিপন্ন করতে পারে না, তেমনই নিজেদের আত্ম-শক্তির দ্বারাই ভিক্ষুরা নিজেদের সংসার-প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারবে। তাঁর জন্ম ও বোধিলাভেব মত তাঁর মহাপরিনির্বাণও হয় এক বৈশাখী পূর্ণিমাতে— বৌদ্ধদের কাছে বৈশাখী পূর্ণিমা ত্রিধা-পুণ্যদিন। তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর

মল্ল-রাজারা উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন স্থানে আটটি স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের ভৌতিক দেহাবশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে শাস্তার ভূমিকায় বুদ্ধ অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এ সব কিছুই করেছেন অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে। কোন প্রশ্নের জন্যই কখনও তিনি উষ্মা প্রকাশ করেননি বা প্রতিপক্ষের কটু মন্তব্যের জন্য অনুরূপ মন্তব্য করেননি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জীব-কল্যাণের দিকেই তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। বারবার তিনি শিষ্যদের সতর্ক করেছেন যে তাঁরা যেন কারও প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মত বা পথ অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে না নেন। সব কিছুই যেন যুক্তি বা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর উপদেশের মধ্যে আমরা কোন মতবাদ বা dogma প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখি না। বিশ্বাস নয়, আচরণই হল তাঁর শিক্ষা বা ধর্মের ভিত্তি। কোন পরম্পরাগত সংস্কার বা অপরের কাছে শোনা কোন বিষয়কে তাঁর শিষ্যবর্গ যেন মেনে না নেন সেদিকে তিনি সতর্ক ছিলেন। অপরের দোষত্রুটির সমালোচনা না করে তাঁর শিষ্যরা যেন নিজেদের দোষত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখে :

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো ব অবেক্ষেয্য কতানি অকতানি চ।।

'অপরের দোষ-ত্রুটি, অপরের কৃত ও অকৃত কর্ম দেখো না,
নিজের দোষত্রুটি, কৃত-অকৃত কর্ম লক্ষ্য করবে।'

সমকালীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি অভিনব ও অভূতপূর্ব ঘটনা যে বুদ্ধের মত একজন ধর্মোপদেশক সর্বসাধারণের মধ্যে নেমে এসে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ একটি মুক্তিপথের ব্যাখ্যান করছেন। উপনিষদের ঋষিদের আমরা পরম-তত্ত্ব প্রকাশ করতে দেখি আপন গোত্রজাত ব্যক্তি, যাঁরা পরা-জ্ঞান লাভের উপযুক্ত আধার বলে বিবেচিত হতেন তাঁদের কাছেই। কিন্তু সর্বসাধারণের দুঃখ-প্রমোচকরূপে আবির্ভূত বুদ্ধের কাছে সকলেরই উপদেশ পাবার অধিকার ছিল।

বৌদ্ধধর্মকে সদ্ধর্ম বলা হয়ে থাকে। ধর্মচক্রপ্রবর্তনের ক্ষণ থেকেই এই সদ্ধর্মের উদ্ভব। সদ্ধর্ম অর্থাৎ সত্যধর্ম বা উত্তম ধর্ম, উত্তম চর্যা, উত্তম শিক্ষা অথবা উত্তমের জন্য উপদেশাবলী, যেভাবেই সদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করা হোক, —এই ধর্ম কিন্তু সাধারণ প্রচলিত অর্থে ধর্ম বা religion নয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যাখ্যাত শিক্ষা বিষয়ে কোন সংশয়, বিতর্ক বা প্রতিবাদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তেমন কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি স্বয়ং তার নিরসন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই তাঁর শিক্ষা-উপদেশ বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে আনন্দ প্রমুখ বুদ্ধ শিষ্যগণ একটি সঙ্গীতির (Council) অনুষ্ঠান করলেন। আনন্দ সহ পাঁচশত অর্হৎ মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে রাজগৃহে 'সপ্তপর্ণী' গুহায় মিলিত হয়ে বুদ্ধবচন আবৃত্তি করার ব্যবস্থা করেন। আনন্দ স্বয়ং আবৃত্তি করেন 'ধর্ম'-বিষয়ক বুদ্ধবচন এবং উপালির উপর ভার পড়ে বিনয়-সংক্রান্ত বুদ্ধোপদেশ উপস্থাপিত করার। এই দুই প্রমুখ শিষ্য বুদ্ধের সঙ্গে অবস্থান কালে শাস্তার মুখে যেমনভাবে উপদেশ শুনেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁদের বিষয়গুলি আবৃত্তি করেন। উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের অবর্তমানে কোন বিষয় সম্বন্ধে বুদ্ধের নির্দেশ কী ছিল সে সম্বন্ধে সম্ভাব্য সন্দেহ বা বিতর্কের অবসান ঘটানো। বিশুদ্ধভাবে বুদ্ধবচন রক্ষা করার এই প্রথম প্রয়াস বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি নামে পরিচিত। এই সঙ্গীতির একশত বৎসর পর বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্য অনুসারে অজাতশত্রুর অন্যতম বংশধর

কালাশোকেব শাসনকালে এই সঙ্গীতি হয়েছিল। এই সঙ্গীতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে অধিবেশনের কোন নেতা ছিলেন না। প্রাথমিকভাবে এই সঙ্গীতিতে সাতশত ভিক্ষুব অংশগ্রহণের কথা হলেও শেষ পর্যন্ত বিচার্য বা আলোচ্য বিষয় পূর্বপ্রান্তের চারজন এবং পশ্চিম প্রান্তের চাবজন নিয়ে গঠিত একটি ভিক্ষু-সংসদের কাছে উপস্থাপিত হয়। বৈশালীর বৃজি-পুত্র (বজ্জি) নামে পরিচিত ভিক্ষুরা এমন দশটি বস্তুর ব্যবহার বা আচরণ করতেন যা সাধারণভাবে অবৈধ বা বিনয়-সম্মত ছিল না বলে নিষ্ঠাবান ভিক্ষুদের মনে হয়েছিল। বিতর্কের সুষ্ঠু নিষ্পত্তির জন্যই এই সঙ্গীতির ব্যবস্থা এবং ভিক্ষু-সংসদে বৃজিপুত্রদের আচরণ বিনয়ানুগ নয় বলে ঘোষণা করা হয়। এর পব বুদ্ধানুরাগী সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্রে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বৃজিপুত্র-ভিক্ষুদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সঙ্ঘভেদের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তার ফলে সম্রাট অশোকের বাজত্বকালেব আগেই বৌদ্ধসঙ্ঘ অন্তত আঠারোটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া বুদ্ধের তিরোধানের ২০০ বৎসরের মধ্যে বহু নিষ্ঠাহীন স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেছিল। নানা বিরুদ্ধ মত ও অধর্মীয় আচরণ সাধারণভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি কবেছিল যে, নিয়মানুসাবী ভিক্ষুরা অ-ভিক্ষুজনোচিত কাজকর্মে লিপ্ত ভিক্ষুদের সঙ্গে একত্র 'উপোসথ' অনুষ্ঠান করতে অসম্মত হন। এর ফলে প্রায় সাত বৎসর পাটলিপুত্রের ভিক্ষুরা কোন 'উপোসথ' অনুষ্ঠান করেননি। এই অবস্থায় বিচলিত মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স-র উপদেশে সম্রাট অশোক বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই তৃতীয় মহাসঙ্গীতির ব্যবস্থা করেন। সঙ্গীতিব আগেই অ-ধর্মীয় ও অবৈধ আচরণকারী দোষী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সঙ্গীতির উল্লেখযোগ্য অবদান হল অভিধম্ম-পিটকের অন্যতম গ্রন্থ 'কথাবত্থু' প্রণয়ন। এই সঙ্গীতিব নেতা সঙঘথের মোগ্‌গলিপুত্ত-তিস্‌স প্রতিপক্ষ ভিক্ষুদের মতের বিরুদ্ধে স্থবিরবাদী মতের প্রতিষ্ঠাব জন্য 'কথাবত্থু'-ব সংকলন করেন। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ-পরম্পরানুসারে এই সঙ্গীতির পরই মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের উদ্যোগে বুদ্ধ-শিক্ষার প্রচারকল্পে নয়-জন প্রচারক বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হন। এদের মধ্যে সিংহল দেশে যান মহেন্দ্র, যাঁকে সম্রাট অশোকের পুত্র, বা মতান্তরে ভ্রাতা বলে উল্লেখ করা হয়। প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সম্রাট অশোকের আগে বুদ্ধের শিক্ষা মুখ্যত ভারতবর্ষের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমনকী তা ভারতবর্ষেরও সর্বত্র প্রচারিত ছিল না। অশোক এবং তাঁব সমসাময়িক ধর্মাচার্যগণের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় শুধু ভাবতবর্ষ বা বৃহত্তর ভারত নয়—বহির্ভারতেও বৌদ্ধধর্ম প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। সেই ইতিহাস একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অন্যদিকে তা ভারতবর্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

সম্রাট কণিষ্কের সময় জলন্ধরে মতান্তরে কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অধিবেশন বসেছিল। পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে অংশ নেন এবং তাঁদের কাজ ছিল পিটকগুলির টীকা প্রস্তুত কবা। প্রতিটি এক লক্ষ শ্লোকে এই সঙ্গীতিতে সুত্ত-পিটকের টীকা, বিনয়-বিভাষা এবং অভিধর্ম-বিভাবা রচিত হয়। সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধ-শাস্ত্র বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং সেই জন্য বৌদ্ধদের শাস্ত্রবিষয়ে অন্তঃকলহ দূর করার জন্য তিনি এই সঙ্গীতির বিষয়ে উদ্যোগী হন। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধরাই সম্ভবত এই সঙ্গীতিতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচীন কোন সূত্রের সাহায্যেই আজ আমরা জানতে পারি না চতুর্থ সঙ্গীতিতে রচিত বিভাষাগুলির ভাষা কী ছিল। আচার্য বসুবন্ধু সম্ভবতঃ এই বিভাষাগুলির আধারেই তাঁর অভিধর্ম-কোষ রচনা করেন এবং যশোমিত্র অভিধর্ম কোষ গ্রন্থের টীকা 'স্ফুটার্থা'-তে বিভাষাগুলি

থেকে অবিকল উদ্ধৃতি দেওয়ায় মনে করা যেতে পারে যে ঐ সঙ্গীতির অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছিল। ঘোষক রচিত অভিধর্মামৃত গ্রন্থটিও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় বলে মনে কবা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ সঙ্গীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সংস্কৃত ভাষাকে বৌদ্ধশাস্ত্রের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা।

বৌদ্ধ-সাহিত্যের সংকলন, পরিমার্জন ও প্রচারে এই সঙ্গীতিগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বৌদ্ধ-শাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ক কোন আলোচনাই এই সঙ্গীতিগুলিকে পাশ কাটিয়ে করা সম্ভব নয়। বুদ্ধ-বাণী সংরক্ষণেব উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এই চারটি সঙ্গীতির অধিবেশন হওয়ার পর শ্রীলঙ্কায় তিনটি, শ্যামদেশে দু'টি এবং মাযানমাব বা ব্রহ্মদেশে দু'টি সঙ্গীতির অধিবেশন হয়েছে। ব্রহ্মদেশের শেষ অধিবেশনটি ১৯৫৪ সালেব মে মাসে রেঙ্গুনে শুরু হয়ে ১৯৫৬ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। মনে করা হয় যে সমাপ্তি অধিবেশনের দিনটিই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণেব ২৫০০ তম বর্ষপূর্তি। বহির্ভারতে বৌদ্ধ-সঙ্গীতির যে অধিবেশনগুলি বসেছে, তার মধ্যে শ্রীলঙ্কার রাজা বট্টগামনীর পৃষ্ঠপোষকতায় খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে যে অধিবেশন বসেছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যেব ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম। রাজা বট্টগামনীর নির্দেশে ঐ সঙ্গীতিতেই ত্রিপিটক আবৃত্তি করে প্রথম লিপিবদ্ধ কবা হয়। এবং টীকাগুলিকেও পরীক্ষা করে প্রয়োজনমত সংশোধন ও বিষয়-ক্রম অনুসাবে বিন্যাস করা হয। শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্য অনুসারে মনে করা অসঙ্গত হবে না যে সম্রাট অশোকের সময় মহেন্দ্র যে পিটকগুলি নিয়ে শ্রীলঙ্কায় যান তা 'পালি ত্রিপিটক' ছিল এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গীতিতে ঐ 'ত্রিপিটক'-ই লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আমরা যে পালি ত্রিপিটক পাই তা ঐ সময় লিপিবদ্ধ 'ত্রিপিটক' এবং থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে ঐ ত্রিপিটকেই বুদ্ধ-বচন শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে।

মত, আদর্শ এবং দর্শনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অনুসারে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যগণ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে যান—হীনযান ও মহাযান। হীনযানীদের প্রাচীন রক্ষণশীল এবং মহাযানীদের উচ্চ আদর্শবাদী ও উদাব-মতাবলম্বী বলে মনে করা হয়। হীনযান-সম্প্রদায় শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি প্রধানতঃ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে আর মহাযান-মতবাদ চীন, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। হীনযানীরা অবশ্য নিজেদের হীনযানী বলে কখনও অভিহিত করেননি। স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে সম্প্রদায় দু'টি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। অশোকেব পূর্বেই সঙ্ঘের মধ্যে আমরা আঠারোটি হীনযানী শাখার উদ্ভব দেখি এবং এদের মধ্যে দশটি শাখা বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। এই দশটি শাখা হল : স্থবিরবাদ বা থেরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল-সর্বাস্তিবাদ, সাম্মিতীয়, মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিরই বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ খুব প্রাচীন কালেই অন্য শাখাগুলি থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিল এবং মতাদর্শ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এদের থেকেই খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহাযানের উদ্ভব। মহাযানী সম্প্রদায়ের মূলতঃ দুইটি শাখা, মাধ্যমিক ও যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। এই দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও আচার্যদের বহু মৌলিক রচনা ও ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের একটি তৃতীয় শাখা আত্মপ্রকাশ করে। এই শাখা বজ্রযান নামে পরিচিত। মহাযানের উদার মতবাদ, করুণার প্রতি বিশেষ গুরুত্বহেতু সর্বসাধারণকে মুক্তির

আশ্বাস বজ্রযানের উদ্ভবের পথ সুগম করেছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং সমকালীন আচার-বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষমূলক মনোভাব হেতু বিভিন্ন ধরণের আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল এবং অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মের এই শাখায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল। যে গৌতম-বুদ্ধ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ একটি পথের সন্ধান দিয়ে দেব-দেবীর পূজা ও ঐশ দেব-ভাব বর্জন করার উপদেশ দিয়েছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত দেবত্বে উন্নীত হয়ে দেবতা সুলভ পূজা পেতে শুরু করলেন। তিনি হয়ে উঠলেন অলৌকিক বা লোকোত্তর। কালক্রমে আরো বেশী আচার-অনুষ্ঠান এবং বহু সংখ্যক দেব-দেবী, যোগিনী, অশুভ শক্তি, প্রত্যন্ত প্রদেশের দেশজ ও বহিরাগত ভাব-ধারা বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে বুদ্ধ-বাণীকে অন্য এক রূপে প্রকাশ করল। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের এইমত রূপান্তর হতে লাগল। এই প্রক্রিয়ায় সহজযান, কালচক্র-যান প্রভৃতি মতবাদ বজ্রযানের বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যেই উদ্ভূত হলেও এই দুটিকেও পৃথক 'যান' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের এই শেষ পর্যায়ের পরিণতি সম্পূর্ণতঃ তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম রূপে সাধারণভাবে পরিচিত। হীনযান, মহাযান বা তন্ত্রযান অথবা বজ্রযান ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভাবে প্রচারিত হলেও শাখাগুলি বুদ্ধের মূল যে শিক্ষা অর্থাৎ চতুরার্য-সত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, মৈত্রী-করুণা প্রভৃতি ব্রহ্মবিহার ভাবনা বর্জন করেননি। এইমাত্র বক্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীরা এই নীতি বা তত্ত্বগুলির নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যা করেছে।

আড়াই হাজার বছরেরও বেশী হয়ে গেছে হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে বুদ্ধ তাঁর প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর অমৃতধারা সিঞ্চন করে মানুষকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবার পথ নির্দেশ করে গেছেন। এতদিন পরও আমরা তাঁর বাণী ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হই যে এই বিংশ শতাব্দীতেও বুদ্ধের উপদেশ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখমোচনে কত অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক। শ্রদ্ধাপ্লুত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত-সেই মহাপ্রাণের সাধনা ও নিরলস প্রয়াসের কথা।

মানুষের জীবন ও চিন্তায় বুদ্ধের প্রভাব ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্রষ্টা যে কোন ধর্মনায়কের থেকে কম ব্যাপক বা গভীর নয়। মানুষের চিন্তা জগতে বুদ্ধ এক বিরল ব্যক্তিত্ব এবং সকল সভ্য মানুষের উত্তরাধিকার। প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতায়, নৈতিক নিষ্ঠায়, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল বুদ্ধদেবকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন রাধাকৃষ্ণন।[৯] বুদ্ধবাণী মানুষের প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করেছে, তিনি কেবল বিশ্বজনীন মৈত্রীর মূর্ত বিগ্রহ নন, তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। তাঁর শাশ্বত বাণীর মধ্যেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ খুঁজে পেয়েছে জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পথ। ললিতবিস্তরে বুদ্ধকে আর্ত মানুষের দুঃখ উপশমের জন্য ভিষক্-শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে,--

চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধি প্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।।[১০]
'বহুদিন ধরে রুগ্ণ ক্লেশ-ব্যাধি প্রপীড়িত এই জীবলোকে হে বৈদ্যরাট্,
তুমি সকল ব্যাধির প্রমোচকরূপে আবির্ভূত।'

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে তাঁর 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি'[১১] করেছেন এবং পার্থিব দুঃখ অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করে সেই মহামানবের শিক্ষার মধ্যেই মানুষের এই সমস্যা

সমাধানের উপায় দেখতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়,[১১] 'তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয় সদর্থক : যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী-সাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।' পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় শৈলীতে বুদ্ধের নতুন আবির্ভাবের জন্য উদাত্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন,

'নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃতবাণী।'[১৩]

স্মরণ করি বুদ্ধের সেই অপরিমেয় মৈত্রী-ভাব যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বলতে পারি--

'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা'[১৪] —সকল মানুষ সুখী হোক।

উল্লেখসূত্র

১। H. Nakamura, Gotama Buddha, পৃ ১২৭
২। E. Lamotte, L'histoire du Bouddhisme পৃ ১৩
৩। Indologica Taurinensia, x, 1982, পৃ ২৯
৪। E J Thomas, The Life of Buddha পৃ ৭১
H. Oldenberg, Buddha পৃ ১২৬
৫। P. V. Bapat, in Prajnaloka, 1, 3 & 4, পৃ ১২৭
৬। ধম্মপদ, ৫০ সংখ্যক গাথা
৭। 'উপোসথ' বৌদ্ধসঙ্ঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, এক প্রকার শুদ্ধি অনুষ্ঠান।
৮। S. Radhakrishnan, Dhammapnda, Introduction
৯। ঐ
১০। ললিতবিস্তর ২৩/৬
১১। রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১১/৪৬৯
১২। ঐ ১১/৪৭৩
১৩। ঐ ৪/১২৮
১৪। সুত্তনিপাত, মেত্তসুত্ত।

অশোকের ধারণায় "দিঢ়ভতিতা"

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৌর্য সম্রাট অশোকেব (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ - ২৩৬) সপ্তম সংখ্যক মুখ্য শিলালেখে "দিঢ়ভতিতা" (দৃঢ়ভক্তিতা) তাঁর প্রচারিত ধম্ম (ধর্ম) অনুশীলনের একটি অন্যতম বিষয় বলা হয়েছে।[১] একই ধবণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ত্রয়োদশ সংখ্যক মুখ্য শিলালেখে।[২]

ইংরাজী অনুবাদে আলোচ্য শব্দটিকে সাধারণতঃ "Firm devotion" বলে লেখা হয়ে থাকে।[৩] আচার্য দীনেশচন্দ্র সরকাবের মতে এর বাংলা অনুবাদ "গভীর ধর্মাসক্তি" বা "দৃঢ় অনুরাগ"[৪]। কিন্তু যিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন[৫], সেই সম্রাট অশোকের কোনও শিলালেখতে "দিঢ়ভতিতা" ("দৃঢ়ভক্তিতা") নিশ্চয় কারও নিজের ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তির, আসক্তির বা অনুরাগের অনুপ্রেরণা দিতে পারে না। তাহলে ওখানে আলোচ্য শব্দটির প্রকৃত প্রাসঙ্গিক অর্থ কি?

কান্দাহারের আবিষ্কৃত অশোকের গ্রীসীয় লেখটি এ বিষয়ের আলোচনায় সাহায্য কবতে পারে। অসম্পূর্ণ এই লেখটিতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক মুখ্য শিলালেখের বিষয়বস্তু আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে।[৬] ত্রয়োদশ সংখ্যক মুখ্য শিলালেখে যেখানে কলিঙ্গের ধর্মঅনুশীলনকারীদের কথা প্রসঙ্গে "দিঢ়ভতিতা" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে গ্রীসীয় অনুশাসনে তার পরিবর্তে লেখা হয়েছে Tous ekei oikountas edei ta tou Basileos sumpheronta noccin[৭]।

কান্দাহার লেখতে গ্রীসীয় লিপিতে এবং এখানে রোমক লিপিতে লেখা এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ করা হয়েছে-- "those who lived there had to mind the king's interest"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অশোক প্রচাবিত ধম্মের অনুশীলনের অঙ্গ হিসাবে দিঢ়ভতিতা বা দৃঢভক্তিতা বলতে যে আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ভক্তির পাত্র সম্রাট নিজে। কোনও ধর্ম বা দেবতা নয়।[৮]

এই ধরণের ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পাণিনির এক সূত্রে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর তারিখ নিশ্চয় প্রাকমৌর্যযুগের। এর এক সূত্রকে (৪. ৩. ১০০) অন্য আর কয়েকটি সূত্রেব (৪, ২, ১২৪, ৪, ২, ১২৫) সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে "ভক্তি" কথাটি এক অর্থে রাজা বা গর্ণরাজ্যের প্রতি প্রজার "আনুগত্য" বোঝাতে পাবে।[৯] সুতরাং অশোকের দুটি শিলালেখে যে "দিঢ়ভতিতা" বা "দৃঢ়ভক্তিতার" উল্লেখ আছে তা তাঁর পক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে অটুট আনুগত্য আশা করার ইঙ্গিত বলে ধরা যেতে পারে।[১০]

ত্রয়োদশ শিলালেখে ক্ষেত্রবিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগেব প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] সুতরাং অশোক যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও একেবারেই কোনওরূপ বলপ্রয়োগের বিরোধী ছিলেন তা নয়। নানা সমস্যায় বিব্রত সম্রাটের পক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে অবিচল আনুগত্য বা ভক্তি দাবী কবা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর প্রবর্তিত ধম্মের আলোচনায় প্রজাদের কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে, তাদের বিভিন্ন ধবণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।[১১] আর দাবী করা হয়েছে তাদের অবিচল ভক্তি।[১২] নিজের সামরিক বলের মতই এই ভক্তির প্রাধান্যের উপর বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল নির্ভরশীল।[১৩]

অশোকেব ধম্ম (ধর্ম) একধরণের রাজনৈতিক দর্শন।[১৪] একে সফল করতে গেলে বাজা, বাজপুরুষগণ এবং প্রজাপুঞ্জকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে। উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যকে সুশাসিত ও চিরস্থায়ী করা। এই সাম্রাজ্য প্রজাদের দৃঢ় ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

উল্লেখসূত্র

১। আব জি বসাক, অশোকান্ ইন্সক্রিপ্শন্, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ ৩৯।
২। ঐ, পৃ ৬৪।
৩। ঐ, পৃ ৩৯ ও ৭২. ই হুলশ, কর্পাস্ ইন্সক্রিপ্শিওনুস ইন্ডিকাকম, খণ্ড নং- ৩১, কলিকাতা, ১৯২৫, পৃ ১৩ ১৪, ৪৪ ও ৫৭, ইত্যাদি।
৪। দীনেশচন্দ্র সরকাব, অশোকের বাণী, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ ৬৭।
৫। আর জি বসাক, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৭ ও ৬১।
৬। বি এন মুখার্জী, স্টাডিজ ইন দি আরামযিক ইডিক্টস অফ অশোক, কলিকাতা, ১৯৮৪ পৃ ৫৩ - ৫৭।
৭। ঐ, পৃ ৩৬।
৮। ঐ, পৃ ৬২।
৯। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ৪, ৩, ১০০ , ৪, ২, ১২৪ ; ৪, ২, ১২৫ ; এস সি বসু, দি অষ্টাধ্যায়ী অফ পাণিনি, খণ্ড নং- ১, পুনর্মুদ্রণ, নিউ দিল্লী, ১৯৬২, পৃ ৭৮৩-৭৮৪, ভি এস অগ্রবাল, ইন্ডিযা এ্যাজ্ নোন্ টু পাণিনি, লখ্নউ, ১৯৫৪, পৃ ৪১৮।
১০। বি এন মুখার্জী, উপবোক্ত গ্রন্থ, পৃ- ৩৮ ও ৬২।
১১। আব জি বসাক, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৬৮-৭০ ও ৭২-৭৩।
১২। বি এন মুখার্জী, উপবোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৪ ইত্যাদি।
১৩। ঐ, পৃ ৬২।
১৪। ঐ, পৃ ৬১-৬২।
১৫। ঐ, পৃ ৬১।

ভারতাত্মায় ধর্ম : বীক্ষণ

প্রণবানন্দ যশ

ধর্মের অর্থ, কিংবা ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ, বড়ই গোলমেলে। স্থানকালপাত্র অনুসারে অর্থ নির্ণয় করাই সমীচীন নতুবা সমস্যা আর সংঘর্ষ। ছোট এই শব্দটি যেন বজ্র আর আগুন দিয়ে গড়া। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ভীষণ। একে লাভ করা দুঃসাধ্য, অস্বীকার করাও অসাধ্য। পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে শক্তির চিরন্তন এক রহস্যগ্রন্থি হল এই ধর্ম। ধর্ম বহমান জীবনচর্যায় এক আবিলতাময় বিশুদ্ধ ছন্দ। সংজ্ঞাহীন। অব্যক্তম। অহেরিব হি ধর্মস্য পদং দুঃখং গবেষিতুম্-- অর্থাৎ সাপের পদচিহ্ন যেমন দেখা যায় না, তেমনি ধর্মের গতিপথও অদৃশ্য। কত সুন্দর সুন্দর উপমা আর অভিধা সহযোগে মহাভারতের শান্তিপর্বে ধর্মের গতিপ্রকৃতি এবং সংজ্ঞা নিরূপণের প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সমাপনান্তে পূর্বের মতোই কুয়াশাচ্ছন্ন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। 'ধর্ম ক্ষুরের ধারের চেয়েও সূক্ষ্ম, পর্বতের চেয়েও গরীয়ান্' (অনীয়ান্ ক্ষুরধারায়া গরীযানপি পর্বতাৎ)। এত গুণলক্ষণের কথা বলেও, শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত হয়ে বলতে থাকি--"ধর্ম কূটস্থ অচল ধ্রুব। আবার আলোকের চেয়েও তীব্র বেগবান্ অস্থির চঞ্চল। একই সঙ্গে কালাতীত এবং কালগত। স্থিতি আর গতির প্রহেলিকার মধ্যে ধর্ম এক রহস্যময় মন্ত্রগুপ্তি।"

ধর্ম সম্পর্কে উপরে কয়েকটি কথা তুলে ধরলাম চটজলদি 'ধর্ম' বিষয়ে কোনো ধারণা থেকে বিরত বা সংযত থাকার জন্য। সত্যাশ্রিত ভারতীয় ধর্ম-দর্শন প্রকৃত অর্থে কোথাও কোনো সংঘাত সংঘর্ষের কথা 'বলে না'; অবশ্য অনেকক্ষেত্রে আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিকৃত অর্থমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রূপান্তরিত করা হয়। যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ আর বীক্ষণের সুচারু প্রয়োগেই ধর্মের যথার্থ স্থিতি। ধর্মের মূল্য প্রসঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের (ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) সুন্দর মন্তব্যটি তুলে ধরছি-- "আমাদের মধ্যে অনেকেই বালুতটে ঝিনুক কুড়ানোর মত সহজেই ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। শ্রমসাধ্য সাধনায় আমাদের ধৈর্যও নেই, শক্তিও নেই। আমরা যেমন ব্ল্যাকওয়েল কোম্পানী থেকে বই কিনি, চাষীর কাছ থেকে ডিম কিনি বা ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনি, তেমনি আশা করি একজন পাদ্রী বা পুরোহিত কয়েক শিলিং মূল্যে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে আমাদের ধর্ম দেবেন। কিন্তু ধার্মিক হতে হলে অনেক মূল্য দিতে হয়। মানুষের সাধনার প্রারম্ভ থেকেই বাসনা ও ধারণাকে বাস্তবে রূপায়ণ সহজসাধ্য ছিল না। ভারতের মহান রাজপুত্র বুদ্ধের রাজ্য, রাজপ্রাসাদ এবং সমস্ত রকমের সুখ, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি এ সমস্ত থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন, এ সমস্তই পরিত্যাগ করেছিলেন কঠিনহৃদয় বলে নয়, সত্যকে চাইতেন

বলে। এই ভাবেই তিনি তাঁর আবেগপ্রবণ প্রকৃতি জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং নিজের মধ্যে বিশ্বকে প্রতিফলিত করেছিলেন।"

আলোচনার বিষয়বস্তু ভারতীয় ধর্ম হলেও আমাদেব আলোচনার প্রেক্ষাপটে থাকবে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের পদরেণুবিজড়িত চারণভূমি এবং সমসাময়িককালের প্রাজ্ঞ মননশীল মনীষীবৃন্দের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনার মূল সুরটি। আড়াই হাজার বছর পূর্বে মধ্যগঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় ; সকলেই ধর্মের অনুশাসন অনুসরণ করতেন, নিজ নিজ ধর্ম-মাহাত্ম্য কীর্তন কবতেন। বর্জিত ছিল বাদ-বিসংবাদ, সংঘর্ষ আর সংঘাত। বৈদিকোত্তর যুগের বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের উদ্ভবেব মধ্যেই প্রোথিত আছে আধ্যাত্মিক ও চিন্তাজগতের অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টির মৌলিক ধারাটি। আর্য ব্রাহ্মণ ধর্ম নিয়ন্ত্রিত সমাজ, সক্ষম ছিল না সমগ্র মানবমনের ধর্মদেশনা নিবৃত্তি সাধনে। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ নির্দেশিত বৈদিক ধর্মের বিকল্প ধর্মরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অপরিহার্য ছিল। ভারত তথা পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসে এইসব ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মীয় গতি-প্রকৃতির সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট কোন দিগদর্শনে ব্যর্থ-অঘনীভূত পর্যায়ে স্থিত। বিকল্প এই ধর্মীয় গতিপ্রকৃতির অভ্যন্তরে অনেকেই প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের ইঙ্গিত খুঁজেছেন। 'আন্দোলন' বলা সমীচীন কিনা ভাববার অবকাশ আছে- ববং বলা যায় বিকল্প পথের অন্বেষণ।

ধর্ম—সত্য, ঋত। মুনি-ঋষি-মনীষীগণের অভিজ্ঞান-লব্ধ যুক্তিনিষ্ঠ সত্যই ধর্ম। যুক্তিহীন বিচারে সত্যলাভ হয় না, বরং ধর্মহানি ঘটে। বুদ্ধি বিচারকে ত্যাগ করে বিবেক সুস্থভাবে চালিত হতে পারে না। এই প্রত্যয় বুদ্ধ, মহাবীর, বৃহস্পতি কিংবা শঙ্করাচার্যেব মতো প্রাচীন বৌদ্ধিক বাণীতে বারে বারে বহুরূপে ধ্বনিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভিতরেই কোথাও এর স্থান আছে-- সে কথা বিশ্বাস করা হয়। যে সময়ের কথা আলোচিত হচ্ছে সে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশেষতঃ উপনিষদ-গীতার বাণীও বিষয় বহির্ভূত নয়, যদিও স্থানকালপাত্রের নিরিখে সার্বিক স্বীকার্য কিনা সে সম্পর্কে সংশয়মুক্ত নয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবনচরিত, তাঁর বাণী, যাব কিছু কিছু 'ধম্মপদ'-র মধ্যে প্রকাশিত, ভারতবর্ষের মর্মকোষ থেকে উদ্‌গত হয়ে আমাদের ধর্মীয় জীবনকে নানাভাবে পরিপূর্ণতা দান করেছে। বিশ্বজনচিত্তে চিরন্তন মাধুর্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যটুকু তুলে ধরছি--

"গীতা ও উপনিষদ যে অংশে সর্বজনীন সে অংশেও তা এমন কতকগুলি তত্ত্ব ও রহস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা সকলের পক্ষে অধিগম্য নয় এবং অধিগম্য হলেও সমভাবে স্বীকার্য নয়। ধম্মপদ কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই তত্ত্ববিচারনিরপেক্ষ। তাই সকলের হৃদয়কেই প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করার পক্ষে কোনো অন্তরায় নেই।... তত্ত্ববিদ্যা-নিবপেক্ষভাবে শুধু আচরণসাধ্য জীবননীতির আদর্শে সর্বমানবকে সার্থকতার পথে প্রবর্তিত করাই এর লক্ষ্য। এই বিশিষ্টতাই ধম্মপদকে বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।" (ধম্মপদ - পরিচয়)

কথাগুলির উল্লেখ করলাম সমসাময়িক কাল-সমাজ-ধর্ম সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভের আশায়। জটিল যাগযজ্ঞকেন্দ্রিক, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যনির্ভব, বৈষম্যমূলক এবং অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ বৈদিকধর্ম সাধারণ জনজীবনের ধর্মপিপাসা নিবারণে ছিল ব্যর্থ, অক্ষম। অস্থিরতা ছিল সার্বিকভাবে সবক্ষেত্রেই – রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায়। ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে

প্রাচ্যদেশ বা পূর্বভারতের ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী থেকে ধর্মসংস্কারকরূপে আর্বিভাব ঘটে বিভিন্ন চিন্তানায়ক দার্শনিক এবং মহামানবের। ব্রাহ্মণবাদের প্রাধান্য, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড, কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন এবং আচার অনুষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তা গৌতম বুদ্ধের জীবনচর্যার ভিতর সার্থকরূপে প্রতিফলিত। একথা বিস্মৃত হওয়া অনৈতিহাসিক যে বুদ্ধ-- সমসাময়িককালে ধর্মীয় জীবনধাবাব ধ্যানধাবণায় সংযোজিত হয়েছে এক নতুনতর মাত্রা। সন্ধান মিলেছে এক নতুন পথের—যার প্রেরণায় তৃষিত তাপিত মানবহৃদয় অমৃত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত। প্রাচ্য-ধর্ম পরিচিত হল এক নতুন ধর্ম-সংজ্ঞার বিভূষণে-- "দিব্যের নিবিড়তর সান্নিধ্যলাভের জন্য নির্জনবাসই যথেষ্ট নয়। ধর্ম শুধু জীবনাতীতই নয়, জীবন-পরিবর্তনকারীও। পীড়িত মানবতার সেবাই যথার্থ পূজা। প্রত্যেকটি মানবাত্মার অপরিসীম মূল্যস্বীকৃতিই সারধর্মের চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব। সমস্ত মানবাত্মাব সচেতন ঐক্যবোধের দিব্যানন্দ মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ দূর করে। মানবজাতির ঐক্যানুভূতিব সম্বন্ধে সংজ্ঞা থাকায় সত্যধর্ম এক আধ্যাত্মিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়।" (সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ . ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। অনুরূপ ধর্মসাধনার পরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় মহামানব গৌতমবুদ্ধের ধর্ম-কর্মের ভাবনাচিন্তা আরাধনায়। তিনি জগৎকে অবলোকন করেন বাস্তবদৃষ্টিতে। কত সহজ সরলভাবে তাঁব সাধনালব্ধ উপলব্ধিটুকু নিবেদন করেছেন-- দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে , দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব এবং তারজন্য প্রয়োজন সঠিক পথের সন্ধান। এগুলি আর্যসত্য, ধ্রুবসত্য, অমোঘ, শাশ্বত, সনাতন। দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণলাভের উপায় নির্দেশই ছিল গৌতমের সাধনায় একমাত্র লক্ষ্য, ব্রত, সাধনতত্ত্ব। জীবনচর্চার মৌলিক দর্শন। ভোগ নয় ত্যাগ যেমন সত্য, তেমনি পরিত্যাজ্য অসহনীয় কৃচ্ছ্রসাধন কিংবা অস্বাভাবিক ভোগবিলাসময় জীবনধারণ। সবরকম বাড়াবাড়িই পরিতাপের। প্রয়োজন মধ্যপন্থার। তাই মানুষের অজ্ঞতা, কামনাবাসনা ইত্যাদির অবসানকল্পে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণের নির্দেশ দেন। যেমন-- সম্মা বাচা (সদ্বাক্য), সম্মা কম্মন্ত (সৎকর্ম), সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা), সম্মা বায়াম (যথার্থ শ্রম), সম্মা মতি (যথার্থ মনন), সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান), সম্মা সঙ্কল্প (যথার্থ সংকল্প) এবং সম্মা দিট্‌ঠি (যথার্থ দৃষ্টি)। বুদ্ধের নির্দেশিত বিধানগুলিকে দৈহিক (শীল), মানসিক (চিত্ত বা সমাধি) এবং বৌদ্ধিক (প্রজ্ঞা)-এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ দীঘনিকায়ে বলা আছে...

শীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুত্তরা।
অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গৌতমেন যসস্সিনা।।

কায়মনোবাক্যে এই আটটি পথ অনুসরণে দুঃখ নিবৃত্তির অসীম পাথার পার হওয়া সম্ভব-- সেকথাগুলিই বুদ্ধদেব বারবার বলে গেছেন তাঁর ধর্মদেশনার মধ্য দিয়ে।

বুদ্ধেব সমসাময়িককালে ধর্মের ধ্বজা ধরে নিপীডন বা হত্যাকাণ্ডেব কিংবা লুঠলুণ্ঠন অগ্নিসংযোগের হদিশ মেলা ভার। নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজনিজ ধর্মীয় ভাবনাচিন্তার প্রকাশের সুযোগ সুবিধা ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। প্রথম দিকের উপনিষদ এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণপ্রভাবমুক্ত নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী কালে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসে পরিব্রাজক বা শ্রমণ অভিধায় পরিচিত একদল সন্ন্যাসী, মুনি, যতি, ভিক্ষু, প্রভৃতি এই নবচিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন। সমাজ ও প্রকৃতিতে মানুষের স্থান কোথায় এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা কয়েকটি সুস্থ এবং সৎ শীল-এর অনুগামী হতে নির্দেশ দেন। আচার-আচরণ, বিচাব-বিশ্লেষণেব ভেদ-ভাবনা

প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন নামে পবিবেশিত আছে বৌদ্ধ, জৈন কিংবা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের রূপরেখায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ৬২ রকম মতবাদ পূর্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিত রূপে দু'ভাগে বিভাজিত। কিন্তু জৈন গ্রন্থে ৩৬৩টি মতবাদের উল্লেখ আছে-- যেগুলি চাবটি পৃথক পৃথক ভাবধারায় চিত্রিত আছে-- যেমন, ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ। ক্রিয়াবাদীদেরও ১৮০টি রকমফের আছে। এই ধরণের মতাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে দুঃখ মানুষের নিজের সৃষ্টি, বাইরের কোন শক্তির ভূমিকা নাই। জ্ঞান আর সদাচরণের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় (বিজ্জা-চরণং পামোক্ষম্)। এঁরা মনে করেন যে মূর্খেরা অসৎ কর্মের দ্বারা চালিত হয় কিন্তু জ্ঞানী লোকেবা কুকর্ম না করেও তা পারেন (ন কম্মনা কম্ম খবেংতি বালা, অকম্মানা কম্ম খবেংতি ধীরো)।

ক্রিয়াবাদের বিপরীত কর্মকাণ্ডের বিশ্বাসী হলেন-- অক্রিয়াবাদী। এঁদেব বিশ্বাস হল কর্মের কোনো ফল নাই। নিষ্ফল। সকল প্রকার মানবিক প্রচেষ্টাই নিষ্ফল। জৈন সাহিত্য ঠানাঙ্গ সূত্রে আট প্রকার অক্রিয়াবাদের উল্লেখ আছে-- এক্কবাদ (অদ্বৈতপন্থী), অনিক্কবাদ (বহুত্ববাদী), মিতবাদ ও নিম্মিতবাদ (বিশ্বতাত্ত্বিক) ; সায়বাদ (সম্ভোগবাদী) ; সমুচ্ছেদবাদ বা উচ্ছেদবাদ এবং ন-সন্তি-পরলোকবাদ অর্থাৎ যাঁরা পরলোকে বিশ্বাস করেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও যদৃচ্ছাবাদীদের অক্রিয়াবাদী বলা হয়েছে। জৈন অজ্ঞানবাদীরা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখিত অমরাবিক্ষেপিকদের সহমতাবলম্বী। এঁদের স্বভাবই হল কোন প্রশ্নেব সহজ এবং সুনির্দিষ্ট উত্তর না দেওয়া। অজ্ঞানবাদের ৬৭ প্রকার রকমভেদ পাওয়া যায়। বিনয়বাদীগণ সুনির্দিষ্ট কতকগুলি নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতেন, যদিও এঁদের মধ্যেও প্রায় ৩২ বকমেব মতামত লক্ষ্য করা যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তার স্ফুরণ, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক তত্ত্বেব যেমন চর্চা কবা হযেছে, তেমনি বাস্তবোচিত দৈনন্দিন কর্মধাবাও বিবর্জিত হয়।

এত সব ভিন্ন ভিন্ন ধবণেব মতবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রকাব অশান্তির বাতাবরণ ধর্মীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য কবা যায না। নিজ নিজ মতবাদ এবং ভাবাদর্শের প্রকাশ সহজেই করতে পারতেন। সব মতবাদ যে কালের নিরিখে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে কথা বলা যায না। তবে এঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনেব চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বাখতে সমর্থ হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

মহাবীব বা নিগ্রন্থ নাতপুত্তের নামটি প্রথমেই স্মবণে আসে। ইনি জৈন তীর্থঙ্কবদেব চব্বিশতম বা শেষ তীর্থঙ্কর। এঁর পূর্বসূরী কাশীবাসী পার্শ্বনাথও ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন জৈন ধর্ম বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহেব অবকাশ নাই। পার্শ্বনাথ মানবজীবনেব দুঃখময় দিকটাই বড় করে তুলে ধবেছিলেন এবং দুঃখেব অবসানকল্পে তাঁর অনুগামীদেব চাবটি ব্রত (চতুর্যাম) পালনের নির্দেশ দেন-- যেমন,

১। অহিংসা বা কোন জীবেব প্রতি হিংসা না কবা ,

২। সত্য বা সকল অবস্থায় সত্য কথা বলা ,

৩। অস্তেয বা চুরি না করা , এবং

৪। অপরিগ্রহ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক না হওয়া।

পার্শ্বনাথ প্রচলিত 'চতুর্যাম' ব্রতের সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্য বা দৈহিক ভোগে লিপ্ত না-হওয়া ব্রতটি সংযোগ কবে পঞ্চমহাব্রত পালনের উপদেশ দেন। সমসাময়িক কালের সমাজ ব্যবস্থায় এবং ধর্মীয়

বাতাবরণে এই ধরণের অনুশাসন বিশেষরূপে অনুভূত হওয়ায় মহাবীর ব্রহ্মচর্য-- অনুশাসনটির উপর অত্যধিক জোর দেন। অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী , কিন্তু কর্মবাদ তত্ত্বের বিরোধী নন। এই কর্মবাদ অনুসারে জীব যথার্থ বিশ্বাস, জ্ঞান ও সদাচরণ অর্থাৎ এই ত্রিরত্ন অনুশীলনের দ্বারা কর্মের বন্ধন ছিন্ন করে নির্বাণ লাভে সক্ষম। আত্মসংযম এঁদের মূলকথা ; ত্যাগ আর পবিত্রতার সাধনাই নির্বাণলাভের সাধনা। কিন্তু প্রমাণ হিসাবে 'প্রত্যক্ষ' 'অনুমান' এবং 'শব্দ'— তিনটি গ্রহণ করে স্যাদ্‌বাদ বা অনেকান্তবাদের প্রচার জৈনদর্শন তথা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের নূতন চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম (মুখ্যতঃ পালি) এবং জৈনধর্ম (মুখ্যতঃ প্রাকৃত) স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, আরও অনেক মতবাদ একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল। তৎকালীন ধর্ম ও আচারের প্রাচীর লঙ্ঘন করে মুক্তচিন্তার প্রকাশনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিভিন্ন মনীষীগণ। বাধা বিরোধের কোন ঘটনা নয়। জ্ঞান-প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ, সারস্বতের সাধনা। তাঁদের চিন্তাধারায় যেমন আছে ক্ষুরধারসম জ্ঞানের দ্যুতি, তেমনি ধরা আছে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক আর আর্থ-সামাজিক অবস্থার চালচিত্রটি।

পূরণ কস্‌সপ অহেতুবাদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রচারক, বুদ্ধের সমকালীন। অক্রিয়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর মতবাদ। হতাশাব্যঞ্জক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে আত্মহত্যার মাধ্যমে। তাঁর মতে ন্যায় বা অন্যায় কোনো ক্রিয়ায় পাপ বা পুণ্যের আগম হয় না। বৌদ্ধসাহিত্যে গোশালের মতাদর্শের কিছু কিছু পূরণের মধ্যে আরোপিত। সেজন্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে পূরণ ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবক্তা-- গোশালের পূর্বসুরী।

গোশাল ছিলেন নিয়তিবাদের প্রবক্তা। তাঁর সম্পূর্ণ নাম মংখলিপুত্র গোশাল। প্রথমে জৈনধর্মের অনুগামী ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে মহাবীরের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তিনি জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং আজীবিক ধর্মানুসরণ করেন। বৌদ্ধ জৈন ধর্মের পাশাপাশি আজীবিক ধর্ম সমসাময়িক সামাজিক জীবনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনকি জৈন ধর্মের বিধি ব্যবস্থায় গোশালের প্রভাব লক্ষণীয়, যেমন কঠিন তপশ্চর্যা, নগ্নতা, ইত্যাদি। আবার আজীবিকদের ছ'রকমের 'অভিজাতি'র ধারণা জৈন 'লেশ্যার' ধারণাকে এবং জীবের শ্রেণী বিভাগের বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে। ক্রিয়াবাদী জৈনদের নিকট গোশাল ছিলেন অক্রিয়াবাদী এবং নিয়তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মানুষ অবস্থার দাস, তার কোন ক্রিয়ার কোন ফল নাই, সে নিয়তি বা ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর মতে-- "আত্মকার নাই, পর-কার নাই, পুরুষ-কার নাই, বল নাই, বীর্য নাই. । সর্ব সত্ত্ব, সর্ব প্রাণী, সর্বভূত, সর্বজীব, অবশ, অবল, নির্বীর্য। তাহারা নিয়তি ও সংযোগে পরিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাত্যনুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।" ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে চরম অদৃষ্টবাদের বা নিয়তিবাদের প্রবক্তারূপে গোশালের অবদান নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটেছে।

নিয়তিবাদী, ক্রিয়াবাদী, অক্রিয়াবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতন্ত্রবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের অভাব ছিল না। অজিত কেশকম্বলী ছিলেন এদের প্রতিভূ। মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা হতাশাব্যঞ্জক, নিস্পৃহ। তাঁর বক্তব্য- "মনুষ্য চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই লীন হয়, অপ্‌ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে এবং বায়ু ধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। .. যাহারা বলে দানের ফল

আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মুর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।'' বিচ্ছেদবাদ বা বস্তুতন্ত্রবাদের জনকরূপে বিবেচিত অজিতেব মতাদর্শ চার্বাক চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনীয়। যেমন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায়। ঈশ্বর, পরলোক, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তর--এসবই বাজে কথা। জীবন শুধু আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত।

একই সময়ে আরো দুটি দার্শনিক ভাবধাবার বিকাশ খুবই গুরুত্ববহ। একটির প্রবর্তক পকুধ কচ্চায়ন এবং অপবটির সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত। পকুধকে নির্ধাবণবাদী রূপে চিহ্নিত কবা হয়েছে। তাঁব মতে জগতের প্রতিটি বস্তু সাতটি উপাদানেব (ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু-সুখ-দুঃখ এবং জীব) সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এঁর যুক্তি হল কেউ কারো মাথা কেটে ফেললে হত্যা করা হয় না। একটি উপাদান অপর একটি উপাদানে পবিবর্তিত হয় মাত্র। কিন্তু মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধানে এই মতবাদ কোনো সৃজনমূলক তত্ত্ব প্রচার কবতে পারে নাই। সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তের প্রচাবিত মতবাদ অজ্ঞানবাদ নামে পরিচিত। তাঁর মতে মানুষেব জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়ায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো সঠিক ও সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা সম্ভব নয়। পরম সত্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ মানব তাই সুস্থ বিচাববুদ্ধিবিহীন। এ সবই সমসাময়িক যুগের ধর্মীয় অস্থিরতার কথাই সূচিত করে। কিন্তু সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাবনাচিন্তার কথা সহজেই প্রকাশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন নাই। অপরেব মতবাদকে দমন করে আপন মতবাদের উপর পশুশক্তি প্রয়োগ করার স্পৃহা ছিল না। যাব প্রমাণ স্বরূপ আবও উল্লেখ করা যায় চার্বাক বা লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের কথা।

ভারতের চিন্তাজগতে চার্বাকের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে নতুন যুগের সুচনা করেছিল। বিশ্বাসেব বেদীমূলে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবার ফলে ভারতীয জনমানসে যে আবিলতা ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তার অপসারণের প্রচেষ্টার মধ্যে আপ্তবাক্য নামে যা প্রচলিত, তা সর্বক্ষেত্রে আমাদের পথ-নির্দেশ প্রদানে অসমর্থ-- ভারতীয় জনচিত্তে এই বোধের সূচনা চার্বাক দর্শনের মুখ্য অবদান।

চার্বাক নামের সঙ্গে লোকাযত এবং বার্হস্পত্য অভিন্ন। কেউ কেউ বলেন বৃহস্পতি, চার্বাক ও লোকায়ত-- নাম তিনটি একই ব্যক্তির। এবং ইনিই চার্বাক দর্শনের আদি গুরু। আসল নাম বৃহস্পতি। লোকায়ত ও চার্বাক হল উপাধি। প্রথমটি তাঁর প্রবর্তিত মতবাদের বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গীব এবং দ্বিতীয়টি ঐ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত আপাতঃ রমণীয় বচনের জন্য। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মশায় বলেছেন-- 'চারু' শব্দেব একটি অর্থ 'বৃহস্পতি'। চারুর বা বৃহস্পতির বাক্য বা উপদেশ যারা অনুসরণ করে তাদেরকেই চার্বাক বলা হয। এই ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ইহলোককেই স্বীকার করে, অন্য সবকিছুই 'অসিদ্ধ'। তবে চার্বাকীয় চিন্তা কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় না। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে অন্যেব মতকে খণ্ডন করেই পরিতৃপ্ত. নিজস্ব কোনো বক্তব্যের বা মতবাদের ধাবাবিহীন। এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে গি.া চার্বাকের প্রতিবোধস্পৃহা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য হাবিয়ে ফেলেছে। তবে সাধাবণ মানুষের সরল বিশ্বাস যে একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়, নতুনভাবে তাব মূল্যায়ণের প্রয়োজন আছে, একথা প্রচাব করে এই মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চার্বাক সম্প্রদায়ের আক্রমণাত্মক বক্তব্যগুলি এককালে প্রবাদবচনেব স্থানাভিষিক্ত হয়েছিল--

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

আচার-আচরণ, ধর্ম-দর্শন, বিধি-বিধান, ন্যায়-নীতির মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের দুস্তর ব্যবধান, তবুও একে অপরের মুক্তির সন্ধানে বা আলোর অন্বেষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। 'ঈশ্বর আছেন', কিংবা 'ঈশ্বর নাই' এই তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান কল্পেই সৃষ্টি হয়েছে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং অজস্র টীকা-টিপ্পনী। সকলেই প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্যের মোড়কে উপস্থাপন করেছেন নিজ নিজ মতাদর্শ। বিরোধ-বিদ্বেষবিহীন বীক্ষণ-- অদৃশ্যশক্তির অন্বেষণে।

নিরীশ্বরবাদী মতবাদগুলি ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত কারণ এরা বেদবিরোধী। আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করেও মীমাংসা আর সাংখ্য দর্শনের অনুগামীগণ কেবল বেদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করেই আস্তিক ভূষণে সমাদৃত। আস্তিক-নাস্তিকের সমাজ-দর্শন-ধর্ম সবই সাযুজ্যহীন কিন্তু সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার তটদেশে মেলবন্ধন ছিল সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত।

ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার যুগসন্ধিক্ষণে বুদ্ধ মহাবীর-গোশাল-বার্হস্পত্য প্রমুখ মনীষীগণের আবির্ভাবে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসের উদার মনোভাবাপন্ন এবং সমন্বয়ধর্মী সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট। সত্য, জ্ঞান আর মুক্তিমোক্ষ মার্গের সন্ধানকারী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, বৈদিক-অবৈদিক, শাস্ত্রীয়-লৌকিক সব সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানবহৃদয় নিজ নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির তীব্র অনুপ্রেরণায় আকুল হয়ে উঠেছিল। সত্য যে কী, নির্বাণ। মোক্ষ-মুক্তির পথ কোনটা-- তা জানতেই হবে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ; জিজ্ঞাসা, কৌতূহলের অন্ত নাই। অন্তরে অনন্ত আলোড়ন-- মুক্তির উপায়। জিজ্ঞাসার চিরন্তন সিঁড়ি বেয়ে উদ্ভাসিত হয় মননশীলতার তরতাজা ফসল--চৈতন্যোদয়। তাই সিদ্ধান্তের চেয়েও জিজ্ঞাসার গুরুত্ব বেশি, প্রশ্নই চেতনার উত্তরণ ঘটায়, দেয় অপ্রতিরোধ্য গতি। প্রশ্নের গভীরতায় বিশ্বাসও গভীরতা পায়। চেতনার পূর্ণ উন্মেষ ব্যতিরেকে যথার্থ ধর্মের উপলব্ধি কল্পনামাত্র। বিবেকানন্দ বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন এই ভাবটি-- চেতনার একটা স্তর আছে যেটা যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়। ধর্মের সত্য বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সেই স্তর থেকেই লাভ করা যায়। এই সূত্রের সন্ধানে, মুক্তির মানসে, কোন বিশেষ ধর্মের তকমা ধারণ না করেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ত পরিভ্রমণ করেছেন। অনেকটা আধুনিককালের চারণ কবির মত। সবার হিত কামনায় মঙ্গল প্রার্থনায়, সুখ-আনন্দের বাসনায়-- বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। সত্যোপলব্ধির সন্ধানে যে কোনো সম্পদই যে কোনো প্রিয় বস্তুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বর্ণজাতির বর্ণনা পাওয়া গেলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তা বহুলাংশে শিথিল ছিল। তাই যবন রাজদূতের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে কিংবা অব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণে উত্তরণ সমাজ-ধর্মে স্বীকৃত। সকল ধর্মের উপর শ্রদ্ধান্বিত হওয়া সমসাময়িককালের ধর্মসাধনার মূল কথা। অপরের ধর্মের প্রতি পরম প্রত্যয়ই ছিল প্রকৃত ধর্ম-প্রাণ মানুষের সনিষ্ঠ প্রার্থনা। 'ধম্মপদ-প্রচয়'-এ সংকলিত প্রবচনটি স্মরণ করি-- "জটার দ্বারা, গোত্রের দ্বারা বা জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না ; যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই সুখী, তিনিই ব্রাহ্মণ।"

> ন জটাহি ন গোত্তেন না জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
> যম্হি সচ্চং চ ধম্মং চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো।।
>
> প্রবোধচন্দ্র সেন, ধম্মপদ-পরিচয়

খ্রীষ্টজন্মের ছয়-পাঁচ শতক পূর্বে পূর্বভারতে নানা সত্যানুসন্ধানী চিন্তাশীল বৌদ্ধিক মানুষজনের ভিন্নমুখী ভাবনার ফলে পরস্পব বিরোধী নানা মতবাদেব সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর নয়। ভাবতীয় ধর্মসাধনার মূল সুরই অনুরণিত বৈচিত্র্যেব ভিতর ঐক্য। সত্য এক অভিন্ন। মুনি-ঋষিগণ বিকশিত করেন বিভিন্নরূপে, ভিন্নমাত্রায়, বৈচিত্র্যের প্রলেপে। পরিবেশ আর পরিমণ্ডলের সুযোগ নিয়ে লোভী-স্বার্থপর মানুষ সময় সময় সংঘর্ষ আর বিভেদের ভয়ঙ্কর রূপছায়ায় শুচিশুভ্র পবিত্র 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃতিতে কলঙ্ক আরোপ করলেও-- সমাপনে ধর্ম সত্য থেকে অনড়, অভিন্ন। মত-পথের বৈসাদৃশ্য স্বীকৃত , কিন্তু উদ্দেশ্য, এক, অভিন্ন। মিলন একসঙ্গ একাত্মতা। বৃহত্তর একসত্তার সঙ্গে মিলন, ভেদাভেদহীন বৈরীহীন শুদ্ধ মিলনের অনুভূতি-- আধ্যাত্মিক নির্মল এক অনুভূতি। যে অনুভূতিব অমূর্তরূপটির প্রতিচ্ছবি চিত্রিত আছে নানকের অমৃতময় বচনে--

''না কো বৈরী না হী বেগানা।
সগল সঙ্গ হমকো বন আই।।''

তুলসীদাস ও তাঁর 'রামচরিতমানস'

রামসিং তোমর

ডাঃ আব্রাহাম জর্জ গ্রিয়র্সন ছিলেন ভারতীয় ভাষার সর্বেক্ষণকর্তা বিদ্বান। ঊনবিংশ শতকের আটের দশকে তিনি The Modern Vernacular Literature of Hindustan নামে হিন্দি সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি তুলসীদাস সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁর মহত্ত্বের মূল্যায়ন যত বেশী করা হোক না কেন তা কখনোই অতিমাত্রার পর্যায়ে পৌঁছবে না। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' যা সর্বসাধারণে রামায়ণ নামেই জানে—মধ্যকালীন কাব্যগগনের শ্রেষ্ঠতম নক্ষত্র। প্রামাণিকতায় আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তুলসীদাসের এই লোক-ভাষার রামায়ণ। তিনি আরও বলেছেন যে এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যের কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলেও এই গ্রন্থ বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাগলপুর থেকে পাঞ্জাব এবং হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে সর্ব বর্গের লোকেদের মধ্যে সমানরূপে আদৃত। গত চারশো বছরেরও বেশী সময় ধরে হিন্দু সমাজজীবনে, আচরণে, বাণীতে মিশে আছে 'রামচরিত মানসে' তুলে ধরা আদর্শ ও মূল্যবোধ। বর্তমানের হিন্দিভাষা-ভাষী অঞ্চলের সমাজ-গঠনে রামচরিতমানসের অবদান অপরিসীম। কোটি কোটি ভারতীয় জনতার এ হয়ে উঠেছে ধর্মগ্রন্থ এবং তাদের কাছে এই গ্রন্থ ততটাই ভগবৎ-প্রেরিত যতটা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কাছে বাইবেল।

তুলসীদাসের জন্ম হয়েছিল ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বাঁদা জেলার রাজাপুর নামক ছোট একটি গ্রামে। নিজের জীবন সম্বন্ধে তাঁর কাব্যকর্মে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্মের অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। শৈশবাবস্থা থেকেই তাই তিনি সাধু-সন্তদের দলে থাকতে শুরু করেন। তাঁর গুরু তাঁকে সোরো (শূকরক্ষেত্রে)-তে নিয়ে যান সেখানেই তিনি প্রথম রামায়ণ-কথা শোনেন। অধিকাংশই বালক তুলসীদাসের বোধগম্য না হলেও তখন থেকেই রামের নাম তাঁর মনে গেঁথে যায়। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর অযোধ্যা ও বারাণসীতেই কাটে। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

তুলসীদাস বহু গ্রন্থ রচনা করেন—'রামচরিতমানস' এবং 'বিনয়-পত্রিকা' তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুলসীদাসের কালে ব্রজভাষা এবং অবধি ভাষা ছিল কাব্যের ভাষা। সে যুগের প্রচলন অনুসারে তাই তিনি বিনয়পত্রিকা রচনা করেন ব্রজভাষায় এবং 'রামচরিতমানস' রচনা করেন অবধি ভাষায়। দুটি ভাষাতেই ছিল তাঁর সমান দখল। তাঁর যুগের সকল প্রচলিত কাব্যশৈলীরই ব্যবহার তিনি তাঁর গ্রন্থে করেছেন। 'রামচরিতমানস' প্রবন্ধকাব্যে তুলসীদাস তাঁর কয়েক দশক পূর্বের কবি মালিক মুহম্মদ

জায়সীর অবধি ভাষায় এবং দোহা-চৌপাই শৈলীতে রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাব্য 'পদমাবতে'র অনুসরণ করেছেন। 'বিনয়পত্রিকা'য় তিনি পদশৈলীর অনুসরণ করেছেন। 'রামচরিতমানস' সমগ্র ভারতের প্রায় সকল প্রমুখ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও 'রামচরিতমানসে'র একাধিক অনুবাদ পাওয়া যায়।

তুলসীদাসেব সম্বন্ধে তাঁর সমকালীন ভক্তকবি নাভাদাস তাঁর 'ভক্তমাল' গ্রন্থে লিখেছেন—

''কলিকুটিল জীব নিস্তার হেত বাল্মীকি তুলসী ভয়ো।'' অর্থাৎ কলিযুগের কুটিল জীবগণের উদ্ধারকার্য হেতু বাল্মীকিই তুলসীদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তুলসীদাসের জীবদ্দশায়ই তাঁর খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সাধুসমাজে বিদ্বান মহলে এবং রাজসভায় সমান রূপে আদৃত হয়েছিলেন। আকবরের একজন প্রিয় সভাসদ আবদুর রহিম খানখানা তুলসীদাসের সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই বারাণসী আসতেন। বারাণসীব তৎকালীন বিদ্বন্মন্ডলে তুলসীদাসের এত খ্যাতি ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। পন্ডিতমহলে প্রচাবিত হয়েছিল 'রামচরিতমানস' এবং সেই সঙ্গে তুলসীদাসেরও কুৎসা। কথিত আছে যে পন্ডিতেরা মিলে ঠিক করলেন তৎকালীন বারাণসীর সর্বজনশ্রদ্ধেয় পন্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর কাছে যাবেন। তিনি যদি তুলসীদাসের রামচরিত মানসের বিচার করে তার পক্ষে রায় দেন তাহলেই তা বারাণসীর বিদ্বৎসভায় সমাদৃত হবে। মধুসূদন সরস্বতী 'রামচরিতমানস' পড়ে বললেন যে তুলসীদাস কলিকালের জঙ্গম তুলসী বৃক্ষ এবং তাঁর কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। 'নিরুপায় হয়ে পন্ডিতজনেরা তুলসীদাসকে যথোচিত সম্মান দিতে বাধ্য হলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তুলসীদাসের রচনার মধ্যে রামচরিতমানস অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যায় তুলসীদাস 'রামচরিতমানসের' রচনাকার্য শুরু করেন। এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে 'রামচরিতমানস' হল রাম-চরিত্রের মানস সরোবর, যাতে রাম-চরিত্রের অগাধ জলরাশি। গ্রন্থের সপ্তকান্ড সরোবরেব সুন্দর সাতটি সোপান। সোরটা-দোহা-চৌপাই আদি ছন্দের পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। গ্রন্থের অপূর্ব ভাব-ভাষা ইত্যাদি পদ্মের পরাগের ন্যায়। শুভাদর্শ রূপী ভ্রমর তার সৌরভে মত্ত। গ্রন্থে নিহিত জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিচাররূপী মরাল, কাব্যগুণের মৎস্য ও নবরস পুষ্করিণীর বিভিন্ন জলচরের রূপে ক্রীড়ারত। ভক্তি সহকারে যাঁরা রামায়ণ পাঠ করেন তাঁরা এই পুষ্করিণীর রক্ষক'। নিন্দুকেরা এই পুষ্করিণীর নিকটেও যেতে পারেন না। পুষ্করিণীর চারটি ঘাটেই রামায়ণের কথা চলছে। একটি ঘাটে শিব পার্বতীকে শোনাচ্ছেন রামায়ণ গাথা ও তার মাহাত্ম্য। দ্বিতীয় ঘাটে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শোনাচ্ছেন ভরদ্বাজ ঋষিকে। তৃতীয় ঘাটে কাকভুষুন্ডি রামচবিতের কথক এবং গরুড় আদি নভ-চরেরা শ্রোতা। চতুর্থ ঘাটে স্বয়ং তুলসীদাস ভক্তবৃন্দকে শোনাচ্ছেন রামকথা।

রামায়ণের বহু লোকপ্রচলিত পরম্পরা বিদ্যমান। বাল্মীকি রামায়ণ, জৈনদের রামায়ণ, বৌদ্ধজাতক কথায় প্রাপ্ত রাম-চরিত, অপভ্রংশ-প্রাকৃতের 'পড়মচরিউ' এবং ভারতের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত রামায়ণ—রামকথার এই বিস্তৃত পরম্পরার সঙ্গে তুলসীদাসের নিবিড় পরিচয় ছিল। মূলতঃ তিনি বাল্মীকির পরম্পরাকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি দু-একটি ক্ষেত্রে দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যা বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত। ভবিতব্যের অমোঘতাকে সৃষ্ট করতে অবতারণা করেছেন রাজা প্রতাপভানুর কথার। প্রতাপভানু ছিলেন এক পরাক্রমশালী রাজা। একদা শিকার করতে গিয়ে তিনি এক বন্যশূকরকে তাড়া করে তাঁর রাজত্ব থেকে ৭০ যোজন দূরে এসে

পড়েন, নিমেষে তিরোহিত হয় শূকর, এবং ঘটনাচক্রে জালে আটকা পড়ে তিনি নিজের রাজ্য হারান। ভবিতব্যকে না এড়াতে পেরে এইরূপে বাল্মীকির রামায়ণ পরম্পরায় প্রবেশ করেছে তুলসী সমকালীন কয়েকটি প্রসঙ্গও। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাদের জয় ও মন্দির-মসজিদ বিরোধের প্রসঙ্গ অন্যতম। রাজা প্রতাপভানুকে তাঁর রাজত্ব অটল রাখার উপায় স্বরূপ যা জানানো হয়েছে তাতে ব্রাহ্মণবাদের জয় ধ্বনিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে এক বৎসর কাল নিয়মিত ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌দের তুষ্ট করলে তাঁর রাজত্ব অটল হবে কিন্তু ভবিতব্যের প্রবল প্রতাপে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ-ভোজন ভ্রষ্ট মাংসের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিসম্পাত দেন। ফলতঃ রাজা তাঁর রাজ্য-পাট সবই হারান। তুলসীদাসের যুগে সমগ্র উত্তর ভারত যে ব্রাহ্মণবাদের মাহাত্ম্যের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল, এ মনে হয় তারই প্রতিফলন স্বরূপ। তুলসীদাস ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি এখানে নিজ ব্রাহ্মণত্বের মহিমা গান করছেন না, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে এখানে।

'রামচরিতমানসে' ব্রাহ্মণের গরিমা স্বীকৃত হলেও কোথাও তুলসীদাসের আত্মম্ভরিতার উদাহরণ নেই। আদ্যন্তই বিনয় ও বিনম্রতার মৃদু স্বরের গুঞ্জন। বারম্বার তুলসীদাস বলেছেন যে তিনি কবিও নন, চতুর কথকও নন। নিজের কাব্যরচনার ক্ষমতাকে জাহির করতে বা নিজের কবিত্বের অমরতার জন্য নয়, নিজের দীন হীন বাণীকে পবিত্র করার জন্যই তিনি রাম-গুণগানে মগ্ন হয়েছেন কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধ্যানুসারেই তিনি রামের যশোগানে আগ্রহী। 'নিজ গিরা পাবন করনি কারণ রাম যশ তুলসী কহ্যো''—(স্ববাণী পবিত্রকরণহেতু তুলসীদাস রামের যশ বর্ণনা করেছেন) 'রামচরিতমানসে'র ভূমিকা এবং সপ্তকাণ্ডের প্রতিটি কাণ্ড জুড়ে তাই বিভিন্ন দেব-দেবী, সাধু-সন্ত এমনকি খল-শঠদেরও বন্দনা গান করেছেন। খল-শঠ-অসাধুদের নিকটেও তুলসীদাস কৃপাপ্রার্থী—সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নিজ আরাধ্যের বন্দনা-গান রচনার কার্যে। সকলের কাছে সাহায্যের আকুল আবেদনে 'রামচরিতমানসে'র ভূমিকা স্বভাবতঃই তাই দীর্ঘায়ত।

আজকের ভারতের অতি সমকালীন বিষয়—মন্দির-মসজিদ বিরোধ মনে হয়, তুলসীদাসের আমলেও ছিল। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধের অবসানের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাঁর গ্রন্থে। 'কবিতাবলী'তে তুলসীদাস উল্লেখ করেছেন যে তিনি ভিক্ষা করে পেট ভরেন, মসজিদে শয়ন করেন এবং রাম-নাম-গানে অবসর যাপন করেন। মনে হয় এই মসজিদ অযোধ্যার বাবরি মসজিদ যা সম্ভবতঃ বাবরিপন্থী সুফীরা নির্মাণ করেছিলেন। সুফী পরম্পরায় প্রচলিত আছে যে, যে কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই মসজিদে বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয় এবং অতিথিদের কিছু ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। বাবরি মসজিদ ছাড়া অযোধ্যায় তৎকালে আর কোন মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁরই আর এক সমসাময়িক সন্ত কবীরও তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন যে রাম না থাকেন মন্দিরে, না থাকেন মসজিদে, তিনি থাকেন মানুষের নিকটেই —'মোকো কঁহা ঢুঁড়ে বন্দে ম্যে তো তেরে পাস মে/- না মন্দিব মে, না মসজিদ মে, না কারে কৈলাশ মে।''

এই কথারই প্রতিফলন দেখা যায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'ও। রামের বনবাসে চিত্রকূটের কাছে বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ''কোথায় হবে তাঁর উপযুক্ত বাসস্থান?'' উত্তরে বাল্মীকি তাঁকে বলেছেন যে নির্মল হৃদয়ই তাঁর একমাত্র উপযুক্ত বাসস্থান—মন্দিরও নয় এবং মসজিদও নয়। হয়ত তুলসীদাস বলতে চেয়েছেন যে মন্দির-মসজিদ বিরোধে উভয়স্থানই হয়ে

পড়েছে ঈশ্বরশূন্য। তাই তিনি স্থানের উপর জোর না দিয়ে বলেছেন যে স্বামী-পিতা-সখা যাঁর সর্বস্ব তুমিই—তাঁর হৃদয়েই তুমি অধিষ্ঠান কর, এই প্রসঙ্গ গান্ধীজীরই অতিপ্রিয় ছিল। বিরোধের আভাস থাকলেও তুলসীদাসের রচনায় কোথাও মন্দির-মসজিদের বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাঁর অপর এক গ্রন্থ 'কবিতাবলী'তে তুলসীদাস রামচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণন করার কালে অবতারণা করেছেন তাঁর বাল্যাবস্থার অভাব-অনটন দৈব দুর্বিপাকের প্রসঙ্গ। পিতৃমাতৃহীন বালক কাঁচা বয়স থেকেই সাধু সঙ্গে দিনাতিপাত করেছেন। চারিটি ছোলার দানাও ক্ষুন্নিবৃত্তিতে জোটাতে সমর্থ হলে তিনি মনে করতেন অর্থ ধর্ম কাম মোক্ষ আদি চতুর্পদার্থ লাভ করেছেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামকারী তুলসীদাস রামনামের ভরসায় সংসার সমুদ্র পার হতে আগ্রহী। রাম ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। নানা পুরাণ, নিগম আগম সম্মত তাঁর রাম কথায় বারংবার উচ্চারিত হয়েছে একটি কথাই। রাম তাঁর আরাধ্য—তিনি তাঁর মন-প্রাণ-কর্ম সব সঁপেছেন তাঁর রামকে। রামের তিনি অনন্যসাধারণ ভক্ত। 'রামচরিতমানসে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য তাই হয়ে উঠেছে এই অনুপম ভক্তির জয়গান। ভক্ত তুলসীদাসের এই গ্রন্থে অমর হয়ে আছে শবরী-জটায়ু নানা ঋষি-মুনি ইত্যাদি ভক্ত চরিত্র। রাবণ সেও রামের ভক্ত; রামের হাতে মৃত্যু বরণ করে সে মোক্ষ কামনা করে। রামচরিতমানসে সকলেই রামের ভক্ত, তথাপি এই গ্রন্থের তিন অসাধারণ ভক্ত চরিত্র ভরত, হনুমান ও বিভীষণ। অযোধ্যাকাণ্ডে রামের চরিত্রও ম্লান হয়ে উঠেছে ভরতের ভক্তি উপাখ্যানের ভাস্বরতায়। ভক্ত তার নিঃশর্ত ভক্তির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন স্বয়ং ভক্তির আকরকে। রামের বনবাসের কষ্টের কথা স্মরণ করে ভরতও নিজগৃহে বসে তপঃসাধনে ব্রতী—''ভরত ভবন বসি তনু তপ কমহিঁ—(ভরত গৃহে বসে তনু তপস্যা রত) ''দ্বিতীয় ভক্ত হনুমান জীবনে রাম ছাড়া আর কিছুরই কামনা করেন না। তেমনি মহান হয়ে উঠেছে রামভক্তির জন্য সর্বত্যাগী বিভীষণের উদাত্ত চরিত্র, সার্থক হয়ে ওঠে 'রামচরিতমানস' ভক্তিকাব্যরূপে। তুলসী সমকালীন ভারতের ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রমণি হয়ে ওঠে উত্তর ভারতে তুলসী কাব্য 'রামচরিতমানস'। তুলসীদাসের জীবদ্দশায় সত্য প্রমাণিত হয় মধুসূদন সরস্বতীর মূল্যায়ন।

ভক্তকবি তুলসীদাস তাই রামের ভক্তিরসেই আকণ্ঠ ডুবে থাকতে চান। মন লাগে না তাঁর যুদ্ধ-বর্ণনার ন্যায় অভক্তির কাজে। বাল্মীকির অপূর্ব যুদ্ধবর্ণনার তুলনায় বড়ই ম্লান তাঁর যুদ্ধের গাথা। রাবণকে মারতে হবে সুতরাং গত্যন্তর না দেখে অত্যন্ত অমনোযোগ সহকারে যুদ্ধের প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তিনি। যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া-ভেরী তূর্য সবই তাই প্রখর স্বরে বাজে না। এই হানাহানির বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত ও দায়সারাগোছের।

তুলসীদাসের কালে শৈব ও বৈষ্ণবে বিষম বিরোধ। 'রামচরিতমানসে' স্বয়ং শিব পার্বতীকে শোনাচ্ছেন রামায়ণকথা, তাই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকার অনেকটাই জুড়ে রয়েছে শিবোপাখ্যান—শিব-সতীর গল্প, সতীর পার্বতীরূপে পুনর্জন্ম, শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ইত্যাদি। শিব-মহিমা কীর্তিত হয়েছে সীতার খোঁজে লঙ্কায় যাওয়ার পথে, রামেশ্বরমে রামের শিব মন্দির স্থাপনা করার বর্ণনায়। রাম বলেন যে শিবের দ্রোহী আমার ভক্ত হতে পারে না[৪]। এইভাবে তুলসী তাঁর কাব্যে এই দুই বৈষম্যের সেতুবন্ধন করেছেন। তাঁর 'রামচরিতমানস' হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় ভারতের নানান বৈষম্য-বিরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী প্রচেষ্টার এক অনন্য স্বাক্ষর স্বরূপ।

প্রাচীন বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-সাহিত্যে তুলসীদাসের গভীর ব্যুৎপত্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য।

রামচরিতের মহত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নানান উপাখ্যানের নিটোল বুননে জমাট হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থের গঠন। এর শক্ত বাঁধনের কাজ করেছে তুলসীদাসের অপূর্ব কাব্যভাষা। তুলসীদাস সংস্কৃতের পন্ডিত কিন্তু সংস্কৃতের তৎসম শব্দের কঠোরতা অনুপযুক্ত তাঁর এই কোমল অবধি ভাষার। তাই তিনি তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছেন তদ্ভব রূপে। রামচরিতের ভক্তির পদ্ম পরাগ তাই জমে উঠেছে শ্রুতিমধুর 'পদম-পরাগা'। তাঁর ভাষা গুরুচণ্ডালী দোষ থেকে মুক্ত যদিও তৎসম শব্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মুখের চলিত গ্রাম্য কথার সুন্দর ব্যবহার হয়েছে তাঁব ভাষায়, যেমন রাবণ চোর নয়, সে 'ভড়েয়া' অর্থাৎ ছিঁচকে চোর। 'ভড়েয়া' এই একেবারে গ্রাম্য ব্রজভাষার শব্দ স্থান করে নিয়েছে তৎসম শব্দের পাশে—এতটুকু বেমানান না হয়ে। তাঁর যথাযথ শব্দচয়নের অপরিসীম ক্ষমতায় ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি যেমন হয়েছে তেমনি ভাষার মাধুর্যও বর্ধিত হয়েছে। 'রামচরিতমানসে'র জনমানসে উচ্চ-স্থানাধিকারের নেপথ্যে আছে তুলসীদাসের মনোহারী ভাষার অবদান। উত্তর ভারতে আজও বহু গৃহে, অতি সাধারণ গৃহেও 'রামচরিতমানসে'র প্রতিলিপি পাওয়া যায়! দিনের সকল কাজেব শেষে শয়নের পূর্বে বহু গৃহে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ দিনচর্যার একটি অনিবার্য অভিন্ন অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' রাম-ময়। তেমনি তুলসীদাসের জীবনও রাম-ময়। রাম ছাড়া অপর কিছুই তাঁর কাম্য নয়। 'রামায়ণের' শেষে উত্তর কাণ্ডে তাই তুলসী বলেন যে ধর্ম-অর্থ-কাম-নির্বাণ কিছুই তিনি চান না, জন্মজন্মান্তর শুধু রাম-পদে রতির বরই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—

"ধর্ম ন অর্থ ন কাম রুচি গতি ন চহু নির্বাণ
জনম জনম রতি রামপদ ইহ বরদানু ন আন—"

উল্লেখসূত্র:

১. আনন্দকাননে হ্যস্মিজঙ্গমস্তুলসীতরু:।
কবিতামঞ্জরী ভাতি রামভ্রমরভূষিতা।।
২. রামচরিতমানস, বালকাণ্ড, ৩৪-৪০ সংখ্যক দোঁহা।
৩. রামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড, ১২৮-১৩১ সংখ্যক দোঁহা।
৪. রামচরিতমানস, লঙ্কাকাণ্ড, ১সংখ্যক দোঁহা।

বাংলাসাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রয়োগ

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

আজকাল একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে বাংলা নন্দনতত্ত্ব ও সমীক্ষাশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব ও সমীক্ষাশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র বা রসতত্ত্বের উপর তার নির্ভর করে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচারের আগে দেখতে হয় যে (ক) প্রাচীন বিশুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিধি কতটা এবং বিশ্বের দরবারে তাদের কোন কালজয়ী অবদান আছে কিনা। (খ) বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতসাহিত্য-নিরপেক্ষ কোন মৌলিক রচনার উদ্ভব হয়েছে কিনা; আর (গ) গত ১০০ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃতসাহিত্য-নিরপেক্ষ কোন সমীক্ষাশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে কিনা।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের উপরেই শক্তিমানের প্রভাব পড়ে। এটা ব্যক্তি, জাতি, সমাজ ও সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। রামায়ণ মহাভারতের কাল অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতক থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক এই দীর্ঘ-আড়াই হাজার বছরে সংস্কৃত সাহিত্য নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই সময়ের মধ্যে রচিত ছন্দোবদ্ধ কাব্য, গদ্য কাব্য, রূপক উপরূপক, কথা, আখ্যায়িকা, ইতিহাসাশ্রিত গদ্য ও পদ্য কাব্য, নীতিকাব্য, নীতিশতক, পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত একশ্রেণীর ছোট গল্প, কল্পনামূলক গল্প ও কাহিনী, গদ্যপদ্যময় চম্পূ ও রাজস্তুতি এবং একশ্রেণীর নীতিকাব্য, হাস্য-বিদ্রূপাত্মক কাহিনী, —এই ষোল বা সতেরটি প্রধান ভাগে বিভক্ত সংস্কৃত বাঙ্ময় রচনা বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে রয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র যাতে গদ্য ও গদ্যকাব্য, রূপক, উপরূপক, এদের স্বরূপ, তাতে দোষ-গুণ, রীতি অলঙ্কার, রস এদের—সংস্থান নিয়ে আছে গভীর ও অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ। সেই তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য অনেক অর্বাচীন, বাংলা সাহিত্যের জন্ম আজ থেকে ২৫০ বৎসর আগে। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে আমরা এই কয়টি পর্যায় লক্ষ্য করি, —যেমন গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, ছোটগল্প, রম্যরচনা, জীবনীসাহিত্য, গোয়েন্দা কাহিনী ও রহস্যকথা, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণবিষয়ক সাহিত্য, ছড়া প্রভৃতি। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সর্বভারতীয় রূপ কিন্তু বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাতী, মারাঠী এ সমস্তই প্রাদেশিক ও প্রান্তীয় সাহিত্য।

সংস্কৃত কথা ও আখ্যায়িকার পরিবর্তে বাংলা সাহিত্যে আমরা পাই উপন্যাস। এ বিষয়ে আচার্য সুকুমার সেনের অভিমত —'‘উপন্যাস শব্দের আদিম অর্থ-- ‘কল্পিত অভিযোগ, মিথ্যা কাহিনী’।

এখনকার দিনে উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সেকালে ছিল না। সাহিত্যের কর্মের বিবর্তনে উপন্যাস অত্যন্ত নবীন। ... বাণভট্টের কাদম্বরীতে (সপ্তমশতক) আধুনিক উপন্যাসের পূর্বাভাস যথাসম্ভব আছে। ... কিন্তু মারাঠী ও কন্নড় ভাষায় 'কাদম্বরী' বলিতে উপন্যাস বুঝাইলেও বাণভট্টের কাব্য হইতে আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয় নাই। ইংরাজী নভেলের অনুসরণে প্রথমে বাঙ্গালায় এবং পরে বাঙ্গালার অনুকরণে অপর আধুনিক ভারতীয় ভাষায় উপন্যাসের চলন হইয়াছে'', সংস্কৃত সাহিত্যে উপন্যাস পদটি 'উপস্থাপিত' এই অর্থে কাব্যে, নাটকে ও শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে আমরা পাই অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্'' (পঞ্চম অঙ্ক) ''পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ (পঞ্চম অঙ্ক), শারীরক ভাষ্যেও পাই—'' ''তস্মাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন'' অমরকোষে বলা হয়েছে উপন্যাসস্তু-বাঙ্মুখম।'' কিন্তু নবরসের কোন এক রসনির্ভর নায়কনায়িকাশ্রিত ঘটনাবহুল আখ্যান এই অর্থে উপন্যাস পদটিকে সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বাংলাসাহিত্যে এই বিশেষ শ্রেণীর রচনা বলতে কবে প্রথম উপন্যাস পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় না। আচার্য সুকুমার সেনও এ প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে গেছেন। উপন্যাসকে বিশেষ শ্রেণীর রচনা এই অর্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে ১৮৭৫ সালে ব্যবহার করেন (কত তিনি শুনাতেন উপন্যাস)। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮৭ ইংরাজী ১৮৮৩ সালে 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে Novel -এর প্রতিশব্দ হিসাবে কথাগ্রন্থ পদটি প্রয়োগ করেন। ১৮৮৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে উপন্যাস পদটি ব্যবহার করেন। তার আগে শশীচন্দ্র দত্ত কয়েকটি ইংরাজী গল্পের অনুবাদ 'উপন্যাসমালা' নামে ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করেন। আরব্যোপন্যাসের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এ থেকে মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস পদটি প্রয়োগ করেন এবং আরব্যোপন্যাস প্রকাশিত হবার পর থেকে পদটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্রাহ্মণ উপনিষৎ বৃহৎকথা কথাসরিৎসাগর ও পালিজাতক ও অবদানকাহিনীর মধ্যে ছোটগল্পের নিদর্শন পাওয়া গেলেও বর্তমান বাংলা ছোটগল্প ইউরোপীয় প্রভাবে সৃষ্ট।

বিশ্বের দরবারে প্রাচীন বিশুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অসামান্য দান রসতত্ত্ব। এই রসতত্ত্বের সূচনা বৈদিক যুগে হলেও[১] এর প্রধান প্রবক্তা মহামুনি ভরত। তাঁর রসনিষ্পত্তির সূত্র হচ্ছে ''বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ''। শব্দার্থসম্বলিত গদ্যপদ্যাত্মক সাহিত্যের আত্মা হচ্ছে এই রস। রস সহৃদয়ের উপলব্ধিগম্য। এক কথায় বলতে গেলে সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য অলৌকিক আনন্দানুভূতিই রস। এই রসের উপলব্ধি দৃশ্যকাব্যে অর্থাৎ রূপক ও উপরূপকে অভিনয়ের মাধ্যমে। শ্রব্যকাব্যে পাঠজনিত বর্ণনা থেকে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে যে রসনিষ্পত্তির যে সূত্র আলঙ্কারিকরা নির্দিষ্ট করেছেন তা কি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না তাকে বাংলা ও ইংরাজী নাটক-নভেলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে এই রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সর্বজনীন ও সার্বকালিক! বিশ্বের সমস্ত দেশের সর্বকালেরই সাহিত্যে এই নিয়ম প্রয়োগ করা যায় ও রসনিষ্পত্তি দেখান যেতে পারে।

সংস্কৃত নাটকের বিকাশ প্রধানতঃ বহির্মুখে বীজ থেকে বৃক্ষের মতন। কোন একটি রসকে অবলম্বন করে সংস্কৃত নাটক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্ত্য নাটকে নাটকীয় কথাবস্তু ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে—, নাটকীয় অবস্থার পরিপুষ্টি সেখানে প্রধান। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

রস-সৃষ্টি-প্রধান হলেও ঘটনার বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এজন্য সমস্ত সংস্কৃত রূপকে পঞ্চসন্ধি[৩] দেখা যায়। এই পঞ্চসন্ধিকে অবলম্বন করেই পঞ্চঅবস্থা[৪]। 'এই পঞ্চঅবস্থা কার্যের। কার্য বলতে অভীষ্ট, যে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সমস্ত নাটকীয় ঘটনাজালের সৃষ্টি এবং যার সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয়। এই পঞ্চ অবস্থা হচ্ছে আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। নাটকের বিষয় বা প্লট পঞ্চসন্ধিতে বিভক্ত এবং সন্ধি ও অবস্থা পরস্পরের পরিপূরক। পঞ্চসন্ধি যেমন নাটকীয় রস বা মূল প্লটের বিকাশের পাঁচটি স্তর—ঠিক সেইরকমই নাটকীয় আখ্যানবস্তুর উপাদান পাঁচটি। এদের বলা হয় অর্থপ্রকৃতি। এরা হচ্ছে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। অর্থ-প্রকৃতি নাটকীয় কথাবস্তুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যুক্ত। এখন আমরা Ibsen রচিত *A Doll's House* নাটকটি বিশ্লেষণ করে পঞ্চসন্ধি ও অর্থপ্রকৃতির সন্নিবেশের বৈচিত্র্য দেখাতে পারি।

প্রথম অঙ্ক মুখসন্ধি[৫] ও আরম্ভ[৬]—

নাটকের প্রধান চরিত্র হেলমার একসময়ে গুরুতর পীড়াগ্রস্ত ছিল, আর্থিক সঙ্গতি না থাকার স্বামীর সুচিকিৎসার জন্য স্ত্রী নোরা হেলমারের অজ্ঞাতে তার বাবার নাম জাল করে ক্রগস্ট্যাড নামে একজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল। হেলমার বিষয়ী ও সঙ্কীর্ণচিত্ত, নোরা ভাবপ্রবণ ও বেহিসেবী চরিত্রের রমণী।

এখানে বীজ[৭] They all think that I am incapable of any thing serious.

যত্ন[৮]—

হেলমার একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেবে। বাড়ীতে ক্রিসমাস উৎসবের আয়োজন। এই উৎসবের দিনে নোরার বাল্যসখী লেন্ডে ও তার পূর্ব প্রণয়ী ক্রগস্ট্যাড এসে হাজির। উভয়ের একই উদ্দেশ্য। ভাবী কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা।

প্রথম অঙ্কে প্রতিমুখ সন্ধি[৯]—

প্রতিমুখসন্ধির সূচনা ডাক্তার ব্যাঙ্কের উপস্থিতির সময় থেকে। বিষয়ান্তর—হেলমার ক্রগস্ট্যাডকে সরিয়ে মিসেস লিন্ডেকে তার ব্যাঙ্কে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিল।

প্রতিকূল ঘটনা—ক্রগস্ট্যাড নোরাকে শাসায় যে হেলমার তাকে ব্যাঙ্ক থেকে বিতাড়িত করলে সে জাল দলিলের বিষয় হেলমারকে জানাবে।

গর্ভসন্ধি[১০] দ্বিতীয় অঙ্ক —প্রাপ্ত্যাশা[১০ক]

ক্রগস্ট্যাডের ভয় দেখিয়ে যাবার পর গর্ভসন্ধির সূচনা।

প্রতিকূল অবস্থায় উদয়—স্বামীর উপরে নোরার অগাধ বিশ্বাস যে স্বামী জাল দলিলের বিষয় জানলে তার দায়িত্ব সে নিজেই নেবে। কিন্তু সেটা হতে দিতে চায় না নোরা। সে ক্রগস্ট্যাডের চাকুরী বহাল রাখার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করল। কিন্তু হেলমার সে অনুরোধ না রেখে ক্রগস্ট্যাডকে বরখাস্ত করল।

অনুকূল অবস্থার সূচনা—নোরা মিসেস লিন্ডের কাছে সমস্ত ঘটনা জানাল। মিসেস লিন্ডে প্রতিশ্রুতি দিল যে ক্রগস্ট্যাডের চিঠি হেলমারের হাতে যাবার আগেই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করাবে। নোরা একটু আশ্বস্ত হল।

তৃতীয় অঙ্ক সূচনা—বিমর্শসন্ধি[১১] নিয়তাপ্তি' নানারকম অশুভ—মিসেস লিন্ডের সনির্বন্ধ অনুরোধে ক্রগস্ট্যাড তার চিঠি ফিরিয়ে নেবার জন্য উদ্যোগী হল। কিন্তু ঘটনাচক্রে লিন্ডে

ক্রগস্ট্যাডকে অপেক্ষা করার উপদেশ দেয় ও চিঠি হেলমারের হস্তগত হয়। হেলমার নোরার উপর বিরূপ হল ও নোরার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইল। নোরা স্ত্রীরূপে থাকলেও সন্তানদের উপর তার কোন অধিকার থাকবে না, হেলমারের এই ঘোষণায় নোরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

অশুভ নিবৃত্তি— কিন্তু লিণ্ডের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় ক্রগস্ট্যাড সেই জাল দলিল ফেরত দিয়ে দেয়। দুশ্চিন্তামুক্ত হেলমার তখন নোরার সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করতে থাকে।

তৃতীয় অঙ্কে নির্বহণ সন্ধি [১২] —ফলাগম [১২ক]

নোরা ও হেলমারের পুনর্মিলনের কথাবার্তার মধ্যে নির্বহণ সন্ধির আরম্ভ। কিন্তু নোরার মধ্যে প্রবল সংঘাত ও আত্মবিশ্লেষণের জোয়ার এল। তার উপলব্ধি হল যে স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও তার ভালবাসা উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। তার ত্যাগ সম্পূর্ণ বিফল। সংসারেব রূপ জানতে হলে আরও গভীরভাবে সংসারকে চেনা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত নানা মানসিক সংঘাতে নোরা গৃহত্যাগ করল। এখানে বিন্দুর উদাহরণ— Do you hear them up there? (তৃতীয় অঙ্ক)

করুণ রস অঙ্গী, অঙ্গরস শৃঙ্গার।

এবার প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক 'মেবারপতন' এ পঞ্চসন্ধি ও পঞ্চাবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক ও নাটকে এদের সন্নিবেশ-বৈশিষ্ট্য দেখাতে চেষ্টা করব।

মুখসন্ধি— প্রথম অঙ্কে প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যব্যাপী।

বীজ-- "যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার কর্লো তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূর নয়।" (গোবিন্দ সিংহ)

প্রতিমুখসন্ধি— সূচনা প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

"কৃষ্ণদাস-- প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?" এই উক্তি থেকে প্রথম অঙ্ক ষষ্ঠদৃশ্যের শেষপর্যন্ত প্রতিমুখ সন্ধি বিস্তৃত।

গর্ভসন্ধি— দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য—

"জয়সিংহ-- আজ মেবারের গৌরবের প্রভাত। দেখ কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়ভূমি উদ্‌ভাসিত' পর্যন্ত।

বিমর্শসন্ধি -- তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য পর্যন্ত।

নির্বহণ সন্ধি-- পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ।

বিন্দু [১৩] — প্রথম অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য, মানসীর প্রবেশ।

পতাকা [১৪] -- গোবিন্দ সিংহ।

প্রকরী [১৫] -- গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজয়সিংহ ও মানসী।

কার্য [১৬] -- পঞ্চমাঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে রাণা ও মহাবৎখাঁর মিলন।

মূলরস -- উৎসাহ স্থায়ীভাব বীররস। অঙ্গ শৃঙ্গাররস।

বাংলা ও ইংরাজী দৃশ্যকাব্যের রসনিষ্পত্তি যে ভাবে দেখান হয়েছে সেই ভাবেই বাংলা উপন্যাসেও রসনিষ্পত্তি দেখান সম্ভব। উদাহরণরূপে আমরা প্রথমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্তকে গ্রহণ করতে পারি। চারখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত, নায়িকা আবাল্য প্রণয়িনী রাজলক্ষ্মী। আশানিরাশা, বিরহ, সংস্কার, দ্বিধা, সঙ্কোচ, এসব বাধা কাটিয়ে

অবশেষে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মিলন। কিন্তু এই মিলন পরিপূর্ণ সম্ভোগশৃঙ্গার জাতীয় নয় বরং একে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারই বলা যুক্তিযুক্ত। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে কমললতা প্রৌঢ়া নায়িকার মতই যে প্রণয়ের প্রবাহ উন্মুক্ত করেছে তা ঠিকমত পরিপুষ্ট না হওয়ায় ভাবাভাসে রূপান্তরিত হয়েছে। উপন্যাসে প্রবহমান শৃঙ্গার রস। এর একটি স্বল্পকাল স্থায়ী খণ্ডরূপ রোহিণী ও অভয়ার মিলন। এই সর্বব্যাপী শৃঙ্গার রসের প্রবাহে ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক অভিযান বিস্ময় স্থায়ী ভাবকে উদ্দীপ্ত করেছে। শ্মশানের সূক্ষ্ম অনুভূতিগ্রাহ্য ভয়াবহ অথচ অতীন্দ্রিয় রূপের বর্ণনা ভয়ানক রসের উদ্দীপন। সমুদ্রে ঝড় একইভাবে ভয়ানক ও অদ্ভুত রসের উদ্দীপক। এর মধ্যে রয়াল বেঙ্গল টাইগার ও নতুনদার আবির্ভাব হাস্যরসের অফুরন্ত উৎস উন্মুক্ত করে নানা রস ও ভাবে এই উপন্যাসটিকে ভরপুর করে রেখেছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অপর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'তে আমরা অন্য এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মূল রস করুণ। কিন্তু একে ঠিক নাট্যশাস্ত্রোক্ত করুণলক্ষণাক্রান্ত বলা যায় না। পাঁচালী অর্থে সঙ্গীত। অপুর জীবনের যাত্রাপথের সঙ্গীত এই রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। দরিদ্র সন্তান অপুর জীবনের সর্ববাপী দারিদ্র্যেব মধ্যে ইন্দির ঠাকরুণ, দুর্গা, হবিহর-- এদের মৃত্যু করুণরসকেই প্রধান ভাবে পরিস্ফুট কবেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থাভাব, অনটন, বঞ্চনা, নৈরাশ্য এগুলি করুণরসের উদ্দীপন , পীড়া, শোক, ক্লেশ, লাঞ্ছনা, পূর্বস্মৃতিজনিত হর্ষবিষাদ-- এগুলি অনুভবের অংশ। কিন্তু এর মধ্যেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতন প্রবাহিত হয়ে চলেছে বিরাট বিশ্ব ও বৈচিত্র্যময় জীবনকে ঘিরে বিকাশমান কিশোর-চিত্তের বিস্ময়ভরা কৌতূহল যা করুণরসের পাশে অবিরোধী বিস্ময়স্থায়ী অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনার সঞ্চাব করে পথের পাঁচালীকে মহাকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। 'পথের পাঁচালী'র ভাবেরই অনুবর্তন হয়েছে 'অপরাজিত'-তে। সমস্ত দুঃখে গ্লানিতে যে পরাজয় স্বীকার করেনি জীবনের যাত্রাপথে সেই অপরাজিত। এখানেও নায়ক যৌবনাধিরূঢ় অপু। স্থায়ী ভাব বিস্ময়। অপুর চরিত্রে রয়েছে একটা নিরাসক্ত স্নেহবন্ধনমুক্ত চঞ্চল গতিশীলতা যা তাকে পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহ কোন আকর্ষণেই আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। এই যে বন্ধনহীন মুক্ত স্বভাব এটা অনেকটা যোগিসুলভ। এর মূলে রয়েছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর অধ্যাত্মদৃষ্টি। জীবনের প্রতিটি স্পন্দনকেই সে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছে। অপুর জীবনে নিশ্চিন্তপুরের প্রকৃতির মাধুর্য, কাশীতে ধনী পরিবারেব নানা বৈচিত্র্যময় সাহচর্য, অপর্ণার স্নেহময় কোমল সান্নিধ্য, চাঁপদানিতে নীচজনসঙ্গ ও পটেশ্বরীর জন্য সহানুভূতি এবং সবশেষে লীলার সঙ্গে অতনুজ প্রেমের আকর্ষণ, এ সমস্তই যেন বুদ্বুদের মতন। সংসারের ঘূর্ণ্যমান মহাবর্তে অপুকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তার চারপাশের গতিশীল স্পন্দনময় জীবন এই মহাবিস্ময়ের উদ্দীপন, ভাবাবেগ, শিহরণ, আকস্মিক আনন্দানুভূতি যাকে "সে ঠিক বলিতে পারে না বুঝাইতে পারে না কিন্তু তাহার মনে হয়" তাই অনুভাব। এর মিলনে সৃষ্ট হয়েছে অঙ্গী অদ্ভুতরস, অঙ্গ হয়ে আছে অপু ও অপর্ণার দাম্পত্য জীবনের মধুর শৃঙ্গাররস নির্ঝরিণী আর সর্বজয়ার মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা করুণ রস। লীলার সঙ্গে অপুর দেহাতীত প্রেম শৃঙ্গাররসের 'ভাব'। সবকে ছাপিয়ে রয়েছে মহাবিস্ময়-জাত লোকাতীত বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত রস। তাৎকালিক সাহিত্যচিন্তার পটভূমিতে ভরত অদ্ভুতের লক্ষণ করেছেন " স চ দিব্যজনদর্শনেপ্সিত-মনোরথাবাপ্ত্যুপবনদেবকুলাদিগমন-সভাবিমানমায়েন্দ্রজাল-সম্ভাবনাদিভি

র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে'' । ... ''দিব্যজনদর্শনেপ্সিতমনোরথাবাপ্তি'' এই অংশের প্রাচীন যুগের প্রাসঙ্গিক অর্থ যাই হোক না কেন এর মধ্যে যে লোকাতীত অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা অনস্বীকার্য। ভরত মুনি এই লক্ষণকে পরিস্ফুট করে ত্রিকালদর্শীর মতই অদ্ভুতরসের যে অতিরিক্ত লক্ষণ উপস্থিত করেছেন তা এই রসের বিশ্বজনীন প্রয়োগসম্ভাবনাকে সর্বকালের ভাবুকমনের কাছে তুলে ধরে। ভরতের [১৭] মতে—

''যত্ত্বতিশয়ার্থযুক্তং বাক্যং শিল্পঞ্চ কর্মরূপং বা।
তৎ সর্বমদ্ভুতরসে বিভাবরূপং হি বিজ্ঞেয়ম্।''

—অর্থের যুগোত্তীর্ণ মাহাত্ম্য অদ্ভুতরসের জনক হলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত নিঃসন্দেহে অদ্ভুতরসাত্মক উপন্যাস।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য রচনা আরণ্যক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ শান্তরসাশ্রিত রচনা বলা যায়। লেখক স্বয়ং এখানে নায়ক। তাঁর বিপরীত কোটিতে রয়েছে সদাপরিবর্তনশীল মায়াময় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই স্থায়ী ভাবের আশ্রয়। প্রধান নায়কের স্থানে লেখক স্বয়ং উপস্থিত থাকলেও আরণ্যকের নানা অংশে আরও অনেকের কথা বলা হয়েছে যাদের দৃশ্যকাব্য বিচারে 'প্রকরী' বলা যায়। বিরাট অরণ্যপ্রকৃতি তার সর্বব্যাপী চেতন সত্তায় মানুষের সমস্ত ছোট ছোট বিরোধ, অসঙ্গতি ও তুচ্ছতাকে অভিভূত ও একাত্ম করে এক স্নিগ্ধ শান্তরূপ গ্রহণ করেছে। কবি বেঙ্কটনাথ, অধ্যাপক বটুকনাথ, সৌন্দর্যপিপাসু যুগলপ্রসাদ, তরুণী ভানুমতী, রাসবিহারী সিংহ ও নন্দকিশোর ওঝা এদের প্রতিটি চরিত্রের পৃথক রূপ যেন অরণ্যপ্রকৃতির নিঃস্পৃহ মহিমায় লুপ্ত হয়ে তার সর্বব্যাপী অধৃষ্যতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। অরণ্যপ্রকৃতির এই বিরাট রূপ যে ভাবের উদ্রেক করে তাকে কামক্রোধাদিবিকারোত্তীর্ণ ত্রিগুণাতীত শমাবস্থাই বলা যায়। ভরতের ভাষায় এখানে দুঃখ, সুখ, দ্বেষ, মাৎসর্য এর কোনটিই নেই। আছে সর্বাতিশয়ী আত্মসমাহিত রূপ [১৮]। আরণ্যক নিসর্গের মায়াময় অপার্থিব স্বপ্নিল সৌন্দর্য— এই শান্তরসের উদ্দীপন, লেখকের ও খণ্ড-নায়কদের আনন্দশিহরণ ও নৈশ প্রকৃতির নিঃশব্দ লীলার অনুভূতি এর অনুভাব, হিংস্র শ্বাপদকুলের গোপন পদসঞ্চার ও অতিপ্রাকৃত লোক থেকে নেমে আসা পরীদের লীলা ব্যভিচারী ভাব। এরা মিলিতভাবে যে অলৌকিক ও সুগভীর আনন্দানুভূতির উদ্রেক করে তাকে যথার্থই শান্তরস বলে অভিহিত করা যায়। মহাভারত রচিত হবার পর মহাভারতের রসনির্ণয় করে ভরত বলেছেন ''শান্তোঽপি নবমো রসঃ''। তার আগে শান্তরস পঙ্‌ক্তিভাজন হয়নি। প্রকৃতির মধ্যে ''য ওষধিষু যো বনষ্পতীষু'' বিরাজমান যে পরমসত্তা যার উপলব্ধিজাত চিত্তের শমাবস্থা এ মহাভারতেও পাওয়া যায় না। বিভূতিভূষণই এই পরমসত্তার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে আরণ্যকের দ্বিতীয় কোন নজির পাওয়া যায় না।

বাংলা সাহিত্য থেকে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রসতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সর্বজনীন রূপটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। সত্যজিৎ রায়ের একটি বিখ্যাত রচনা 'আগন্তুক'। এখানে নায়ক একজন বহুকাল প্রবাসী আত্মীয়। তাঁর বিপরীত কোটিতে আছেন আত্মীয়া ভাগিনেয়ী ও স্বামী। সুতরাং আলম্বনের দুই পক্ষ আলম্বন ও আশ্রয় উপস্থিত। আত্মীয় মাতুলের পরিচয় নিয়ে বিতর্ক মূল বা স্থায়ী ভাব। এই বিতর্ক, সন্দেহ, বিকার, বিরুদ্ধচিন্তা — এ সমস্ত বিভাবের মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক নানা বিচার, বিরুদ্ধ প্রশ্ন, সম্ভাষণ এগুলি অনুভাব। বিভাব ও অনুভাব মিলিত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়ক হয়েছে। এখানে মূল ভাব বিতর্ক। কিন্তু আলঙ্কারিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিতর্ক ব্যভিচারী

ভাব। অবশ্য আটটি স্থায়ী ভাব কোন কোন সময়ে ব্যভিচারী হতে পারে। কিন্তু ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী চিত্তবৃত্তি নয় এজন্য তা উদ্দীপ্ত হয়ে রসাবস্থায় পৌঁছুতে পারে না। কিন্তু বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব এদের সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে 'ভাবে' পরিণত হতে পারে। 'ভাব' বলতে রসবর্ণনার নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ থেকে ভিন্ন স্বল্পকালীন কাব্যাস্বাদজনিত আনন্দানুভূতি। ভরতমুনির সিদ্ধান্তের অপরূপ সঙ্গতি আমরা দেখি 'আগন্তুক' রচনায়। বিতর্কের লক্ষণ ''সন্দেহ বিমর্শবিপ্রতিপত্ত্যাদিভি-র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েদ বিবিধবিচারিত প্রশ্নসম্ভাষণসম্প্রধারণ মন্ত্রসংগূহনাদিভি-রনুভাবৈঃ।'' বির্তক ব্যভিচারী ভাব এই 'আগন্তুক' রচনাকে ভাব শ্রেণীর রচনায় উত্তীর্ণ করেছে।

এইভাবে বিচার করলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যকাহিনীর অনেকগুলিকেই ভয়ানক রসাশ্রিত বা ভয়ানকরসের 'ভাব' শ্রেণীর ; বাদল সরকারের কয়েকটি একাঙ্ক নাটককেও অদ্ভুতরসের 'ভাব' শ্রেণীর ও জরাসন্ধের কারা-কাহিনীগুলিকেও করুণরসের ভাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেখান সম্ভব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' আলঙ্কারিক বিচারে অভিনবত্বের দাবি রাখে। সভ্যেতর মানবগোষ্ঠীর একাংশ বেদে সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস সংস্কার, সর্পবিষ ও ওষধিনির্ভর বিচিত্র জীবনযাত্রা, অতিপ্রাকৃত ও সর্পদেবীতে বিশ্বাস, --ওসব নিয়ে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। নাগিনীকন্যার প্রথমে এক বেদের প্রতি আসক্তি পরে মুসলমান বেদের সঙ্গে প্রণয় ও মিলন ; পিঙ্গলা ও নাগুঠাকুরের প্রেমকথা অবশেষে নাগুঠাকুরের শিরশ্ছেদ নাগিনীকন্যার সর্পদেবীর কাছে আত্মবলি-- এইগুলি অঙ্গী শৃঙ্গাররস ও অঙ্গ করুণরসের পরিপোষক। কিন্তু এরই সঙ্গে সর্পদেবীর উপরে অলৌকিকত্বের আরোপ ও মা মনসায় অটুট বিশ্বাস দেবাদিবিষয়া রতি যাকে অলঙ্কারশাস্ত্রে 'ভাব' বলে তার উদ্বোধক। এর সঙ্গে হিজলবনের রহস্যময় ভয়াল পরিবেশ জীবজন্তু আনাগোনার বিচিত্র গতি, এসব ভয়ানকরসের বিভাবরূপেই দেখা দিয়েছে। এজন্য এই কাহিনীতে মূলরস শৃঙ্গার ও অঙ্গরস করুণ হলেও রচনার একাংশে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসজনিত রতি 'ভাব' ও ভয়ানকরসের ব্যঞ্জনা উপাখ্যানটিকে এক অনন্যসাধারণ সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মূল ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এখানে বর্ণনীয় বিষয় প্রধানতঃ দেবদেবী, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও রাজকুলজাত অভিজাত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা, ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজা ও রাজ্যের বিরোধ, যুদ্ধ এবং প্রকৃতিবর্ণনা—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অবশ্য এর মধ্যেও স্বপ্নবাসবদত্তার মতন সর্বকালে সংবেদনশীল নাটক মৃচ্ছকটিকের মত বাস্তবজীবনাশ্রিত রসোত্তীর্ণ প্রকরণ বা ভগবদজ্জুকীয়ম্ এর মত নানাশ্রেণীর নীচ ও মধ্যম চরিত্রাশ্রিত প্রহসনও রচিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা দুই-ই দেখা যায়। প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের স্থিতিশীল প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক অযান্ত্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-ক্রোড়-সংলগ্ন জীবন ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই যান্ত্রিক জনবহুল সমস্যাকীর্ণ নাগরিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখনকার সাহিত্যের কথাবস্তু একান্তভাবেই লৌকিক ও অনেকটাই নগরকেন্দ্রিক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে চেতনপ্রকৃতি উদ্দীপন বিভাবের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে থাকত। এখন এই পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে যন্ত্র। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার একাধিপত্য। কিন্তু সাহিত্যে যন্ত্রের স্থান কোথায়? যন্ত্র স্বয়ং অচেতন। অচেতন বস্তু কোন সময়েই চেতনাভাবকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। আলঙ্কারিকরা স্বীকার করেন যে ক্ষেত্র বিশেষে তির্যগ্‌যোনির প্রাণীও রসের আলম্বন হতে

পারে। যেমন কুমারসম্ভবে অকালবসন্ত বর্ণনায় হরিণ হরিণীর ব্যবহার। কিন্তু যন্ত্রের ভূমিকা কি? উদ্দীপক বলতে সাধারণভাবে পরিবেশকে বোঝায়। পরিবেশ অর্থে আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা, উপকরণ, দ্রব্যসামগ্রী এবং প্রকৃতি। কিন্তু শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেই নয় বিশ্বের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যেই প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাবের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। এই প্রকৃতিও জড় ও চেতন দুইই হতে পারে। জড় অর্থে মেঘ, পঞ্চভূত, বিদ্যুৎ ও গ্রহতারকায় ঘেরা অনন্ত বৈচিত্রময় সৌরজগৎ, আর চেতন অর্থে বৃক্ষলতাগুল্ম-নদনদীশোভিতা এই ধরিত্রী। জীবনের ছবি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলনের অনিবার্য নিয়মেই সাহিত্যে যন্ত্রের উল্লেখ ঘটে। যন্ত্রের কোন বাঁধাধরা বিশ্বজনীন রূপ নেই। যুগ দেশ কাল ও প্রয়োজন ভেদে যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রয়োজন অনুসারেই যন্ত্রের রূপ পরিবর্তন ঘটে। এই যন্ত্র যেমনই হোক না কেন মানুষের লেখা সাহিত্যে মানুষের তৈরী যন্ত্রের স্থান হবেই। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই নয় বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহিত্যে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সাহিত্য-পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ যন্ত্রের অবাধ গতির একটা নিজস্ব চিত্রধর্মী সৌন্দর্য আছে যা চিরকালই সৌন্দর্যস্রষ্টা কবির মনকে আকৃষ্ট করে। উদাহরণরূপে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বিমান বা নভোগামী যান্ত্রিক রথের নভশ্চারণার অনবদ্য বর্ণনাকে নেওয়া যায়।[১৯] "বিমানের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বৃক্ষকোটর থেকে চাতকগুলি বেরিয়ে আসছে। বিদ্যুতের হরিদ্বর্ণ আলোকে তাদের দেহ হরিদ্বর্ণ দেখাচ্ছে। বিমানটি মেঘের উপর দিয়ে যাবার সময় বারিগর্ভ মেঘের সংস্পর্শে চাকাগুলি আর্দ্র হয়ে উঠছে। অবতরণের সময় নিম্ন অবলুপ্ত পৃথিবী যেন ক্রমে পর্বতের গা বেয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। গাছগুলি ক্রমে পাতার ঘন সন্নিবেশ থেকে জেগে উঠছে। যে সমস্ত নদীর ধারা সুদূর আকাশ থেকে বিলুপ্তপ্রায় মনে হচ্ছিল তাদের ক্ষীণ প্রবাহ ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন নীচের দৃশ্যমান পৃথিবীতে কেউ হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত করে আমাদের কাছে নিয়ে আসছে।" মালিনী ও শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে মহাকবির এই রসসন্ধানী বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। একই ধরণের কৃত্রিম নভশ্চর রথে আকাশযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় ভাসরচিত অবিমারক নাটকে এবং সুধাসোমজাতকে[২০]। সংস্কৃত সাহিত্যে নভশ্চর বিমানের উল্লেখের সঙ্গে গতিশীল অশ্ববাহিত রথ, জলযন্ত্র, ধারাযন্ত্র, কৃত্রিম পুত্তলিকা, কৃত্রিম যন্ত্রমানব (রোবোট) এ সবেরই বিশদ বর্ণনা আছে[২১]। কিন্তু এই সমস্ত উল্লেখই আলঙ্কারিকদৃষ্টিতে উদ্দীপন বিভাবরূপে।

এ যুগের সমালোচক ও সুধীমণ্ডলীর একাংশ অবশ্য মনে করেন যে সাহিত্যে যন্ত্র তার নিজস্ব সত্তা নিয়েই উপস্থিত হবে। এই চিন্তাধারারই প্রকাশ হয়েছে কবি অমিয় চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রবিনিময়ে। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, implements মানুষকে সম্পদশালী করেছে কিন্তু inspire করেনি... বাষ্পের যোগে যেখানে রেলগাড়ি চলে সেখানে clever কে দেখি perfect কে দেখিনে... যেখানে স্থূলকে দেখি অনির্বচনীয়কে দেখিনে ত।' কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি Stephen Spender-র The Express কবিতাকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে যন্ত্রকে অবলম্বন করেও কবিতা হতে পারে। যেমন-

After the first powerful plain manifests.
The black statement of pistons without more fuss.
But gliding like a Queen. The leaves the station
Without lowing and with restrained unconcern.
She passes the houses which humbly crowd outside.

এখানে রেলগাড়ীকে এক মহিমান্বিতা রাজ্ঞীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; সম্রাজ্ঞী যেমন মহাসমারোহে অথচ সংযত গরিমায় অপেক্ষমাণ জনতাকে অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে যাত্রা করেন রেলগাড়ীও সেইভাবে নগরের ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণীকে পিছনে ফেলে ধীরমন্থর গতিতে যাত্রা করে। রেলগাড়ীর যাত্রীর বিপুল সমারোহ, তার প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত বর্ণনা ক্রমবর্ধমান শব্দ এবং শেষে উল্কার মতন দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া এইগুলির বাহ্য সৌন্দর্য ও চাতুর্য প্রথম পাঠের সময় পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করলেও অর্থানুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর সঙ্গে বিপুলকায় যন্ত্রের উপমা সামঞ্জস্য ঔচিত্য ও পরিমিতিবোধকে আঘাত দিয়ে রসাস্বাদনে বাধার সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক সংস্কারবশেই পাঠকও যন্ত্রকে নারীর প্রতিরূপ আলম্বন রূপে গ্রহণ করে নিতে পারে না। আলম্বনহীন উদ্দীপন রসের সৃষ্টিতে সমর্থ হয় না। আলঙ্কারিক বিচারে এই কবিতা যথার্থ কাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এখন আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে হয় যে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকরা সাহিত্যতত্ত্ব ও সমীক্ষা শাস্ত্রের যে রীতি-নীতি ও বিচার বিশ্লেষণের ধারা নির্দেশ করেছেন তা আজকের দিনে কতটা প্রযোজ্য। ইংরাজী সাহিত্যের নিজস্ব একটি নন্দনতত্ত্ব ও সমীক্ষার ধারা রয়েছে যেখানে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতিনীতির প্রয়োগসম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ইংরাজী ও সংস্কৃত এই দুই সাহিত্য-স্রোতাস্বিনীর বারিপ্রবাহে পুষ্ট। তাই বাংলা নন্দনতত্ত্ব ও সমীক্ষা-শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুকর্ষ প্রয়োজন। ভারতীয় প্রজ্ঞা ও মনীষার অসামান্য নিদর্শন হচ্ছে নয়টি স্থায়িভাবের স্বীকৃতি। এই নয়টি স্থায়িভাবের অধিক কোন স্থায়িভাব (permanent emotion) আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানযুগে 'দেশপ্রেম' বলতে যা বোঝায় তা একটি পরিবর্তনশীল মনোভাব মাত্র। যুগ দেশকাল ভেদে এই চেতনা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ইতিহাসে যেমন দেখা যায় Ottoman Empire ভেঙ্গে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ইসলামধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন Serbia montenigro রাষ্ট্র ভেঙ্গে বর্তমান বল্কান রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়েছে এবং অবিভক্ত সোনার বাংলা থেকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। প্রতিটি দেশেই নিজস্ব নবীন দেশপ্রেমের জন্ম হয়েছে। এই চেতনা কোন স্থায়িভাব নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"কুতোঽপি কারণাদ্ বাপি স্থৈর্যত্বামুপয়ন্নপি।
উন্মাদাদির্ন তু স্থায়ী ন পাত্রে স্থৈর্যমেতি যৎ।"[১১]

এই পরিবর্তনশীল চেতনা অবলম্বন করে যে সাহিত্য-কমের জন্ম হয় তাকে 'ভাব' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাংলাসাহিত্যে স্বদেশী যুগে যেসব তথাকথিত দেশ-প্রেমাত্মক কাব্য নাটক রচিত হয়েছে সেগুলিতে রসতত্ত্বের বিচারে বীররস অথবা অদ্ভুতরসকে অঙ্গীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

আচার্য ভরত খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগে রসনিষ্পত্তির যে যুক্তিনিষ্ঠ ও মনস্তত্ত্বসম্মত তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন, সমসাময়িক কালে Aristotle বহু বিতর্কিত Catharsis ও পরবর্তী কালে Croce তাঁর stimulous, aesthetic synthesis, hedonic accompaniment শিল্পসৌন্দর্যানুভূতির এই তিন পর্যায়ে তার অনুরূপ কোন রসতত্ত্ব উপস্থিত করতে সক্ষম হননি। শব্দ ও অর্থের সুষম সন্নিবেশ থেকে যে চারুতার জন্ম হয় তাই ঔচিত্য। ক্ষেমেন্দ্রের প্রতিপাদিত এই অসামান্য তথ্যের ঈষন্মাত্র প্রতিধ্বনি পরের যুগে Robert Bridges-এর Keep-

ing-এর মধ্যে পাওয়া যায়। স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাবের বিকাশের যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুদীর্ঘ ধারা ভরত থেকে রামচন্দ্রগুণচন্দ্র এই দেড় হাজার বৎসরের অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে পাওয়া যায় তা পাশ্চাত্যের যে কোন দেশের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে বিরল। উদার ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখ'লে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিটি সূত্র ও তথ্যেরই যুগোপযোগী প্রয়োগৌচিত্য দেখান যায়। এই অলঙ্কারশাস্ত্রেরই একটি ভূয়োদর্শী সিদ্ধান্ত এই যে অচেতন বস্তু কোন সময়েই আলম্বন হতে পারে না 'নাচেতনানামালম্বনত্বমিতি' । নায়ক-নায়িকা বা আলম্বনের অন্তর্লীন ভাব কবির শ্রোতার বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকের মধ্যে সমানভাবে সংক্রামিত হলেও ভাবের আদান-প্রদান সিদ্ধ হয়। একের অনুপস্থিতিতে সমস্ত ব্যাপারটি নিষ্ফল হয়ে পড়ে। দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে আলম্বনের অভাবে রসাস্বাদন অসম্পূর্ণ হলেও শ্রব্যকাব্যের বিষয়ে আলঙ্কারিকরা একটা সমাধান খুঁজে বার করেছেন। তাঁদের মতে কোন কাব্যে যদি আলম্বন নাও থাকে তাহলে তার পরিবর্তে একটি আলম্বন আক্ষেপ অর্থাৎ অনুমান করে নিতে হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন -- [২৩]

"সদ্ভাবশ্চেদ্ বিভাবাদের্দ্বয়োরেকতরস্য বা ন ভবেৎ।

ঝটিত্যন্য সমাক্ষেপে তদা দোষো ন বিদ্যতে।।"

যেমন কোন কাব্যে যদি নায়ক-নায়িকার একজন অথবা উভয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকটিকে বা সম্পূর্ণ পদ্যটিকেই আলম্বনের স্থানে কল্পনা করে নিতে হয়। তাহলে গুরু লঘু বিন্যাসযুক্ত পদ্যটিই আলম্বন হয় এবং গোটা পরিবেশটি যার মধ্যে প্রকৃতি প্রধান স্থান জুড়ে আছে তাই উদ্দীপন হয়। এতে রসসৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় না। কাজেই দেখা যায় যে যন্ত্রের আলম্বনরূপে উপস্থিতি সিদ্ধ না হলেও যন্ত্রের বর্ণনাযুক্ত কবিতার ছন্দোবদ্ধ বাক্যাংশই আলম্বন হতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে The Express কবিতাটিকে কাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। তবে এই জাতীয় কাব্য গুণীভূতব্যঙ্গ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে পুনার খ্যাতনামা সংস্কৃত অধ্যাপক জি কে ভট Wordsworth -এর Rainbow কবিতাটিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করে তার রসনিষ্পত্তি সিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন ঠিকই থেকে যায়। শ্রব্যকাব্যের বিষয়ে এইভাবে রসানিষ্পত্তি দেখান গেলেও দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে যন্ত্রের আলম্বনরূপে উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইদানীন্তন কালের অনেক সাহিত্যসমালোচক মনে করেন যে যন্ত্র যদি দূরদর্শনের মত কোন মাধ্যমের সাহায্যে উপস্থিত হয় তাহলে রসসৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না। এই কথাটিকে বিশদ করে আমেরিকার শ্রীমতী Susane Langer বলেছেন যে যন্ত্রমানুষও (Robot) যদি কোন অভিনয় করে এবং সেই অভিনয় দূরদর্শনের মাধ্যমে উপস্থিত হলে রসাস্বাদনের মানসপ্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না। কারণ সমস্ত ব্যাপারটি ত্রিমাত্রিক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই অভিমত এখনও সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি। দূরদর্শন ছায়াচিত্রের মতন অপর একটি মাধ্যম। রঙ্গমঞ্চে উপযুক্ত সাজসজ্জা আলোকসম্পাত, রমণীয় কালোপযোগী পটভূমির মাধ্যমে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় ছায়াচিত্রে ও দূরদর্শনে তারই অভিক্ষেপ। অভিনয়ে নটনটী ও অন্যান্য চরিত্র নবরসের অভিনয়ে উপযুক্ত অংশগ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্রমানব বা যন্ত্রকে নবরসের কোন একটিতেও আলম্বনরূপে উপস্থিত করা যায় না। যন্ত্র কোন সময়েই মানুষের হাসিকান্না বা মিলনবিরহের অংশীদার হয় না। যন্ত্রের একমাত্র ভূমিকা হতে পারে ভয়ানক বা বিস্ময়জনক ঘটনার সৃষ্টিতে। ভরতমুনির অভিমতে [২৪] লোকাতীত অর্থযুক্ত সমস্ত বাক্য

শিল্প বা কর্মই অদ্ভুতরসের বিভাব হতে পারে। লোকাতীত অর্থযুক্ত বাক্য শিল্প ও কর্ম শুধু বর্তমান যুগেরই নয় অতীত ও অনাগত কালের সমুদয় সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনা ও শিল্পকর্মকেই অদ্ভুতরসের বিভাবের অন্তর্ভুক্ত করে। বলা বাহুল্য যে যন্ত্র এই বিভাব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গটিকে আরও বিশদ করে ভরত বলেছেন যে অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময় দিব্যদর্শন, বহুদিনের মনোবাঞ্ছাপূরণ, রাজসভা প্রভৃতি অগম্য, দুরধিগম্য, অথবা দুর্গমস্থানে প্রবেশ, বিমান বা নভশ্চর যন্ত্র, মায়া বা ইন্দ্রজালবিদ্যার সাহায্যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখান, --এই সব কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। অমরসিংহ ও অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থকার 'বিমান' পদটিকে এক বাক্যে আকাশবিহারী যন্ত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। বিমানবিহারের মত যন্ত্রচালিত কৃত্রিম মানব যদি কোন আকর্ষণীয় বা অসম্ভব কর্ম সম্পাদন করে এবং কবির রচনার গুণে তা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয় তাহলে সেই রচনা অদ্ভুতরসাশ্রিত রচনা বলেই গণ্য হবে। এইজন্যই রামায়ণে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও যুদ্ধযাত্রা বা দশকুমারচরিতে ইন্দ্রজাল বিদ্যার সাহায্যে রাজবাহন ও অবন্তীসুন্দরীর বিবাহ পাঠক সমাজের ঔচিত্যবোধকে ব্যাহত করে না। অনাগত ভবিষ্যতে যদি মহাকাশযান নিয়ে কোন সাহিত্যসৃষ্টি হয় তাহলে ভরতমুনির ব্যাখ্যা অনুসারে তা অদ্ভুতরসের অন্তর্ভুক্ত হবে। একইভাবে মহাসাগরের অতলদেশে বা বিজন মরুদেশে অথবা তুষারাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশে যদি যন্ত্রবিভাবের সাহায্যে কোন অভিনব কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তার সরস ও মনোজ্ঞ বর্ণনা এই ব্যাপকসংজ্ঞা বলেই অদ্ভুতরসের অন্তর্ভুক্ত হবে। যন্ত্র স্বয়ং ভয়ানক রসেরও উদ্দীপন হতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয় বা প্রিয়জনবিরহের মতো মর্মান্তিক ঘটনার সৃষ্টি হয় তা ভয়ানকরসের স্থায়িভাব ভয়কে বা করুণরসের স্থায়িভাব শোককে উদ্দীপ্ত করে। অলঙ্কারশাস্ত্রের এই সাক্ষ্য— একটি সত্যকে প্রতিপাদন করে যে সাহিত্যে যন্ত্রের স্থান উদ্দীপন বিভাবরূপেই, আলম্বন রূপে নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময়ের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যে যন্ত্রের এই ভূমিকা সুন্দরভাবেই চিহ্নিত করা যায়। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম যন্ত্রকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেন। এর সুন্দর উদাহরণ 'পাল্কীর গান'। তবে মনে রাখা দরকার যে মনুষ্যবাহিত যান পাল্কীকে প্রচলিত যন্ত্রের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু ভরতমুনি যাকে শিল্পকর্ম বলেছেন সেই বৃহত্তর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে যন্ত্রমধ্যে গণনা করা সম্ভব। কবিতা হিসাবে 'পাল্কীর গান' অপূর্ব উপভোগ্য। কিন্তু এখানে পাল্কীর বাহ্য-অবয়বের বিশেষ কোন বর্ণনা নেই। আছে সামগ্রিক গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পল্লীবাংলার রুক্ষ ধূসর প্রকৃতি ও নিসর্গচিত্রের উপযুক্ত লঘুগুরু ছন্দোবিন্যাসের মাধ্যমে বর্ণনা। ছন্দই এখানে চমৎকৃতির কারক। উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'রেলঘুম' কবিতায় যন্ত্ররূপে সমস্ত রেলশকটের বাহ্যরূপের ও রেলযাত্রীর দৈহিক ও মানসিক অনুভূতির কথা অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এখানে রেলগাড়ির বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনা পাল্কীর তুলনায় অনেক বেশী স্থান জুড়ে আছে। যাত্রীদের মানসিক অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ এবং সেই সঙ্গে তন্দ্রাবিজড়িত মন্থর চেতনার বিভিন্ন স্তরকে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করে উপস্থিত করা হয়েছে। এখানেও কিন্তু কাব্যের সংবেদন ছন্দেরই মাধ্যমে। যন্ত্রের গতিকে ছন্দের মাধ্যমে শ্রুতিগম্য করার আবেদন মস্তিষ্কে ক্ষণস্থায়ী ও সুখকর চমকের সৃষ্টি করে কোন স্থায়ী ভাবকে উদ্দীপ্ত করে না। কবিতা হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ দুজনের কবিতাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্রেণীর : ব্যাঙ্গ্যার্থপ্রধান ধ্বনিকাব্য নয়। ইংরাজী সাহিত্যে All Quiet on

the Western Front উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে War Poet সংজ্ঞায় চিহ্নিত আমেরিকার Whitman প্রমুখ কবিদের কবিতায় যন্ত্রের বিধ্বংসী রূপই নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসে নিস্তব্ধ নৈশ পরিবেশে বোমারু বিমানের আক্রমণের সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যে কাজেই যন্ত্র উপস্থিত হোক না কেন তার ভূমিকা উদ্দীপন বিভাবের অতিরিক্ত কিছু নয়।

যন্ত্রসভ্যতা বিংশ শতকের মানুষের সামনে স্বচ্ছন্দ ঐশ্বর্যের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেও নিগর্সপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এজন্য প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরেই তিনি যন্ত্রকে 'পঞ্চভূত বন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র' বলেছেন। কিন্তু তবু অলক্ষ্যভাবে রবীন্দ্রকাব্যে যে যন্ত্রের পদক্ষেপ ঘটেছিল 'নবজাতক' 'আরোগ্য' ও 'সেঁজুতি'র কয়েকটি কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মোটরগাড়ি, গ্রামোফোন, সিনেমা, রেডিও আর রেলগাড়ির অনেকবারই তিনি উল্লেখ করেছেন। আকাশপ্রদীপে স্টীমারের বর্ণনা চিত্রের মতই নিখুঁত কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের স্বপ্নের মতই ঈষৎ আনন্দের হিল্লোল তুলেই শেষ হয়ে যায়। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে হলেও 'আরোগ্যের' চতুর্থ কবিতায়-

মাঠের অদৃশ্যপারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে পাতালের বুকে
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয় পতাকা।

রেলগাড়ির যথার্থ রূপকে ফুটিয়ে তোলে। 'রাতের গাড়ি' কবিতায় যন্ত্রের হাতে অন্ধের মতন নিজেকে সঁপে দিয়ে অজানার পথে পাড়ি দেবার অনিশ্চয়তা কবিকে মুগ্ধ করতে পারেনি। এই কবিতায় উদ্দীপন নৈশ প্রকৃতি তার এক ক্ষুদ্র অংশ গতিশীল যন্ত্র। ইস্টিশন কবিতায় সকাল বিকেল স্টেশনে এসে গাড়ীভরা মানুষ নিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে পূর্ব থেকে পশ্চিমে রেলগাড়ীর যে যাত্রী তার অনিশ্চয়তা ও রহস্যের মধ্যে মানুষেরই অনন্তলোকে যাত্রীর বেদনা যেন রসসন্ধানী কবির দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। এই সবকটি কবিতায় যন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে কোন রসের আলম্বনবিভাব হয়নি। কবি স্বয়ং স্থায়িভাবের আশ্রয়, আলম্বন হচ্ছে-- ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা কাব্যাংশ যন্ত্রপ্রকৃতির অঙ্গভূত উদ্দীপন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে বীভৎস ও ভয়ানক বাদে সমস্ত রসেরই অল্পবিস্তর পরিচয় মেলে। 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' বাদে বাকী সমস্ত উপন্যাসই মূলতঃ শৃঙ্গার রসাত্মক, সঙ্গে করুণ ও হাস্যরস অঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক ও তাঁদের রচনার আমরা উল্লেখ করেছি। গত দেড়শো বৎসরের মধ্যে রচিত উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে কাব্যধর্মী, বুদ্ধিপ্রধান, জীবনসমস্যাপ্রধান, সামাজিকজটিলতাশ্রয়ী ও মনস্তাত্ত্বিক সমসস্যামূলক নানা শ্রেণীর উপন্যাস দেখা যায়। এই উপন্যাসগুলিতে নরনারীর প্রণয় ও যৌনমিলনজনিত সমস্যা ও সংঘাত, নায়কনায়িকার পূর্বপ্রণয়ী বা প্রণয়িনীর সঙ্গে সম্পর্কজনিত দাম্পত্যজীবনে ভাঙ্গন, আশাভঙ্গ, কলহ, বারাঙ্গনার সঙ্গে প্রণয়, একাধিক নায়কনায়িকার সমাবেশ ও সম্পর্কজন্য জটিলতা, বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক বা সামাজিক আদর্শ বা মতভেদকে অবলম্বন করায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সমস্যা এইগুলি প্রধানভাবে দেখা যায়। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায় প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই শৃঙ্গার করুণ

ও হাস্য এই রসত্রয়ী অঙ্গ ও অঙ্গীভাবে রয়েছে। বীভৎস বা ভয়ানক রসপ্রধান কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। অবধূত রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' এই দুটি রচনার মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজে' করুণ রস ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাটে' শৃঙ্গাররস প্রধান ; বীভৎস রস গৌণভাবে উভয়ক্ষেত্রেই উপস্থিত। এখানেও আমরা দেখি আলঙ্কারিকদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত [২৭] যে হাস্য-বীভৎস ভয়ানক কখনই প্রধান রসের স্থান অধিকার করতে পারবে না। কারণ এরা রঞ্জনা প্রধান, রসাত্মক নয়। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সংঘাত বলে যে বিশেষ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয় আলঙ্কারিক বিচারে তা অনৌচিত্যপ্রসূত। প্রথমতঃ আলম্বন বা আশ্রয়ের অনুপস্থিতি একটি দোষ। স্থায়িভাব অপরিপুষ্ট থাকাও দোষ। এই দোষ থাকলে রচনাটি রসাভাসে পরিণত হয়। রসাভাস বলতে বোঝায় রসের অসম্পূর্ণতা। এই অসম্পূর্ণতা সমস্ত রচনায় (তা সে উপন্যাসই হোক বা কবিতাই হোক) থাকতে পারে বা একাংশে থাকতে পারে। যতক্ষণ অনৌচিত্যমূলক নেতিভাব জাগ্রত থাকে ততক্ষণ রসাস্বাদনে বিঘ্ন হয়। অতীতের অনৌচিত্যের ধারণা ও আধুনিক কালের সাহিত্যের অনৌচিত্যের ধারণা পৃথক। সহৃদয়ভেদেও ঔচিত্যানৌচিত্যের ভেদ হয়। মানসিক জটিলতার এও অন্যতম কারণ। এছাড়া ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী মানুষের মনকে নানাভাবে বিচলিত ও বিপর্যস্ত করায় গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, দ্বেষ, বিতর্ক, ভয়, শোক, ভাবসংগোপন প্রমুখ যে ৩৩টি ব্যভিচারী ভাব ভরতমুনি গণনা করেছেন তারা চিত্তবৃত্তিতে তাৎকালিক প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য উপন্যাসে প্রবহমান মূল স্থায়িভাবের পাশাপাশি 'সহসা উদ্বুদ্ধ ব্যভিচারিভাবও' আত্মপ্রকাশ করে।

এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় জটিলতার সৃষ্টি করে। এজন্য রসাভাস, ভাবাভাস ও ব্যভিচারিভাবের একই উপন্যাসে নানাভাবে প্রকাশ হওয়ায় সমগ্র রচনার আস্বাদনে বিলম্ব ও প্রতীতিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে বাংলাসাহিত্যের অনেক উপন্যাসেরই অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ সম্ভব।

সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার শাস্ত্র অথবা ইয়োরোপীয় নন্দনতত্ত্বের মতন বাংলাসাহিত্যে এখনও একটি পৃথক ও সম্পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাশাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। যেসব প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্তের নাম সর্বপ্রথম বিবেচ্য। অধ্যাপক দাশগুপ্ত সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ভিত্তিতে তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব অলঙ্কারশাস্ত্রের অভাবের পরিপূরণ করার চেষ্টায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর গ্রন্থ সেই আশা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রথমতঃ কাব্যালোক গ্রন্থে দেশপ্রেমকে রস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ভারতীয় মনস্তত্ত্ব ও আলংকারিক বিশ্লেষণের বিরোধী। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে দেশপ্রেম কোন মৌলিক চেতনা নয় এবং দেশপ্রেম একটি ভাব মাত্র। বিশুদ্ধ দেশপ্রেমাত্মক রচনা 'ভাব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা তা বীর বা অদ্ভুতরসের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবপদাবলীর অলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে উদ্দীপন বিভাবের আধিক্য থেকেই রসসৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু একথাও শাস্ত্রসম্মত নয়। আলম্বনের অনুপস্থিতিতে রসাভাস হয়; আর উদ্দীপন বিভাবের বা আশ্রয়ের অনুপস্থিতিতে তাদের একটিকে আক্ষেপ করে নিয়ে রসচর্বণা নিষ্পন্ন করতে হয়। তৃতীয়তঃ অধ্যাপক দাশগুপ্ত দ্রুতিকাব্য নামে একটি কাব্যভেদ কল্পনা করেছেন। যার কোন মনস্তাত্ত্বিক ও রসশাস্ত্রসম্মত ভিত্তি নেই। কিন্তু এমন ত্রুটি সত্ত্বেও অধ্যাপক দাশগুপ্তের

উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয় ও মৌলিকতার দাবী রাখে। কারণ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বাংলাসাহিত্যে প্রয়োগের ব্যবহারিক দিকটি তিনিই প্রথম বিশদ করে দেখিয়েছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর অলঙ্কারচন্দ্রিকা গ্রন্থে বাংলাসাহিত্যের মণিমঞ্জুষা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে অলঙ্কারশাস্ত্রের মানদণ্ডে তাদের প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে আলঙ্কারিকরা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে যে সব আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে যেগুলি এ যুগের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক তাদের সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে উপস্থিত করেন। আলঙ্কারিকদের প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন হলেও বক্তব্য আজকের মতই। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর দু-একটি প্রবন্ধে সংস্কৃত নাটকের রসতত্ত্ব পাশ্চাত্য নাটকের কলাকৌশল অবলম্বন করে রসোদ্রেক হয়েছে কিনা তা বিচার করেছেন। কিন্তু এখানেও দ্বিজেন্দ্রলাল অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলিরই অনুবর্তন করেছেন। ঊনবিংশ শতকে শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ বসু 'শকুন্তলায় নাট্যকলা 'এই নামে শকুন্তলা নাটকের নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক একটি বই লেখেন। শকুন্তলা নাটকের সৌন্দর্য ও গূঢ়মর্ম ফুটিয়ে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য হলেও গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ ইংরাজী বাংলা ও সংস্কৃত নাটক পাশাপাশি রেখে চুলচেরা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশমত পঞ্চসন্ধি ও কার্যের পঞ্চাবস্থা কোথায় কিভাবে হতে পারে তা দেখিয়েছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া অন্য সাহিত্যে প্রয়োগ নিয়ে এমন আলোচনা অন্য কোথাও এখন পর্যন্ত হয়নি। এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ বসু বাংলা সমীক্ষাশাস্ত্রের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন বলা চলে। প্রথম যুগের বাংলা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনায় দিগদর্শক ছিল লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থ। অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর 'কাব্যবিচার' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রসতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেন কিন্তু তিনি কোথাও প্রয়োগশাস্ত্র হিসাবে অলঙ্কারশাস্ত্রের সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেননি। সাম্প্রতিক কালে অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'সাহিত্য-মীমাংসা' ও 'কাব্যকৌতুক' এই দুইটি গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্বের তুলনামূক আলোচনার মাধ্যমে অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বজনীন প্রয়োগ সম্ভাবনার দিকটি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণ বাংলা সাহিত্যকে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছে।

একথা অবশ্য খুবই সত্য যে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত ও লক্ষণই আধুনিক বাংলা সাহিত্য বা ইংরাজী সাহিত্যে প্রয়োগ করা যায় না। দেশ ও কালের পরিবর্তন সাহিত্যে একটি বড় রকমের পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু তা হলেও অলঙ্কারশাস্ত্রে অন্তর্নিহিত সূত্রগুলির একটি সর্বজনীন ও সার্বকালিক ভিত্তি আছে। যুগ দেশ কাল ও রুচির পরিবর্তনসাপেক্ষ এই সূত্রগুলিকে বাংলা সাহিত্যে প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এবং তাতে প্রাচীন ও নবীনের মিলনের ফলে যে সমীক্ষাশাস্ত্র গড়ে উঠবে তা বাংলাসাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করবে।

উল্লেখসূত্র

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

২। রসো বৈ সঃ রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৬।৩।

৩। নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্। মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ।।
সাহিত্যদর্পণ, ৭.৭৫

৪। অবস্থা পঞ্চ কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভযত্নপ্রাপ্ত্যাশা নিয়তাপ্তিফলাগমাঃ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭০।
৫। যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৬।
৬। ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭১।
৭। অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৬৫।
৮। প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোহতিত্বরান্বিতঃ সাহিত্যদর্পণ ৬.৭২।
৯। ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চতৎ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৭।
১০। ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৮।
১১। যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোহধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৯।
১২। বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৮০।
১২ক। সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্যঃ য সমগ্রফলোদয়ঃ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৭৩।
১৩। অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৬৬।
১৪। ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৬৭।
১৫। প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৬৮।
১৬। অপেক্ষিতন্তু যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধন ঃ।
সমাপনংতু যৎ সিদ্ধ্যৈ তৎ কার্য্যমিতি সম্মতম্ ।। সাহিত্যদর্পণ ৬.৬৯।
১৭। নাট্যশাস্ত্র, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, প্রথম খন্ড , পৃ. ৩২৯-৩৩০।
১৮। নাট্যশাস্ত্র, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিবিজ, প্রথম খন্ড , পৃ. ৩৩৪
১৯। শকুন্তলা নাটক, সপ্তম অঙ্ক শ্লোক ৭-৮।
২০। অবিমারক চতুর্থ অঙ্ক ১১ শ্লোক; জাতক ৫৩৭ ঈশানচন্দ্র ঘোষের বঙ্গানুবাদ।
২১। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, সূচনা থেকে; ১৪৭ অঃ বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী রাজপ্রাসাদ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।
২২। সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫৮ শ্লোক। দেশ ২৭শে মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যায় শিশিরকুমার দাশের প্রবন্ধে (পৃ. ৮৬) সংস্কৃত সাহিত্যে দেশপ্রেমের অভাব আছে এই অভিমত সংশোধনযোগ্য।
২৩। সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ শ্লোক ১৬।
২৪। পূর্বোক্ত ১৭ নং পাদটীকা।
২৫। নাট্যশাস্ত্র অভিনবভারতী টীকা, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮।

বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয়

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গের লেখক মার্ক টোয়েন একবার কৌতুকের ছলে ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "lies , damn lies, statistics" ইতিহাসের কলেবর গঠন করে। ইতিহাস কি কেবল রাজামহারাজা, বাদশাহ, সুলতানদের "জন্ম, মৃত্যু, গৃহ-বিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র" (বঙ্কিমচন্দ্র)? বহু পূর্বে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহণ তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী'-তে 'অর্থকথন'- কেই (অর্থাৎ ব্যাখা বিশ্লেষণ) ইতিহাসের মূল তাৎপর্য বলিয়াছিলেন। একালের ইতিহাস-দার্শনিকগণও কথাটা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কথ্য, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে নানা মতান্তর সৃষ্টি হয়। তথ্য যদিও বা পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য লইয়া নানা মতান্তর সৃষ্টি হয়। পন্ডিতে পন্ডিতে 'ব্যতিহার বহুব্রীহি' আরম্ভ হইয়া যায়, বিস্তর কলহ-কাজিয়ার পরেও সংশয় ঘুচে না। যেমন—বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ জয়। এ সম্বন্ধে দুইখানি ফারসি কিতাব ভিন্ন ('তবকাৎ-ই-নাসিরী' ও 'ফুটু-উস-সলাতিন') আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিছু তথ্য থাকিলেও তাহার অধিকাংশই গালগল্প এবং অতিরঞ্জিত ঘটনায় পূর্ণ। কবে নবদ্বীপে এই কান্ডকারখানা ঘটিয়াছিল, কীভাবে সপ্তদশ (অষ্টাদশ নহে, বখ্‌তিয়ারকে হইয়া উনিশ জন) খিলজি অশ্বারোহী নবদ্বীপ অধিকার করিল এবং অতিবৃদ্ধ রাজা পুত্রকলত্রের হাত ধরিয়া বিনা যুদ্ধে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, সোনার গাঁয়ে পৌঁছাইয়া নূতন করিয়া রাজ্যপাট গড়িয়া তুলিলেন তাহার অনেকটাই কল্পনাপ্রসূত। লক্ষ্মণসেন যৌবনে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে অভিযান চালাইয়াছিলেন, কোনো কোনো অঞ্চল নিজ দখলে আনিয়াছিলেন। * সেই-তিনি বার্ধক্যে পৌঁছিয়া রাজধানী নবদ্বীপ (নবদ্বীপ রাজধানী কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে) রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। দিবারাত্র স্মৃতি-পুরাণ ও কাব্যচর্চা করিয়া কাল হরণ করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাপতিরাও মুসলমান অভিযানের কোনো সংবাদ পাইলেন না। এই ঘটনার বৎসরখানেক পূর্বে বিদেশী লুঠেরাগণ বিহার ধ্বংস করিয়াছিল, তবু লক্ষ্মণসেনের সেনাপতিগণ হাত গুটাইয়া ভাগীরথীর ঢেউ গণিতে লাগিলেন—এসব ঘটনা বালক-ভুলানো রূপকথা মাত্র! অথবা ইহার মূলে কি কোনো গুপ্তষড়যন্ত্র ঘটিয়াছিল? রাজপুরুষদের কেহ কি শত্রুপক্ষে গোপনে যোগদান করিয়া খিলজি বাহিনীর পথ প্রশস্ত করিয়াছিল? এই গুপ্তচরবৃত্তির মধ্যে বৌদ্ধেরাও থাকিতে পারে। সিন্ধুতে

* মগধ হইতে গাহড়বালদের খেদাইয়া দিয়া, তাহা অধিকার করিয়া কাশীরাজকে কব্জার মধ্যে আনিয়া, বারাণ ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণসেন যৌবনে অসাধারণ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

যেমন বৌদ্ধেরা মুসলমান আততায়ীর গুপ্তচর হইয়া হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে সংবাদ আদানপ্রদান করিত, তেমনি হিন্দু-সমাজে নিগৃহীত বাঙালি বৌদ্ধেরা কি খিলজি আক্রমণে দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করিয়াছিল? লামা তারনাথও সেই প্রকার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

মোটামুটি কথাটা এই—১২০১ বা ১২০২ খ্রীস্টাব্দে শীতের মাঝামাঝি উনিশজন লুঠেরা তুরুক সওয়ার দিবা দ্বিপ্রহরে নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া লণ্ডভণ্ড করে, নির্বিচারে হত্যা করে, স্বয়ং ঔপন্যাসিকের কল্পনায়, ''যবনেরা রাজপথে যে দুই-একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবনসকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথাও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথাও বা প্রাচীর উল্লংঘন করিয়া, কোথাও বা শঠতাপূর্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম''('মৃণালিনী')। যে-কোনো যুদ্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। তাতার তুরস্ক লুঠেরার দল বাল-বাচ্চা-কবিলা সঙ্গে করিয়া' হিন্দুস্থান লুঠিতে আসে নাই। তাহাদের অধিকাংশই একটি অশ্বতর ও একখানি হাতিয়ার সম্বল করিয়া গান্ধার পুরুষপুর অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে হানা দিয়াছিল। ধনদৌলত ও আওরতের জন্য গোটা দেশটাকে যেন চষিয়া ফেলিয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তিহিসাবে সিন্ধুদেশে ইসলামের প্রথম প্রবেশ ঘটে ৭১১ খ্রীঃ অব্দে। কিন্তু ফলাফলের দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এই সম্পর্কে লেনপুল যথার্থ বলিয়াছেন : " ... an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results." ৯৯৭ অব্দের দিকে সবুক্তগিনের মৃত্যু, সোমনাথ লুণ্ঠন (১০২৬), সুলতান মামুদের মৃত্যু (১০৩০), কুতুব উদ্দিনের দিল্লী অধিকার (১১৯২-৯৩) এবং ১২০০ খ্রীঃ অব্দের দিকে পূর্বভারতে বখ্‌তিয়ারের লুঠতরাজ — অর্থাৎ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের সূচনা হইতে দ্বাদশ শতক—প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও পূর্বভারতে ইসলামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের হিন্দু রাজা-মহারাজারা সেলাম জানাইয়া ইসলামের কাছে নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছিলেন। পারস্পরিক বিবাদ, জাতি ও শ্রেণীভেদ, পুরাতন ধরনের শিথিল রণনীতি এবং বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে পরিবার ও সমাজে ভাঙন, সর্বোপরি বাস্তব জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য দুর্মদ ইসলামের অনুপ্রবেশ বাধা দিতে পারে নাই, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে :

''মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের গর্বোদ্‌গার কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাস-মালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দির সকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পান্ডুরতা, কিংখাব আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদবুদাকার পাষাণ মণ্ডপ, খোজা-প্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদের অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী?'' (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্তকে যেন নিকষ পাষাণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই অভিশপ্ত রাজপ্রাসাদ ও জনশূন্য পথ দিয়া হয়তো এখনও কোনো পাগলা মেহের আলি 'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়' বলিয়া হাঁক দিয়া চলিয়াছে। মোট কথা অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ভারতবর্ষ ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধের নামে রণক্ষেত্রে খাড়া দাঁড়াইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। হিন্দু রাজাদের বীরত্বের অভাব ছিল না, চতুরঙ্গ বাহিনীর অনেকটা জরদ্গব হইলেও তাহারা দলবদ্ধভাবে রুখিয়াছিল বটে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া আত্মহত্যা করা এক কথা, এবং ছলে-বলে-কৌশলে আততায়ীকে ধরাশায়ী করা আর এক কথা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলিয়াছেন, হিন্দু-ভারতবর্ষ দলে দলে জহরব্রত করিয়াছে, কত গোগুণ্ডা (হলদিঘাট) গিরিসংকটে হিন্দুবাহিনী প্রাণ ডালি দিয়াছে। আজিকার দিনে সে রক্তাক্ত ইতিহাস ঘাঁটিয়া কী লাভ?

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বলিতেছি। তখন ঐ শতক প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখনও গৌড়-বঙ্গ-পুন্ড্রবর্ধনে হিন্দু রাজত্ব ছিল। মঠমন্দির, সংঘারাম ও বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, ছিল জৈনদের তাম্রলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় ও পুন্ড্রবর্ধনীয় শাখা উপশাখা। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র ও মহাযান বৌদ্ধ শাখা মিলিয়া মিশিয়া গিয়া বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান—রহস্যময় দেহচর্যার মধ্য দিয়া ভুক্তি-মুক্তির সাধনা করিতেছিল। কালক্রমে তাহা হইতে মুক্তি খসিয়া পড়িল, পঞ্চেন্দ্রিয়াত্মক ভুক্তির সহস্র উপায় জাঁকাইয়া বসিল। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় স্মৃতিশাস্ত্র, কাব্যরস ও আদিরসের স্রোত বহিতেছিল। হঠাৎ তপোভঙ্গের দূতের মতো তাতার-তুর্কী খিলজী সেনাবাহিনী প্রবেশ করিল। অতর্কিতে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজরক্ষীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল, কাহাকেও বা শূলবিদ্ধ করিয়া বালবৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বিনাশ করিল। দিবাদ্বিপ্রহরে রাজধানীতে মাত্র আঠারো জন সৈনিক এবং তাহাদের সর্দার—এক খর্বাকার কুরূপ ব্যক্তি, যাহার বাহুদুটি[১] প্রাগ্‌মানবের (neanderthal man) মতো জানু ছুঁই-ছুঁই করিতেছিল। রাজপ্রাসাদের প্রায় সকলকে নির্বিচারে হত্যা করা হইল। ইতিমধ্যে বহু সৈনিক রাজধানীর তোরণদুয়ার ভেদ করিয়া রক্ষীদিগকে মারিয়া ধরিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছুটিয়া চলিল। উদ্দেশ্য, রাজাকে বন্দী ও যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন। বৃদ্ধ রাজা অভুক্ত অন্ন ফেলিয়া নগ্নপদে খিড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। এ কাহিনী বহু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। যত দিন গিয়াছে ততই ইহাতে রঙ ধরিয়াছে, অবশ্য কৃষ্ণ বর্ণটাই বেশী। যে-রাজা উনিশজন লুঠেরার ভয়ে রাজধানী ফেলিয়া পলাইযা যায়, রক্ষীরা প্রাণ হারায়, সমগ্র নগর জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় তাহাকে ভীরু কাপুরুষ ছাড়া আর কীই-বা বলা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিক বর্ণনার একস্থলে একটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্মাধিকারের (প্রধান বিচারক) বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।" আবার তিনিই প্রবন্ধে গর্জিয়া উঠিয়া বলিয়াছেন, "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। মাত্র সতেরজন (উনিশজন) হাতিয়ারধারী লুঠেরা বণিকের বেশে হানা দিয়া এত বড়ো কাণ্ডকারখানা ঘটাইল, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই: তাই কোনো কোনো ঐতিহাসিক অলীক বলিয়া এই ঘটনাকে উড়াইয়া দিয়াছেন[২], কেহ -বা সবটা না মানিলেও কিছু কিছু স্বীকার করিয়াছেন।

বখতিয়ার অল্প কয়েকজন সিপাহি লইয়া নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, অবশ্য পশ্চাতে দশ হাজারের মতো সেনাবাহিনী ছিল। অল্প পরে তাহারা আসিয়া নবদ্বীপের প্রেতকৃত্য সমাধা করিল। এই জন্য অনেক অবাঙালি লেখক বাঙালিকে ভীরু বলিয়া ব্যঙ্গ করেন, শ্বেতাঙ্গ সাহেবরাও

বাঙালির ভালে 'non martial race' বলিয়া কলঙ্কতিলক দাগিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তখন উত্তরা-পথেও হিন্দুরাজারা মুসলমান দলপতিদের পাদুকা বহিতে দ্বিধা করেন নাই, ইসলামের সহিত বৈবাহিক সূত্রে জড়িত হইতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। সুতরাং পুরাতন গৌড়-বঙ্গকে ভীরু বলিয়া গালির মাত্রা চড়াইয়া দিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইবে। এখন আসল কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক।

খর্বতনু, অপ্রিয়দর্শন, সুদীর্ঘ লম্বমান দুইখানি বাহুবিশিষ্ট বখ্তিয়ার বাহিরের দিক হইতে নিতান্ত সাধারণ মানুষ। ইনিই নবদ্বীপ অভিযানের নায়ক 'মালিক-উল-গাজী' ইখতিয়ার উদ্দিন, মুহম্মদ বিন বখ্তিয়ার খলজি' (Malik-ul-ghazi, Ikhtiyar-ud-din, Muhammad, son of Bakht-yar Khalzi)' কাজের সুবিধার জন্য তাঁহার ল্যাজামুড়া ছাঁটিয়া দিয়া শুধু বক্তিয়ায় খিলজি নাম ব্যবহার করিব। বক্তিয়ার-পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন ঘোর অঞ্চলের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নাম গারমসির, আধুনিক সিস্তানের পূর্ব-ইরান ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্‌গানিস্থানের সীমান্তে অবস্থিত। ১৯৫৯ সালে এটি বালুচিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে ফারসি কিতাবে নানা গুণে (impetuours, enterprising, bold, sagacious and expert) ভূষিত করা হইয়াছে। তাঁহার পিতৃব্য আর এক মুহম্মদ গজনীর সুলতানের সেনাবাহিনীভুক্ত ছিলেন এবং তরাইয়ের যুদ্ধে রায় পিথোরাকে পরাভূত করেন, কাশমন্ডির জায়গীরদার নিযুক্ত হন এবং পরে মুহম্মদ বখতিয়ার সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এখন বলা বোধ হয় সমীচীন হইবে না-- "had no pretensions to a high lineage or rich heritage in his native land."[৪]

১১৯৫ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরে তিনি গজনীর সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘোরীর কাছে সৈন্যপদ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার 'খুবসুরত' কান্তি দেখিয়া সুলতান পত্রপাঠ বিদায় করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর অভিমুখে রওনা দিয়া মালিক কুতবুদ্দিন আইবকের দরবারে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও তাঁহার বাহ্য অবয়ব বাদ সাধিল। বলা বাহুল্য, দিল্লীর সুলতান এই দীর্ঘবাহু বামনাবতারকে দেখিয়া খুশি হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার মধ্যে যাযাবর ধরনের বেগ ও মানসিকতা ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পূর্বদিকে বদাউনে পৌঁছাইলেন। সেখানে শাসনকর্তার কাছে কিছু তন্‌খা মিলিল, কিন্তু জায়গীর দূরস্থান। বদাউনের সিপাহসালার মালিক হিজবর উদ্দিন তাঁহাকে নগদ মাসমাহিনায় নিযুক্ত করিলেন। ১১৯৭ খ্রীঃ দিকে কিছু বীরত্ব প্রদর্শন কারিয়া তিনি শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলেন, তাঁহার কেরামতের পরিচয় পাইয়া জায়গীরদার হুসাম উদ্দিন এই উচ্চভিলাষী যোদ্ধাকে একটু দূরে রাখিলেন। কি জানি, উটের পৃষ্ঠে চড়নদার না বসিয়া যদি চড়নদারের পৃষ্ঠে উট বসিতে চাহে! যিনি শাসকের নিকট হইতে মির্জাপুরের দুটি জায়গীর লাভ কবিলেন এবং বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন, বহু তাতার-তুরকী-খিলজি লুঠেরাদের সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিকে লুটপাট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মির্জাপুরের ভুইলি গ্রামের কাছে একট পরিত্যক্ত কেল্লায় আস্তানা গাড়িয়া কর্মনাশা নদীর পূর্বতীরে যথারীতি 'বিষয়কর্ম' করিতে শুরু করিলেন। অচিরে তাঁহার কর্মকুশল বীরত্বের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আকারে প্রকারে ছোটমাপের হইলে কি হয়, সে 'খামতি' টুকু বীরত্বের দ্বারা পোষাইয়া হইলেন। তাঁহার ক্রিয়াকৌশলে মুগ্ধ হইয়া খিলজি ও তুরস্ক ভবঘুরের দল তাঁহার সাগরেদি করিতে জমায়েত হইল। কোথায় কোপ মারিবেন বখ্তিয়ার ভাবিতে লাগিলেন। মস্তিষ্ক ও বাহুবল তাঁহার পথ বাতলাইয়া দিল। উত্তর-বিহারে তখন কর্ণাটবংশীয়

হিন্দুরাজা বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, সে দিকে সুবিধা হইল না। তাঁহার লুঠেরা বাহিনী রণদক্ষ হিন্দু সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি দক্ষিণ-বিহারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অচিরে দিল্লীতে তাঁহার কেরামতের সংবাদ পৌছাইল। সুলতান কুতবউদ্দিন আইবেক তাঁহার বীরত্বে খুশি হইয়া বহুত বহুত খেলাত দিয়া 'লড়াই-ভিড়াইয়ে' উৎসাহ দিলেন। অবশ্য গাজি বনিবার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনার বশে বখ্‌তিয়ার হাতিয়ার ধারণ করেন নাই, বড়ো মাপের রাজ্য স্থাপনার ইচ্ছাও ছিল না, সাধ্যও ছিল না, কারণ তখনও তাঁহার চাবিদিকে হিন্দুরাজারা যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য লইয়া নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। কনৌজের হরিশ্চন্দ্র (জয়চন্দ্রের পুত্র), রানক বিজয়কর্ণ, রোটাসগড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামীরা, মহামাণ্ডলিক উদয়রাজ— যাঁহারা বিশেষ শক্তি ধরিতেন। সুতরাং চতুর বখ্‌তিয়ার অনর্থক লড়াই করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতে চাহিলেন না। উক্ত রাজা ও ভূস্বামীরাও এই ক্ষুদ্র জায়গীরদার এবং তাঁহার চেলা চামুণ্ডাদের বিশেষ আমল দিলেন না। তাঁহাদের সুদৃঢ় কেল্লা দখলের মতো বখ্‌তিয়ারের ধনবল, জনবল ও অস্ত্রবল ছিল না, তাই অকারণে তিনি ইঁহাদের ঘাঁটাইতে চাহিলেন না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগে অর্থসংগ্রহ, তাহার বেশী নহে। তাই যে-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত, সেই অঞ্চলে উৎপাত শুরু করিলেন এবং ছোটখাট হিন্দু ভূস্বামীদের দাবাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বেশ মোটা রকমের ধনসম্পদ জুটিয়া গেল।

অতঃপর বখ্‌তিয়ার সম্ভবত ১১৯৯ খ্রীঃ অব্দে শ'দুয়েক খিলজি সিপাহি লইয়া বিহাব আক্রমণে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্বে বছর দুয়েক ধরিয়া হিন্দু রাজাদের রাজ্যরাজধানী লুঠিয়াপুটিয়া, দেবমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সহসা হিসার-ই-বিহার, অর্থাৎ কেল্লা বিহারের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন। বস্তুত ইহা কেল্লা দুর্গ কিছুই নহে— একটি বিশাল বৌদ্ধ সংঘারাম, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়, দেখিতে প্রায় কেল্লার মতোই সুরক্ষিত। মুণ্ডিতশির সহস্র সহস্র শ্রমণ এখানে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন-ন্যায় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিত। ভক্তদের মোটা প্রণামির ফলে যথেষ্ট ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারে বহু সহস্র পুঁথিপত্র সংগৃহীত হইযাছিল। মহাযান তান্ত্রিক ও হিন্দু গ্রন্থও ছিল। অষ্টম শতাব্দীর পর কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে যে নব্য পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান হইয়াছিল তাহার প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম কিছু হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মহাযান শাখা সহজেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে মিতালি পাতাইয়াছিল। ফলে সৃষ্টি হইল বহু দেবদেবী, অনুশীলিত হইতে লাগিল বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি বহু উপধর্ম, যাহাতে ভগবান তথাগতের আদর্শের সঙ্গে মতাদর্শ, বিশেষত তন্ত্র, হঠযোগ, কৌল উপধর্ম ও শৈবমতের এক বিচিত্র 'ককটেল' প্রস্তুত হইল। এই সমস্ত ধর্মমতও এই সংঘারামে নিশ্চয় অনুশীলিত হইত। এই বৌদ্ধকেন্দ্র ওদন্তিপুর (ওদন্তপুর) নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এটি নিশ্চয় সুবৃহৎ ছিল, পাশে নগরও ছিল। তাই ইহাকে মিনহাজ উদ্দিন সুরক্ষিত শহর (fortified city) বলিয়াছেন। যাহা হউক সংঘারামটিকে কিল্লা ও মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণদের সৈনিক ভাবিয়া বখ্‌তিয়ারের বাহিনী এই বিশাল ভবনের পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, শ্রমণদের নির্বিচারে হত্যা করিল এবং যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল। কাঠের পেটিকায় সুরক্ষিত পুঁথিপত্রে আগুন লাগাইয়া দ্বিতীয় দোজখ সৃষ্টি করিল, যেমন হইয়াছিল আলেজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থাগারে। খলিফা ওমর মিশর অধিকার করিয়া সর্বাগ্রে এই গ্রন্থাগারটির অগ্নিসৎকার করেন (৬৪২ খ্রীঃ অঃ)। সে যাহা হউক, এই সংঘারামের শ্রমণেরা যে অস্ত্রধারী সৈন্য নহে তাহা আততায়ীরা বুঝিতে পারিল না, সুতরাং সকলকেই প্রাণ বলি দিতে হইল। ইহারা যে হিন্দু নহে, বৌদ্ধ-- তাহা স্বয়ং মিনহাজও জানিতেন

না। তিনিও এই শ্রমণদের ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন : "The greater number of the inhabitants of that place were Brahmanas, and the whole of these Brahmanas had their head shaven ; and they were all slain. There were a great number of books there : and when all these books came under observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that that they might give them information respecting the import of those books, but the whole of the Hindus had been killed." Zubadat-ul Twarikh গ্রন্থের লেখক মিনহাজ উদ্দিনের তথ্য পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মন্তব্য করিয়াছেন, যে-হিন্দুদের ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা নাকি উক্ত পুঁথিগুলি বিষয়বস্তু জানাইয়া দিয়াছিল। সেই সমস্ত পুঁথিতে নাকি লেখা ছিল : "That fortress and city was called a college, but correctly, a Buddhist monastery." এ-সব কথার যথার্থ্য নির্ণয়ের উপায় নাই, কে যে কাহার হাতে তামাক খাইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এই শেষ বাক্যাংশটি 'তবকাৎ'-এর অনুবাদক ও সম্পাদক মেজর র‍্যাভার্টির সংযোজন। যাহা হউক, বখ্‌তিয়ারের এলেম বুঝিয়া দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দিন আইবেক তাঁহাকে বাদশাহি খেলাত পেশকশ করিলেন, অত্যন্ত খাতির করিলেন এবং বহু অর্থাদি দান করিলেন। অবশ্য তখনও বিহারেব কিছু অংশ লুঠতরাজ করিতে বাকি ছিল, অতএব বখ্‌তিয়ার মহানন্দে বিহারের দিকে প্রস্থান করিলেন। তারপর নবদ্বীপ ('নূদীয়া')[৫] বিজয়ের কথা।

সত্যই কি বখ্‌তিয়ার অষ্টাদশ অনুচর লইয়া নবদ্বীপ অধিকার ও ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং রাজা লক্ষ্মণসেন সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন? ইহার উৎস কোথায়? মাত্র দুইখানি ফারসি গ্রন্থে ('তবকৎ-ই-নাসিরী' ও 'ফুটু-উস-সালাতিন') নবদ্বীপ বিজয়ের কথা গল্পের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'-র লেখক মৌলানা মিনহাজ উদ্দিন, যিনি দিল্লীর সুলতানি শাসনে উচ্চ পদে (প্রধান কাজী, ৬৩৯ হিজিরা বা ১২৪১ খ্রীঃ অঃ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার এক বৎসর পরেই (১২৪২) উক্ত পদে ইস্তফা দিয়া বাংলাদেশের লক্ষ্মণাবর্তীতে (প্রাচীন গৌড়) উপস্থিত হন এবং এখানে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া বোধ হয় বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। বহা বাহুল্য, তিনি নবদ্বীপ জয় চর্মচক্ষে দেখেন নাই। লোকমুখে বা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকদের নিকট এই বিষয়ে যে গল্পকথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বেশ কিছু পরে ইতিহাস রচনা শুরু করেন। তাঁহার তবকৎ-এ আ হিজিরা ৬৫৮ বা ১২৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের বিবরণ আছে। সে বিবরণ তিনি এক বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট সংগ্রহ করেন, তাহাও মূল ঘটনার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে। তাহারও অনেক পরে অর্থাৎ নবদ্বীপ জয়ের অন্তত এক শত বৎসর পরে আর একজন লেখক, ইসামি 'ফুটু-উস-সালাতিন' রচনা করেন (১৩৫০ খ্রীঃ অঃ)। মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকৎ' মিলাইয়া এই সনতারিখগুলি নির্ধারিত হইয়াছে :

১. আনুমানিক ৫৬১ আ হিজিরা (১১৯৫ খ্রীঃ অঃ) বখ্‌তিয়ার জীবিকার সন্ধানে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেন, এবং বদাউনের শামক হিজবার উদ্দিনের চাকুরি গ্রহণ করেন।

২. ১১৯৬ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যার শাসক হুসাম উদ্দিন তাঁহাকে মির্জাপুরের দুইটি জায়গীর দান করেন।

৩. আনুঃ ৫৯৩-৫৯৪ আ হিজিরায় (১১৯৭-১১৯৮) বিহার ও মুনেরে লুঠতরাজ করিতে থাকেন।

৪. আনুঃ ফেব্রুয়ারি ১১৯৯ অব্দে ওদন্তিপুর বৌদ্ধ বিহার (হিসাব-ই-বিহার) ধ্বংস করেন।

৫. অক্টোবর ১১৯৯ হইতে ১২০১ খ্রীঃ জানুয়ারির মধ্যে বিহারের অনেক অঞ্চল কব্জা করেন।

৬. আনুঃ ১২০১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি বা কিছু পরে নবদ্বীপ ধ্বংস করেন।

৭. ১২০১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর ও ১২০৩ অব্দের জানুয়ারির মধ্যে গৌড় ও বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন।

৮. আনুঃ ১২০৬ অব্দের মার্চ-জুন মাসে তিব্বত অভিযানে যাত্রা করেন এবং ব্যর্থ, পরাভূত ও বিপুল ক্ষতিসহ কোনোক্রমে দেবকোটে (দিনাজপুর শহরের নিকট বাণগড় গ্রাম) ফিরিয়া রোগগ্রস্ত অবস্থায় নিজ অনুচরের দ্বারা নিহত হন (১২০৬)।

মিনহাজ উদ্দিন বা ইস্‌মি কেহই নবদ্বীপ আক্রমণের প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু হলায়ুধ মিশ্রের নামে প্রচারিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে (১৬ শতকের শেষভাগে অর্বাচীন সংস্কৃতে রচিত) এইভাবে সনের উল্লেখ আছে :

চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্ব তুরস্ক সমুপাগতঃ।

অর্থাৎ, ১১২৪ শকাব্দে (১২০২ খ্রীঃ অঃ) তুরস্ক সেনা বেহার-পাটনা হইতে পূর্ব দিকে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপ কবে তুরুক সওয়ার কর্তৃক অক্রান্ত হইয়াছিল তাহা 'সেকশুভোদয়া'র গ্রন্থকার জানিতেন। নব্য ভারতীয় ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার 'রাজাবলী'তে (রাজতরঙ্গ) লক্ষ্মণসেন ও অন্যান্য সেনরাজ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন-- বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, মাধবসেন, শূরসেন, ভীমসেন, কার্তিকসেন, হরিসেন, শত্রুঘ্নসেন, নারায়ণ সেন, লক্ষ্মণসেন, দামোদরসেন— যাহার সবটাই কুলজি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এবং অধিকাংশই জল্পনা-কল্পনাজাত। মৃত্যুঞ্জয় বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনকে দিল্লীব অধিপতি বলিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনায় ভূগোল-ইতিহাস জট পাকাইয়া গিয়াছে।

এবার প্রথমে মিনহাজ উদ্দিনের বর্ণনা (মেজর রাভার্টির ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে) সংক্ষেপে উল্লেখ করি :

"বিহার জয়ের পর বখ্‌তিয়ার দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দিন আইবেকের দ্বারা সম্মানিত হইলেন, কিন্তু আমীর-ওমরাহ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও বাদ গেল না। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শারীরিক বলের পরিচয় দিতে হইল। ইহার ফলে তিনি সুলতানের নিকট আরও খেলাত ও সম্মান লাভ করিলেন। সুলতানের আদেশে প্রতিকূল অভিজাতবর্গ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নানা উপহার দিলেন, কিন্তু সে সমস্ত উপহার বখ্‌তিয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন কেবল সুলতান প্রদত্ত বাদশাহি পোষাক সঙ্গে লইয়া বিহারের দিকে 'রাহী' হইলেন। গৌড় (লক্ষ্মণাবর্তী), বাংলা (পূর্ববাংলা) ও বিহারের নানা অঞ্চলের কাফেরদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভীতি সঞ্চারিত হইল। তাঁহার বীরত্বের সংবাদ রায় লখমনিয়ার (অর্থাৎ রাজা লক্ষ্মণসেন) কাছেও পৌঁছাইল। এই 'রায়' অত্যন্ত দক্ষ রাজা ছিলেন এবং আশী বৎসর রাজত্ব করেন। রায় লখমনিয়া জন্ম সম্বন্ধে এক কাহিনী বলা যাক।

"পিতার মৃত্যুর সময়ে লখমনিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুটটি গর্ভিণী মাতার উদরের উপর স্থাপন করা হইল, কর্মচারীরা রানীর সেবায় নিরত হইলেন। হিন্দুস্থানের এই 'রায়' বংশ খলিফার

মতো সম্মানিত ছিলেন। ক্রমে লক্ষ্মণসেনের ভূমিষ্ঠ হইবার কাল নিকটবর্তী হইল। তখন গর্ভবতী রানী দৈবজ্ঞদের ডাকাইয়া কোষ্ঠীপত্র ঠিক আছে কিনা দেখিতে বলিলেন। তাহারা জানাইল, এই মুহূর্তে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে তাহার ভাগ্য মন্দ হইবে এবং রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি আর দুই ঘড়ি পরে মাতৃজঠর হইতে বাহির হয় তাহা হইলে আশী বৎসর রাজত্ব করিবে। তাই আসন্নপ্রসবা রানী আদেশ দিলেন, তাঁহাকে যেন পদদ্বয় উপরের দিকে এবং মস্তক নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখা হয়। তাহাই হইল। দৈবজ্ঞের দল কোষ্ঠী বিচার করিতে লাগিলেন। তারপর শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে রানী তাঁহাকে নামাইয়া লইতে আদেশ করিলেন, এবং নামাইয়া লওয়ার পর লক্ষ্মণ সেন জন্ম লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা এত কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন, কালে লক্ষ্মণসেন সিংহাসন লাভ করিলেন।

"রাজা লখমনিয়া আশী বৎসর বাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা এই লেখককে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেন কাহারও প্রতি কখনো কোনো অন্যায় অত্যাচার করেন নাই এবং যে-কেহ তাঁহার নিকট ধন-প্রার্থনা করিত তিনি অকাতরে তাহাকে ধন দান করিতেন-- যেমন করিতেন দিল্লীশ্বর সুলতান কুতব উদ্দিন। লক্ষ্মণসেন প্রতিদিন অন্তত এক লাখ কড়ি দান করিতেন।[৮] ঈশ্বর তাঁহার প্রাপ্য শাস্তি (যাহা অমুসলমান মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য) যেন লাঘব করেন।

"ইতিমধ্যে বখ্‌তিয়ারেব শৌর্যবীর্যের কথা রায় লখমনিয়ার কানেও পৌঁছাইল। জ্যোতিষী-দৈবজ্ঞ ও পারিষদবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণদের রচিত প্রাচীন গ্রন্থে আছে যে, এদেশ তুরস্কের হস্তগত হইবে। সেই দুঃসময় এইবার ঘনাইয়া আসিতেছে। ইহারা বিহার দখল করিয়াছে, পরবর্তী বৎসরেই এদেশ আক্রমণ করিবে। যদি রায় সমস্ত লোকজনের সহিত নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে আমরা তুরুষ্কের কবল হইতে রক্ষা পাইব।" রায় বলিলেন, "কে আমাদের দেশ অধিকাব কবিবে, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ আছে কি?" তাহারা বলিল, "শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে-- যখন সেই বীরপুরুষ দণ্ডায়মান হয় এবং দুই হাত ঝুলাইয়া দেয়, তখন হাত দুইখানি তাহার হাঁটু ছাড়াইয়া যায়।" রায় বলিলেন, "তাহা যথার্থ কিনা দেখিবার জন্য বরং কাহাকেও পাঠাইয়া দাও, যে গুপ্তভাবে সরেজমিনে গিয়া সেই বীরের লক্ষণ দেখিয়া আসুক।" তাঁহার কথামতো বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে বখ্‌তিযারের শরীরের বর্ণনা দিল। যখন শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার মিল হইল তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অধিবাসীরা নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সাঁকনাট,[৯] পূর্ববাংলা এবং কামরূপের দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু রায় রাজধানী ছাড়িতে চাহিলেন না। তাহার পরের বৎসর বখ্‌তিয়ার পূর্বদেশে অভিযান করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তারপর বিহার হইতে বাহির হইয়া সহসা নুদীয়া শহরে হানা দিলেন। এত দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে, আঠারোজন অনুচর ভিন্ন অন্য সেনারা তাঁহাব পিছনে পড়িয়া রহিল। নগরীর তোরণদ্বারে উপনীত হইয়া বখ্‌তিয়ার কাহাকেও কিছু বলিলেন না, ধীরে ধীরে শহরের মধ্য দিয়া চলিলেন এবং এমন ধীরস্থির 'গদাই লস্করী' চালে চলিতে লাগিলেন যে, নগরবাসীরা মনে করিল বোধ হয় অশ্ববিক্রেতা বণিকেরা আসিয়াছে। তাহারা মনেও করিতে পারে নাই যে, এই সেই দীর্ঘ প্রলম্বিত-বাহু বখ্‌তিয়ার। ক্রমে তিনি প্রাসাদের[১০] দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তরবারি বাহির করিয়া সদলবলে কাফেরদিগকে হত্যা শুরু করিলেন। তখন দ্বিপ্রহরে রায় লখমনিয়া আহারে বসিয়াছিলেন, সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে থরে থরে সুখাদ্য সজ্জিত ছিল। হঠাৎ প্রাসাদ-তোরণের দিক হইতে আর্তনাদ শোনা গেল। তখন

রায় বুঝিতে পারিলেন কী ঘটিতেছে। বখ্‌তিয়ার তোরণ দিয়া দ্রুত বেগে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় সকলকেই তরবারির আঘাতে বধ করিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রাসাদের পিছন দুয়ার দিয়া পলায়ন করিলেন, সঙ্গে গেল যাবতীয় সঞ্চিত ধনরত্ন, স্ত্রীলোক,[১১] এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা। অবশ্য উমাপতিধরের মতো কোনো কোনো হিন্দু আততায়ী মুসলমানকে সেলাম বাজাইয়া ম্লেচ্ছ সেনাপতিকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন ('সদুক্তিকর্ণামৃত')। মুসলমানেরা 'অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ফেলিল এবং প্রাসাদ হইতে এত অর্থ লুঠ করিল যে তাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না। যে সেনাবাহিনী পিছাইয়া পড়িয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহারা আসিয়া পড়িল এবং অচিরে সমস্ত শহরটাকে অধিকার করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিল। বখ্‌তিয়ার এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে রায় লখমনিয়া বং-এ (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) কিছুদিন রাজত্ব করিয়া মারা গেলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও (অর্থাৎ ১২৬০ খ্রীঃ অঃ) সেখানে রাজত্ব করিতেছেন।

"বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ নগরী ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান এবং লক্ষ্মণাবতীতে (গৌড়) শাসনযন্ত্র স্থাপন করেন।[১২] নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিও নিজ অধিকারে আনেন, প্রত্যেক স্থানে খুতবা পাঠ ও টাঁকশালের ব্যবস্থা করেন। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং দরবেশদের জন্য আস্তানা বানাইয়া দেন। লুঠতরাজ করিয়া সংগৃহীত বহু ধনসম্পত্তি তিনি দিল্লীশ্বরের (কুতবউদ্দিন আইবেক) নিকট পাঠাইয়া দেন।"

ইহার পর মিনহাজ উদ্দিন বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযান বর্ণনা করেন। সেই অভিপ্রায়ে উচ্চাশী বখ্‌তিয়ার বহু সেনা সংগ্রহও করেন। আলি মেজ নামে এক ধর্মান্তরিত স্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাদের পথ দেখাইয়া পার্বত্য প্রদেশে লইয়া যায়। সম্মুখে ছিল বিশাল নদী—বাগমতী। ক্রমে তিনি ইহার তীরে উপস্থিত হইলেন। উক্ত আলি মেজ প্রায় দশ দিন ধরিয়া দুর্গম পার্বত্য পথে তাঁহাদের লইয়া চলিল, সম্মুখে কুড়িটি খিলানের উপর নির্মিত একটি পুরাতন সেতু। ১২০৬ খ্রীঃ অব্দে বখ্‌তিয়ার দেবকোট হইতে তিব্বতের দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে চলিল সুসজ্জিত দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। ক্রমে তাঁহারা পর্বতে চড়িতে লাগিলেন এবং কামরূপ-রাজার রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। সেতু পাহারা দিবার জন্য কিছু সৈন্য ও দুইজন সেনারক্ষককে রাখিয়া গেলেন। প্রায় ষোল দিন চড়াই-উৎরাই পার হইয়া তাঁহারা একটি সমৃদ্ধ শহরে পৌঁছাইলেন, কিন্তু এইবার তাঁহাদিগকে বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইল, উক্ত শহরের অধিবাসীরা প্রবল বিক্রমে তাঁহাদের বাধা দিতে লাগিল, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে জয়ী হইয়াও সেখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করিলেন না, সেই রাত্রিতেই তাঁবু উঠাইয়া পিছন ফিরিয়া চলিলেন। অতঃপর আরম্ভ হইল পশ্চাদপসরণের দুর্গতি। আবার ষোল দিনের উল্টা রথের যাত্রা। পথে এক কণাও খাদ্য মিলিল না, ঘোড়াদের জন্য দানাপানি ঘাস পাওয়া গেল না, গ্রামবাসীরা পোড়ামাটির রীতি অনুসরণ করিয়া সব কিছু পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। রুশদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া নেপোলিয়ন ও হিটলারের যে দশা হইয়াছিল, অনুরূপ দুর্ভাগ্য বখ্‌তিয়ারের বাহিনীকে গ্রাস করিল। রুশ-নেপোলিয়নের যুদ্ধে রুশের দুই জন প্রধান সেনাপতি ছিল প্রচণ্ড শীতকালের দুইটি মাস। তাহাতেই নেপোলিয়নের বিশাল সেনাবাহিনীর এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া আর সবই মারা পড়িল। বখ্‌তিয়ারও তেমনি পাহাড়িয়া বর্ষার কবলে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বখ্‌তিয়ার-বাহিনী কোনো প্রকারে বাগমতী নদীতটে সেতুর নিকট পৌঁছাইল। হতাশ বখ্‌তিয়ার দেখিলেন সেতু পাহারা দিবার জন্য যাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারা হয় পালাইয়া গিয়াছে, আর না হয় মারা পড়িয়াছে। গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্-- কামরূপরাজ উক্ত সেতুটি ভাঙিয়া চুরিয়া

নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাধ্য হইয়া অশ্বারোহী সেনারা খরস্রোতা পাহাড়িয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শ'খানেক ছাড়া বিরাট বাহিনীর সকলেই নষ্ট হইল। অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে লইয়া ব্যর্থ বখ্‌তিয়ার কোনো প্রকারে দেবকোটে পৌঁছাইলেন। ভাগ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, অনুগত লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতার অস্ত্রে শাণ দিতেছিল, গোপনে গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। নির্ভীক বীরপুরুষ এইবার ভয় পাইলেন, ষড়যন্ত্রের আঁচ পাইলেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না, দারুণ জ্বরে শয্যাগত বখ্‌তিয়ার মৃত্যুমুহূর্ত গণনা করিতে লাগিলেন। দেবকোটে ফিরিবার প্রায় তিনমাস পরে এক গভীর রাত্রে যখন তিনি প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মৃত্যুদূত আসিয়া হানা দিল। আলি মর্দান খিলজি নামে তাঁহার এক অনুচর মুমূর্ষু বীরকে ছুরিকাঘাতে বধ করিল (আ হি ৬২০-১২০৬ খ্রীঃ অঃ)। একালের ঐতিহাসিক এই বলিয়া বখ্‌তিয়াবের কথা শেষ করিয়াছেন : "Though plebeian by birth and deformed in body, he was a born leader of men, brave to recklessness and generous to a fabulous extent. His weaknesses were those born of over-confidence and uninterrupted success." *(History of Bengal,* Vol. II, Ed. by Sir Jadunath Sarkar, Dacca University, 1948)

বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয় সম্বন্ধে আর একখানি ফারসি কিতাব (Futuh-us-satatin -ইসমি রচিত) ছন্দে লেখা হইয়াছিল। সেটিও ভারতবর্ষের ইতিহাস, এখানে সেই পুস্তক হইতে সংক্ষেপ নবদ্বীপ বিজয় সম্বন্ধে কিছু তথ্য উদ্ধার করা গেল।[১৩]

"আমি শুনিয়াছি মুহম্মদ-বিন-বখ্‌তিয়ার পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বণিকের মতো বেড়াইতেন। মুহম্মদ এদেশে প্রবেশ করিলে রায় লখমনিয়ার কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, সীমান্তের এক বণিক বহু মূল্যবান বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে। বহু তাতার দেশীয় অশ্ব, মূল্যবান চীনা রেশম বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য তাহার কাছে ছিল। সংবাদ পাইয়া লখমনিয়া অবিলম্বে প্রাসাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, নানা দেশের মূল্যবান বস্তু কিনিয়া লন। হতভাগ্য রাজা বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীর কথা জানিতেন না, ইহার অন্তরে যে আরো এক ব্যাপার লুকাইয়া আছে তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিবেন? যাহা হউক, প্রাসাদ হইতে নামিয়া তিনি বস্তুগুলি দেখিবার জন্য বণিকের কাছে গেলেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি বণিকের কাছে উপস্থিত হইলে মুহম্মদ তাঁহার সম্মুখে চমৎকার দ্রব্যসম্ভার বিছাইয়া দিলেন। ক্রমেই তাঁহার লোকজন জমা হইতেছিল। পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে মুহম্মদ ইঙ্গিত করিলে তাঁহার সঙ্গীরা চারিদিক হইতে রাজাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করিতে লাগিল। তুর্কী সেনারা তাহাদের উপরে চড়াও হইলে তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। যাহারা ঘেরিয়াছিল তাহারা তুরস্ক সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইল। আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অতঃপর বীর তুরস্ক সেনারা ঝড়ের বেগে হিন্দুদের আক্রমণ করিল। বেশ কিছু হিন্দু অশ্বারোহী বধ করিল। রায়কে গ্রেফতার করিয়া বখ্‌তিয়ারের সম্মুখে আনা হইল[১৪] অতঃপর বখ্‌তিয়ার সমস্ত অঞ্চলের বাদশাহ হইলেন। তাঁহার রাজধানী দিল্লী হইতে পৃথক হইল।"

এই দুইটি বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে অনেক ফাঁকফুকর ধরা পড়িবে। সকলের জানা আছে, গল্পের গরু গাছে চড়ে এবং কথা কানে হাঁটে। তাই প্রকৃত ঘটনা লোকমুখে ছড়াইতে ছড়াইতে মিনহাজের কাছে পৌঁছাইয়াছিল। তিনি বখ্‌তিয়ারের বিহার বিজয় একজন বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নবদ্বীপ-বিজয়ের প্রকৃত তথ্য লোকমুখে শুনিয়া

লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে তথ্যগত ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। মোটামুটি স্বীকার করিতে হইবে, বখ্‌তিয়ারের বিহারজয়ের বৎসরখানেকের মধ্যে উক্ত সংবাদ নবদ্বীপে পৌছাইলেও নগর রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কেন ছিল না, তাহার পশ্চাতে কোনো অন্তর্ঘাত ছিল কিনা, এ-সব কথা মিনহাজ ভাবিয়া দেখেন নাই, তিনি এই ব্যাপারে গালগল্পের উপর খানিকটা নির্ভর করিয়াছেন। যে-ভাবে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্মবিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গঞ্জিকাধূমের কিছু বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে। ফুটু-উস-সালাতিনের লেখক ইসমি তাঁহার বর্ণনায় কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে তুরস্ক সেনাদের আক্রমণে হিন্দু সৈন্যেরা পরাজিত হইল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের একদল দেহরক্ষী রায়কে এমনভাবে ঘেরিয়া রাখিল যে, তুর্কী সেনারা প্রমাদ গণিল। অবশেষে বীর খিলজি সেনারা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইয়া হিন্দু অশ্বারোহীদিগকে বধ করিল।[১৮] বাধ্য হইয়া রায় বখ্‌তিয়ারের বন্দী হইলেন। এই সমস্ত অর্ধসত্য ও অতিরঞ্জনের মধ্য হইতে সত্য বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। অবশ্য একথা ঠিক যে, রাজা লক্ষ্মণসেনকে মিনহাজ বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন রায়ের প্রাপ্য শাস্তি (যাহা অমুসলমানের প্রাপ্য) লাঘব করা হয়। তিনি ভীরু কাপুরুষ, নিজ রাজধানী রক্ষা করিতে পারেন নাই। পুত্র কলত্রের হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাইতে পারে? কিন্তু কৈশোর ও যৌবনে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, বোধ হয় মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হইয়াছিলেন। অন্তত 'সেকশুভোদয়া' হইতে তাই মনে হইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল, নিজেও রচনা করিতে পারিতেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উমাপতির রচনা ("দেবে কুট্যতি যস্য বৈরি পরিষন্মারাঙ্কামল্লে"—মারাঙ্কামল্লদেব অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন যখন সম্মুখযুদ্ধে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতেছিলেন) হইতে তাঁহাকে বিশেষ বীর বলিয়া বোধ হইতেছে। কবি শরণের শ্লোকেও ('স্বেচ্ছাম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি'—স্বেচ্ছাক্রমে ম্লেচ্ছদের বধ করিলেন) দেখা যাইতেছে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১১৭৯ খ্রীঃ অব্দে পিতা বল্লালসেনের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। 'অরিরাজ মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর' লক্ষ্মণসেনের বয়স তখন ৮০-৮২ বৎসর, যখন নবদ্বীপে রাষ্ট্রসঙ্কট আরম্ভ হইল। মিনহাজের সাক্ষ্য মানিতে হইলে দেখা যাইবে, তুরস্ক সৈন্যের আক্রমণ আশঙ্কায় নবদ্বীপ হইতে লোকজন পলাইতে শুরু করিলেও বৃদ্ধ রাজা রাজ্য-রাজধানী ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রাজধানী রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। নানা সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে অনুমিত হইতেছে, নবদ্বীপে তুরুক সওয়ার ও বাঙালি হিন্দু অশ্বারোহীদের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু মিনহাজ তাহার কোনো উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু 'ফুটু-উস-সালাতিনে' ইসমি স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজার শরীররক্ষীরা তাঁহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে ঘেরিয়া রাখে এবং সম্মুখ যুদ্ধে প্রস্তুত হয়। কিন্তু রাজাকে বখ্‌তিয়ারের বাহিনী বন্দী করিতে পারে নাই, তাহার পূর্বেই তিনি নদীপথে পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বোধহয় 'ফুটু-উস-সালাতিনে'র লেখক উড়ো কথার উপর নির্ভর করিয়া এই সংবাদ দিয়াছেন। সমকালে বা পরবর্তীকালে হিন্দুরা এ বিষয়ে কিছু লিখিয়া যান নাই, না সত্যঘটনা, না অতিরঞ্জন। তাই নবদ্বীপজয় সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা জানিবার উপায় নাই। আমরা মুদ্রার এক পিঠ দেখিয়াছি, অপর পিঠ দেখি নাই। দুই পিঠ না দেখিলে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এইটুকু শুধু অনুমান করা যায় যে, ১২০১ (অথবা ১২০২) খ্রীঃ অব্দের শীতকালের মাঝামাঝি দিবাদ্বিপ্রহরে বখতিয়ার খিলজি নামে এক খিলজিবংশীয় যুদ্ধনায়ক হাজার দশেক সেনা

জুটাইয়া অতর্কিতে নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া বহু হিন্দু বধ করেন। নগরটিও ধ্বংস করেন। অতিবৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন স্ত্রীপুত্রাদি ও পারিষদবর্গের সহিত নৌকাযোগে বিক্রমপুরের নিকট সোনার গাঁয়ে পলাইয়া গিয়া আরো কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরে দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন পর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকেও মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের তাম্রলিপি হইতে মনে হয় তাঁহারা পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১৬] লক্ষ্মণসেনের খ্যাতি এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে তাঁহার নামে অব্দ (লক্ষ্মণ সংবৎ, ল. সং) বাংলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। মিনহাজ ও ইসমির বর্ণনায় অনেক ফাঁক আছে। অনেক প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। সেই ফাঁক ভরাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে ('মৃণালিনী') লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকার (প্রধান বিচারক) পশুপতির সহিত আক্রমণকারী মুসলমানের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাসে এমন অনেক ফাঁক আছে। এখানে তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। শুধু একটি কথা স্বীকার করিতে হইবে, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে অনর্থক ভীরুতার কলঙ্ক পাইতে হইয়াছে। কিন্তু মিনহাজ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। বরং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। নবদ্বীপ আক্রমণের পূর্বে উত্তরভারত মুসলমানের পদানত হইয়াছিল। বিহারকে তো বখ্‌তিয়ার তাঁহার খিলজি দলবল লইয়া ছারখার করিয়াছিলেন। প্রশ্ন এই, উত্তরভারতের হিন্দুরাজারা মুসলমানের আক্রমণ ঠেকাইতে পারেন নাই কেন? রাষ্ট্রসঙ্কটের সময়ে বৃদ্ধ রাজা (যুবক বা প্রবীণ) কতদূর বীরত্ব দেখাইতে পারিতেন তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বার্ধক্যেও যে লক্ষ্মণসেনের সাহস, বীর্য ও ঔচিত্যবোধের অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ মিনহাজ-কথিত বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইতে দেখা যাইবে, রাজধানীর সকলেই নিরাপদে অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া তুরস্ক-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। বার্ধক্যের জন্য হয়তো তাঁহার রাজদণ্ড কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, গুপ্তচরগণ সতর্ক ছিল না, বা 'ধুতি খাইয়া' (অর্থাৎ ঘুষ খাইয়া) হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল, সেনাবিভাগ ও মন্ত্রিগণও আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, বা গ্রাহ্য করেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা ঘটা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল। তাহার জন্য লক্ষ্মণসেনকে ভীরু কুলাঙ্গার বলিয়া গালি দিবার প্রয়োজন নাই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সেন-আমলের তাম্রলিপি, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত 'অসতীব্রজ্যার' আদিরসাত্মক শ্লোকগুলির নজির তুলিয়া বলিয়াছেন, যে-রাজসভায় স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং কামশাস্ত্রের অবাধ অনুশীলন চলিতেছিল, 'পবনদূতে' বর্ণিত মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের কামকবোষ্ণ নৃত্যগীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারে বারনারীরা নাগর ধরার ফাঁদ পাতিত, জলাশয়ে অসম্বৃত যুবতীদের স্নানলীলা যুবা বৃদ্ধ সকলকেই লালাসিক্ত করিত —এই নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্মণসেনের বিপর্যয়ের কারণ হইতে পারে। কিন্তু উত্তরাপথের হিন্দু রাজারা তুরকি খোরাসানি মুসলমানের গাড়ু-গামছা বহিয়াছিলেন কেন? সেখানে তো লক্ষ্মণসেনের 'পঞ্চরত্ন' ছিলেন না। আসল কথা, সাহিত্যকে হুবহু বাস্তব সমাজজীবনের প্রতিফলন বলিয়া মনে করা হয়তো সব সময়ে যথার্থ নাও হইতে পারে। সাহিত্যের কতকগুলি 'দাঁড়া' বা convention আছে। তাহার সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকিতে পারে, সামান্য সম্পর্ক থাকিতে পারে, কোনো সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। সুতরাং যেহেতু 'পবনদূতে' অভিসারিকার বর্ণনা আছে এবং গীতগোবিন্দে

নির্জলা কামমহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে, সেই হেতু নবদ্বীপের পতন হইয়াছিল, এইভাবে সাহিত্য ও ইতিহাসের অতিসরলীকৃত সমীকরণ করা যায় না। সে যাহা হউক, মিনহাজ-কথিত এই 'রায় লখমনিয়া' নানাবিধ রাজকীয় গুণে ভূষিত ছিলেন। যৌবনে, এমনকি প্রবীণ বয়সেও যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট শৌর্যবীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১৭] শত্রুপক্ষের প্রশংসাই লক্ষ্মণসেনের মহৎ চরিত্রকে মহত্তর করিয়াছে। শশাঙ্ক, গোপাল-ধর্মপাল এবং লক্ষ্মণসেন বাংলায় ইসলাম অভিযানের পূর্বে যথেষ্ট বলবীর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন লক্ষ্মণসেনের সভায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অতিচর্চার জন্য বাংলা সাহিত্য মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার রাজসভায় সংস্কৃত অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এত দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সংস্কৃতের দ্বারা বলাধান না হইলে বাংলা ভাষা উপভাষার অগৌরবের মধ্যে আত্মগোপনে বাধ্য হইত। সংস্কৃতের পালিশ না পড়িলে 'বঙ্গাল-বাণী' patois হইয়া থাকিত। তাহাতে ছড়া পাঁচালী ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি হইত না। পরবর্তীকালে পুরাণাশ্রিত হিন্দুধর্মের প্রসার হইয়াছিল, এবং একালেও তাহা বজায় আছে। লক্ষ্মণসেনের সভায় সংস্কৃত শাস্ত্র-সংহিতা ও রসসাহিত্যের চর্চা না হইলে তাহা হয়তো লুপ্ত হইয়া যাইত। সর্বশেষে এই ভাগ্যতাড়িত লক্ষ্মণসেনকে অতি মহৎ রাজা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেই হইবে।[১৮] বীর বখ্‌তিয়ার আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াছিলেন, উচ্চাশা তাঁহাকে আলেয়ার মতো ছলনা করিয়া অবশেষে শেষ ফাঁস টানিয়া ধরিয়াছিল। লক্ষ্মণসেনও যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে অতিশয় বীর ও সমরনায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যে তাঁহাকে কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া রাজধানী ছাড়িতে হইয়াছিল। দুই জনেই ভাগ্যবিড়ম্বিত, দুই জনেরই একই বৎসরে মৃত্যু হইয়াছিল। একজনের রক্তাক্ত মৃত্যু, আর একজনের বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক মৃত্যু। একজনের শুধু শস্ত্রেই অধিকার, অন্যজনের শস্ত্র ও শাস্ত্রে তুল্যাধিকার। স্বীয় নামাঙ্কিত অব্দের (লক্ষ্মণ সংবৎ বা ল. সং.) দ্বারা এখনও তিনি বাংলার বাহিরেও স্মরণীয় হইয়া আছেন, আর একজনের কবর পর্যন্ত পাওয়া যায় না। একজনের সভায় জ্ঞান-বিদ্যা ও রসসাহিত্যের স্রোত বহিত, আর একজনের জীবন শুধু ঘোড়ার পিঠে পিঠেই কাটিয়া গেল। তাঁহার কোনো বংশধারা নাই, পুত্র-কন্যা ছিল কিনা জানা যায় না। অপরদিকে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পরেও তাঁহার বংশধারা বজায় ছিল।

গ্রন্থসূত্র:

গৌড়লেখমালা— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
গৌড়রাজমালা— রমাপ্রসাদ চন্দ
গৌড়ের ইতিহাস (১ম. ২য়)— রজনীকান্ত চক্রবর্তী
বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম, ২য়)— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়
বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম)— রমেশচন্দ্র মজুমদার
Tabaqut-i-Nasiri– Ed. and tr. by–Major H. G. Raverty (New edition, The Asiatic Society)
Futuh-us-salatin–Ed. by Dr. M. Hussain
History of Bengal, Vol. I. Ed. by Dr. Ramesh Chandra Majumdar, Dacca University.

History of Bengal, Vol. II. Ed. By Sir Jadunath Sarcar, Dacca University

Indian Historical Quarterly, XVII

উল্লেখসূত্র :

১. "Most of the soldiers who entered Bengal with Bakhtiyar and his generals did not bring their wives with them or were unmarried. They and other foreign Muslims married in this province, and settled down for good, and in course of time Muslims became cultural force in Bengal" *(Muslim Bengali Literature–Enamul Huq)*

২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মিনহাজের কাহিনী বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের গৌড় বিজয়কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।" .. কোন্ সময়ে, কিরূপে গৌড়দেশে মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

৩. 'মিনহাজ উদ্দিন' তবকাৎ-ই-নাসিরী' তে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্তগ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক মেজর এইচ. জি. র‍্যাভের্টি লিখিয়াছেন— "The father's name it appears was Bakhtyar (i. e. the fortunate or lucky), the son of Mahmud."

৪ History of Bengal, Vol. II (Ed. by Sir Jadunath Sarkar)

৫. ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনে নবদ্বীপ 'নদীয়া' বা 'নূদীয়ায়' পরিণত হইয়াছে।

৬. তবকাৎ-ই-নাসিরী অর্থাৎ নাসির উদ্দিন সুলতানের গল্প। ফুটু-উস-সালাতিন অর্থাৎ সুলতানদের বিজয়কাহিনী।

৭. দ্রষ্টব্য -*Sekasubhodaya,* Ed. by Sukumar Sen (Asiatic Society Publication)

বোধহয় মূল রচনাটি বাংলা, কোনো স্বল্পজ্ঞাত ব্যক্তি সংস্কৃতে উহার অনুবাদ করেন। ভাষা অত্যন্ত কাঁচা, যেন বাংলা শব্দে সংস্কৃত বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করিয়া সংস্কৃত রচনার রূপ দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য: "The language of Sekasubhodaya, therefore, is not a kind of Mixed or Dog Sanskrit but is miswritten Sanskrit, i. e., Sanskrit written in the Bangala manner as is now quite well known in examination scripts."

৮. হাজার খানেক বৎসর পূর্বে এক লক্ষ কত মূল্য ছিল সে সম্বন্ধে তবকাতের অনুবাদক র‍্যাভার্টি বলিয়াছেন, "In 1845 the rupi was equivalent to 6500 kauris. and a lakh would be equal to a fraction over fifteen rupees. In ancient times, they may have been estimaed at higher rate, but a lak of kauris could not have been a very desireable present to obtain, or a very convenient one." কিন্তু তবকাতের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে কড়ির বদলে রৌপ্যমুদ্রার ('জীতল') কথা আছে। দ্রঃ র‍্যাভার্টির সংস্করণ, পৃঃ ৫ ও ৬।

৯. সাঁকনাট কোথায় অবস্থিত তাহা জানা যায় না। তবকাতের একাধিক পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি নানাভাবে লেখা হইয়াছে। 'জাবদাত-উস-তারিখে' ইহাই আছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে আছে জগনাথ।

ইহা কি পূর্ববঙ্গের কোনো অঞ্চল? র‍্যাভার্টি ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ফারসি লিপিকরের অজ্ঞতায় ইহা এইরূপ দুর্বোধ্য ভাবে লেখা হইয়াছে। ইহা কি সিলাহাট (Silahat) অর্থাৎ শ্রীহট্ট (সিলেট)? আমাদের মনে হয়, ইহা জগন্নাথধামও হইতে পারে। কারণ তখন পুরী ও তাহার চারিপাশে হিন্দুরাজত্ব ছিল। তাই হয়তো কোনো কোনো নবদ্বীপবাসী পুরীধামের নিরাপদ আশ্রয়ে ঘর বাঁধিয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বয়ং জয়দেব। শেষজীবন তিনি পত্নী পদ্মাবতীসহ পুরীধামেই অবস্থান করেন।

১০. একালের কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, নবদ্বীপের ঘরবাড়ি, এমন কি রাজপ্রাসাদও বাংলা ঘরের মতো চালাঘর ছিল। পরবর্তীকালে নবদ্বীপের কাছে যে বল্লাল ঢিপি ও রাজধানীর ইষ্টক নির্মিত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রাজপ্রাসাদকে নিতান্ত চালাঘর বলা যায় না।

১১. সে যুগের প্রথামতো লক্ষ্মণসেনের অন্তঃপুরে পট্টমহাদেবী ছাড়াও বহু 'ভোগমহিষী' (অর্থাৎ উপপত্নী) ছিল। দ্রষ্টব্য— বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা'। 'সেকশুভোদয়া'য় তাঁহার পট্টমহাদেবীকে রত্নপ্রভা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও তাঁহার অনেক 'ভোগপত্নী' ছিল। 'পুরুষ-পরীক্ষা'য় বলা হইয়াছে—"বভূব গৌড়দেশে লক্ষ্মণসেনো নাম রাজা। তস্য রত্নপ্রভা নাম্নী মহিষী। তদিতরাশ্চ ভোগিন্যঃ কতিচিদ বভূবঃ।"

১২. ঐতিহাসিক বদাউনি লিখিয়াছেন, বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীর যাবতীয় দেবমন্দির চূর্ণ করেন এবং তাহার উপরে মসজিদ ও নানা ধরনের হাবেলি নির্মাণ করেন। এখানে নিজনামে শহর প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহাই গৌড়।

১৩. দ্র. *The Muslim Conquest of Bengal*– N B Roy (I H Q XVII)

১৪. এ বর্ণনা একেবারেই অলীক কল্পনা। এই গ্রন্থ মূল ঘটনার বহু পরে লিখিত বলিয়া এই ধরনের অনেক বাজে কথা ইহাতে ঠাঁই পাইয়াছে।

১৫. এই বর্ণনা হইতে মনে হইতেছে লড়াইটা একতরফা হয় নাই, দুই পক্ষে রীতিমতো সংঘর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু মিনহাজ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই।

১৬. সেন রাজবংশের বিজয়সেন ১০৯৫ খ্রীঃ অব্দে, বল্লালসেন ১১৫৭ খ্রীঃ অব্দে, লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খ্রীঃ অব্দে, বিশ্বরূপসেন ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে, কেশবসেন ১২২৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

১৭. 'সেকশুভোদয়া'-তে লক্ষ্মণসেনের সমরবিজয়ের কথা আছে, "গৌড়বিষয়ে মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনঃ সমরবিজয়ী।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) আর এক স্থানে (নবম পরিঃ) লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "তত্র লক্ষ্মণসেনো নাম মহারাজস্তিষ্ঠতি। তত্র যো যবনো যাতি তং ঘাতয়তি।" সেখানে লক্ষ্মণসেন নামক রাজা আছেন। সেখানে মুসলমান গেলে তিনি তাহাকে বধ করেন। দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মণসেনের প্রতি মুসলমানদের ভীতি তখনও ছিল।

১৮. "His name should go down in history as that of a great and noble, though unfortunate, ruler."–*History of Bengal*, Vol. I (Ed. Ramesh Chandra Majumdar), Dacca University, 1943

পীঠস্থান বক্রেশ্বর

শুভেন্দুগোপাল বাগচী

ভারতের ধর্মজীবনে এমন একদিন এল যখন বৈদিক ধর্ম আচারসর্বস্ব হয়ে সাধারণ মানুষের উপর একদিকে বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, আবার অন্যদিকে সূক্ষ্ম ঔপনিষদিক ধ্যান ধারণা ও বিচার সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে থেকে গেল। ঠিক এই সময়টাতেই আবির্ভূত হলেন গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

তিনি মানুষের দুঃখের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন যে, জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি মানুষের দুঃখের কাবণ ঠিকই। তবে এদের মূলে আছে জন্ম নামক ঘটনাটি। জন্ম হয় পূর্বকৃত কর্মের জন্য। কর্মের মূলে থাকে বাসনা এবং তাবও হেতু হোল অবিদ্যা[১] বা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের সম্যক ধারণার অভাব। সঠিক ধারণা না থাকলে মানুষকে সাংসারিক বন্ধন ও দুঃখের মধ্যে পড়তে হয়। দেহ কেবল দেহই, মন কেবল মনই, এগুলির সঙ্গে নিজেকে অভেদ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুত স্থায়ী ব্যক্তিসত্তার ধারণাই সকল দুঃখের মূল।[২]

বৌদ্ধ ভাবনায় কোন কিছুই কারণনিরপেক্ষভাবে ঘটে না। ঘটনা, দৃশ্যপট বা মানুষের জন্ম একটার পর একটা প্রবাহের মত চলেছে। কিছু ঘটেছে বলেই তার রেশ ধরে অন্য কিছু ঘটছে। এই ভাবনার আলোতে কর্মবাদীকে বোঝা যায়। কর্ম অনুসারে মানুষকে ফলভোগ করতে হয়। ফলে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এর থেকেই ত দুঃখ। বুদ্ধ জন্ম বা দুঃখের নিরোধের উপায় হিসাবে সকাম কর্ম না করে লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়ে নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন যাতে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করতে না হয়। জীব নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। সংসার থেকে মুক্ত হয়। এই নির্বাণ প্রাপ্ত সাধকই হলেন অর্হৎ বা পূজনীয়। এই মুক্তি সাধককে অর্জন করতে হয়। এতে ঈশ্বরচিন্তার স্থান নেই।

অর্হৎ-যান[৩] ক্ষুদ্র (হীন) যান, যাতে একজন মাত্র যাত্রীর সংসারসমুদ্র-পারের কথা জানা যায়। কালে এর পরিবর্তে এল বোধসত্ত্বযান (মহাযান) যাতে সাধক তাঁর নিজের সঙ্গে অন্যকেও সহযাত্রী হিসেবে নিতে পারেন। এই ভাব এল মহাযানীদের বুদ্ধদেবের মহৎজীবন ও কার্যাবলী থেকেই প্রেরণা লাভ করে। তাঁরা সর্বসাধারণের দুঃখমুক্তির উপায় খুঁজলেন। বুদ্ধদেবকেই ধর্মকায়রূপে ভগবানের আসনে বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে করুণা, ভালবাসা ও সাহায্য আশা করলেন। বলা হয় সম্রাট অশোকের সময় থেকেই (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক) কণিষ্কের সময়েই উক্ত ধারার আবির্ভাবকাল এবং এর পর থেকেই এই ধর্মমতের প্রসার হতে থাকে।

উদ্‌গত ভক্তিভাব বৌদ্ধধর্মকে নানা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের কাছাকাছি নিয়ে এল। তন্ত্রের

মূল কথাই হোল উপাস্য ও উপাসকের একীভূত হয়ে যাওয়া।

আবার দেখা যায়, মহাভারতে মাতৃদেবীকে বৌদ্ধ দেবায়তন বা চৈত্যগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে।[৪]

" Jambu-kataka- caityesu nityam Samhitalaye.
Tyam vidya Brahmavidyanam mahanidra ca dehinam."

ঐতিহাসিক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, উপরোক্ত মহাভারতের উল্লিখিত চৈত্য সংস্পর্শে দেবীর সান্নিধ্যের ঘটনার কাল যদি কুষাণ যুগ (খৃঃ অব্দ প্রথম শতক) হয় তাহলে নিশ্চয় করে বলা যায় যে মহাযানী বৌদ্ধধারা শাক্তধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে।[৫]

এবার সহজেই ভাবা যেতে পারে যে, বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লিখিত শাক্তধর্মপীঠগুলো গড়ে ওঠার পেছনে বৌদ্ধচৈত্যগুলোর অবস্থান প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকবে।

বিভিন্ন পুরাণে বা তন্ত্রে পীঠসংক্রান্ত আলোচনায়[৬] পার্থক্য আছে। পীঠের সংখ্যা হিসেবে সব জায়গায় এক না। আদিতে চারটি পীঠস্থানের কথার উল্লেখ আছে পরে তা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে একান্নতে। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধারার পদ্ম বজ্র রচিত হেবজ্রতন্ত্রে যে চারটি পীঠের উল্লেখ আছে, তারা হল জালন্ধর, উড্ডীয়ান, পূর্ণগিরি ও কামরূপ। কালিকাপুরাণে সাতটি পীঠের মধ্যে কামরূপ, পূর্ণগিরি ও জালন্ধরের স্থান আছে, তবে উড্ডীয়ানের পরিবর্তে আছে ওড্র।[৮] আবার বৌদ্ধ গ্রন্থ সাধন মালার সংখ্যা পূর্বমত হলেও, জালন্ধরের পরিবর্তে সেখানে আছে শিরিহট্ট বা শ্রীহাট। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে (দক্ষযজ্ঞভঙ্গ পর্বে) ন'টি পীঠের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মযামলের অন্তর্গত রুদ্রযামলে দশটি পীঠের উল্লেখ আছে এবং এর মধ্যে প্রথমোল্লিখিত চারটি পীঠও আছে।

এইভাবে দেখা যায় যে পীঠের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের একটি অধ্যায়ে ৫০টি পীঠের কথা বলা হয়েছে।[১]

আবার সতেরো শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের রচনা তন্ত্রসারে মেরুগিরি বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মেরুপীঠ এবং গিরিপীঠে। এই বক্তব্য স্থান পেয়েছে প্রাণতোষণীতন্ত্রে। তাই তন্ত্রসার প্রাণতোষণীতন্ত্র ইত্যাদিতে যে ৫১টি পীঠসংখ্যা[৭] দাড়াল, তা তান্ত্রিক সাধনমণ্ডলে ও সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তন্ত্র সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা কবলে যে বিষয়টা চোখে পড়ে তা হল, বেশীর ভাগ পীঠস্থান গড়ে উঠেছে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক আছে স্মৃতিশাস্ত্রকার মনুর মধ্যদেশে, যার পশ্চিম সীমা হল হরিয়ানার অন্তর্গত হিসারের বিনসন যেখানে সরস্বতী নদী মরুবালিতে হারিয়ে গেছে। পূর্বে এলাহাবাদ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল, যা প্রাচীন সাহিত্যে কালকাবন বলে পরিচিত। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং উত্তরে হিমালয়। এই অংশটিকেই বোধায়ন, বশিষ্ঠ আর্যভারত বলেছেন।[৮] ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই মধ্যদেশই আর্যদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শাখাটির আশ্রয়স্থল।

রমাপ্রসাদ চন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পরবর্তী আর্যশাখার মানুষেরা পূর্বে আগত শাখাটিতে চাপ সৃষ্টি করে গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলের মধ্যে তাদের যাতায়াত সীমিত করে দিয়েছিল।[৯] আর অন্তর্বর্তী এই শাখাটি রচনা করেছে বেদশাস্ত্র। আর পীঠগুলির বেশীব ভাগ গড়ে উঠেছে বহির্বিভাগীয় আর্য শাখা অধ্যুষিত অঞ্চলে। তাই মনে হয় পীঠস্থানের ধ্যানধারণা বৈদিক ভাব ভাবনা

থেকে অনেক আলাদা।

ইতিহাসবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হেবজ্রতন্ত্র (অষ্টম শতাব্দী) কালিকাপুরাণ (১০০০ খৃঃ পূঃ নাগাদ) এবং যোগিনীতন্ত্র (মোটামুটি ঐ সময়েরই) ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অসমে শাক্ততন্ত্রধারা যথেষ্টভাবে উক্ত সময়কালে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।[১০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে বাংলার পীঠগুলো সপ্তদশ শতকের আগে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি।[১১] তবে লক্ষ্য করা যায় যে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমাংশের বীরভূম এমনি একটি জেলা যেখানে একান্ন পীঠের মধ্যে পাঁচটি পীঠস্থান অবস্থিত। এতগুলি পীঠস্থান দেশের আর কোন জায়গাতেই নেই। এরা হল বক্রেশ্বর, নলহাটী, অট্টহাস, নন্দীপুর ও কঙ্কালী। স্থানমাহাত্ম্যে বামা ক্ষ্যাপার সিদ্ধপীঠ-(তারাপীঠ) এদের পাশেই স্থান পেয়ে থাকে। তবে কিংবদন্তীর যুগে বশিষ্ঠ এবং ইতিহাসের সময়ের কোঠায় যাঁকে ধরা যায় সেই বামা ক্ষ্যাপার সিদ্ধভূমি তারাপীঠের নাম উপরোক্ত পীঠগুলোর সঙ্গেই সাধারণত করা হয়ে থাকে। বক্রেশ্বর পীঠের সাধক অঘোরীবাবাও সাধনভজনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। স্বল্প পরিসরে বক্রেশ্বর পীঠের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কোন স্থানের ইতিহাস বুঝতে গেলে কিংবদন্তীর অংশকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ তাতে সেই স্থানের মানসিক পরিবেশের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাবক্র সংহিতাতে আছে যে, [১২] ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালকের শিষ্য কহোড়মুনির শাপে (মাতৃগর্ভে থাকা কালীন) তাঁর পুত্র আটটি ভাঁজ বিশিষ্ট শরীর নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তাঁর নাম হয় অষ্টাবক্র। দ্বিজমনুলাল সম্পাদিত[১৩] শ্রী শ্রী বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে যে, তিনি বড় হলে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে কাশীতে এলে, সেখানে শিবের আদেশ পান যে গৌড় দেশে গিয়ে সেখানে অবস্থিত আটটি কুণ্ডের ধারে তপস্যা করলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করবেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, তীর্থস্থানটি বীরভূমে, অথচ বলা হয়েছে গৌড়ের কথা। তবে বক্রেশ্বরের অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখা যায় যে,[১৪] শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে গৌড়াঞ্চলের উল্লেখ আছে, যার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি বিস্তৃত এলাকা নিয়ে।

দেখা যায় কাশী ও বক্রেশ্বর উভয় দেবস্থানের বৈশিষ্ট্য কুণ্ড এলাকার মাহাত্ম্যে। কাশীতে মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী নামক তিনটি কুণ্ডকে ঘিরে একটি শক্তিকোণ গড়ে উঠেছে এবং এই অঞ্চলটি কাশী-বিশ্বনাথ ধামের সব চেয়ে বেশী মাতৃশক্তি-প্রভাবিত অংশ মনে করা হয়। (কল্যাণ শক্তি অঙ্ক, পৃ ৬৬৮)। এদিকে বক্রেশ্বরেও কুণ্ড এলাকাই ক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত।

তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনায়ঃ

দেবকীর্তি বর্তমান, তাহাতে করিলে স্নান
অষ্টসিদ্ধি লভে মানবেতে।
সৌভাগ্য, ভৈরব, যার, অগ্নি ব্রহ্মা কুণ্ড আর
শ্বেতগঙ্গা, বৈতরণী-নামে।

বস্তুত বক্রেশ্বরের সমস্ত ধাম অঞ্চলটিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। কুণ্ডগুলির উত্তরে সবচেয়ে কাছের অংশটিকে সত্ত্বগুণান্বিত মহিষমর্দিনী দেবীর স্থান ও পাপহরা নদের মধ্যবর্তী অংশকে রজঃগুণান্বিত এবং পাপহরা নদী পার্শ্বস্থ শ্মশান অঞ্চলকে তম গুণাশ্রিতধাম অংশ বলে মনে করা হয়। বলা বাহুল্য গুরুর নির্দেশে সাধক বিভিন্ন অংশে সাধন ভজন করে থাকেন।[১৫]

জপের দ্বারা অষ্টাবক্র অষ্টসিদ্ধিলাভ করেছেন এই প্রবাদ, গুপ্তভাবে সাধনার স্থান এবং কাশীর

সঙ্গে বক্রেশ্বরের কুণ্ডমাহাত্ম্যের সাদৃশ্য বক্রেশ্বরকে গুপ্তকাশী আখ্যা দিয়েছে।

অষ্টাবক্রের বিশেষ সাধন এলাকা কুণ্ডগুলো যেমন বিশিষ্টতা পেয়েছে, তেমনি আরাধ্য দেবতা বক্রনাথের মূল মন্দিরটি শিল্পী মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশেষত এই মন্দিরটির শৈলীতে ওড়িষী প্রভাব। মন্দিরের শীর্ষে আছে শিখর ও আমলক। চারপাশেই দাঁড়িয়ে আছে বহু চারচালা বিশিষ্ট দেবমন্দির ও বাড়ী। এর কারণ জানতে গিয়ে অধ্যাপক David Mc Cutchion দেখেন যে, বক্রেশ্বর তথা বাংলার বিশেষ সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এর জন্য দায়ী।[১৬]

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের ফলে সাধারণভাবে ধর্মসংক্রান্ত ঘর-বাড়ী সব কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্থাপত্য-সৌকর্যের হানি হয়। ক্রমশ আক্রমণাত্মক ভূমিকার প্রশমন হয়েছে। এসেছেন চণ্ডীদাস ১৪শ শতকে তাঁর অমর বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' নিয়ে। চণ্ডীদাসের বাড়ী বীরভূমের নানুর গ্রামে। এরপর আসেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) তার প্রেমের বাণী নিয়ে সেখানে জাতপাত ও ধর্মের খুঁটিনাটি বিচারবিভেদ জড়িয়ে দেখা হয়েছে মানুষকে, মানুষের মঙ্গলই এখানে কেন্দ্রবিন্দু। Mc Cutchion এই ধারণা পোষণ করেন যে, ঐ সময়ে সাধারণ বাঙ্গালীর মনে যে ভাবভাবনার উদয় হয়েছিল তার ফলে বীরভূম ও বাংলাব অন্যত্র গড়ে উঠেছে চারচালা ধাঁচের মন্দির, পল্লীবাসীর সাধারণ ঘর-বাড়ীর ছাঁচটাকে মনে রেখে, সাধারণ মানুষকে মনে রেখে।

বাইরে থেকে মানুষ এসে কেবল ক্ষতি করেনি পীঠস্থানের, নানা মঙ্গলকাজে অর্থসামর্থ্য দিয়ে সাহায্যও করেছে। একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এই অঞ্চলের ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া যায়। এই তালিকায় আছেন আফগান রাজারা, আছেন মোগল বংশের শেষবেলাকার বাদশা শাহ আলম।

শাসকবর্গের সহযোগিতার কথায় আসে বর্ধমান জেলার রাজা শ্বেতের কথা। বলা হয় তিনি এই দেবীস্থানের নানা মঙ্গলকর্মে সহযোগিতা করেছিলেন, শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডের নাম তাঁরই নামে। এই রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিংবদন্তীর এলাকা ছাড়িয়ে সরাসরি ইতিহাসের মধ্যে এসে পড়ি।

কথিত আছে, কিছু সামন্ত রাজা বাংলার (প্রাচীন) পাল বংশের রাজা রামপালকে (১০৭৭খৃঃ) উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন।[১৭] শ্বেত রাজা ছিলেন তাঁদের একজন। 'রামচরিতম্'-এ কিছু রাজার নাম আছে যাঁরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তবে এছাড়াও এমন কিছু রাজা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন যাঁদের নামের উল্লেখ নেই।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, "ইহাদের মধ্যে যে সমুদয় সামন্ত রাজ্যের অবস্থিতি মোটামুটি জানা যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রধানত মগধ ও রাঢ় দেশের সামন্তগণই রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।"[১৮] আরও বলা হয় রামপাল সম্ভবত দক্ষিণ বঙ্গ থেকে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। তাই শ্বেতরাজার ঐতিহাসিকতা সম্ভব বলেই মনে হয়।

বাংলায় মুসলমান রাজাদের মধ্যে হুসেন শাহ (ষোড়শ শতক) দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল টৌডরমল্লের খাজনা তালিকায় এ অঞ্চল এসে যাওয়া এবং তা বলাবাহুল্য মোগলদের এদিকে প্রভাব বিস্তারের কথা প্রকাশ করে। এটা সম্ভব হল কারণ এই এলাকায় পাঠান জায়গীরদাররা মোগলদের হয়ে, ঝাড়খণ্ড, তথা ছোটনাগপুর থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় আসা জঙ্গল মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করতে লাগল।[১৯]

অষ্টাদশ শতকে মারাঠারা বাংলায় আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে লাগল, বাংলার (তদানীন্তন) প্রান্তস্থিত জেলা ছটি, বীরভূম ও বর্ধমান প্রথমে আক্রান্ত হোল।[২০] এই সময়ে বীরভূমের রাজা আসাদ-উল্লা প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।[২১] ইনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মস্থানগুলোতে দান খায়রাত করেছেন বলে শোনা যায়। এর প্রপৌত্র আসাদ-উজ-জামাল এত শক্তি ধারণ করতেন যে, লর্ড ক্লাইভও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বস্তুত তিনি তদানীন্তন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁকে প্ররোচিত করতে প্রয়াস পেলেন। আসাদ-উজ-জামাল সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসাতে বুঝতে পারলেন যে, কালে এই সাদা চামড়ার মানুষগুলো দেশে বিপর্যয় নিয়ে আসবে। তাই তিনি বাদশা আলমগীরের (২য়) পুত্র শাহ্ আলম(২য়)কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান করলেন। শাহ্ আলমের দিল্লীর দিনগুলো তখন ভাল যাচ্ছিল না। মুসলমান আমীর ওমরাহেরা তাঁর বিপক্ষে চলে যাচ্ছিলেন, আলমগীরের মৃত্যুর পর মসনদকে ঘিরে তাঁরা শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইলেন।[২২] এইরকম একটা সময়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে শাহ্ আলম বাংলাদেশ আক্রমণ করেন।[২৩] বাদশা যে পথ দিয়ে তাঁর আক্রমণ রচনা করেন তার উপর লাক্রাকুণ্ডা বলে একটি জায়গা পড়ে।[২৪] এই পথ দিয়েই লর্ড ক্লাইভের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বাদশাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন মেজর কাউল্যাণ্ড ও মীয়ান (যাঁরা ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন)।[২৫] এই লক্রাকুন্ডা জায়গাটি থেকে বক্রেশ্বর পীঠ বেশী দূরে না। বাদশা আলমের পক্ষে এই ধর্মস্থানের জন্য সশরীরে এসে জমি জায়গারও অর্থ দান করা সম্ভব ও স্বাভাবিক। পাণ্ডাও তাঁর কথা খুব সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন।

যে কোন পীঠস্থানেরই দেবীর নিত্যপূজার নির্ঘন্ট থাকে যার নির্দেশে প্রতিদিনের পূজা অর্চনা হয়ে থাকে, যার বেশীর ভাগ পাণ্ডারাই করে থাকেন। আবার সাধক স্থানীয় মানুষেরা সাধন ভজন ইত্যাদির দ্বারা পীঠগুলোর নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবটা বজায় রাখেন।

স্বল্প পরিসরে সাধন সংস্কৃতির কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। সাধকদের জীবনযাত্রা ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বহুদিন ধরে চলে আসা কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সাধকগণ মূলত এখানে তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যোগভূমিতে অবস্থানকালে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁরা কৌল বলে অভিহিত হন। অঘোরীর ন্যায় অতি উচ্চ কোটির বীর সাধক এখানে বাস করে গেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র সাধকদের তিনটি স্তরে ভাগ করে থাকে। পশ্বাচারী, বীরাচারী ও দিব্যাচারী।[২৬] সাধকও শক্তিরই পূজারী। শক্তিকে জগৎ ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত ভাবা হয়। এঁর পূজায় লাগে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন; কারণ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকেই এখানে পূজার উপচার হিসেবে দেখা যায়।[২৭] যেহেতু উপাচারগুলির প্রথম অক্ষর 'ম' তাই এদের সাহায্যে সাধনাকে পঞ্চ-মকার সাধনা বলে। কিন্তু বিভিন্ন সাধকের অধিকারীভেদে পঞ্চতত্ত্বের উপাদানগুলোর ব্যবহার ও সংজ্ঞা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্বাচারের স্তরে যাঁরা আছেন, তাঁরা কারণ-বারির পরিবর্তে নারকেলের জল পান করেন, দিব্যাচারী অবস্থায় সাধকের কাছে কারণ-বারি হল যোগ মাধ্যমে আহরিত পরমতত্ত্ব এবং বীরাচারীগণই পঞ্চতত্ত্বের সাক্ষাৎ অর্থ গ্রহণ করে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা সাধনা কবেন। অন্য উপচারগুলোতেও একই নিয়ম।

তবে বীর সাধকদের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। স্বভাব বীর প্রত্যক্ষতত্ত্ব আর বিভাব বীর মানসিক প্রত্যক্ষতত্ত্ব ও বাহ্য অনুকল্পতত্ত্বের দ্বারা দেবীর আরাধনা করেন। মন্ত্রসিদ্ধবীর যে কোন অভিরুচির

শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার করতে পারেন।"[২৮]

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় (যিনি অঘোরীবাবাকে স্বচক্ষে দেখেছেন) তাঁর বহুপঠিত গ্রন্থ 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' (প্রথম ভাগ, পৃ ২৩১)-তে লেখেন যে, পীঠস্থানের সাধন ক্রিয়া সংস্কার সম্বন্ধে তিনি অঘোরীবাবা'র শিষ্য। খণ্ড ভৈরবের কাছে জানতে চাইলে, তিনি বলেন যে, যা কিছু হয়ে থাকে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে, তবে অঘোরীর কাছে যা দেখবেন তার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর কোন গুহ্য নাই। তিনি সিদ্ধযোগী। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না উপরোক্ত আলোচনায় মন্ত্রসিদ্ধবীরদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তা লক্ষ্য করলে। নেপালে শাক্ত সম্প্রদায়ের কতগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তাকে কৌল আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।[২৯] এঁদের গুরু হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। বক্রেশ্বরের শিব 'বক্রনাথ' এই নাথ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অদূরে কোপাই-এর ধারে কঙ্কালী পীঠকে ঘিরে যে প্রবাদ কাহিনীটি আছে তা লক্ষ্য করা যাক। নাথ সম্প্রদায়ের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ শিবের কাছ থেকে জীবন-রহস্য চুরি করে নিয়ে গেলে দেবী তাঁকে নানা ছলাকলায় বশীভূত করে তাঁর অস্তিত্ব বিনাশ করেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁর সাধনা বজায় রাখতে সমর্থ হন। দেবী তাঁকে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করলে, তিনি প্রতিহত করেন। দেবী তাঁর শরীরের অভ্যন্তরে মাছি হয়ে প্রবেশ করলে, উনি দেহের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর নির্গমনের পথ করে দিলে বাইরে বেরোবার সময় দেবীর কাঁকাল ভেঙ্গে যায়। তখন গোরক্ষনাথ দেবীর প্রাপ্য সম্মান জানিয়ে দেবীস্থান প্রতিষ্ঠা করলে তার নাম হয় কঙ্কালী। শিব পরে দেবীর খোঁজ করতে এলে তাঁকে গোরক্ষনাথ বলেছিলেন,

"ভাঙ ধুতুরা খাও তুমি কি বলিব তোরে
কথাতে হারাইছ নারী ধর আসি মোরে।"

দক্ষযজ্ঞের পর সতীর দেহাংশকে নিয়ে নানা জায়গায় পীঠ গড়ে ওঠার কাহিনীটা সকলেরই জানা, তবে গোরক্ষনাথ কর্তৃক দেবীকে উপরোক্তভাবে প্রতিষ্ঠার কথা স্থানীয় লোকমুখে শোনা যায়।

"সেই যে গোরক্ষ তাহে নিবন্ধ করিল
কালী বলি এক মূর্তি রাঢ়েতে স্থাপিল।"

বলা বাহুল্য কালী বলে এখানে গোরক্ষনাথের মূর্তি স্থাপন বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে।

গোরক্ষনাথের নামমাহাত্ম্য একসময় সারা উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। এমনকি সুদূর পেশোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।[৩০] আবার বাংলাদেশের ময়নামতীর গানের ভেতর দিয়ে এই কথা প্রচারিত হতে দেখা যায়।[৩১] এতে বোঝা যায় এঁর প্রভাব এ অঞ্চলেও ছিল। কঙ্কালীর সঙ্গে এ কে জড়িয়ে কিংবদন্তী ধর্মীয় ইতিহাস সন্ধানের সূত্রের ইঙ্গিত দেয়।

বলা হয় কৌল ধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি সহজিয়া মতবাদ থেকে গৃহীত, এ ধর্মে গুরুর বক্তব্যই শেষ কথা। চরম গুরুবাদের উপর এই সাধন প্রণালী যোগ বিশেষ। এই সাধনার মূল কথা হল শরীরের বিভিন্ন নাড়ীর মধ্য দিয়ে শক্তিকে একেবারে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্থানে বা মহা সূক্ষ্মস্থানে পৌঁছে দেওয়া। এই অবস্থায় সাধকের বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। 'সাধক, জগৎ, বুদ্ধ' একাকার হয়ে যায় এবং সাধক অদ্বৈত জ্ঞানের অধিকারী হন।[৩২] তবে এরা বর্ণাশ্রম মেনে চলে বলে ব্রাহ্মণ্য শাক্ত ধারার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পেরেছে তাই বক্রেশ্বরের পীঠদেবতা 'বক্রনাথ'। উল্লেখ্য অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালে বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক। তবে এ বৌদ্ধধর্ম সহজিয়া সাধন ধাবার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত কৌল ধর্মের মধ্যে যাঁরা জাত বিচার করলেন না তাঁরাই সহজিয়া, বাউল অবধূত ইত্যাদি

সম্প্রদায়ে পরিগণিত হয়েছেন, আবার এঁরাই সাধন মার্গের পার্থক্য অনুসারে রজকী, ডোম্বী, নটী ইত্যাদি কল্পিত কুলে বিভক্ত ছিলেন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্যক্ত করেছেন, উপরোক্ত কুলের নাম থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তর থেকে বেশীর ভাগ মানুষেরা এঁদের মধ্যে স্থান পেত। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম প্রাচীন সহজিয়া ধর্মের পঞ্চকুলের অন্যতম রজকীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য এ চণ্ডীদাস (চতুর্দশ শতক) বীরভূমের নানুরের বাসিন্দা। তিনি সহজিয়া ছিলেন এবং একথা বলা হয় যে পরবর্তীকালে সহজিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে সত্যকে কৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তিকে রাধারূপে কল্পনা করে।

১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সময় সীমার মধ্যে বাংলার ধর্মসংস্কৃতির জগৎকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে Trivor O Ling লক্ষ্য করেছেন যে, এখানে একদিকে ক্রমশ রাধার গুরুত্ব বাড়ছে, আর একদিকে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার সঙ্গে সূফী ধর্মচিন্তার যোগের ফলে বাউল সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে।[৩৩] সুফীদেরও ত মূল বক্তব্য মানুষের নিজের চরিত্রের পরিশোধন করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এতে পুরান প্রথা, যুক্তির চেয়ে তার প্রেম, মনের মিলের অভিব্যক্তি বেশী উপজীব্য।[৩৪] এখানে গবেষক সুধীর চক্রবর্তীর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি কোন এক সুফী সাধকের (বেলোয়ারি) কাছে গল্পটি শোনেন।[৩৫] একবার হজরত মহম্মদ গভীর ধ্যানের পর আল্লাতলার কাছ থেকে তিনটি বস্তু পেলেন—জহর(বিষ), মধু ও আতর। তিনি নিজের জন্য জহর রেখে মধু ও আতর শিষ্যদের দান করেন। বলা হয়েছে, মহম্মদ যে জহরটা নিজে নিলেন, তাতে পরে শিষ্যরা বলেছিল, "তিনি নিজে কষ্টটা নিলেন আর আমাদের দিলেন আনন্দ। সেটা কি ঠিক হলো? কষ্ট করতে যে আমাদেরও ইচ্ছে হয়, হজরত আমাদের কষ্ট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করলেন। কষ্ট না করলে কি আল্লাতলাকে কোনদিন পাওয়া যায়?" সাধক এই ব্যাখ্যা তাঁর গুরু মহম্মদ শাহর কাছ থেকে জানতে পারেন, জানতে পারেন প্রকৃত আত্মসুখ সম্বন্ধে ধারণা। খুব সহজেই বাউল সংস্কৃতি ও সুফী চিন্তা ধারার সঙ্গে মিলেমিশে একটি প্রবহমান স্রোতে পরিণত হয়েছে। বক্রেশ্বর পীঠ থেকে বীরভূমের বিশিষ্ট সুফী সাধনধাম পাথরচাপড়ী বেশী দূরে না। ধর্মস্থানের মানুষেরা এখানে এই বীরভূমে শান্তিতে পরস্পরের আঙ্গিনায় যাতায়াত করেন। সকলেই জানেন, বাউল সংস্কৃতির বৃহত্তর আঙ্গিনায় বীরভূমে বাউলের এক বিশেষ স্থান আছে। অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে এঁদের প্রভাব বক্রেশ্বর পীঠের মানসিক আবহাওয়াকে প্রভাবিত করেছে। তাইতো যুগ যুগ ধরে নানা পথের পথিক এখানে আসেন, সাধারণ মানুষ আসেন শান্তি পেতে।

উল্লেখসূত্র :

১. Article ' Philosophy' by S. N. Dasgupta, *The Legacy of India*, ed. G. T. Garratt, Oxford Clarendon Press.

২. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy* Vol.I, p 416.

৩. A. K. Majumdar, *Elements of Indian Culture*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay-7 p 39.

৪. J. Muir, *Original Sanskrit Text*, London 1863 Vol IV.

৫. Sudhakar Chattopadhyaya, *Evolution of Hindu Sects in Ancient India*, p 163

৬. কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৬৪, পৃ ৪৩-৪৫, এবং অধ্যায় ১৮.

৭. *Anandasrama* ed. Patala XIV Verse 112 দ্রষ্টব্য উপেন্দ্রকুমার দাস, শাস্ত্রমূলক তন্ত্র সাধনা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

৮. মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২২।

৯. R. P. Chanda. *Indo-Aryan Races*, Chap. I

১০. *The Place of Assam in History and Civilisation of India,* p.13.

১১. *The Sakta Pithas*, Journal of The Royal Asiatic Society of Bengal XIV No 1, 1948.

১২. উপক্রমণিকা, অষ্টাবক্র সংহিতা, ধ্রুবানন্দ গিরি সম্পাদিত।

১৩. বক্রেশ্বরে গবেষণাকর্মে রত অবস্থায় কতিপয় পাণ্ডার কাছ থেকে সংগৃহীত পুস্তিকা।

১৪. দিগ্বিজয় প্রকাশ থেকে এস. কে. ঘোষের গৌড়কাহিনীতে উদ্ধৃত, পৃ ১০।

১৫. ১৯৬৯ সালে বিশেষ সাধক গুহাবাবা দেহ রাখেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কালে ঐ সময় অবগত হওয়া যায়।

১৬. David Mc Cutchion's article 'Temple of Birbhum', VisvaBharati Quarterly, ed. S. S. S. Vol 31 No 4.

১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৭ম সং, ১৯৮১, পৃ ১১৫

১৮. ঐ

১৯. Blochman, *Contribution to Geography and History of Bengal*, Journal of the Asiatic Society of Bengal 1843, pp 222-23.

২০. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* Chap IV. p 19.

২১. C. Stewart. *History of Bengal*, p. 269.

২২. W. Irvin, *The Imperial Gazetteer of India* Vol II, p 411.

২৩. H. H. Dodwell, *Cambridge History of India.* Vol V.

২৪. Broom's *History of Bengal Army*, pp 181, 192 Census 1951, West Bengal, District Handbook Birbhum 1954 p x-এ উদ্ধৃত।

২৫. J. Sarkar. *Fall of the Mughal Empire* Vol II, p 539.

২৬. John Woodroffe, *Shakti And Shaktas,* p 598.

২৭. ঐ pp 604-606

২৮. উপেন্দ্রকুমার দাস, শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৬৩৭।

২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ২১৫।

৩০. H. H. Wilson. *Hindu Religions*, (published by the Society for Re-suscitation of Indian Literature,

৩১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ ২১৬, পূর্বোক্ত সং।

৩২। ঐ

৩৩. তাঁর কথায় But it cannot be denied that there were some interesting and significant development in Hindu religion during this period in question,

particularly notable for example, are the growth of the Sahajiya cult especially in its Vaisnava context; and the increased importance of the worship of Radha; and the growth of the Baul community in the seventeenth century. The last of these has been seen as the outcome of the assimilation of the Vaisnava Sahajiya with Sufistic ideas.

Trevor O Ling, *Religious Change and the Secular State* (Stephanos Nirmalendu Ghosh Lectures, Calcutta University) Research India Publication, p. 22.

৩৪. দ্র. *Encyclopedia America*. Vol 25, p 849.

৩৫. গভীর নির্জন পথে, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ১০৭-৮।

রামমোহন রায় ও উজ্যান বুর্নুফ
দিলীপকুমার বিশ্বাস

রামমোহন রায়ের রচনাবলী পাশ্চাত্ত্য সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ আরবী ভূমিকা সংযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্ফাৎ-উল্মুওহ্‌হিদিন' (১৮০৩-০৪) সে-সময় এদেশের বিদগ্ধ মহলে অবশ্য যথেষ্ট আলোড়ন ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। জর্‌থুশ্‌ত্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এর যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়; এবং রামমোহনের সম্ভবতঃ কোনো মুসলমান মিত্র 'জওয়াব্-ই-তুহ্ফাৎ-উল্মুওহাহিদিন' শীর্ষক এক পুস্তিকা লিখে কড়া ভাষায় এই সমালোচনার উত্তর দেন। তা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত মূল পুস্তিকাখানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে য়ুরোপীয় বিদ্বানদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না, তাঁরা সাধারণভাবে রামমোহনের এই প্রথম প্রকাশিত রচনার অস্তিত্ব বিষয়ে অবগত ছিলেন মাত্র। এটির বক্তব্য তাঁরা সুনিশ্চিত ভাবে জানতে পারেন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মৌলভি ওবেইদুল্লা আলওবেইদ্ কৃত এর প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর। অপরপক্ষে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পাশ্চাত্ত্য পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে দুই শ্রেণীর রচনা ছিল এবং তাদের আকর্ষণ ছিল মুখ্যতঃ দুই গোষ্ঠীর পাঠকের কাছে। ১৮২০ সালে রামমোহন প্রকাশ করেন তাঁর খ্রিস্টোপদেশের সারসংকলন *The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness*, এবং ফলস্বরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে সুদীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল খ্রিস্টীয় ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত যাজকগণের সঙ্গে। এই বিতর্ক প্রসঙ্গে ১৮২০ থেকে ১৮২৩ -এর মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনখানি গ্রন্থ *An Appeal to the Christian Public (১৮২০); Second Appeal to the Christian Public (১৮২১);* এবং *Final Appeal to the Christian Public* (১৮২৩)। এই গ্রন্থগুলি য়ুরোপ এবং আমেরিকার খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং প্রচলিত ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রিস্টধর্ম বিরোধী অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ইউনিটারিয়ান খ্রিস্টীয় মণ্ডলী রামমোহনের বিদ্যাবত্তা ও শাস্ত্রবিচার পদ্ধতির নিপুণতা সম্পর্কে প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যেই উক্ত গ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণ য়ুরোপ-আমেরিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি ছিল হিন্দুধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত রামমোহনের গ্রন্থনিচয়। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ এর মধ্যে রামমোহন প্রকাশ করেন 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫); 'কেনোপনিষৎ' (শাংকরভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত ১৮১৬); 'ঈশোপনিষৎ' (শাংকরভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৬); 'কঠোপনিষৎ' (শাংকরভাষ্যানুযায়ী

বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৭); 'মাণ্ডূক্যোপনিষৎ' (শাংকরভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৭); 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮); 'মুণ্ডকোপনিষৎ' (শাংকরভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৯); এবং শংকরাচার্য কৃত 'আত্মানাত্মবিবেক' (বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৯)। এই পর্বে ও পরবর্তী দশকে মুদ্রিত তাঁর ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক ও সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাসংক্রান্ত বিচার গ্রন্থগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মূল বাংলায় প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন তাঁর এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থরাজির ইংরেজি অনুবাদও মুদ্রিত করে যাচ্ছিলেন। ''বেদান্তসার'-এর অনুবাদ *(An Abridgment of the Vedant* ... শিরোনামে) প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৮১৬ সালে। 'কেনোপনিষৎ' এবং 'ঈশোপনিষৎ'-এর ইংরেজি সংস্করণদ্বয়ের প্রকাশও ঐ সালে। 'মুণ্ডক' ও 'কঠ' উপনিষদ দুটি অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল ১৮১৯-এ। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু ও এককালীন উপরওয়ালা মনিব জন ডিগ্‌বী লণ্ডন থেকে *An Abridgment of the Vedanta* ও Cena (Kena) Upanishad -এর যুগ্মসংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরই Abridgment of the Vedanta (ইংরেজি থেকে) জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে Auflosung des Wedant .... নামে য়েনা (Jena) থেকে প্রকাশিত হয়। সতীদাহ সংক্রান্ত রামমোহনের কলকাতায় প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থের ইংরেজি ভাষান্তর মুদ্রিত হয়েছিল ১৮১৮ ও ১৮২০ তে। এরপর তিনি ১৮৩০ সালে *Abstract of the Arguments regarding the burning of Widows alive* নামক তৃতীয় একখানি গ্রন্থ ইংরেজিতে কলকাতায় প্রকাশ করেন। তা ছাড়া ইংলণ্ডে প্রিভি কাউনসিলে বেন্টিঙ্ক -এর সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের শুনানি চলাকালীন রামমোহন ইংলণ্ডে সতীদাহ-উচ্ছেদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে ১৮৩১ সালে প্রকাশ করেন তাঁর সতীদাহ-সংক্রান্ত সর্বশেষ গ্রন্থ *Some Remarks in Vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India.* এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য ১৮২২-এ কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর হিন্দুনারীর পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত গ্রন্থ *Some Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females according to the Hindu Law of Inheritance,* এবং ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তিকা। তাঁর মৃত্যুর বৎসর (১৮৩৩) পর্যন্ত প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও এ বিষয়ে তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। বিদেশীদের কাছে তাঁর এই স্বতন্ত্র ইংরেজি গ্রন্থগুলিকে সহজলভ্য করবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ সালে এগুলির মধ্যে নির্বাচিত তেরখানি গ্রন্থের একটি সম্মিলিত সংস্করণ লন্ডন থেকে পারবারী এলেন কোম্পানির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির শিরোনাম ছিল *Translation of Several Principal Books, Passages and texts of the Veds, and of some Controversial Works on Brahmunical Theology.* -এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বেদান্তসার ও পূর্বোল্লিখিত উপনিষদ্ চতুষ্টয়ের ইংরেজি অনুবাদ; সতীদাহ সংক্রান্ত প্রথম তিনখানি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ; শংকর শাস্ত্রী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রত্যুত্তর স্বরূপ রচিত যথাক্রমে *A Defence of Hindoo Theism etc* ও *Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, etc,* (দুখানিরই রচনাকাল ১৮১৭); *An Apology for the pursuit of Final Beatitude independently of Brahmunical Observances*

(১৮২০); *A Translation into English of a Sunskrit Tract inculcating the Divine Worship* (১৮২০; 'গায়ত্রীর অর্থ' পুস্তিকার অনুবাদ); এবং পূর্বোক্ত হিন্দুনারীর পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ (১৮২২)। (অতঃপর এই সম্মিলিত সংস্করণটি *Some Principal Books* -এই সংক্ষিপ্ত নামে উল্লিখিত হবে।) রামমোহনের মৃত্যুর সাত বছর পরে ১৮৪০ সালে কম্পেন থেকে *Vertaling Van Verscheidene Voername Boeken, Pladtsen en Teksten Van de Veddas* নামে ডাচ ভাষায় এর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হিন্দু ধর্ম, দর্শন, উপাসনাপদ্ধতি ও সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত রামমোহনের এই শ্রেণীর রচনাগুলির প্রতি প্রথম থেকেই বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন ইংলন্ড ও য়ুরোপ খণ্ডের প্রাচ্যবিদ্ (orientalist) পণ্ডিতসমাজ। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন। এই বহুমুখী গবেষণার ধারা ঊনবিংশ শতকে নানা দিক দিয়ে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে এ দেশের গৌরবময় অতীতের এক সুস্পষ্ট পরিচয় জগতের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে। রামমোহনের প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা অবশ্য নিছক গবেষণাধর্মী ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন এর অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল্যবোধসমূহকে পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করে তারই আধারে স্বদেশবাসীকে যুগোপযোগী এক নূতন জীবনবোধ ও জীবনচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে। তবু কার্যতঃ অনুশীলনের ক্ষেত্র একই হওয়ায় য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌গণের অধিকাংশই তাঁদের গবেষণাক্ষেত্রে রামমোহনকে সহপথিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন ও বিশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর রচনাবলী অধ্যয়নপূর্বক সে-বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাচ্যবিদ উজ্যান বুর্নুফ।

উজ্যান বুর্নুফ (১৮০১-১৮৫২) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ফরাসী সংস্কৃত ভাষাবিদ ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ। তিনি তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় College Royal de France-এর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক আঁতোয়ান লেওনার্দ্ দ্য শেজির নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে ১৮০২ সালে শেজির মৃত্যুর পরে ঐ কলেজেই সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাতে বুর্নুফের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। এক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে তিনি ক্রমশঃ সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত থেরবাদী বা স্থবিরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্রের বাহন পালি ও ইরানের সুপ্রাচীন জরথুশত্রীয় ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার অর্জন করেন। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে সমসাময়িক জার্মান প্রাচ্যবিদ কৃস্টিয়ান লাসেনের সহযোগিতায় পালিভাষা সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *Essai sur le Pali* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পালিই মূল মাগধী ভাষা—সিংহল বা শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রচলিত এই মতবাদের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে; সংস্কৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ লেখকদ্বয় বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিয়েছেন; পালি ব্যাকরণের সূত্রগুলি নির্দেশ করা হয়েছে; এবং তৎকাল যাবৎ আবিষ্কৃত পালি গ্রন্থসকলের বিষয়বস্তু বিশ্লেষিত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণার ইতিহাসে এই গ্রন্থ যথার্থই দিক্ নির্দেশক এবং বুর্নুফের ক্ষেত্রে এটি তাঁর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণার পথপ্রশস্তকারী। বুর্নুফ যে কালে অবেস্তার চর্চা আরম্ভ করেন তখন এই প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল

না। সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় হেতু তিনিই প্রথম দেখাতে সমর্থ হলেন, মূল জরথুশত্রীয় ধর্মগ্রন্থের ভাষা প্রকৃতপক্ষে বৈদিকভাষার সগোত্র ও বৈদিক ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা উক্ত ভাষা ও শাস্ত্র অনুশীলনের নির্ভুল ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এ বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি জ্ঞানরাজ্যের নূতন দ্বার খুলে দিয়েছে: ১ *Vendidad Sade* (১৮২৯-৪৩); ২. *Commentaire sur le Yasna* (১৮৩৩); ৩. *Etude sur la langue et les Textes Zend* (১৮৪০-৫০)। এর মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে অবেস্তার ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও একটি শব্দকোষ দেওয়া আছে। তা ছাড়া বুর্নুফ প্রাচীন ইরানীয় অভিলেখ (inscription) পাঠোদ্ধারেরও অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Memoire sur deux inscriptions cueniform trouvees presque de Hamadan* গ্রন্থে তিনি পারস্যের হামাদানে আবিষ্কৃত প্রাচীন হখামনীষ-বংশীয় দুই সম্রাট দরেইওস (Darius) ও ক্সের্‌ক্সেস (xerxes) -এর দু'খানি অনুশাসনের পূর্ণ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেছেন ও অবেস্তার ভাষার সঙ্গে উক্ত লেখদ্বয়ে ব্যবহৃত প্রাচীন পারসীক ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়ে প্রাচীন পারসীক অভিলেখ চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। সংস্কৃত ভাষার বৈদিক ও বেদোত্তর (classical) উভয় ক্ষেত্রেই বুর্নুফের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আরও দুখানি গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রেখেছে। প্রথমেই উল্লেখ্য *L' Introduction a l' histoire du Boddhisume Indien* (১৮৪৪) অথবা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এখানে তিনি তাঁর অভ্যস্ত তুলনামূলক পদ্ধতিতে সিংহল, নেপাল, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রাপ্ত পুঁথির সাহায্যে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের একটি একদেশদর্শিতামুক্ত নির্ভরযোগ্য সমগ্র চিত্র উপস্থিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ নেপাল থেকে ব্রায়ান হাউটন হজ্‌সন আবিষ্কৃত পুঁথির সাহায্যে মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' -এর সটীক ফরাসী অনুবাদ Le Lotus de la bonne Lois। গদ্যপদ্যাত্মক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সংস্কৃতে রচিত--গদ্যাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং ছন্দোবদ্ধ গাথাভাগ বৌদ্ধ লেখকগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাকৃত-প্রভাবিত মিশ্র সংস্কৃত। উভয় ভাগেই অনুবাদের আশ্চর্য নিপুণতা সংস্কৃতে বুর্নুফের অসামান্য অধিকারের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ্য Classical সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুর্নুফের প্রধান কীর্তি তিন খণ্ডে ভাগবত পুরাণের আংশিক ফরাসী অনুবাদ *Le Bhagavata Purvana on histoire poetique de Krichna Tomes I II et III* (পারি, ১৮৪০-৪৭)। এই গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড দীর্ঘদিন পরে পারি থেকে প্রকাশিত হয় (১৮৮৪ ও ১৮৯৮)। ফ্রান্সে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার মুখ্য কেন্দ্র Asiatique এবং প্রাচীন অভিলেখ-অনুশীলনকেন্দ্র Acadenue des Inscriptions -এব বুর্নুফ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ফ্রীড্‌রীশ্‌ ম্যাক্সমুলার ও রুডল্‌ফ ফন রোট উত্তরকালে যথাক্রমে ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে বৈদিক সাহিত্যের সার্থক গবেষণা করে গুরুর মুখোজ্জ্বল করেছেন।[১]

রামমোহনের গ্রন্থাবলী ও খ্যাতির সঙ্গে বুর্নুফের পরিচয় ঠিক কোন সময় থেকে এ বিষয়ে আমরা অনেকটা সঠিক আন্দাজ করতে পারি। যতদূর জানা যায় ফ্রান্সে রামমোহনের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করেন ব্লোয়া (Blois)-র বিশপ আবে গ্রেগোয়ার ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছর তৎকালীন ফরাসী পত্রিকা 'ল্য ক্রোনিক রেলিজিউজ্‌' -এ এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২] গ্রোগোয়ারের রচনাটি যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এমন কথা বলা

চলে না। তবু তিনি তদানীন্তন কলকাতাবাসী সাংবাদিক *The Calcutta Times* পত্রিকার সম্পাদক রামমোহনের অনুরাগী জন দা' কোস্তার নিকট থেকে তথ্য ও রামমোহনের কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে রামমোহনের যে দীর্ঘ পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে পরবর্তী জিজ্ঞাসুগণের কৌতূহল উদ্রেকে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। এর পর থেকেই রামমোহনের গ্রন্থাবলী এবং সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত সংস্কার প্রচেষ্টা ক্রমশঃ তাঁদের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যাচ্ছে এর পরেই ফ্রান্সের অপর এক সাময়িক পত্রে 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক' *(Revue Encylopedique)* এর সপ্তম খণ্ডে (১৮২০) রামমোহন রায়ের আটখানি গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী সুধীসমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের এটি এক নির্দশন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের প্রধান কেন্দ্র 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' যার সংগঠক এবং প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন বুর্নুফ। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'জুর্নাল আসিয়াতিক' (Journal Asiatique) -এর জুলাই, ১৮২৩ সংখ্যায় মুদ্রিত সংবাদে দেখা যায় ৭ জুলাই, ১৮২৩ অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় ম. দুবোয়া দ্য ব্যোচেন গ্রন্থাগারে কিছু পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন।[৩] তার মধ্যে আটখানি হল ১৮১৬ থেকে ১৮২১ এর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত রামমোহন রায় রচিত। পত্রিকার পরবর্তী আগস্ট, ১৮২৩ সংখ্যায় রামমোহনের উক্ত আটখানি এবং অতিরিক্ত আরও ছয়খানি মোট চোদ্দখানি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়।[৪] এইভাবে রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী ভারত-জিজ্ঞাসুগণের আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পেতে লাগল যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে প্রবৃত্ত হলেন এবং 'সোসিয়েতে' আসিয়াতিক্'-এর এক সদস্য কোঁৎ জ্যাঁ দেনি লাঁজুয়ানে 'জুর্নাল আসিয়াতিক্' এর অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায় সেগুলির মূল্যায়নভিত্তিক এক নিবন্ধ প্রকাশ করে ফরাসীদেশে রামমোহন চর্চাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিলেন।[৫] লাঁজুয়ানের রচনার দ্বারা ফরাসী প্রাচ্যবিদ্‌গণের মনে রামমোহন সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা জাগরিত হয় তারই প্রত্যক্ষ ফল 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক'-এর সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য (Associe Correspondant) পদে রামমোহনের মনোনয়ন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৭ জুন, ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে বার্ঁ দ্য সাসি ও লা কোঁৎ দওত্যরিভ এই মর্মে এক প্রস্তাব আনেন। ঐ সভাতেই রামমোহনের উক্ত পদলাভের যোগ্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচারের উদ্দেশ্যে তিন সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হয়েছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন লাঁজুয়ানে, বুর্নুফ ও ক্লাপরোটা।[৬] পরবর্তী ৫ জুলাই-এর অধিবেশনে বিচারকমণ্ডলীর পক্ষে ক্লাসরোট এ বিষয়ে সদস্যত্রয়ের সর্বসম্মত অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেন এবং রামমোহন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য (Associe Correspondant) রূপে মনোনীত হন। 'জুর্নাল আসিয়াতিক'-এর জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় বিষয়টি এইভাবে উল্লিখিত হয়েছিল: "বৈদেশিক সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পণ্ডিত রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তা বিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে ম. ক্লাপরোট বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবরণ পেশ করেন। এ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল সেগুলি পরিচালকমণ্ডলীর অধিবেশনে উপস্থিত করা হয় এবং রামমোহন রায়কে বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়" **(M. Klaproth au nom d'une commission fait un rapport sur les titre litteraires du Pandit Rammohun Ray, presente' pour e'tre associe' correspondant. Les conclusions de ce rapport sout soumises a la de'libe'ration du conseil, et le titre d' associe' correspondant et decerne' a'**

Rammohun Roy)।[৭] বিচারক-সমিতির সদস্য হিসাবে রামমোহনকে এই পদে অধিষ্ঠিত করবার তৎকালীন ফরাসী প্রাচ্যবিদন্মগুলীর সম্মিলিত প্রয়াসের অংশভাগী উজ্যান বুর্নুফও ছিলেন; এবং এই উপলক্ষে রামমোহনের পাণ্ডিত্যখ্যাতি সম্পর্কে তিনি যে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থাবলী যথেষ্ট মনোযোগসহকারে পাঠ করে তার মূল্যবিচার করেছিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। সে-যুগের ফরাসী পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই উত্তম ইংরেজি জানতেন। তাঁরা রামমোহনের গ্রন্থগুলি ইংরেজি অনুবাদেই পড়েছিলেন এবং তাঁদের আলোচনায় ইংরেজি গ্রন্থগুলিরই উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের কোনো গ্রন্থই ১৮২৩-২৪ সালে ফরাসীতে অনূদিত হয়নি। পরবর্তীকালের সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম 'বেদান্তসার'। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী প্রাচ্যবিদ জ্যঁা পিয়ের গ্যলম পথিয়ে সুবিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ হেনরী টমাস কোলব্রুকের হিন্দুদর্শনের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলির এক ফরাসী অনুবাদ টীকাটিপ্পনী সহ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে তিনি রামমোহনের 'বেদান্তসার'-এর একটি ফরাসী অনুবাদ সংযুক্ত করেছেন।[৮]

আমাদের স্বভাবতঃ জানতে আগ্রহ হয়, ১৮১৯ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিদ্বৎসমাজে রামমোহন ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে যে অনুসন্ধিৎসা ও সশ্রদ্ধ মনোভাব জন্ম নিয়েছিল, রামমোহন সে বিষয়ে কতদূর অবগত ছিলেন এবং সমকালীন সমানধর্মা ফরাসী সারস্বত সমাজের সঙ্গে চিত্তের যোগ করবার জন্য তিনি কোনও প্রকারে সচেষ্ট ছিলেন কিনা। এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু সমসাময়িক কাগজপত্র ঘাঁটলে কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়। আধুনিক কালে বিপ্লবের জন্মভূমি হিসাবে ফ্রান্সের প্রতি রামমোহন যৌবনকাল থেকেই পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবকে তিনি ইতিহাসে মানবমুক্তির দিশারী দুই যুগপরিবর্তক ঘটনা বলে মনে করতেন। এমনকি এই প্রভাব তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল; প্রথম জীবনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে (constitutional monarchy) বিশ্বাস বর্জন করে পরিণত বয়সে তিনি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই (republic) আদর্শ মনে করতেন। এ জন্য ইংলণ্ডে প্রকাশ্য সভাসমিতি বা জনসম্মিলনীতে তাঁকে নিজের রাজনৈতিক মত গোপন করে খুব সাবধানে চলতে হত, কেননা ইংলণ্ডের জনমত ছিল সাধারণভাবে রাজতন্ত্রের অকুণ্ঠ সমর্থক; বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের পর ইংরেজের প্রজাতন্ত্র ভীতি অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৯] সমসাময়িক ফ্রান্সে তাঁর সম্পর্কে ১৮১৯ সালে আবে গ্রেগোয়ার যে দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তার জন্য তথ্য এবং পুস্তকাদি কলকাতা থেকে সরবরাহ করেন রামমোহন বন্ধু সাংবাদিক জন দা'কোস্তা। সুতরাং তার ভিত্তিতে রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর দ'কোস্তা সংবাদ পেয়েছিলেন ও রামমোহনকে তা জানিয়েছিলেন এমন অনুমান কষ্টকল্পনা নয়। রামমোহনের আর এক অনুরাগী বন্ধু Calcutta Journal -এর স্বাধীনচেতা সম্পাদক জেম্‌স সিল্ক বাকিংহামের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রংপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর রামমোহন ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ১৮২৪ সালে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক'-এর সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হবার পর সেই বিষয়ক অভিজ্ঞানপত্র তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর কলকাতাবাসী ইংরেজ বন্ধু কর্নেল লাচ্‌লানের মাধ্যমে। এঁর এক পত্র থেকে জানা যায়, এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাসূচক পদলাভের সংবাদ পেয়ে রামমোহন কি গভীর তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন।[১০] ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কর্তৃক তাঁর প্রতিভার এই সশ্রদ্ধ প্রকাশ্য স্বীকৃতি ফ্রান্সের প্রতি রামমোহনের অনুরাগ ও

শ্রদ্ধাকে নিঃসন্দেহে গভীরতর করেছিল এবং সম্ভবতঃ ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কারা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন সে সংবাদও তাঁর অগোচর ছিল না। বিচিত্র নয় এই প্রসঙ্গে বুর্নুফের নামও তাঁক কাঁছে পৌছে থাকবে। তবে তদানীন্তন ফরাসী প্রাচ্যবিদ্‌গণের মধ্যে একজনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল যাবৎ পত্রমাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল, তিনি হলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ও ফরাসীভাষার হিন্দী ও হিন্দুস্থানী (উর্দু) সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক গার্স্যাঁ দ্য তাসী (১৭৯৪-১৮৭৮)। এই যোগাযোগের কারণ সহজেই অনুমেয়। রামমোহন স্বয়ং ইসলামীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং হিন্দী ও উর্দুতে মাতৃভাষার মতই পারঙ্গম ছিলেন। সুতরাং সমানধর্মা এই মনীষিদ্বয় যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এ আর আশ্চর্য কি। দ্য তাসী সোসিয়েতে আসিয়াতিক্-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের জবানীতেই জানা যায় রামমোহনের সঙ্গে ইংরেজি ও হিন্দুস্থানীতে তাঁর বহু পত্র বিনিময় হয়েছিল। ১৮৩২ সালে রামমোহনের ফ্রান্স পরিদর্শন কালে দুজনের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। দ্য তাসী তাঁর হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ রামমোহনের কীর্তির কিছু পরিচয়ও দিয়েছেন।[১১] ইংলণ্ডে পৌছাবার প্রায় চার মাস পরেই রামমোহন দ্য তাসীকে ১ আগষ্ট, ১৮৩১ এক পত্র লিখে শীঘ্রই তাঁর ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। উর্দুতে লেখা এই পত্রখানি রক্ষিত হয়েছে।[১২] এই পত্রে রামমোহনকে ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেখা যায়, তিনি পারিতে পৌছে দ্য তাসীর মধ্যস্থতায় 'কোন্যাজ রয়্যাল দ্য ফ্রঁস্' এর সংস্কৃতাধ্যাপক ম. আঁতোয়ান লেওনার দ্য শেজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন (ইনসা আল্লাহ্‌তালা আনক্করিব পারিসমে মুশ্‌শারফ্ এ খেদ্‌মত হোগা ঔর আপকি তরজ্জোহ্‌সে জনাব শেজি সাহাব কি সাথ মুলাক্কাত হাসিল করেগা)। বুর্নুফের গুরু, ফরাসী ভাষায় শকুন্তলা, অমরুশতক ও রামায়ণের অংশবিশেষের অনুবাদক প্রাচ্যবিদ দ্য শেজির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন যে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন পত্রসাক্ষ্যে তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রে রামমোহনের ফ্রান্স পরিদর্শন বিলম্বিত হয়। ১৮৩২-এর শেষের দিকে অল্পদিনের জন্য তিনি সে দেশে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দেই শেজিরও মৃত্যু হয়। সুতরাং উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। শেজির পরে ঐ বৎসরেই ফ্রান্সের রাজকীয় মহাবিদ্যালয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বুর্নুফ। সুতরাং সে যাত্রায় বুর্নুফের সঙ্গে রামমোহনের যে পরিচয় হয়েছিল এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি। রামমোহন ফরাসী ভারতজিজ্ঞাসুগণের পরিচয়লাভের জন্য যেমন উৎসুক ছিলেন তেমনি বুর্নুফ এবং তৎকালীন ফরাসী অন্যান্য প্রাচ্যবিদগণ রামমোহনের পাণ্ডিত্যখ্যাতির সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক'-এর সম্মানিত বিদেশী সদস্যকে ফরাসী প্রাচ্যবিদ্বন্মণ্ডলী স্বাগত জানাবেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগলাভে খুশী হবেন তা খুবই স্বাভাবিক।[১৩]

এই প্রেক্ষাপটে ১৮৩২ সালে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ সংকলনগ্রন্থ পূর্বোল্লিখিত *Some Principal Books* লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে বিদগ্ধ মহলে সেটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। ঐ বৎসরই এখানির উপর দুটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধ ফ্রান্সের দুটি বিখ্যাত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। 'রেভ্যু আঁ সিক্লোপেদিক্'-এর ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায় এর একটি লেখেন পূর্বোল্লিখিত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত গুলম পথিয়ে।[১৪] দ্বিতীয়টির রচয়িতা স্বয়ং বুর্নুফ, এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'জুর্নাল দে সাভাঁর'-এর ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায়।[১৫] বুর্নুফের এই সুদীর্ঘ আলোচনাটি নানা কারণে মূল্যবান, কিন্তু এটি এখন পর্যন্ত এদেশে অজ্ঞাত এবং রামমোহন সংক্রান্ত

আলোচনায় অব্যবহৃত। আমার অনুরোধে পারি-প্রবাসী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্য এই দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধের একটি জেরকস্-প্রতিলিপি অশেষ সৌজন্য সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন এবং রচনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল। অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বলে নেওয়া সমীচীন মনে করছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা যথেষ্ট অগ্রসর হলেও উপনিষদ এবং বেদান্তাদি ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জগতের তৎকালাবধি সঞ্চিত জ্ঞানে কিছু ঘাটতি ছিল। বৈদিক গবেষণা তখন সুরু হয়েছে; বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিও বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই গড়ে উঠছে; ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতিও য়ুরোপীয় চিত্ত আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু সেই অনুপাতে বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও তদ্‌ভিত্তিক দর্শনপ্রস্থানগুলির অনুশীলন যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি। বেদ, উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্রের কোনো প্রামাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচারিত হয়নি। য়ুরোপখণ্ডে (Continent) এ বিষয়ে শুদ্ধ পাঠবিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য পুঁথিরও অভাব ছিল। ইংলণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির Transactions এ ১৮২৩-২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হেনরী টমাস কোলব্রুক রচিত হিন্দুদর্শন বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এই পর্বের সম্ভবতঃ সর্বাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ্ কিছু হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর সাহায্যে 'সির্‌র-ই আকবর' 'সির্‌র-উল্ অস্‌রাব' শিরোনামে বাহান্ন খানি উপনিষদের ফার্সী গদ্যানুবাদ সংকলন করেন।[১৬] ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁ (১৭৩১-১৮০৫) এই ফার্সী সংস্করণের 'উপ্‌নেক্‌হৎ' *(Oupnek'hat)* শিরোনামে এক লাটিন অনুবাদ করেছিলেন যার এক প্রামাণিক সংস্করণ ১৮০১-০২ সালে পারি থেকে প্রকাশিত হয়। দারা শুকোহ্ সংকলিত মূল ফার্সী সংস্করণে অনেক ত্রুটি ছিল। একটি পূর্ণ অনুবাদের অনুবাদ হওয়ায় দ্যুপেরোঁর লাটিন অনুবাদও ছিল অসংখ্য ত্রুটিপূর্ণও এবং বহুস্থলে প্রায় দুর্বোধ্য।[১৭] রামমোহনের উপনিষদের সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে এই ত্রুটিপূর্ণ লাটিন সংস্করণটি উপনিষদ-বেদান্ত চর্চায় ফরাসী পণ্ডিতগণের প্রায়-একমাত্র অবলম্বন ছিল। উইলিয়ম জোন্স, উইলিয়ম কেরী বা কোলব্রুকের উপনিষদের দু'একটি অনুবাদ য়ুরোপখণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে নি। লাঁজ্যুয়ানে এবং বিশেষ করে বুর্নুফের প্রবন্ধ পাঠ করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বুর্নুফ তাঁর রচনায় যে সব পাদটীকা ব্যবহার করেছেন, অনুবাদে সেগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। অনুবাদ যতদূর সম্ভব আক্ষরিক করবার চেষ্টা করেছি; তবে যেখানে তার জন্য বাংলা গদ্যভঙ্গীতে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানে বাধ্য হয়ে বাক্যাংশকে স্বতন্ত্র বাক্যের রূপ দিতে হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ তেমন নিদর্শন সংখ্যায় অত্যল্প। মাঝে মাঝে লেখকের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য যে অতিরিক্ত দু'একটি শব্দ যোজনা করতে হয়েছে তা বন্ধনীভুক্ত করেছি। লেখকের বক্তব্যের উপর যে-সব মন্তব্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেগুলি ক্রমিক সংখ্যানুসারে প্রমাণপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত।

বুর্নুফের সমালোচনা প্রবন্ধের অনুবাদ

সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায়কৃত বেদের কোনও কোনও অংশের ও তৎসহ বিতর্কমূলক কয়েকখানি (ইংরেজি) অনুবাদের বর্তমান সংকলনটির মত অল্প গ্রন্থই আছে যা একত্র এতগুলি (বিভিন্ন) বিষয়ের প্রতি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। হিন্দুদের তাদের

বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে (আধুনিক) ইউরোপীয় ধ্যানধারনায় দীক্ষিত করা যে কি কঠিন ব্যাপার সেটা যাঁরা জানেন তাঁরা প্রায় ধরেই নেন যে (হিন্দুমানসে) এ ধরনের পরিবর্তন ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই শ্রেণীর লোকেদের কাছে (রামমোহনের) মত একজন ব্রাহ্মণ যিনি সমুদ্রপার হয়ে ইংলণ্ডে এসেছেন এবং সেখানে ভারতীয় বহুদেববাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর এক সংস্করণ রচনা করেছেন,—স্বয়ং একজন ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হবেন। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য, ভারতে ইংরেজশাসনের আদিপর্ব থেকে সরকার পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ফলে যে ব্রাহ্মণগণ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন রামমোহন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম। কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রণালী যে একমাত্র তাঁরই উপর দর্শনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে তা মোটেই নয়। যখন সার্ উইলিয়ম জোন্স[১৮] সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের উৎসাহে রাধাকান্ত দেব,[১৯] শর্বরী ত্রিবেদী[২০] প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন, তখন থেকেই য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে (ভাবভূমিতে) এক বোঝাপড়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল; এবং সেই বোঝাপড়াকে কি ভাবে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করা যায় জোন্স তাঁর পরবর্তিগণকে সে পথও দেখিয়েছিলেন। যেদিন এক ইংরেজ এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে হিন্দুদের পক্ষে বোঝা সহজ হল যে তাঁরা বহু শতাব্দী ধরে যে সব সামাজিক বিধিব্যবস্থা, লোকব্যবহার ও ভাবধারা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে আসছেন, তাঁদের শাসককুলের মধ্যে সেগুলি অনুশীলন করবার আন্তরিক আগ্রহ বিদ্যমান। অপরপক্ষে (হিন্দুদের) সেই অতি জটিল সমাজব্যবস্থা ও একই পরিমণ্ডলে উদ্ভব হেতু তৎসহ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত ধর্মবিশ্বাস, ব্যবহারবিধি ও রীতিনীতির মর্ম অবগত হয়ে ইংরেজগণও বুঝলেন ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতার অসাধারণ দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ কি। সেই সঙ্গে তাঁদের এ ধারণাও জন্মালো যে, যে মহাকাল এ যাবৎ এসমূহকে রক্ষা করে এসেছেন একমাত্র সেই কালপ্রভাবেই ভবিষ্যতে এগুলির হয় সংস্কার না হয় বিলুপ্তি সম্ভব হতে পারে। এই বোঝাপড়ার ফলে ভারতবর্ষের লাভ হয়েছিল (রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়) তার ধর্ম ও ব্যবহারবিধির সংরক্ষণ; আবার এরই ফলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উপর তার অধিকার বেশ পাকাপোক্তভাবেই কায়েম করে নিতে পেরেছিল এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এই আশ্চর্য দেশের সৌধাবলী ও সাহিত্য অনুশীলনের দ্বারা এর (সভ্যতা) সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেননা ব্রাহ্মণগণও যখন দেখলেন (শাসক) ইংরেজরা তাঁদের কাছে পাঠগ্রহণে স্বীকৃত, তখন তাঁরাও ইংরেজের শিষ্য হতে বিলম্ব করলেন না। কলকাতায় তাঁদের তত্ত্বাবধানে যে অসংখ্য সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে তাঁদের য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে লাভবান হবার ব্যগ্রতা এবং জগতের সম্মুখে নিজেদের সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের পরিচয় দেবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট। তাঁদের (সংস্কৃতির) প্রতি বিদেশীদের যে কৌতূহল জন্মেছে তারই অনুরূপ এক অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে তাঁরাও তৎপরতার সঙ্গে অল্পকালের মধ্যে আমাদের কলা ও বিজ্ঞানসমূহের চর্চায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছেন। ইংরেজি ভাষার অনুশীলন ক্রমশঃ তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিদ্বান ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় যিনি এই ভাষা অত্যুচ্চ নৈপুণ্যসহকারে লেখেন আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করবার জন্য হিব্রু ও গ্রিক চর্চাতেও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন।

আন্দাজ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে[২১] বাংলাদেশের অন্তর্গত বর্ধমানে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহেই তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। এখানে তিনি ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর পাটনায় আরিস্টট্‌ল ও ইউক্লিড অধ্যয়নের মাধ্যমে তর্কশাস্ত্র ও গণিতের

পাঠ গ্রহণ করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ব্রাহ্মণদের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত আয়ত্ত করেন।[২১] ১৮০৪ কি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা ও দুই ভ্রাতার মৃত্যুর ফলে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।[২২] এর পর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষগণের নিবাসস্থল মুর্শিদাবাদে এসে বাস করেন এবং এখানেই ফার্সীতে লিখিত এবং আরবী ভূমিকাযুক্ত 'সবধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে'[২৩] শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর লেখকজীবন সুরু হয়। (ধর্মবিষয়ে) তাঁর মুক্ত চিন্তা হিন্দু ও মুসলমান —উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলল যার ফলে তিনি কলকাতা চলে আসাই উচিত বিবেচনা করলেন।[২৪] কয়েক বছর পরেই তিনি বাংলার রাজস্ববিভাগে কলেক্টর নিযুক্ত হলেন।[২৫] এই কর্মের সুবাদে তাঁকে ইংরেজি শিখতে হল এবং শীঘ্রই তিনি এই ভাষা এমন শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে বলবার এবং লিখবার ক্ষমতা অর্জন করলেন যাকে আশ্চর্য বলা যায়। সেই সঙ্গে তিনি লাটিন গ্রিক এবং হিব্রু শিক্ষাতেও মন দিলেন। এর মধ্যে শেষের দুটি ভাষা তিনি এতটা অধিগত করেছিলেন যে (মিশনারীদের সঙ্গে) বাদ-প্রতিবাদমূলক রচনাগুলিতে তাঁর পক্ষে (বাইবেলের) পুরাতন ও নূতন টেস্টামেন্ট থেকে মূলভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।[২৬] এর পর থেকে তিনি একদা হিন্দুধর্ম সংস্কার ও যুক্তিনির্ভর ঈশ্বরোপাসনা (*deisme)* প্রচার সংক্রান্ত যে কাজ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, সেই কর্তব্যপালনে একান্ত মনোনিবেশ করেছেন। তিনি যে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সেগুলির লক্ষ্য হল এক অদ্বিতীয় নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করা যিনি তাঁর অনুবর্তিগণের নিকট কোনও কঠোর, সংকীর্ণ নীতিমার্গের অনুসরণ দাবি করেন না। বাংলা ও ইংরেজিতে তিনি পর পর বেদের কিছু অংশ (অনুবাদে) প্রকাশ করে যাচ্ছেন এ কথা প্রমাণ করবার জন্য যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের একমাত্র প্রতিপাদ্য সেই অতি বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি (বাইবেলের) নিউ টেস্টামেন্টেরও আলোচনা করেছেন এবং (সেখান থেকে সংকলন করে) সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজিতে *The Precepts of Jesus* প্রকাশ করেছেন;[২৭] অর্থাৎ গস্‌পেলের তত্ত্বভাগ ও ঐতিহাসিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর নীতিমার্গকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করেছেন। শ্রীরামপুরের সুপণ্ডিত ধর্মযাজক মার্শম্যান উক্ত গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করেন। এতে রামমোহন নিজ গ্রন্থের সমর্থনে আসরে নামলেন এবং "খ্রিস্টীয় সাধারণের প্রতি প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ নিবেদন" শীর্ষক তিনখানি পুস্তকে (গস্‌পেলের অন্তর্ভুক্ত খ্রিস্টের মুখনিঃসৃত) নীতি-উপদেশসমূহের স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করলেন। তিনি আরও প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে, প্রাচীন ও নবীন টেস্টামেন্টে কুত্রাপি (প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত) ত্রীশ্বরতত্ত্বের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না; অধিকন্তু যুক্তির দিক দিয়েও এই মতবাদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা (হিন্দুধর্মের) বহুদেববাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তার সবগুলিই (প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের) ঈশ্বরের একাধিক সত্তায় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমান সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

[রামমোহন রায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আমার ধারণায় যা যথার্থ, —আমি আমার এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিন্তু নানা কারণে আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও সেখানি এখনও শেষ করতে পারিনি।[২৮] বইখানি যখন প্রচারিত হয়নি, মনে হয়, এখানে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু দিয়ে রাখলে ক্ষতি নেই।]

আলোচ্য সংগ্রহভুক্ত রামমোহন রায়ের যে গ্রন্থনিচয়ের উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে বর্তমানে আমি সেই ক'খানিরই আলোচনা করতে ইচ্ছুক যেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদিম বিশুদ্ধ রূপটিকে

পুনঃস্থাপন করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ এর মূলতত্ত্বসমূহের ধারক, সেগুলি বর্তমানে প্রচলিত বহুদেববাদের সমর্থন করা দূরে থাকুক, অতি স্পষ্ট ভাবেই ঈশ্বরসত্তার ঐক্য নির্দেশ করেছে। (আলোচ্যগ্রন্থরাজির মধ্যে) এগুলি হল, (রামমোহনের কৃত) বেদের কিছু কিছু অংশবিশেষের অনুবাদ এবং উক্ত একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁর রচিত কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ। খাস ব্রাহ্মণদের প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে নেওয়া অংশসমূহের প্রথমটির শিরোনাম রামমোহন দিয়েছেন *Translation' of an Abridgement of the Vedant or the resolution of all the Vedas, the most celebrated and revered work of Brahminical Theology: establishing the unity of the Supreme Being; and that He alone is the object of worship'* উক্ত অনূদিত অংশটি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গোড়াতে এক ক্ষুদ্র ভূমিকায়, এই ব্রাহ্মণ মনীষী বহুদেববাদের স্থলে একেশ্বরবাদ প্রবর্তনের উদ্যম গ্রহণের জন্য তাঁর উপর যে আক্রমণ হয়েছে, ভদ্র এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে তার জবাব দিয়েছেন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, যে মূলগ্রন্থের তিনি মাত্র বর্তমান সংক্ষিপ্ত অংশটুকু প্রকাশ করেছেন সেটি বেদসংকলয়িতা ব্যাসদেবের রচনা এবং সমগ্র বেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সারভাগ। রামমোহন তাঁর সারানুবাদ হিন্দুস্থানী, বাংলা[২৯] এবং শেষে ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন এবং এর মধ্যে শেষোক্ত ইংরেজি গ্রন্থখানিই আলোচ্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে এর পূর্বেও বেদান্তদর্শনের সারসংকলন করে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং রামমোহন তাঁর নিজের বইটি লিখবার সময় হয়তো এগুলির কোনও কোনওটি তাঁর চোখের সামনে ছিল।[৩০] রচনাকালে তিনি ঠিক কোন প্রণালী অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি যদি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করতেন তাহলে বোধ করি ভাল হত। বিশেষতঃ বেদান্তসূত্রের শংকরের ভাষ্যকে আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ তিনি গ্রহণ করেছেন কিনা এবং তার ফলে ভাষ্যের ব্যাখ্যা মূল সূত্রের উক্তির সঙ্গে কতদূর মিশে গেছে সে বিষয়েও একটু স্পষ্ট নির্দেশ বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করা উদ্দেশ্য নয় সেখানে এমন মিশ্রণ তো অনিবার্য। আমাদের বিশ্বাস রামমোহন এই ছকটিই অবলম্বন করেছেন, অন্ততপক্ষে যে আদর্শ প্রচারে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত তার সমর্থনে স্বয়ং বাদরায়নের প্রচুর উদ্ধৃতি তিনি (এই গ্রন্থে) দিয়েছেন।[২৯] সুতরাং বেদান্তের এই সংক্ষেপিত সংস্করণটিকে বাদরায়ন রচিত এবং বহু প্রাচীন ভাষ্যকারকর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শংকরাচার্যের মতানুযায়ী, ব্রহ্মসূত্রের একটি সারবান যথার্থ চুম্বক মনে করা যেতে পারে। যদিও সমালোচকের দৃষ্টিতে আমাদের এটিকে কোলব্রুকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থভুক্ত উত্তরমীমাংসা দর্শনের বিবরণের সমকক্ষ মনে হয়নি, তবু যতক্ষণ শংকরের মত কোনও ভাষ্যকারের ভাষ্যসহ বাদরায়নের সূত্রগুলির কোনও সম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের হস্তগত না হচ্ছে ততক্ষণ এটির কিছু মূল্যবত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৩১]

[সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হয়েছে যার দ্বারা এই অভাব পূর্ণ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এটি হল ম. ভিণ্ডিশ্‌মান (কনিষ্ঠ) রচিত *Shankara*[৩২] কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত বইখানি দেখতে পাইনি। সুতরাং *Shankara* এই শিরোনামটি ছাড়া এগ্রন্থ সম্পর্কে আর কোনও বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা শিরোনামটিই মাত্র আমরা জানি। এই মুহূর্তে ভারতীয় দর্শন অনুশীলনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপর একখানি গ্রন্থ সুপণ্ডিত অধ্যাপক লাসেন প্রণীত সাংখ্যসূত্র[৩৩] সম্পর্কেও আমরা মন্তব্য করব না। পরে কখনও এই মূল্যবান গ্রন্থখানির—যেটির

মধ্যে গভীর সংস্কৃতজ্ঞান*ও প্রয়োগচাতুর্যসম্পন্ন সূক্ষ্ম স্বাভাবিক বুদ্ধির মণিকাঞ্চনযোগ ঘটেছে,— পরিচয় দেবার আশা রাখি।]

(সংগ্রহভুক্ত) দ্বিতীয় গ্রন্থ হল শংকরাচার্যের ভাষ্যানুসারে মুণ্ডকোপনিষদের (ইংরেজি) অনুবাদ। ১৮১৯ সালে এখানি কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আমরা জানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানিও সেখানে মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু সেটির কোনো খণ্ড সংগ্রহ করতে পারিনি। সুতরাং আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ ফার্সী ভাষা থেকে এর যে অনুবাদ করেছেন এবং রাজকীয় গ্রন্থাগারে এর উপর শাংকর ভাষ্যের কয়েকটি (বিচ্ছিন্ন) অংশের হস্তলিখিত যে সংস্করণ আছে, মাত্র সেগুলির মাধ্যমেই মুণ্ডকোপনিষদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।[৩৪] দুঃখের বিষয় এই ভাষ্য মূলগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে মূলের পাঠকে সহজে আলাদা করা যায় না। রামমোহনের পাঠের সঙ্গে আমাদের হাতে মুণ্ডকোপনিষদের যেটুকু অংশ আছে তার তুলনা করে বোঝা যায়, মোটামুটি তাঁর অনুবাদ যথাযথ। তবে আমার যেন মনে হয়, কয়েকটি স্থানে তাঁর অনুবাদের মূলানুগত্য তুলনায় আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ কর্তৃক তাঁর *Oupanekhat* গ্রন্থে প্রদত্ত অনুবাদ অপেক্ষা কিছু কম। শেষোক্ত এই *Oupanekhat* গ্রন্থখানিতে অবশ্য কিছু কিছু ফার্সী প্রক্ষেপ রয়েছে; ভাষাপ্রয়োগের রীতিও প্রায়ই দুর্বোধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অন্ততঃ মনে হয় অনেক সময় বইটির অযথা একটু বেশী সমালোচনা করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্যঃ *Oupanekhat,* Tome I, pp 375 ff.]। আমরা মনে করি (আলোচ্য উপনিষদের) যে অংশে পরব্রহ্ম থেকে উত্তরোত্তর সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হয়েছে, সেখানে রামমোহন রায় ও আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ উভয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের সামঞ্জস্য করা আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়েছে। [দ্রষ্টব্য: আমাদের সমালোচ্য রামমোহনের গ্রন্থ, পৃঃ ২৮; Oupanekhat, Tome I, p.377] । (উল্লিখিত অংশের) রামমোহন প্রদত্ত অনুবাদ এই: "From her [nature] the first operating sensitive particles of the world styled by Brahmã, the source of the faculties proceeds. [From the faculties] the five elements [are produced, then spring] the seven divisions of the world, whereon ceremonial rites, with their consequences are brought forth."। আঁক্যাতিল দ্যু পেরোঁ-এর *Oupanekhat* -এ যা আছে তা এই: "Primum alimantum fit; post alimantum pran, id est anima; post animam, cor fit; post cor *sata* fiunt; post *sata* omnis mundus fit; post mundum opus fit; et post opus merces operis."। এখানে মনে হচ্ছে দ্যু পেরোঁই মূলের বেশী কাছাকাছি এসেছেন, কেননা (রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত মুণ্ডকোপনিষদের পুঁথিতে—অন্ততপক্ষে আমি যতদূর শাংকর ভাষ্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া এর পাঠ আলাদা করতে পেরেছি, মূল অংশটি এইভাবে দেওয়া আছে: "ততোন্নং। ততঃ প্রাণঃ। তসমাচ্চ মনঃ। ততঃ সত্যং। তসমাচ্চ সপ্তলোকাঃ। তেষু কর্মাণি কর্মস্বমৃতং ফলং।" এর অর্থ হল: তাঁর থেকে (পুষ্টির আধার) অন্নের উৎপত্তি; (পোষক) অন্ন থেকে প্রাণ প্রসূত; প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব; মন থেকে অস্তিত্ববত্তার (সত্যের) উদ্ভব; অস্তিত্ববত্তা থেকে সপ্তলোকের সৃষ্টি; এই সপ্তভুবনে কর্মসমূহের উৎপত্তি; এবং কর্ম থেকে অবিনশ্বর ফলের উৎপত্তি।" শংকরের ভাষ্যে যথেষ্ট স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে "ততঃ" (বা "তাঁর থেকে") শব্দের অর্থ 'পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে' বুঝতে হবে, 'প্রকৃতি থেকে' নয়। আমাদের মনে হয় মূল গ্রন্থে প্রকৃতির উল্লেখ নেই। অন্ন থেকে প্রাণবায়ুর জন্ম; আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ তাঁর অনুবাদে এর দরুণ মূল সংস্কৃত 'প্রাণ' শব্দটিই বজায় রেখেছেন। এক্ষেত্রে রামমোহনের অনুবাদ অবশ্যই শাংকর ভাষ্যের দ্বারা প্রভাবিত, এবং বেদান্তদর্শনে 'প্রাণ' বা সকল

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সমাবেশকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করলে এই অনুবাদও যে যথেষ্ট সমর্থনযোগ্য তাতে সন্দেহ থাকে না। অন্যত্র শংকর অন্যান্য উপনিষদে যাকে হিরণ্যগর্ভ আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রাণকে তারই সমার্থবাচক বলে ধরেছেন। যাই হোক, মনে রাখা প্রয়োজন রামমোহন রায়ের অনুবাদ ততটা আক্ষরিক নয়, একে একটি ভাষ্যই বলা যায় যা মূলের সরল উক্তির কিছু অর্থবিস্তার ঘটিয়েছে। এই ভাষ্যে 'মন' থেকে 'প্রাণ'কে পৃথক করা হয়নি। কিন্তু মূলে 'মন' স্পষ্টতঃ 'প্রাণ' থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণিত ও পৃথকভাবে উল্লিখিত। ভাষ্যে আরও বলা হয়েছে, সংকল্প, বিকল্প, বাসনা কামনা প্রভৃতি থেকে মনের সৃষ্টি। মন থেকে সত্যের উৎপত্তি। 'সত্য' শব্দটিকে বাচ্যার্থে অবশ্যই 'যাথার্থ্য' বোঝাবে; কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এটিকে 'অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু' বলে অনুবাদ করাই শ্রেয়। শংকর একে আকাশাদি ভূতপঞ্চকের সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইংরেজি অনুবাদক (রামমোহন) এই ব্যাখ্যাই অনুসরণ করেছেন। মূলের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, ইংরেজি অনুবাদে তা যথাযথ রূপান্তরিত হয়েছে। মাত্র 'অমৃত' শব্দটি ব্যতিক্রম, এটির অনুবাদ দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় এরও অনুবাদ সংযোজন করা তাঁর উচিত ছিল, কেননা শব্দটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের কৃতকর্মফলের স্থায়িত্বে বিশ্বাস ভারতের প্রাচীনতমগুলির একটি অপরিহার্য অঙ্গ; উক্ত (অমৃতত্ব-সংক্রান্ত) প্রত্যয়টি সেই পরিচয়টিই আমাদের কাছে সূচিত করে। অন্যথা জন্মান্তরবাদ অর্থহীন হয়ে পড়ে, জগতে শুভাশুভের অস্তিত্বের কোনও তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে শংকরের ভাষ্যের অনুসরণ করাই সুবিধাজনক, তিনি স্পষ্ট বলেছেন: 'যাবৎ কর্মাণি কল্পশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্''।।—অর্থাৎ, যেমন শতকোটিকল্পেও কর্মনাশ হয় না তেমনি কর্মফলেরও (সে পর্যন্ত) বিনাশ নেই।

সুতরাং এটা বলতে হবে, এই সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন তা ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানগুলিকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি তার সঙ্গে এক হতে পারে না। তিনি যেহেতু তাঁর দেশবাসীর বা কিছু য়ুরোপীয়ের— যাঁরা হিন্দুদের মধ্যে বাস করার দরুণ হিন্দুদের রীতিনীতি, সংস্কার ও অন্তরের (বিশেষ) প্রবণতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ,—উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন, তাঁর পক্ষে এমন কিছু খুঁটিনাটি বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে যার তাৎপর্য বর্তমানে য়ুরোপে আমরা অতি আগ্রহ সহকারে অনুসন্ধান করছি; কারণ এগুলি এবং এদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এখন পর্যন্ত আমাদের অজানা। এইসব রীতিনীতি কোনও ভারতীয়কে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আমাদের কাছে যা একেবারেই দুর্বোধ্য, যদি কোনও টীকাকার আমাদের না উদ্ধার করেন। যেমন ধরা যাক রামমোহনের অনুবাদের এই অংশটি : The eighteen members of rites and sacrifices [void of true knowledge] are infirm and perishable"। এক্ষেত্রে এই 'eighteen members of rites' বলতে যে ঠিক কি বুঝতে হবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। টীকাকার (শংকর) আমাদের সব অনিশ্চয়তার অবসান ঘটান যখন তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে এখানে "ঋত্বিক' নামধারী (যজ্ঞের) কার্যনির্বাহক ষোলজন পুরোহিতকে বোঝাচ্ছে যাঁরা যজমান ও তাঁর পত্নীর হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন : "অষ্টাদশ সংখ্যাঃ কাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ'।[৩৮]

[আমি অন্যত্র দেখাব যজ্ঞের কর্মকর্তা এই পুরোহিতগোষ্ঠীর নাম কি আকারে জেন্দ্ (প্রাচীন পারসীক) ভাষায় স্থান পেয়েছে; আরও দেখাব জেন্দ্ ও (বৈদিক) সংস্কৃতের মধ্যে প্রাচীন কালে

আদান-প্রদানের এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। দুই ভাষার বাক্-রীতি লক্ষ্য করলে পরস্পরের মধ্যে অন্তত চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে,—যেমন সংস্কৃত, 'বশিষ্ঠ' ও জেন্দ্ 'বহিস্ট', সংস্কৃত 'কৃশাশ্ব', (প্রাচীন) পারসীক 'গুরশাস্প'; এবং ইরানীয় পর্বতের নাম 'বর্দ' ও সংস্কৃত 'বৃহৎ'।][৩৬]

দুঃখের বিষয় আমাদের হাতে এই বিচিত্র উপনিষদখানির এমন কোনও সম্পূর্ণতর ও শুদ্ধতর পাঠ নেই যার সাহায্যে আমরা বর্তমান ইংরেজি অনুবাদটির বিচার করতে পারি। অনুবাদকের প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সততা ও গভীর আন্তরিকতা যে যুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা খুলে বলবার প্রয়োজন নেই। তবে বেদের এই বিশেষ অংশটি প্রকাশ করবার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যখন প্রমাণ করা যে এক ঈশ্বরের উপাসনাই উক্ত প্রাচীন গ্রন্থরাজির প্রতিপাদ্য তখন তিনি আগাগোড়া ধারাবাহিকতার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিনা (সমালোচকের) সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার প্রয়োজন হয়। কলকাতায় (রামমোহন কর্তৃক) প্রকাশিত সমগ্র উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী যাঁরা দেখেছেন কেবল তাঁরাই এ বিষয়ে সঠিক মতামত দিতে পারেন। আমরা মাত্র এইটুকু বলতে পারি ঈশ ও কেন উপনিষদের যে পাঠ ম. পথিয়ে [তাঁর তাও-মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থে] উদ্ধৃত করেছেন তার অনুবাদ আমাদের মতে অতি যথাযথ হয়েছে।[৩৭] এইরকম বিশুদ্ধ অনুবাদই আমরা একজন গ্রন্থকারের কাছে আশা করতে পারি যিনি এক য়ুরোপীয় ভাষায় এমন কতগুলি ভাবধারা রূপান্তরিত করবার সুকঠিন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের উপর নিয়েছেন যা স্থানে স্থানে অতি উন্নত এবং যার রচনারীতি মূল বৈদিক ভাষার ধর্মানুযায়ী যথেষ্ট ঋজু ও সংক্ষিপ্ত।

(সংগ্রহভুক্ত) কঠোপনিষদের (ইংরেজি) অনুবাদ ও *A Translation into English of a Sanskrit Tract inculcating the Divine Worship esteemed by those who believe in the revelation of the Vedas as most appropriate to the nature of the Supreme Being* গ্রন্থ দুখানি এই বিশেষ গুণে সমুজ্জ্বল। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি 'গায়ত্রী' নামক প্রার্থনামন্ত্রের উপর রচিত এক ক্ষুদ্র টীকা। গায়ত্রীমন্ত্রকে সাধারণতঃ বেদের নির্যাস বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত এই গ্রন্থগুলিতে 'ব্রহ্ম' শব্দের অনুবাদে ইংরেজি god শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সুপণ্ডিত অনুবাদকের মতে, কোনও য়ুরোপীয়ের কল্পনায় god বা 'ঈশ্বর' শব্দের যে অর্থ প্রতিভাত হয় শিক্ষিত হিন্দুমানসে 'ব্রহ্ম' শব্দের তাৎপর্যও তদনুরূপ। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত ও নিত্য সত্তা; এবং বিভিন্ন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় কর্তৃক কল্পিত ও বর্ণিত ঈশ্বরসত্তার মধ্যে অনুবাদকও ব্রহ্মসত্তার উক্ত প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন। রামমোহন রায়ের পর্যায়ের এক মনীষীর প্রগাঢ় জ্ঞান ও সুপক্ক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকার আমাদের নেই; তাঁর পরিস্থিতি ও বিশেষ বিদ্যাভ্যাস হেতু তিনি যে সকল বিষয় আমাদের চেয়ে ভালভাবে অধিগত করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর মতামত খণ্ডন করবার দুঃসাহসও আমাদের নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁদের ঈশ্বরকে যে 'বিশ্বাত্মা' *(ame du monde)* সংজ্ঞা দেন, কোনও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী তা গ্রহণ করবেন কিনা এতে আমাদের সন্দেহ আছে। অথচ ভারতীয়রা 'ব্রহ্ম' বলতে যা বোঝেন সেই ধারণাসূচক যে সব শব্দ ও বাক্-প্রতিমা (আলোচ্য সংগ্রহভুক্ত) উপনিষদ-চতুষ্টয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তার সবগুলির মধ্যেই ঘুরে ফিরে উক্ত প্রত্যয়টিই প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতীতি হিসাবে এটি উন্নত এবং যথেষ্ট বিমূর্ত এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় উক্ত বস্তুরূপময় চিন্তার স্পর্শ থেকে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি এবং শব্দটির অন্তর্নিহিত এই আদিম প্রত্যয়ের আভাস এখনও অনুভব করা যায়। ব্রহ্মকে যদি অদ্বিতীয় বলতে হয় তবে তাঁকে

পরমাত্মা বলে স্বীকার করতে হবে যিনি সকল জীবাত্মার পরম গতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি যাঁর মধ্যে বিধৃত ও যাঁর দ্বারা সঞ্জীবিত। ব্রহ্ম সত্তায় যে ঐক্যের আবোপ করা হয়ে থাকে তাকে প্রকৃত ঐক্য অপেক্ষা একটা সমগ্রতা বলাই বোধ করি অধিক সঙ্গত। কোনও ভারতীয়ের কল্পনায় পরমাত্মা প্রায় জীবাত্মাসমূহের এক সমষ্টি, এবং জীবাত্মাপুঞ্জ পরমাত্মার বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গবিশেষ যেগুলি (প্রত্যেক জীবের) মর্ত্যশবীরের আবেষ্টনী দ্বারা বদ্ধ ও সীমিত। মরদেহের আয়ুষ্কাল পর্যন্তই এই জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য থাকে। জীবাত্মার পরিণাম হল ইহজীবনে (জড়বেষ্টনীর) এই বাধাগুলিকে অতিক্রম করা ও ধ্যানযোগে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া; কেননা জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার থেকে স্বতন্ত্র নয়। জীবাত্মা স্বয়ং ঈশ্ববের সঙ্গে অভিন্ন--এমন সংস্কার আমাদের সরাসরি এক অতিগূঢ় রহস্যবাদের ভূমিতে উপনীত করে যা কোনও খ্রিস্টান অপবিত্রজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবে।[৩৮]

'ব্রহ্ম' শব্দটির, অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে 'ঈশ্বর' বলতে আমরা (খ্রিস্টধর্মাবলম্বী য়ুরোপীয়রা) যা বুঝি, তার কিছু পার্থক্য বিনীতভাবে নিবেদন করলাম। অপরপক্ষে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে (এ পর্যন্ত আলোচিত গ্রন্থগুলিতে) এই প্রসঙ্গে অনুবাদক সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে যে ধরণের ঈশ্বরবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য চলে আসছে তার সঙ্গে তুলনা করে আদি বৈদিক ধর্মেব আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে (আলাদা) কোনও মন্তব্য করেন নি। এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য (বর্তমান সংগ্রহভুক্ত) তাঁর (পরবর্তী) তিনখানি গ্রন্থ রচিত। এগুলি হল : *A Defence of Hindu Theism in reply to the attack of an advocate of idolatry at Madras (Calcutta, 1817), A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship, (Calcutta, 1817)* এবং *An Apology for the pursuit of Final Beatitude independently of Brahmunical observances, (Calcutta, 1820)*· এই গ্রন্থত্রয় অতি বিচিত্র ধরণের; — কেন না এগুলির মাধ্যমে আমরা হিন্দুদের চিন্তাপ্রণালী বিশেষতঃ তাদের দার্শনিক বিচার পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই। এর মধ্যে প্রথমখানি মাদ্রাজের সেইন্ট জর্জ কলেজের প্রধান ইংরেজি শিক্ষক শংকর শাস্ত্রী লিখিত এক ইংবেজি পত্রের উত্তর।[৩৯] এই পত্রে শংকর শাস্ত্রী বলতে চেয়েছেন, "ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা গুণবাচক চিহ্নের অর্চনার মত যে সব ক্রিয়াকর্ম বেদ অনুমোদন করেছে, সেগুলি মানুষের চিত্তকে ঈশ্বরের নিঃসীম পরিপূর্ণ স্বরূপের অভিমুখী করবার উপায়বিশেষ; সুতরাং রামমোহন রায় সেগুলি বর্জন করে ভুল করেছেন। পাঠকবর্গ সম্ভবতঃ শাস্ত্রীর যুক্তিগুলির ধরণ ও গঠনবিন্যাস সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হবেন। রামমোহন পরিচালিত ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে *Madras Courier* পত্রিকায় বলা হয়েছিল "আমরা শুনেছি হিন্দুধর্মের সমস্ত বড় বড় পার্বণ-উপলক্ষে রামমোহন রায় স্থাপিত 'আত্মীয়সভা'-র অধিবেশন বসে। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সভার সদস্যগণকে দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখাই নয়; বেদবিহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে তাদের বিশ্বাসে নূতন করে শক্তি সঞ্চার করাও বটে। এইসব অধিবেশনে তাঁদের অপেক্ষাকৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর মত তাঁরা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে থাকেন, যদিও তাঁদের সঙ্গীতগুলি তাঁদের নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশক।" এই বিবৃতির উপর শংকর শাস্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা এই: "এ পর্যন্ত বেদের শিক্ষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে, আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে না পারলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না; এবং যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রায়শ্চিত্ত, পূজা, শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ ও অর্থবিচার ছাড়া সেই বিশুদ্ধীকরণ অসম্ভব। কিন্তু

সভানুষ্ঠান বা গীত, বাদ্য, নৃত্যাদি স্থূল ঐহিক আমোদ-প্রমোদের মধ্যে গণ্য; শাস্ত্র এগুলিকে মন বিশুদ্ধ করবার উপায় বলে স্বীকার করেনি। প্রশ্ন হতে পারে একেশ্বরবাদের তত্ত্বপ্রকাশই যদি এই গীত বাদ্য প্রভৃতির লক্ষ্য হয় তবে তার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হতে পারবে নাই বা কেন? উত্তরে আমি বলব, সংসারে প্রত্যেক কর্ম সম্পন্ন হয় তার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে, যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুধ বা ঐ জাতীয় কোনও পানীয়ের একান্ত প্রয়োজন, বালির দ্বারা তা সাধ্য নয়। তৃষ্ণা শান্তির উপায়গুলি মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও লোকব্যবহার থেকেই জানতে পারে; কিন্তু মনোরাজ্যের অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বৃত্তিসমূহের শুদ্ধীকরণ কখনই মানুষের নিজস্ব বুদ্ধির সাহায্যে সাধিত হতে পারে না; তা একমাত্র ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং এর জন্য (প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রনির্দিষ্ট) যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, পূজাবিধি প্রভৃতি বর্জন এবং তার পরিবর্তে নৃত্যগীত বাদ্যাদির প্রবর্তন কোনও ধর্মমতের পক্ষেই স্বীকার্য হতে পারে না।" সমালোচনার জবাব রামমোহন এইভাবে দিয়েছেন: "আমি স্বীকার করছি, ঈশ্বরোপাসনা কালে নৃত্যের অনুমোদন শাস্ত্র করেননি। তদনুসারে আমাদের উপাসনায় নৃত্যের ব্যবহার আমরা কদাচ করিনি। 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রে আমাদের উপাসনায় নৃত্যানুষ্ঠানের যে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, এ বিষয়ে সম্পাদক ভুল খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু উপাসনায় একেশ্বরবাদমূলক সংগীত ব্যবহারের সমীচীনতার প্রশ্নে আমি পত্রলেখকমহোদয়ের দৃষ্টি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১১৪ ও ১১৫ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের প্রতি আকর্ষণ করতে চাই। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরধ্যান উপলক্ষে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহারই অনুমোদন করেননি, ইতরজন রচিত গানকেও পাঙ্‌ক্তেয় বলে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া এটাও তো স্পষ্ট যে কোনও হৃদয়গ্রাহী ভাব সাধারণ প্রচলিত ভাষামাধ্যম অপেক্ষা গানের সুরে বসানো কাব্যের মাধ্যমে মানুষকে অধিক আকুল করে।"[৪০]

এই ব্রাহ্মণ মনীষী (রামমোহন) আলোচ্য বিতর্কের গভীরতর বক্তব্যগুলিকেও একইভাবে উপস্থিত করেছেন। যখন তাঁর প্রতিপক্ষ বলতে চেয়েছেন, ধর্মের (শাস্ত্রবিহিত) ক্রিয়াকর্মগুলিই আত্মার বিশুদ্ধীকরণ ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ, রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যেই উত্তর দিয়েছেন যে উল্লিখিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন ছাড়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব; এবং যখন শংকর শাস্ত্রী বিভিন্ন দেবদেবীকে পরব্রহ্মের গুণসমূহের ইন্দ্রিয়বেদ্য স্থূল রূপ আখ্যা দিয়ে ভারতীয় বহুদেবোপাসনা সমর্থন করেছেন, রামমোহন পৌরাণিক সাহিত্য এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থসমূহে উক্ত দেবমণ্ডলীর যে সব ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে সেগুলির উল্লেখ করে জানতে চেয়েছেন, এদের কীর্তিকাহিনীর বর্ণনা এবং এদের মূর্তিপূজা স্থূলতম জড়োপাসনা ভিন্ন অন্য কিছুর পর্যায়ে পড়ে কিনা।

একেশ্বরবাদের সমর্থনে (পূর্বোল্লিখিত) দ্বিতীয় সওয়ালখানি, প্রথমখানির মত, কলকাতা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক রামমোহনের মতামতের সমালোচনার প্রত্যুত্তর। উক্ত সমালোচনা বাংলা ও ইংরেজিতে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪১] তাঁর এই গ্রন্থে রামমোহন (শংকর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত) তাঁর প্রথম পুস্তিকার মতই জবাবে দু'রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন,—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বচনও উদ্ধার করেছেন। আবার সহজ বুদ্ধিজাত প্রমাণও দিয়েছেন। উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলি হল প্রধানতঃ সেইগুলি যা আজ পর্যন্ত (প্রামাণ্যজ্ঞানে) সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সহজবুদ্ধি প্রসূত যুক্তিগুলি সংখ্যায় প্রচুর, সুনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত অকাট্য। আলোচ্য গ্রন্থে এবং পূর্বোক্তখানিতেও লেখকের আলোচনা-পদ্ধতি ও পরিকল্পনা অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত; এবং যদিও তিনি তাঁর মতবাদের প্রতি অধিক সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করবার অভিলাষে নিজ চিন্তাপ্রণালীকে হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপন করতে কিছু আগ্রহ দেখিয়েছেন, সহজেই বুঝতে পারা যায় তিনি শাস্ত্র প্রমাণ

অপেক্ষা যুক্তির উপরই বেশী ভরসা রেখেছেন। তাঁর তর্কপদ্ধতির মধ্যে যে পরিমাণ য়ুরোপীয় উপাদান আছে তা তাঁর প্রতিপক্ষগণ-অনুসৃত বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতির তুলনায় অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। শেষোক্ত (ভারতীয় তর্কপদ্ধতি) প্রধানতঃ তুলনা ও বাক্-প্রতিমার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল (celui-ci procède par comparaisons et par images); এর শব্দপ্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গী মূল বক্তব্যের ও তার ভিত্তির মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলার যে অভাব আছে তাকে চাপা দিতে পারে না। বক্তব্য উপস্থিত করবার যে ধরণটি উপনিষদগুলিতে দেখা যায় এ হল যেন তারই অবশেষ। (উপনিষদের রচনাশৈলীতে অভিব্যক্ত) এই পদ্ধতিতে সংগীতের সঙ্গে যুক্তির মিলন ঘটেছে এবং সেখানে যেহেতু আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের আলংকারিক ভাষা ব্যবহৃত তাই অত্যন্ত কঠিন তর্কপদ্ধতিও সমুজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসে দ্যুতিমান। এই তর্কপদ্ধতি কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও বা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু সর্বত্র নির্ভীক ও চিত্তাকর্ষক। এই গোত্রের চিন্তা ও আরিসতত্‌লীয় ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান, কিন্তু তবুও আমাদের কালে একই দেশে (ভারতবর্ষে) দুটি পদ্ধতিব সহাবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের জানা নেই এদের কোনওটি (অপরটিকে) ছাড়িয়ে যাবে কি না, কিংবা প্রথমটি (ভারতীয় পদ্ধতি) সেখানে আর টিকে থাকবে কি না, অথবা দ্বিতীয়টি (পাশ্চাত্ত্য তর্কবিদ্যা) একটু বেশী আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছে কি না।

(আলোচ্য সংগ্রহভুক্ত) পরবর্তী তিনখানি গ্রন্থ বিধবা নারীদের স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন বিষয়ক। এগুলির মধ্যে লেখকের প্রতিভা যতখানি গৌরবোজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত তাঁর লোকহিতাদর্শ তার চেয়ে কিছু কম নয়। গ্রন্থত্রয় ইতোপূর্বে কলকাতায় যথাক্রমে ১৮১৮, ১৮২০ এবং ১৮৩০ সালে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম দু'খানি দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে (কল্পিত) কথোপকথনের আকারে লিখিত; এঁদের মধ্যে একজন নারীদের মৃত পতির সঙ্গে চিতায় আত্মবিসর্জন প্রথার সপক্ষে এবং অপরজন তার বিপক্ষে সওয়াল করেছেন। তৃতীয়টি এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরোধী ও সমর্থক দুই পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহের এক সারসংকলন। একটি কথোপকথনে—যার মধ্যে মহত্তম হৃদয়াবেগের সঙ্গে তর্কবিদ্যার সূক্ষ্মতা ও চাতুরী মিশে গেছে,—রামমোহন দেখিয়েছেন যে, হিন্দুরা প্রাচীনতম যে সব গ্রন্থকে শাস্ত্রের ভিত্তি বলে মনে করেন, বিধবাগণকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে বাধ্য করবার প্রথা বস্তুতঃ সেই সব গ্রন্থসাক্ষ্যের বিরোধী। একজন য়ুরোপীয় দার্শনিক প্রশ্নটির যেভাবে বিচার করতেন তিনি সে পথে যাননি, একজন হিন্দু স্মার্তরূপেই সমস্যাটিকে দেখেছেন; এবং কোনও পাশ্চাত্ত্য মনীষী এই দুর্ভাগিনীদের বিষয়ে কেবল লৌকিক বুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতা নির্ভর যে সব যুক্তি দিতেন, তিনি সযত্নে তা এড়িয়ে গেছেন। কেননা প্রাচীন শাস্ত্রের বলে বলীয়ান ব্রাহ্মণগণকেই তিনি তর্কের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন। মনুসংহিতার উপর নির্ভর করে—যেখানে বিধবাগণকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করবার এবং বৈধব্যমুহূর্ত থেকে অন্য কোনও পুরুষের স্বপ্ন পর্যন্ত না দেখবার নির্দেশ দেওয়া আছে, তিনি প্রমাণ করেছেন যে সহমরণের বিধান সংবলিত অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উক্ত গ্রন্থের (মনুসংহিতার) প্রামাণ্য অধিক। কারণ এই সংহিতা, যার থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত গৃহীত, — সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং সমগ্র বেদের সারভাগ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই যুক্তির উত্তর দেওয়া কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; কিন্তু রামমোহন মাত্র এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে আরও এক যুক্তি উপস্থিত করেছেন যা হিন্দুদের কাছে কম চূড়ান্ত বলে মনে হবে না; যে সব শাস্ত্রগ্রন্থে সতীদাহের বিধান আছে সেগুলি আত্মবিসর্জনকারিণী নারীদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এমন আশ্বাসও দিয়েছে যে তারা নিজেরা (মৃত্যুর পর) স্বর্গসুখ ভোগ করবে এবং তাদের পতিকুল ও

পিতৃকুলও অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। এইসব লোভনীয় পুরস্কারের আশ্বাসেই সাধারণতঃ নারীরা (সহমরণরূপ) আত্মহত্যায় প্রণোদিত হত। অপরপক্ষে মনু বিধবাদের জন্য যে বিষাদময় প্রায়শ্চিত্তমার্গের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি। এই জ্ঞান এর অধিকারীদের পক্ষে স্বর্গবাস অপেক্ষা অনেক বড় লাভ হল ব্রহ্মসমাধিজনিত পরমানন্দ। সুতবাং দাঁড়াচ্ছে, ফলাফলের দ্বারা যদি দুটি উক্তিকে বিচার করা যায় তাহলে সতীদাহের ব্যবস্থাপক স্মৃতিকারগণের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা মনুর বিধানকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তা ছাড়া এই অর্থে ফলকামনায় নিষ্পন্ন সকল কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য অনুশীলিত ধ্যানধারণার তুলনায় তা আরও অনেক অধিকগুণে নিকৃষ্ট। অতএব এর থেকে সিদ্ধান্ত হল যে, যে বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর (সহমৃতা না হয়ে) ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরধ্যানে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁরা (রক্ষণশীল) ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক উদ্‌ভাবিত ও উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত এই বর্বর (সতীদাহ) প্রথার অনুবর্তিনী নারীগণের চেয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যপূর্ণ ভবিষ্যতের অধিকারিণী। রামমোহনের যুক্তিবিন্যাসের ভিত্তি এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় মনের প্রবণতা যাঁরা বুঝতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছে এই তর্কপ্রণালী বিশেষ কৌতূহলজনক হবে। যদিও এর খুঁটিনাটির ব্যাপারগুলো কোনও বিদেশী অপেক্ষা হিন্দুদের কাছেই আকর্ষণের বস্তু, কেননা হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই ওগুলো লেখা হয়েছে, তবু এর থেকে গ্রন্থকারের বুদ্ধির চাতুর্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জন্মায়। কখনও কখনও হয় তো প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে তিনি কিছু (অনাবশ্যক) বিতণ্ডায় জড়িত হয়ে পড়েছেন, যার ফলে সূক্ষ্মতার কিছু হানি ঘটেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অবলম্বিত প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু মৌলিকতা আছে যা আশ্চর্য করে দেয়। এই জাতীয় সূক্ষ্মতার আমরা মাত্র একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণের মর্যাদার পক্ষে এটি বিশেষ সম্মানসূচক নয়।

একটি অনুচ্ছেদে রামমোহন নিজ বক্তব্য এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন, আমরা খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে শুধু সারাংশটুকু দিলাম: "আপনি স্বীকার করেছেন বিধবাদের সহমরণ বিষয়ে অঙ্গিরা, বিষ্ণু এবং হারীতের সিদ্ধান্ত মনুর সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত; এবং আপনি একথাও বলেছেন যে, যদি মনুপ্রবর্তিত কোনও একটি বিধি অন্যান্য একাধিক স্মৃতিকার খণ্ডন করেন, তবে তা অবশ্য নাকচ হয়ে যায়। এই (শেষোক্ত) বিধিটি প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে আপনি তিনটি যুক্তি দিয়েছেন, তার প্রথমটি হল এই বৃহস্পতির মতে মনুবিরোধী প্রতিটি বিধিই অগ্রাহ্য। এখন, আপনি বলছেন, যেহেতু এখানে ঐ প্রাচীন ঋষি 'প্রতিটি বিধি' শব্দদুটিতে একবচন প্রয়োগ করেছেন, তার থেকে দাঁড়াচ্ছে তিনি এক্ষেত্রে মাত্র একটি বিধিই বুঝতে চেয়েছেন, একাধিক বিধি নয়; অতএব একজনমাত্র স্মৃতিকারের প্রস্তাবিত কোনও বিধি যদি মনুসংহিতার ব্যবস্থাবিরোধী হয় তবেই শুধু তা মনুর বিধির দ্বারা খারিজ হবে; অপরপক্ষে যদি অনেক স্মৃতিকার কোনও বিষয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মনুর বিধানের বিরোধিতা করেন তা হলে মনুর বিধানেরই পরাজয় ঘটবে, কেন না সেখানে বৃহস্পতিনীতির ব্যত্যয় হয়েছে।" রামমোহনের প্রতিপক্ষ আর যে দুটি যুক্তি উত্থাপিত করেছিলেন তা আমরা বাদ দিলাম, কারণ যে বিচিত্র কৌশলে রামমোহন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন সেটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। (রামমোহন বলছেন) "যদি আপনার ব্যাখ্যার যাথার্থ্য স্বীকার করে নেওয়া যায় এবং একবচনের প্রয়োগকে আপনার প্রস্তাবিত অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহলে নিম্নোক্ত বচনটির তাৎপর্য সেক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে একবার বিবেচনা করে দেখুন: "যে কোনও ব্রাহ্মণকে আঘাত করে সে নরকে যায়।" এখানে কর্তা প্রথমা বিভক্তিতে এবং কর্ম দ্বিতীয় বিভক্তিতে—দুইই একবচন

আছে। আপনার মতানুসারে এর থেকে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা—যদি দু-তিন ব্যক্তি এক যোগে কোনও এক ব্রাহ্মণকে প্রহার করে বা যদি কোনও এক ব্যক্তি অনেক ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তাহলে কোনও অপরাধই হবে না। এই আজগুবী কল্পনাকে কোনও রকমেই সমর্থন করা যায় না। (..ce qu'on ne peut soutenir sans absurdite)"।

আলোচ্য সংগ্রহগ্রন্থটিতে সর্বশেষ সংযোজন (হিন্দু) বিধবাদের অধিকার সংক্রান্ত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এর বক্তব্য, বর্তমানে বিধবাদের প্রতি সমাজ যেমন (হৃদয়হীন) ব্যবহার করে তাদের প্রতি (ভারতের) প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মনোভাব তার চেয়ে অনেক বেশী অনুকূল ছিল। কেননা সেই ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী (মৃত) স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তার বিধবা পত্নীর প্রাপ্য। (সংগ্রহভুক্ত) পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি যে সব বিশেষ গুণের জন্য আমাদের কাছে সুগ্রাহ্য মনে হয়েছে বর্তমান আলোচনাটিও তাই। এটি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই—এই সুপ্রসিদ্ধ মনস্বী গ্রন্থকার কিভাবে স্ববর্ণজাত পূর্বসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানবিকতার পবিত্র অধিকার ও ন্যায়বিচারাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্বদেশের প্রাচীন বিধিব্যবস্থাসমূহের প্রতি তাঁর মনোগত শ্রদ্ধার মিলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন।

উজ্যান বুর্নুফ

উল্লেখসূত্র

১. উজ্যান বুর্নুফ সম্পর্কে 'ভারতকোষ', পঞ্চম খণ্ডে বর্তমান লেখকের রচনা দ্রষ্টব্য (পৃ ১৪৬-৪৭); তাঁর স্বল্পপরিসর জীবন ও বহুমুখী কীর্তির বিস্তারিত পবিচয় পাওয়া যাবে I Barthelemy-Saint Hilaire লিখিত জীবনচরিত, *Eugène Burnouf, Ses Travaux et Sa Correspondance* (Paris, 1891) গ্রন্থে।

২. দ্রষ্টব্য *Chronique Relegiouse,* Vol III (1819), 'Notice sur la vic et les e'crits de Rammohun Roe, savant bramine, et sur la secte nouvelle qu'il a formic recemment dans l'Inde' pp, 388-403; এই রচনার একটি সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ ইংলণ্ডের সমকালীন ইউনিটারিয়ান মণ্ডলীর মুখপত্র *The Monthly Repository of Theology and General Literature* এ পর বৎসর (১৮২০) মুদ্রিত হয়েছিল। সেই অনুবাদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ মেরী কার্পেন্টার রামমোহনের শেষজীবন সম্পর্কিত তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, দ্রষ্টব্য তাঁর *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy* Third Ed, 1915, pp 49-54; বর্তমান লেখক মূল রচনাটির টীকাটিপ্পনী যুক্ত এক সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন, দ্রষ্টব্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, (মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭) পৃ ২০-৪১।

৩. *Journal Asiatique,* I Ser. Tome III (July, 1823), p. 88.

৪. *Ibid.* I Ser Tome III (August, 1823), pp. 117-19.

৫. Ibid. I Ser Tome III (October, 1823), 'Observations sur quelques ouvrages de Rammohan Roy,' pp. 243-49; বর্তমান লেখক টীকাটিপ্পনীসহ উল্লিখিত প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন, দ্রষ্টব্য তাঁর 'রামমোহন-সমীক্ষা' (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ ৫১৪-১৯।

৬. বিচারক-সমিতির এই তৃতীয় সদস্য হাইনরিষ য়ুলিয়ুস ক্লাপরোট তখনকার অন্যতম সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ। তিনি ককেসাস অঞ্চলের ভূগোল, ভাষাতত্ত্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, 'মাগাজেঁ আসিয়াতিক্ (Magasin Asiatique) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও *Asia Polygotta* (১৮২৩) গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

৭. *Journal Asiatique,* I Ser Tome 5, (July, 1824), p. 62; দ্রষ্টব্য, এখানে রামমোহনকে পণ্ডিত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৮. *Essais sur la Philosophe des Hindous,* par M H T Colebrooke Traduits de l' Anglais, par G Pauthier (Paris, 1833) Appendix II. pp. 277-95; অনুবাদটির সন্ধান আমাকে দিয়েছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

৯. দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'রামমোহন-সমীক্ষা' (১৯৮৩), পৃ ২৩-২৬; ৬১৭-১৮.

১০. Mary Carpenter. *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy* (Calcutta 1915), pp. 223-25 ।

১১. Garcin de Tassy, *Histoire de la Literature Hindonie et Hindoustanic* S'econde E'difion, Tome II. Paris. 1870, pp. 548-52; এঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'রামমোহন রায় ও গার্স্যা দ্য তাসী', 'দেশ', ৪৪ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা (১২ কার্তিক, ১৩৮৪), পৃ ১৭-১৯।

১২. *Appendice aux Rudimens de la Langue Hindoustane, Paris*, 1833, p. 31, No. 14 ।

১৩. মাত্র রামমোহন নন, উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ফ্রান্স ভ্রমণ কালে বুর্নুফ তাঁর সঙ্গেও পরিচিত হন এবং সাক্ষাৎকার উপলক্ষে তাঁর ভাগবতপুরাণেব ফরাসী অনুবাদের এক খণ্ড দ্বারকানাথকে উপহার দেন। বুর্নুফের ছাত্র অধ্যাপক ম্যাকসম্যুলার এই সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যাক্সম্যুলারের কাছে এই কাহিনী শুনে তার উল্লেখ করেছেন ('আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস,' ১৯১৫, পৃ১১)।

১৪. *Revue Encyclopedique,* December, 1932, pp. 694-706; ম জ্যঁা পিয়ের গ্যুলম পথিয়ে (১৮০১-১৮৭৩) প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন চীনা উভয় সভ্যতার ক্ষেত্রেই তাঁর কালে যথেষ্ট গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাথমিক পর্বে তাঁর কাজ প্রণিধানযোগ্য হলেও উত্তরকালে তা তেমন সমাদৃত হয়নি। বর্তমান লেখক পথিয়েকৃত রামমোহনের Some Principal Books বিষয়ক সম্পূর্ণ সমালোচনা-প্রবন্ধটি টীকাটিপ্পনীসহ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, দ্রষ্টব্য 'রামমোহন-সমীক্ষা' (১৯৮৩), পৃঃ ৫২২-৩৬।

১৫. *Journal des Savans*, December, 1832, pp. 705-17 ।

১৬. Kalika Ranjan Qanungo, *Dara Shukoh,* Vol. I. (Second Ed. Calcutta, 1952), pp. 108-12।

১৭. যদিও দার্শনিক শোপেনহাউএর এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এর দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে পরবর্তী পণ্ডিতগণের সকলেই প্রায় মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে এই অনুবাদ 'largely unintelligble'- *A History of Indian Philosophy,* Vol I, p 39।

১৮. উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুভাষাবিদ ইংরেজ মনীষী; ভারতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরের বছর (১৭৮৪) গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকাল (১৭৯৪) পর্যন্ত জোনস এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। সমগ্র এশিয়াখণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্যবিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে পরবর্তী দুই শতাব্দীকাল এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। জোন্স য়ুরোপে থাকতেই গ্রীক, লাটিন, বর্তমান য়ুরোপের প্রধান ভাষাসমূহ এবং প্রাচ্য ভাষার মধ্যে হিব্রু, আরবী ও ফার্সী ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতবর্ষে দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি সংস্কৃত ভাষাও উত্তমরূপে শেখেন। এক্ষেত্রে তাঁর 'ঈশোপনিষদ', 'মনুসংহিতা', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', ও 'গীতগোবিন্দ'-র ইংরেজি অনুবাদ এবং বহুসংখ্যক গবেষণামূলক নিবন্ধ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

১৯. জোন্সের ব্রাহ্মণ সংস্কৃত-শিক্ষকগণের মধ্যে বুর্নুফ-উল্লিখিত রাধাকান্ত দেবের নামটি প্রথমে আসাটায় কিঞ্চিৎ ধাঁধায় ফেলে। নামটি শুদ্ধভাবে উল্লিখিত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই নাম শুনলে স্বভাবতঃ যাঁর কথা প্রথমে মনে আসে, রামমোহনের সেই রক্ষণশীল প্রতিপক্ষ রাধাকান্ত দেব ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার এক বিত্তশালী কায়স্থ সমাজপতি। তা ছাড়া এই কায়স্থ রাধাকান্তের জন্ম ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে জোন্সের মৃত্যুকালে তিনি দশবছরের বালক মাত্র। তাঁর পক্ষে জোন্সের সংস্পর্শে আসবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবে বুর্নুফ-উল্লিখিত দুই পণ্ডিত রাধাকান্ত দেব ও শর্বরী ত্রিবেদীর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই ১৯ মার্চ, ১৭৮৮ তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে লিখিত উইলিয়ম জোন্সের এক পত্রের প্রেক্ষাপটে। এই পত্রে কৃত জোন্সের প্রস্তাব অনুসারে সরকারী অনুমোদনে ও ব্যয়ে জোন্সের তত্ত্বাবধানে আদালতে ব্যবহারের জন্য হিন্দু আইন সংগ্রহের কাজে দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের একজন বাঙালী রাধাকান্ত শর্মা; অপরজন বিহারবাসী সব্বর (বা শর্বরী) তিওয়ারী। জোন্সের ঘনিষ্ঠ এই দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই বুর্নুফ জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক 'রাধাকান্ত দেব ও শর্বরী ত্রিবেদী' বলে উল্লেখ করেছেন এতে সন্দেহ নেই (দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ৭১৯)। মনে হয়, 'রাধাকান্ত শর্মা' নামটি তাঁর ব্যবহৃত আকরে 'রাধাকান্ত দেবশর্মা' রূপে উল্লিখিত ছিল। 'শর্মা' অংশটি কোনও কারণে তাঁর বিবরণে বাদ পড়েছে। শুধু 'দেব' পদবী সাধারণতঃ বাঙালী কায়স্থরাই ব্যবহার করে থাকেন। 'তিওয়ারী' সংস্কৃত 'ত্রিবেদী' শব্দের অপভ্রংশ।

২০. ১৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২১. রামমোহনের জন্মমাস সংক্রান্ত এই ভুল তারিখ, যতদূর জানা যায়, প্রথম চালু করেন আবে গ্রেগোয়ার তাঁর 'ক্রোনিক রেলিজিউজ'—এ ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন সংক্রান্ত প্রবন্ধে

(দ্রষ্টব্য পাদটীকা২)। এই ভুল সংবাদ তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন তাঁর ভারতীয় সংবাদ-দাতা সাংবাদিক জন দা' কোস্তার নিকট থেকে। তদবধি এই তারিখটি কিছুদিন কোনও কোনও য়ুরোপীয় মহলে, বিশেষতঃ য়ুরোপখণ্ডে (Continent of Europe) রামমোহনের প্রকৃত জন্মসাল বলে উল্লিখিত হয়েছিল। এই তারিখ যে ভুল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ভিত্তিতে রামমোহনের উত্তরজীবনের সুপরিচিত ঘটনাগুলির যথাযথ কালবিন্যাসে সামঞ্জস্য আনা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর প্রকৃত জন্মবৎসর হিসাবে ১৭৭২, বা ১৭৭৪-এর কোনও একটিকে মেনে নিতেই হবে।

২১ক. রামমোহনের সংস্কৃতশিক্ষা সম্পর্কে এই তথ্যটিও আবে গ্রেগোয়ার কর্তৃক জন দা' কোস্তা প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশিত। এ সংবাদ সত্য হলে বলতে হবে রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল কলকাতায় এবং উত্তরজীবনে এর ভিত্তি পাকা হয়েছিল কাশীতে, বিশেষতঃ উপনিষদ্-বেদান্তের ক্ষেত্রে।

২২. রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয় ১৮০৩ সালে। কিন্তু তাঁর দুই ভ্রাতা জগমোহন ও রামলোচনের মৃত্যু ১৮০৪-০৫-এ হয়নি। জগমোহনের মৃত্যু হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে; রামলোচনের মৃত্যুর তারিখ ১৮০৯-১০ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মধ্যে কোনও সময়। ভাইদের মৃত্যুর পর রামমোহন সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এ কথাও ঠিক নয়। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় আইনসম্মতভাবে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ তিনপুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তির এই এক-তৃতীয়াংশের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ব্যবসা ও চাকরীর স্বোপার্জিত আয়ে তিনি পরবর্তী জীবনে এই সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছিলেন। তাঁর ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁদের বংশধরগণ।

২৩. 'তুহ্ফাৎ-উল্ মুওহাহিদিন'-এর ইংরেজি অনুবাদক আর্বী-ফার্সী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ আলিম মৌলভি ওবেইদ্-উল্লা এল ওবেইদ। এই গ্রন্থশিরোনামের অনুবাদ করেছেন 'A Gift to Deists' - অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসীগণকে উপহার'। নামটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এই পুস্তিকায় সমস্ত প্রচলিত ধর্মের (ইসলাম সমেত) পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গুরুবাদ, অযথা শাস্ত্রনির্ভরতা, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি খণ্ডন করে এক যুক্তিনির্ভর সর্বমানবিক ধর্মের কয়েকটি সূত্র বিবৃত হয়েছে। 'সবধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে' সংজ্ঞার মধ্যে সে তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে পৌত্তলিকতা খণ্ডনের প্রয়াস প্রধান ঝোঁক নয়।

২৪. শোনা যায়, রামমোহনের যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ইসলাম ব্যাখ্যা মুসলমান সমাজের গোঁড়া শাস্ত্রমার্গীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল (Collet, ***The Life and Letters of Raja Rammohun Roy,*** Fourth Ed,. 1988, p 32); ধর্মান্ধ মুসলমানদের পক্ষ থেকে রামমোহনের জীবননাশের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, নবসংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৬)। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তরফে রামমোহনের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সতীদাহ-নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পর (১৮৩০)। গুপ্ত আততায়ীর ভয়ে তাঁকে সে সময় কিরকম সন্ত্রস্ত থাকতে হত তার এক বিবরণ দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা John Bull পত্রিকা।

২৫. রামমোহন কোনও সময়ে সরকারী রাজস্ববিভাগের 'কলেকটর' (Collector) নিযুক্ত হননি। এপদ তখন দেশীয় কর্মচারীদের লভ্য ছিল না। দেশীয়রা তখন সর্বোচ্চ যে সরকারী পদ লাভ করতে পারতেন তা ছিল শ্বেতাঙ্গ Collector -এর অধীনে 'দেওয়ান'-এর পদ। রামমোহন প্রথমে ঢাকা-জালালপুরে (১৮০৩) ও পরে রংপুরে (১৮০৯-১০) অল্প কিছুকালের জন্য 'দেওয়ান' পদ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১৪ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কোনও সরকারী চাকরী করেননি। কেবল ১৮১৫ সালে অল্প কিছুদিনের জন্য ইংরেজ সরকারের দূতরূপে ভুটানে গিয়েছিলেন মাত্র।

২৬. দা' কোস্তা প্রেরিত যে তথ্যের ভিত্তিতে আবে গ্রেগোয়ার রামমোহন সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে কলকাতায় প্রিচার্ড নামক এক ইংরেজ স্কুলশিক্ষক ছিলেন রামমোহনের লাটিন শিক্ষক। হিব্রু তিনি শিক্ষা করেন এক ইহুদী পণ্ডিতের কাছে; তাছাড়া উত্তম আরবী জানতেন বলে সমগোত্রের হিব্রু ভাষায় অতি শীঘ্র ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তাঁর গ্রীকচর্চার প্রথম উৎসাহদাতা সম্ভবতঃ তাঁর মনিব ও বন্ধু জন ডিগ্‌বী। ডিগ্‌বী গ্রীক ও লাটিন খুব ভাল জানতেন। রামমোহন ইংলণ্ডে থাকাকালীন তাঁকে ভারতে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন লণ্ডনের Times পত্রিকার এমন এক (ইংরেজ) প্রাচ্য সংবাদদাতা (Well-informed Oriental Correspondent) ১৩ জুন, ১৮৩১ সংখ্যা Times -এ (p, 5, Column4) 'Ram Mohun Roy' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি এই সংবাদটি দিয়েছেন: "In the year 1812 he [রামমোহন রায়] became the friend and companion of the iate John Digby Esq. of the Civil Service, who was at that period collector at Rangpoor. Mr. Digby was a considerable proficient in classical literature, and prosecuted his studies during his leisure hours in which he prevailed on Ram Mohun Roy to join him "। এখানে তারিখটি শুধু সংশোধন করে নিতে হবে। ডিগ্‌বীর সঙ্গে রামমোহন রংপুরে বাস করেন ১৮০৯ থেকে ১৮১৪—একাদিক্রমে পাঁচ বছর। তার আগেও ১৮০৫ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত তিনি রামগড়, ভাগলপুর যশোর প্রভৃতি স্থানে ডিগ্‌বীর অধীনে চাকরী করেছিলেন।

২৭. রামমোহন *The Precepts of Jesus* -এর সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার সংকল্প করেছিলেন এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তা ঘোষিতও হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ তাঁর প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘকাল পরে রাখালদাস হালদার এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন 'সুখশান্তির উপায়স্বরূপ যিশুপ্রণীত হিতোপদেশ' নামে (কলকাতা, ১৮৫৯)।

২৮. দুর্ভাগ্যবশতঃ বুর্নুফের পরিকল্পিত রামমোহন সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থ শেষপর্যন্ত হয় প্রকাশিত হয়নি, কিংবা রামমোহন সম্পর্কিত বিবরণ নূতন করে তাতে দেওয়ার সংকল্প তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে বইখানি প্রকাশিত হয়ে থাকলেও সেখানির নাম আমাদের অজানা।

২৯. এই বাংলা সংস্করণটিই মূল গ্রন্থ; 'বেদান্তসার' নামে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর হিন্দী অনুবাদ রামমোহন সম্ভবতঃ ঐ বৎসরই কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। বইখানি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত রামমোহনের বাংলায় সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সুবৃহৎ 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর সংক্ষিপ্তসার। রামমোহন এখানির হিন্দী অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন সম্ভবতঃ ঐ একই বৎসর। তবে এই বৃহৎ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ তিনি করেননি। ***Abridgement***

of the Vedanta তাঁর 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ।

৩০. হিন্দু দার্শনিক সাহিত্যে 'বেদান্তসার' নামে পূর্ববর্তী অন্ততঃ দুটি গ্রন্থের নাম আমরা জানি। একখানি রামানুজ (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) প্রণীত 'বেদান্তসার'; অপরটি সদানন্দ (ষোড়শ শতাব্দী) প্রণীত ঐ নামধেয় গ্রন্থ। এর মধ্যে প্রথমটি রামানুজ-ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের সংকলন; দ্বিতীয়খানি শাংকর অদ্বৈতবাদের। একথা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহন পূর্ববর্তী এই দুখানি গ্রন্থের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এবং স্বরচিত সুবৃহৎ বেদান্তভাষ্যের সারসংকলন কালে গ্রন্থনাম নির্বাচনে সুপরিচিত এই নামটিই তাঁর মনোমত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য সদানন্দকৃত 'বেদান্তসার'-এর কোনও অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতকৃত ভাবানুবাদের ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত একটি পুঁথি শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (শ্রীরামপুর, ১৯৮৪)। রামানুজ প্রণীত 'বেদান্তসার'-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

৩১. দুর্ভাগ্যবশতঃ বুর্নুফ জানতেন না বাদরায়ন বা ব্যাসরচিত সমগ্র ব্রহ্মসূত্র রামমোহনের নিজ বাংলা ভাষ্য সমেত ১৮১৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাঁর আলোচ্য রামমোহনের 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদখানি উক্ত বৃহৎ গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্তসার। সম্ভবতঃ এ বিষয়েও তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না যে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণের মধ্যে শংকরের প্রতিই রামমোহন সর্বাধিক শ্রদ্ধাবান এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যায় শংকরকেই মুখ্যতঃ অনুসরণ করেছেন (ভাষ্যকাররূপে শংকরের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, 'রামমোহন-সমীক্ষা', পৃ ১১৮-৩৭)। বুর্নুফ সম্ভবতঃ একথাও জানতেন না যে ১৮১৮ সালে রামমোহন ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র শাংকর ভাষ্য 'শারীরকমীমাংসা' নামে কলকাতা থেকে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন। 'বেদান্তসার'-এর মূল বাংলা সংস্করণের উপসংহারে শংকরাচার্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে যদিও ইংরেজি অনুবাদে সেই অংশটি বর্জিত।

৩২. উল্লিখিত গ্রন্থটি হল F. H. M. Windischmann রচিত *Sancara sive de Theologumenis Vedantacorum* (Bonn, 1833)। বুর্নুফের আলোচ্য নিবন্ধ রচনাকালে সেটি বিজ্ঞাপিত হলেও প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থকারের প্রাচ্যবিদ পিতার নামও Windisch ছিল বলে বুর্নুফ এঁকে তাঁর পুত্র হিসাবে 'কনিষ্ঠ' (fils) বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৩. Christian Lassen সম্পাদিত ও অনূদিত সাংখ্যকারিকা বিষয়ক গ্রন্থের নাম *Gymnosophista sive Indicae Philosophie Documenta* (Bonn, 1832)।

৩৪. এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সেই আদি যুগে উপনিষদ সাহিত্য সম্পর্কে ফ্রান্সে গবেষণার উপাদানের কতখানি অপ্রাচুর্য ছিল। মুণ্ডকোপনিষদের মূল গ্রন্থ বুর্নুফ হাতে পাননি। College Royal de France এর গ্রন্থগারে অশুদ্ধপাঠ-কণ্টকিত মূলগ্রন্থের উপর শংকরাচার্যের ভাষ্যের কয়েকখানি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল। বাধ্য হয়ে তাঁকে আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁর অশুদ্ধ ও দুর্বোধ্য লাটিন অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কলকাতায় রামমোহন শুদ্ধ মূল পাঠ সমেত উপনিষদের যে বঙ্গানুবাদগুলি প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি, এবং সেজন্য রামমোহনের উপনিষদ-অনুবাদের সমালোচনায় যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী হতেও

পারেননি। রামমোহনের ইংরেজি অনুবাদগুলিব সঙ্গে মূল সংস্কৃত দেওয়া নেই; তদুপবি বঙ্গানুবাদের তুলনায় তা (সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্য পাঠকগণের কথা মনে রেখেই) কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও সরল করা হয়েছে। এটা সমালোচকের বিভ্রান্তির বিশেষ কারণ হয়েছিল।

৩৫. রামমোহনের গ্রন্থে মূল সংস্কৃত না থাকায় মাত্র তাঁর ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর অবলম্বিত মূল গ্রন্থের পাঠ বুর্নুফকে অনুমান করে নিতে হয়েছিল। এর সঙ্গে তাঁর প্রাপ্ত শাংকর ভাষ্যের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকে আহরিত মূলের অংশটুকু মিলিয়েও তাঁর মনে হয়েছে রামমোহনের অনুবাদ যথাযথ। অথচ দ্যু পেরোঁ-র ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি আবার অন্ততঃ একটি স্থলে রামমোহনের মূলানুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে সমালোচনার দুর্বলতা চোখে পড়ে। মূলের শ্লোকটি এই:

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।।
মুণ্ডকোপনিষদ, ১. ১. ৮

রামমোহনের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ পর পর তুলে দেওয়া গেল:
"সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন, তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে জগতের সাধারণ কারণ সূক্ষ্ম রূপে উৎপন্ন হয়, পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা কর্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীবস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন হয়েন, পরে, ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্প রূপ মনের জন্ম হয়, আর ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে ক্রমে ভূরাদি সপ্তলোকের জন্ম হয়, সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্রমে কর্মসকল জন্মে, আর ঐ কর্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়।"
"From his omniscience the Supreme Being resolves to create the Universe. Then nature the apparent cause of the world, is produced by him. From her the prior operating sensitive particle of the world styled Bruhma, the source of the faculties proceeds. From the faculties the five elements are produced; thence spring the seven divisions of the world, whereon ceremonial rites with their consequences, are brought forth."।
অনুবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমতঃ দুটি অনুবাদেই মূলে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম পরম্পরা (ব্রহ্ম, অন্ন, প্রাণ, মন, সত্য, সপ্তলোক, কর্ম ও কর্মফল) সযত্নে রক্ষিত। দ্বিতীয়তঃ দুটি অনুবাদেই রামমোহন প্রত্যাশিতভাবেই শংকরাচার্যের ভাষ্যকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে শাংকরভাষ্য-সম্মত সে কথা বাংলা-ইংরেজি গ্রন্থদ্বয়ের নামপত্রে স্পষ্ট দেওয়া আছে। এটাও মনে রাখতে হবে রামমোহনের ইংরেজি অনুবাদ তুলনায় বঙ্গানুবাদ অপেক্ষা কিছু সংক্ষিপ্ত সরল এবং অনুপুঙ্খবর্জিত, কেননা মূল শাস্ত্র ইংরেজি ভাষান্তরিত করবার সময়ে তিনি সর্বদা সাধারণ য়ুরোপীয় পাঠকের কথা মনে রেখেছিলেন যাঁরা ভারতীয় হিন্দুদের মত শাস্ত্রীয় পরিভাষায় অভ্যস্ত নন। আশ্চর্যের বিষয় বুর্নুফ দ্যু পেরোঁ-র অনুবাদের সঙ্গে রামমোহনের অনুবাদ তুলনা করতে গিয়ে রামমোহনের অনুবাদ অসম্পূর্ণ ও বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আরম্ভের 'From him the Supreme Being resolves to create the Universe. Then nature the apparent cause of the world is produced by him.' —এই দুটি

বাক্য সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। তার পরের বাক্যে " ..... the world styled Bruhma" তে ইচ্ছামত 'styled Bruhma' শব্দদুটির মধ্যে 'by' বসিয়ে দিয়েছেন; পরের দুটি বাক্যের সংযোজনী 'thence' শব্দকে স্বেচ্ছায় 'then' করে অনুবাদটিকে ক্রমভঙ্গ করিয়েছেন। হাতের কাছে বই থাকতে বুর্নুফের মত জ্ঞানী সমালোচকের এ বিপত্তি কেন ঘটল এ রহস্যের সমাধান করতে বর্তমান লেখক অপারগ। এরপর তিনি প্রথম অভিযোগ করেছেন রামমোহনের অনুবাদে 'মন' থেকে 'প্রাণ'কে পৃথক করা হয়নি। রামমোহনের অনুবাদে 'প্রাণ'কে সঙ্গতভাবেই হিরণ্যগর্ভ (বাংলা) ও সমার্থবোধক 'ব্রহ্মা' (ইংরেজি) রূপে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা শাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ বিশ্বপ্রাণ রূপেই কল্পিত; এবং বুর্নুফ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনুবাদে একটি 'by' যোগ না করতেন তাহলে ভাল করেই বুঝতে পারতেন যে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভরূপী বিশ্বপ্রাণ থেকে উৎপন্ন মনকে রামমোহন ইংরেজি অনুবাদে সংকল্পবিকল্পাদি অন্তঃপ্রক্রিয়ার সমাবেশ অর্থে Faculties শব্দে প্রকাশ করেছেন। বঙ্গানুবাদে তো প্রাণ ও মনের পার্থক্য এবং দ্বিতীয়টির প্রথমটির থেকে উৎপত্তি আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। 'সত্য' শব্দটিকে দ্যু পেরোঁ অবিকল বজায় রেখেছেন, কিন্তু শংকরানুসারী রামমোহন তাকে five elements ভূতপঞ্চক রূপে ব্যাখ্যা করে এর অর্থকে আরও স্পষ্ট করেছেন। বুর্নুফের আরও গুরুতর অভিযোগ ব্রহ্মাই যে সৃষ্টির মূল রামমোহন তাঁর অনুবাদে মূলের এই তত্ত্বটি না দিয়ে প্রকৃতি (nature) থেকে সৃষ্টির উদ্ভব, এমন অর্থ প্রকাশ করেছেন। এই মন্তব্য আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। রামমোহনের ইংরেজি অনুবাদের প্রথম দুটি বাক্য বাদ দিয়ে (যেখানে অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মা সৃষ্টির মূল এবং প্রকৃতি তাঁর থেকে উৎপন্ন বর্ণিত) ইচ্ছামত সৃষ্টিক্রমের মাঝখান থেকে—অর্থাৎ আগের ধাপটি উহ্য রেখে 'প্রকৃতি' থেকে, সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা আরম্ভ করে, তারপরে অনুবাদকে সেজন্য দায়ী করা ঠিক দায়িত্বশীল সমালোচনা আখ্যা পেতে পারে কি? বিশেষ করে বুর্নুফের মত শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীর পক্ষে? যদি বুর্নুফ আর একটু খোলা মনে বিচার করতেন তাহলে নিশ্চয় লক্ষ্য করতেন যে মূলানুগত্যে রামমোহন এই বিশেষ অংশের অনুবাদে দ্যু পেরোঁ অপেক্ষা তিলমাত্র ন্যূন তো ননই বরং তাঁর অনুবাদ মূলের অর্থকে অধিকতর স্পষ্ট করেছে; দ্যু পেরোঁ কয়েক স্থানে মূলের শব্দগুলিকে (যথা 'প্রাণ', 'সত্য') অপরিবর্তিত রেখে দেওয়ায় সেগুলি কি অর্থে প্রযুক্ত পাঠকের সে সম্পর্কে ধারণা হয় না।

তবে আর একটি ব্যাপারে বুর্নুফ যে মৃদু আপত্তি জানিয়েছেন, রামমোহনেব ইংরেজি ও দ্যু পেরোঁর লাটিন অনুবাদ বিবেচনা করলে তা কিছুটা সঙ্গত মনে হতে পারে। মূলের 'লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্'—অংশের অনুবাদে দ্যু পেরোঁ করেছেন—- Post **sata** omnis mundus fit; post mundum, opus fit; post opus merces operes; রামমোহনের ইংরেজি অনুবাদঃ (" ... from the elements the seven divisions of the world, where on ceremonial rites with their consequences are brought forth.")। উভয় অনুবাদকই মূলের 'অমৃতম্' বিশেষণটি বর্জন করেছেন। এখানে এই বিশেষণের দ্বারা কর্মফলের দীর্ঘস্থায়িত্বের কথা বলা হয়েছে যা এর উপর শাংকর ভাষ্য পড়লে পরিষ্কার হয় (যাবৎ কর্মাণি কল্পকোটি শতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্)। দ্যু পেরোঁও এর কোনও অনুবাদ দেননি, post opus merces operis অর্থাৎ 'কর্মের পরে কর্মফল ক্রিয়াশীল হয়'—এটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। বুর্নুফের এই মন্তব্যে যুক্তি আছে যে এই কর্মফলের দীর্ঘস্থায়িত্বের উপরই ভারতীয় জন্মান্তরবাদের ভিত্তি, সুতরাং 'অমৃত' বিশেষণটি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণও। রামমোহনের বঙ্গানুবাদ যদি তিনি

দেখতে পেতেন তাহলে জানতে পারতেন যে সেখানে রামমোহন বিশেষণটি বাদ দেননি ("... ঐ কর্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়")।

তেমনি মুণ্ডকোপনিষদের (১ ২.৭) 'অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ সম্পর্কে বুর্নুফের মৃদু আপত্তি এই ছিল, কেন রামমোহন শাংকবভাষ্য অনুসবণ করে যজ্ঞেব এই অষ্টাদশ অঙ্গের (অর্থাৎ যোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও তাঁব পত্নী) একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলেন না। বাংলা বা ইংরেজি কোনও অনুবাদে রামমোহন এটা অবশ্য করেননি। হয়তো কর্মকাণ্ডের এই খুঁটিনাটি বিবৃত করা তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। দ্রষ্টব্য, এই প্রসঙ্গে বুর্নুফ শাংকরভাষ্যের যে পাঠ উদ্ধৃত করেছেন 'অষ্টাদশ সংখ্যাঃ কাঃ যোড়শর্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ', তাতে একটু লিপিকরপ্রমাদ আছে— প্রথম দুটি শব্দ একত্র হয়ে 'অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ' হবে।

৩৬. বেদ ও অবেস্তার পারস্পবিক ভাষাগত অন্তরঙ্গ যোগাযোগের এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সারগর্ভ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Batakrishna Ghosh ***Linguistic Introduction to Sanskrit***, pp. 26-47।

৩৭. দ্রষ্টব্য G. Pauthier, *Memoire sur l'origine et la propagation de la doctrine du Tao, Paris,* 1831, pp. 53-79; উল্লেখটির জন্য বর্তমান লেখক অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নিকট ঋণী।

৩৮. খ্রিস্টীয় সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে বুনুর্ফের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। নির্বিশেষ বিমূর্ত ব্রহ্মসত্তায় ব্যক্তিসত্তার চিরবিলুপ্তিই জীবাত্মার চরম পরিণতি, এমন সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী খ্রিস্টানের পক্ষে ভীতির বস্তু।

৩৯. শংকর শাস্ত্রীর পত্রখানির তারিখ ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৬; এখানি ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সংখ্যা *Madras Courier*-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

৪০. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এই দুটি শ্লোকের উল্লেখ বামমোহন দ্বিতীয়বার করেছেন তাঁর 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) নামক এক পাতড়ায়। উপাসনায় সংগীত ব্যবহারের জন্য কেবল মাদ্রাজের শংকরশাস্ত্রী নন, কলকাতায় তাঁর প্রতিপক্ষগণও তাঁর উপর যথেষ্ট কটাক্ষ করেন। 'প্রার্থনাপত্র' নামক রচনাটিতে তিনি উত্তরে দশনামা সন্ন্যাসীদের অনেক গোষ্ঠী গুরু নানকের সম্প্রদায়, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বীদের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন "ভাষাবাক্যই তাঁহাদের উপদেশের দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে।" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (৩।১১৪-১৫)-এর উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় এই:

"ঋগ্‌গাথা পাণিকাদক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ।
গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষ সংজ্ঞিতম্।।
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি।।"

লক্ষ্য করবার বিষয় ঋগ্‌গাথার পাশাপাশি পাণিকা ও দক্ষবিহিতা নামক দুই শ্রেণীর অবৈদিক গীতিকে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে 'ব্রহ্মগীতিকা' বা ব্রহ্মবিষয়ক গান বলা হয়েছে। এর সঙ্গে রামমোহন

কর্তৃক প্রচলিত 'ব্রহ্মসংগীত' অভিধার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৪১. বাংলা 'বেদান্তচন্দ্রিকা'-র (১৮১৭) রচয়িতা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯); বইটির সঙ্গে এর ইংরেজি অনুবাদও *An Apology for the present state of Hindoo Worship* নামে যুক্ত ছিল। অনুবাদক জনৈক ইংরেজ।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনা : পুনর্মূল্যায়ন

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

নিছক বিনোদন ছাড়াও যে-কোনো শিল্পকর্মেরই পাঠক শ্রোতা ও দ্রষ্টা-সাপেক্ষ বোধগম্যতার একটা দিক আছে বলে মনে করি। এই বোধগম্যতার মধ্যে সৃষ্টিবিশেষের পরিপ্রেক্ষিত, নিজস্ব অর্থগৌরব ও প্রকাশদক্ষতা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত। এমন রচনা থাকতেই পারে, যার পরিপ্রেক্ষিত, ভাব বা অর্থগৌরব তেমন মূল্যবান বা প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু প্রকাশদক্ষতা আছে; আর তাতেই তার বিনোদন-মূল্য। সেক্ষেত্রে 'বিনোদন' শব্দটিকে একটু হালকা অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে সাহিত্য বা শিল্পবস্তু বোধগম্য করতে গেলে তার পরিপ্রেক্ষিত এবং ভাবগৌরবটিকে যে খুঁটিয়ে বা তলিয়ে বুঝতে হয় তা আমরা মানতে বাধ্য। অবশ্যই কবিতার ক্ষেত্রে এই বোধগম্যতা পাঠকের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, কারণ তার অনেকটাই আকারে-ইঙ্গিতে, প্রতীক-প্রতিমায় প্রকাশ পায়। কিন্তু গদ্যরচনা তুলনায় অনেকটা বেশি আয়ত্তের মধ্যে থাকে। এবং সেদিক থেকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে তার ভাবগত বা অর্থগত গুরুত্বকে তার পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি।

আসলে সৃষ্টিমাত্রেই একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রকাশ। তাই সৃষ্টির ভেতর থেকে আমরা যদি তার সাংস্কৃতিক ধরনটিকে (cultural disposition, tone or mood) বুঝতে না পারি তাহলে তার সঠিক মূল্যায়ন কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। সাহিত্যিক মূল্যায়নের সার্থকতা আসলে একটি সৃষ্টি বা রচনাকে কেন্দ্র করে তার সাংস্কৃতিক চরিত্রটিকে ধরবার চেষ্টা। চেষ্টাটা যতখানি অগভীর হবে, সাহিত্যিক মূল্যায়নও ততখানি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উপভোগের প্রতিক্রিয়ায় যদি কেবল 'অনবদ্য', 'অপূর্ব, 'অতুলনীয়' বা 'জঘন্য' বলে যাই তো সে কোনো মূল্যায়নই নয়।

সাহিত্যিক মূল্যায়ন যে আসলে সাংস্কৃতিক চরিত্রেরই উদ্‌ঘাটন—একথা বলে বোধহয় নিজের পথটিকে দুর্গম করে ফেলছি। কেননা স্বামীজীর রচনার মধ্যে যে বিশ্ববীক্ষা আছে তা যথার্থভাবে ধরবার সাধ্য আমার নেই। এমন এক সংস্কৃতির সংকটের মুখে (স্বামীজীর ভাষায় 'সংঘর্ষ') দাঁড়িয়ে বিশ্ব ও ভারত সংস্কৃতির তুলনাত্মক ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে সে ছবিতে বিশাল ক্যানভাসটিকে বোধগম্য করে তোলা বা স্বামীজীর নিজের ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক সংকটটি স্পষ্ট করে দেখানো মুশকিল। কিছুটা আভাস দেওয়া যায় মাত্র।

কম্প্যারেটিভ লিটারেচার শাস্ত্রে inter-literariness বা আন্তঃসাহিত্যকতা বলে একটি শব্দ চলে। কোনো সাহিত্যিককে কেবল নিজের দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় না দেখে অন্যান্য সংস্কৃতিমান জাতির সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে বা একই দেশের একাধিক সংস্কৃতি থাকলে তাদেব সঙ্গে তুলনার চোখে দেখাই inter-literariness। এই তুলনাই সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করে।

মূল্যায়নে বিনয় ও ঔদার্য আনে। সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্রষ্টাও নিজেকে আরও সচেতন, সতর্ক ও প্রস্তুত করে। আর স্রষ্টার অবর্তমানে সমকালের ও ভবিষ্যতের স্রষ্টারাও ব্যাপক প্রেক্ষাপটে দাঁড়াবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা দেবার তাড়না অনুভব করতে পারে।

উনিশ শতকে দুটি সংস্কৃতির যে 'সংঘর্ষ' ঘটে তাতে অনিবার্যভাবেই একজন সমকাল-সচেতন সৃষ্টিশক্তিমান্ মানুষ নিজের সংস্কৃতির বিচারে comparatist বা তুলনা-পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা হয়ে ওঠেন। এই সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর মতো একজন উদ্দীপ্ত দ্রষ্টা লেখক হিসেবে প্রথম থেকেই comparatist। নিবেদিতা একটি প্রবন্ধে (Our Master and His Message) বলেছেন, স্বামীজীর জীবনের তিনটি সূত্র তাঁকে বুঝবার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত**, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমতের লৌকিক প্রকাশে মুগ্ধ। যেভাবেই হোক, সেই উদার মতটিকে তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতের পাশাপাশি রেখে তাঁর সর্বমানবিক ধর্মের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে উদ্যোগী। **দ্বিতীয়ত**, তাঁর সমস্ত ধারণা-শক্তির একটা বড় অংশ পাশ্চাত্য সাহিত্যের মাধ্যমে এসেছে। ইয়োরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য তাঁর মনন ও অনুভূতিকে মুগ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে নিবেদিতা শুধু সাহিত্যের কথা কেন বলেছেন জানি না (হয়তো ব্যাপক অর্থেই বলেছেন)। প্রাচীন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মজিজ্ঞাসা ও জাতিগত সভ্যতার ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে। আরও স্পষ্ট করে বলা উচিত, বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসের তিনি একজন মনোযোগী পাঠক। জাতীয় চরিত্র ও আচার ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ নজরে খুবই স্পষ্ট। শুধু পাশ্চাত্য নয়, চিন-জাপানের মতো প্রাচ্য সংস্কৃতিও তাঁর সমান আয়ত্তে। কাজেই পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মচিন্তাগুলি তাঁর নিজস্ব ধর্মচিন্তা-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। **তৃতীয়ত**, তাঁর দেশপ্রেম তাঁর মাতৃভূমির পূর্বগৌরবকে পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। স্বামীজীর সমস্ত তুলনাত্মক সংস্কৃতি-বিচারের একটাই উদ্দেশ্য। অতীতে যেমন ভারতীয় ও গ্রীক সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল, মিলন হয়েছিল আরবীয় সভ্যতার সঙ্গে ইয়োরোপীয় সভ্যতার, আসন্ন ভবিষ্যতেও নতুন পুনর্মিলনের কেন্দ্রভূমি হবে ভারতবর্ষ, এই তাঁর বিশ্বাস। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনায় স্বামীজী বলেছিলেন, "ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকাব সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারাব উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না, বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণেব যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।"

স্বামীজীর মনে এই মিশ্রণের ভয়ও ছিল: "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি না ভাসিয়া যায়। ভয় যে পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমি ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে না আত্মহারা হইয়া যায়: ভয় যে, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মুলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।"

তাই স্বামীজী সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে জনসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর ; তাহার নাশ কে করে?" আবার শুধু ঐতিহ্যকে

সামনে রেখে বাইরের দরোজা খুলে রাখলেই চলবে না। যা ভেসে যাচ্ছে তার সবই কি ফেলে দেবার মতো? তাই সতর্ক বিচারও চাই। তাই তিনি বলছেন, "যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।" কাজেই স্বামীজী যে তাড়নায় কলম ধরেছিলেন তার তিনটি মূলসূত্র ছিল। ১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটি সংস্কৃতির মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ২. ঐতিহ্যগৌরবকে সামনে রাখা ৩. পরিবর্তনের মুখে যা পরিত্যক্ত হচ্ছে তা সত্যিই পরিত্যাজ্য কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। বিচারকের বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রাখা।

তাই কোনোরকম হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে স্বামীজী দুটি সংস্কৃতির মিলন ও সামঞ্জস্য— Counterpoint বা Counterpoise যাই বলা যাক, তাই চেয়েছিলেন : 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের সংস্কৃতির সামঞ্জস্য-ঘটিত মীমাংসার জন্য উদ্বোধন "সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।"

শুধু বাংলা নয়, নিছক শাস্ত্রব্যাখ্যা ছাড়া স্বামীজীর যা কিছু রচনা আছে তার মূল্যায়নের সঠিক দৃষ্টিকোণ বোধহয় এই। একে বলা যেতে পারে তুলনাত্মক উদার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত-সচেতনতা বা Cultural Perspectivision.

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাগুলিকে বিচার কার যাক। ভাব ও ভাষার আলোচনা আগে অনেক হয়েছে। বেশ কিছু ভালো আলোচনাও আছে। সামগ্রিকভাবেই তাঁর রচনাগুলিকে দেখার চেষ্টা করছি।

বিবেকানন্দের সাংস্কৃতিক ঔদার্যের মধ্যে এক বড় গুণ ছিল তাঁর রসবোধ। তীব্র ব্যঙ্গ তাঁর রচনায় কমই আছে। স্বামীজীর চরিত্র যেমন, তাতে অন্তত এরকম নিরন্তর ব্যঙ্গনৈপুণ্য থাকার কথা নয়। যদি আমার নজর এড়িয়ে থাকে তাহলে তা ব্যতিক্রম বলেই ধরব। যৌবনে শাস্ত্রের মধ্যে বহুক্ষেত্রে তিনি ন্যায্যত যেমন যুক্তি খুঁজেছেন, তেমনি অকারণেও যুক্তি খুঁজেছেন। বোধহয় প্রমদা মিত্র তাঁকে পদে পদে যুক্তি খোঁজার ব্যাপারে কিছুটা নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝেছিলেন, প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যে অসঙ্গতি থাকতেই পারে, কিন্তু জীবনের আচরণের উপযোগ্য বহু সর্বজনীন সদুক্তি থেকে গেছে যেগুলির মধ্য দিয়ে দেশকাল জাতধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই কাছে টেনে নেওয়া যায়। শিকাগোতে প্রদত্ত তাঁর হিন্দুধর্মব্যাখ্যার মূলে এই দৃঢ় বিশ্বাসই কাজ করেছে। এবং যেটা বলতে চাই তা হলো, এই ঔদার্যই তার চরিত্রের ভিত্তি,—কতকটা সহজাত, কতকটা অর্জিত। 'জ্ঞানার্জন' নামে একটি রচনায় স্বামীজী বলেছিলেন "অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাব কারণ। লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।' এমনও হতে পারে, যাকে সহজাত বলছি তার পেছনে বহুদিনের ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা কাজ করছে— বিশেষ করে স্বামীজীর ক্ষেত্রে একথাটা খাঁটি সত্য।

স্বামীজীর রসবোধের মধ্যে এই বহুদর্শী মানুষটিই লুকিয়ে আছে। কবিতায় তাঁর রূপাসক্তিও আর একটি প্রমাণ। তাই মায়ার খোলস ছাড়িয়েই তিনি অনায়াসে জাত-পাত ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে রসিকতা

করতে করতেই 'পরিব্রাজক'-এর পথে এগিয়ে চলেছেন। তথাকথিত সন্ন্যাসের খোলসটি এই ঔদার্যের বলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন অনায়াসে। সংস্কৃতির সঙ্গে যিনি মৌলিকভাবে জড়িয়ে আছেন, অন্য সংস্কৃতি যাঁর কাছে নিরন্তর শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয় এবং নিজের সংস্কৃতির তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যিনি সজাগ তাঁকে তো সন্ন্যাসীর মায়ার বাঁধন ছিঁড়তেই হবে। তাই যাঁর কাছে যা স্বভাবসুন্দর তা যেমন আবেগের ভাষায় ধরা দেয় তেমনি যার মধ্যে সংস্কারদোষ থেকেই গেছে তাকে সংস্কারমুক্ত হয়ে প্রসন্ন কৌতুকে দেখাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নয় তো বটেই, কারণ, ইয়ার্কি—যার শুদ্ধ বাংলা খুঁজে লাভ নেই-- সেই ইয়ার্কিও তাঁকে উচুঁদরের নিরাসক্ত-রসিক শিল্পী করে তুলেছে। তাই সন্ন্যাসের প্রথাগত ধারণাটি না ছাড়লে বিবেকানন্দকে পাওয়া যাবে না।

আপাতত কিছু উদাহরণ দিয়ে সেই মুক্ত মনটিকে ধরা যাক। সাধু চলতি মিশিয়ে সুস্বাদু গুরুচণ্ডালি জগাখিচুড়ি ভাষাতেও সমসাময়িক ভাষাগত বিধিনিষেধ কাটিয়ে অনর্গল হয়ে ওঠার যে চেষ্টা তাঁর রচনায় দেখি তা সাংস্কৃতিক ঔদার্যের একটি দিক। 'পরিব্রাজক'-এর ভূমিকায় বলেছেন, 'ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথায় পাই বলো।' একটু পরেই বলছেন, 'আমিও যে একেবারে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি ; তোমরাও খোঁটাখুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো।' পাঠক লক্ষ করবেন খোঁটাখুঁটি ছেড়ে দিয়ে— এই শব্দগুলির ওপর। যাদের জন্যে লেখা তাদের স্বভাবে ফিরতে বলছেন। যার ভেতর শিল্পী লুকিয়ে আছে সেই একথা অম্লানবদনে বলতে পারে। অন্যের ভেতরকার রসবোধকে সে টেনে আনতে চায়।

পরিব্রাজক-এ 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' অধ্যায়ে দেখছি— মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামীজীকে আগের বারের মতো গঙ্গাজল পাঠিয়েছেন বড় পাত্রে। স্বামীজী বলেছেন 'বৃহৎ বদনাকার কমণ্ডলু'। রাতে জাহাজ দুলছে। কাজেই বড় কমণ্ডলুর জলও দুলছে। স্বামীজী বলছেন, 'সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তবস্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় করো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ওই যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু ; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে,... ওরা হচ্ছে আসল মেথর, লালবেগের চেলা। যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ি পাঠাব ; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ির দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা— ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।"

আমাদের দেশের গঙ্গাজল সম্পর্কে যে ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার তাকে নিয়েই সন্ন্যাসীর এই ঠাট্টা উত্তর ভারতের কোনো সন্ন্যাসী-লেখক করতে পেরেছেন বলে তো আমার জানা নেই। তাছাড়া এই ঠাট্টা নিজেকে নিয়েও। কারণ এ সংস্কার তাঁর নিজেরও ছিল। আগের বার বিদেশযাত্রায় গঙ্গাজল সঙ্গে ছিল। "বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই ইয়োরোপীয় জনস্রোত,

বিলাসক্ষেত্র, প্যারিস লন্ডন নিউইয়র্ক বার্লিন রোম সব লোপ হয়ে যেতো। আর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হতো গঙ্গার গর্জন "হর হর হর"।" তাহলে এ ঠাট্টা নিজেকে নিয়েও। সংস্কৃতির নানা প্রেক্ষাপট যাঁর দেখা তাঁর পক্ষেই এই আত্মকৌতুক সম্ভব। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষেও কি? সাধারণভাবে না। তবে সংস্কারমুক্ত স্বামীজীর পক্ষেই তা সম্ভব। স্রষ্টা ও শিল্পী বলেই তিনি সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। এই মুক্তমনের কৌতুকরসিকতা তাঁর সমস্ত বাংলা রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচনার উপভোগ্যতার একটা বড় কারণ এই রসবোধ।

আবার অন্যদিকে মাতৃভূমির গর্বে যেন তিনি ফেটে পড়েন। সারা বিশ্ব-ঘোরা সৌন্দর্যমুগ্ধ এই সন্ন্যাসীর মনের কোণে মাতৃভূমির একটা সৌন্দর্যপ্রতিমা তো জ্বলজ্বল করছেই! রূপের এই ছবি তাঁর কবিতাতেও আছে। সে প্রসঙ্গে পরে বলছি। এখন তাঁর ভাষায় সেই মাতৃভূমির প্রকৃতিকে দেখুন। কিন্তু তার আগে তাঁর মন্তব্যটি শোনার মতো। "আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন, ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোকে বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে?"

বোঝা যাচ্ছে, সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসেও যখন তার নিজের দেশের প্রকৃতি অবধারিত ভাবে তাঁর চোখে মায়াঞ্জন লাগাচ্ছে তখন বুঝতে হবে, বিশ্ব-চালচিত্রের মাঝে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক রূপটিও স্বামীজীর চোখে মোহ জাগায়। কিন্তু তুলনা এখানেও আছে : "এই অনন্ত শস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতী মাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ কিছু আছে মালয়ালমে (মালবারে)। আর কিছু কাশ্মীরে।" তারপরেই বলছেন, "জলে কি আর রূপ নাই?" জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুপাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ— এতে কি রূপ নাই?"

রূপের গঙ্গার ছবি, বিদেশ থেকে যখন ডায়মণ্ডহারবার দিয়ে জাহাজ ঢোকে তখনকার বাংলাদেশের ছবি: "সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল-পাতাই পাতা- গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে— যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানি গাল্‌চে-দুলচে কোথাও হার মেনে যায়।"

দু'চারটি লাইন বাদেই লিখছেন : "আবার পায়ের নীচে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি — যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"

তারপর ঠিক রোম্যান্টিক কবির ধাঁচে শিল্পায়নের আসন্ন আবির্ভাবে যে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে না সেই আশঙ্কা থেকেই বলছেন, "হুঁ, বলি— এই বেলা এ গঙ্গা মা-র শোভা দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে।"

মাতৃভূমির এমন প্রাকৃতিক রূপ, এমন সকাল, গাছপালা সমুদ্রের রঙের বাহারওয়ালা মধ্য-

প্রাচ্যের গালচে-হার মানানো সবুজ ঘাসের কার্পেট. এমন পায়ের নীচে থেকেই মাথাব ওপর পর্যন্ত এক রেখায় রঙের বৈচিত্র্য যেন মায়ের কোল পাওয়ার নেশা, তার সঙ্গে রঙ-পাগল পতঙ্গ-মৌমাছির তুলনা চলে। আবার শতাব্দী-সন্ধিক্ষণে যে কলকারখানার উদ্‌গম আকাশ-সীমাকে ঢেকে দেবার আশঙ্কা—সব মিলিয়ে এক শিল্পীকেই পাই, যার হাতে ঠিক যেন অবনঠাকুরের তুলির জোড়া মিলেছে।

যাই হোক, এর পরেই গঙ্গাকে বঙ্গোপসাগরের মুখে পেছন-ফিরে দেখা। ভাষায় কখনো তালধ্বনির প্রাবল্য, কখনো স্নিগ্ধ-নির্ঘোষ, খানিকটা যেন বঙ্কিমী ঢঙে। এর সঙ্গে চলতি সাধু ক্রিয়াপদ অনায়াসে মিশে যাচ্ছে। তার‌পরেই দোদুল্যমান জাহাজের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াব ছবি--বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকে ভরা : 'জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দু'হাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছে।'

এছাড়া 'পরিব্রাজকে'র যেটা বিশেষগুণ তা হলো অসম্ভব পর্যবেক্ষণশক্তি ও তথ্যগত কৌতূহল—যে কোনো বিষয়ে। গঙ্গা-হুগলি নদীর পুরোনো জলধারার ইতিহাস। টালিনালা, আদিগঙ্গা, কবিকঙ্কণের নায়কের সিংহলযাত্রার পথ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রামের পুরনো ঐশ্বর্য, পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসিদের আসা-যাওয়া। গঙ্গা হুগলি যতটা নাব্যতা হারায় ততটাই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি দক্ষিণে নেমে আসে। কবে কোন চড়ায় ঠেকে মালবোঝাই জাহাজগুলি বিপদ এড়িয়ে কখন সাগরে পড়া গেছে তখন তুরীয়ানন্দ হাঁফ ছেড়ে বলে ফেলেছিলেন 'পাঁটা মানত করা উচিত সাধে?' স্বামীজী বললেন 'একদিন কেন, প্রত্যহ।' তাতে সুবিধে এই, কলকাতার ছেলে স্বামীজীর পেটে গঙ্গাজল আছে বলে রোজই এক একটি পাঁটার গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে। এক কলকাতার ছেলে গঙ্গাহীন দেশের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খাবার আগে অজান্তে শ্বশুরের অস্থি মেশানো দুধ খেয়ে কবে-মরে-যাওয়া শ্বশুরের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়েছেন বলে চারদিকে ঢাক ঢোল বেজে উঠেছিল। কাজেই সেই যুক্তিতে—পাঁটার গঙ্গাপ্রাপ্তির যুক্তিতে—রোজই পাঁটা জুটবে। তুভায়াকে এ গল্প বলে রসিকতাটা মাঠেই মারা যায় : 'ভায়া যে গম্ভীর প্রকৃতি—বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল বোঝা গেল না।'

মাঝে মাঝে এমন গল্প আছে বলেই জাহাজে যাবার সূত্রে জলযানের ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে শ্রীমন্ত সদাগরের সাগর-পার-হওয়া থেকে শুরু করে চাটগেঁয়ে বাঙাল মাঝিদের গল্প, আধুনিক বাণিজ্যপোতের পত্তন, জাহাজী যুদ্ধ—কতো কী আছে। আছে কালা আদমিদের এমিগ্রান্ট অফিসের সার্টিফিকেট ছাড়া বিদেশ যেতে না দেবার আইন (কুলি কেনা-বেচা বন্ধ করার জন্যে)। সেই আইনই কাজে লাগানো হচ্ছে প্লেগ ছড়াবার ভয়ে। নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ যতই থাক, সাহেবদের কাছে সবাই আমরা একজাত—'নেটিভ'। অন্তত সরকারি কৃপায় সব নেটিভের সঙ্গে একত্ব বোধ করা গেছে। নিজেদেরই ব্যঙ্গ করে বলেছেন : 'দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ-রাজা নাকি মাথায় করে নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ। পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত। ধন্য ইংরেজ সরকার। তোমার তখৎ তাজ অচল রাজধানী হউক।' এইরকম জাতীয় অবমাননার অজস্র উদাহরণ 'পরিব্রাজক'-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। আর সেই আত্মাবমাননা থেকেই মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর

উদ্দেশে : 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক।'

কখনো ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যায় ও দর্শনচিন্তায় বড় বড় দক্ষিণী পণ্ডিতদের কথা, কখনো আধুনিক ভারতের নির্লজ্জ জাতিভেদ, ইংরেজ শাসকদের শক্তিমত্তা সত্ত্বেও তাদের ঔপনিবেশিক অত্যাচার, সবই পাশাপাশি চলেছে। এদের রেডসি, সুয়েজখাল, যেদিক দিয়েই জাহাজ চলেছে, সেখানকার প্রাচীন সভ্যতা, ধর্মাচরণ, ভারতীয়দের সঙ্গে প্রয়োজনমতো সেইসব সভ্যতাধর্মের তুলনা 'পরিব্রাজক'-এর ভ্রমণকাহিনীকে খুবই উপভোগ্য করে তুলেছে। বিচিত্র সভ্যতার টানাপোড়েনে ভারতীয় সম্পদের বিদেশী কদরের পেছনে যে আমাদেরই শ্রমজীবী 'ছোট জাত'-এর পরিশ্রম তার কোনো দামই নেই। শুধু 'বর্তমানভারত' বইটিতে নয়, অন্যত্র বহু জায়গায় স্বামীজী বিদেশী জাতির আধিপত্য ও ঐশ্বর্যের পেছনে ভারতীয় সম্পদসৃষ্টিকারী শ্রমজীবীদের কাছে নতমস্তক হয়েছেন। ভূমধ্যসাগর থেকেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসটি গল্পের মতো বলে চলেছেন। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর থেকে কীভাবে ইসলাম ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার ঘটলো, বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির প্রচার হলো, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো, কীভাবে ধর্মনীতি জাতিতত্ত্ব নিয়ে বইপত্তর লেখা হলো, এবং ওদের তুলনায় আমাদের বাংলা ভাষায় তেমন কিছুই লেখা হলো না-- এসব সুখদুঃখ বা আক্ষেপের কথাই বলতে বলতে ভ্রমণ চলছে। ভারতের দারিদ্র্য ও বিদ্যাচর্চার অভাব কীভাবে তার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্যে স্বামীজীর তো আক্ষেপের শেষ নেই। ইয়োরোপের থিয়েটার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বিখ্যাত গায়িকা, সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহাসিক (জুল নোওযা) ও ক্যাথলিক পণ্ডিত-পাদ্রী ইত্যাদিদের সংস্পর্শে এসেছেন স্বামীজি। ফ্রান্স্, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়ে যেমন তিনি মুগ্ধ তেমনি এই সভ্যতার বৈপরীত্য দেখেও আশঙ্কিত। ইয়োরোপীয় সভ্যতার উন্নতিতে তার শহর জনপদ, বিশেষ করে প্যারিস যেমন স্বর্গের অমরাবতী হয়ে উঠেছে, তেমনি এই সভ্যতার অন্তর্লীন ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত স্বামীজীর মনে বিষণ্ণতাই জাগিয়েছে। তা ছাড়া ইয়োবোপের জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিদ্বেষই যে তার ঐতিহাসিক পরিচয় এটা ভাবলেও খারাপ লাগে। এক ইংল্যান্ড ছাড়া সমস্ত ইয়োরোপময় কনস্ক্রিপশন। তবু, স্বামীজী বলছেন, 'স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক, পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভালো কাজও করতে ইচ্ছা যায় না।'

যে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা positional objectivity থেকে পরিব্রাজকের এই ভ্রমণ তা হলো এক শোষিত ঐতিহ্যাবস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিতে সংস্কৃতির তুলনা-বিচার থাকা তো খুবই স্বাভাবিক, আক্ষেপ থাকাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কোথাও হীনমন্যতা নেই। মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনা দিয়ে শুরু, তারপর জাহাজ যতো এগোয় বক্তার সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা পাঠে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গভীর ও ব্যাপক হয়ে আসে। বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকরসিক 'তথাকথিত' এক সন্ন্যাসী পাশ্চাত্য সমাজ-সভ্যতার শিল্প-সংস্কৃতি দেখে কেবল এক স্বাধীনচিত্ত জাগ্রত ঐতিহ্যসচেতন স্বদেশের কথাই ভেবেছেন। এই সাংস্কৃতিক জাগৃতি-স্পৃহাই 'পরিব্রাজক'-এর সব চেয়ে বড় সাহিত্যিক মূল্য। সাধু-চলতি মেশানো দ্রুতগতিশীল ভাষা, মানবিক চরিত্রজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির বৈশ্বিক জ্ঞান সেই সাহিত্যিক মূল্যকে অনেকখানি বাড়িয়েছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামেই স্পষ্ট যে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দুটি সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনা। পরিব্রাজক-এর প্রথম পরিচয় থেকে যেমন মূল উদ্দেশ্যটা বেরিয়ে আসে এখানেও তাই। 'পরিব্রাজক' উদ্বোধন-এর প্রথম বর্ষ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্বিতীয় বর্ষ থেকে। কাজেই প্রায় একই সময় একই মানসিকতা দুটি সংস্কৃতির বিচার করছে। পরিব্রাজক যেহেতু ভ্রমণকাহিনী, সেইজন্য পারিপার্শ্বিক চলমান ছবিতে নানা দেশের নানা সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠছে। ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ধর্মনীতি রাজনীতি-- নানা দেশের যে সব প্রসঙ্গ উঠছে তাতে সামগ্রিকভাবে সভ্যতার ইতিহাসটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার ওপর আছে মানুষের সম্পর্কে। সঙ্গীত ও ভাষা থেকে শুরু করে বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত ক্যাথলিক পেয়র হিয়াসান্থ ও তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত। চরিত্র-বৈচিত্র্য পরিব্রাজক-এর আকর্ষণের একটা বড় কারণ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সে তুলনায় কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা বলে বেশ কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির হওয়ারই কথা। কিন্তু কমা সেমিকোলন-খচিত বড় বড় ধীরগতির বাক্য, এক-একটি ছোট বড় বিশেষণ (যেন চরিত্রদ্যোতক এক একটি imagery) পর্যবেক্ষণশক্তির এক একটি সংহত রূপ যার নিখুঁত প্যারাগ্রাফিং বা অনুচ্ছেদ-সৃজনের মধ্য দিয়ে দুটি সংস্কৃতির মুখোমুখি নাটকীয় উপস্থাপনা—বিষয়ভিত্তিক সমগ্র আলোচনাটিকে নাটকীয় কৌতূহলে আকর্ষক করে তুলেছে।

প্রথমেই গুরুগম্ভীর চালে বহির্দৃষ্টিতে ইয়োরোপ ও ভারতের ছবি। ভারতের ছবিতে বৈপরীত্য—উচ্ছ্বাসময়ী নদী উপবন ও মর্মর প্রাসাদের পাশেই 'ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছদে' দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটিরকুল'। 'শীর্ণদেহ নরনারী ও সমশরীর গো-মহিষ বলদ' এবং চারদিকের আবর্জনায় বর্তমান ভারত খুবই স্পষ্ট। তৃপ্তি আর অতৃপ্তির মধ্যে ব্যবধানের ছবি। বিদেশীরাও এই কুসংস্কারপূর্ণ রোগ-শোকের কুরুক্ষেত্রের মধ্যে মোক্ষপরায়ণ যোগীকেই দেখেছে।

আবার ভারতীয়রাও ইয়োরোপীয়দেব হিংস্র, দেহাত্মবাদী, কামোন্মত্ত, সুরাসক্ত, পরধনলোভী শোষক হিসাবেই দেখে। স্বামীজী বলছেন, উভয় পক্ষেরই এটা বহির্দৃষ্টি। কেউ কারো ভেতরটা দেখে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, বিদেশীরাও আমাদের 'কালো দাস' বলে ঘৃণা করে। দু'দেশের এই সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ব্যবধানের 'সংকট' তৈরি করেছে। তাই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দুঃখদারিদ্র্য উৎপাতের মধ্যে একটা 'জাতীয় ভাব' এখনও নষ্ট হয়নি। ইয়োরোপীয়দেরও একটা প্রবল 'জাতীয় ভাব' আছে। এবং তাও খুবই প্রবল। কিন্তু অনেক অধঃপতন হলেও আমাদের শাক্তধর্ম শিবকালী রূপে নানা দেশে ছড়িয়েছে। সেই প্রাণশক্তি এখন সুপ্ত, কিন্তু 'ছিল'। তাই সংস্কৃতির তুলনাটাকে স্বামীজী 'ধর্ম ও মোক্ষ' 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' 'শরীর ও জাতিতত্ত্ব' 'পোশাক ও ফ্যাশন' 'পরিচ্ছন্নতা' 'আহার ও পানীয়', 'বেশভূষা', 'রীতিনীতি', 'পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা', 'ইউরোপের নবজন্ম' 'পারি ও ফ্রান্স', 'পরিণামবাদ' 'সমাজের ক্রমবিকাশ', 'দেবতা ও অসুর', 'দুইজাতির সংঘাত' 'তাতার জাতি', 'উভয় সভ্যতার তুলনা'—এই কটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছেন।

তুলনার মধ্যে পরিব্রাজক-এ যেমন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটিতেও তেমনি, কোথাও হীনমন্যতাও নেই। পাশ্চাত্যের লক্ষ ধর্ম, প্রাচ্যের মোক্ষ। ধর্ম, ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম 'ক্রিয়ামূলক' ! ধর্ম মানুষকে দিয়ে সুখ খোঁজাচ্ছে। সুখের জন্যে খাটাচ্ছে। আর মোক্ষ হলো ইহলোকের সুখকে যেমন গোলামি মনে করা, পরলোককেও তাই। বৌদ্ধযুগে

মোক্ষই প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম অনাদৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মের চেয়ে মোক্ষ বড় হলেও বিবেকানন্দের মতে ধর্মের আচরণ আগে করা চাই ; বীর্য প্রকাশ করো, সামদান ভেদ দণ্ড নীতি প্রকাশ করো। পৃথিবী ভোগ করো। তবে তুমি ধার্মিক।' বোঝাই যায়, পরাধীন, বিদেশী-পদলেহনকারী দাসত্বে অভ্যস্ত দেশে স্বামীজী ধর্মের এই উদ্যোগ ও বীর্যের দিকটাকেই বড় করে দেখতে চাইছেন। মোক্ষের দিকটা নয়। এইটাকেই বলতে হবে স্বামীজীর এই তুলনামূলক সংস্কৃতির অলোচনার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত (positional objectivity)। আর এই দৃষ্টিকোণে তো পাশ্চাত্যের কাছে শেখবার আছেই। উদ্যোগে, প্রসারে, বীর্যে, বলবত্তায় তো আমরা পেছিয়ে গেছি। স্বামীজী তো নিজস্ব ভঙ্গিতেই বলেছেন, 'মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে, ও-সব বাকি আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্‌বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।' এই হলো স্বামীজির ক্রিয়ামূলক ধর্ম। আর সে জন্যে যদি প্রাণশক্তির প্রয়োজন হয় তো পরের কাছ থেকে শিখতেই হবে। আবার স্বামীজীর কথাতেই বলতে হয়। 'আর এক কথা বোঝো দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে।...তবে দেখ, জিনিসটা আমাদের ঢঙে ঢেলে নিতে হবে।' এই মাত্র। আর আসলটা সর্বদা 'বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।' ('স্বধর্ম বা জাতিধর্ম')

আগে উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয় ধরে ধরে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশচাত্যের তুলনা করেছেন। তুলনার লক্ষ্য এই নয় যে, নিজেদের ছোট করা। প্রাচ্যের জাতিগত চরিত্রগত আচার আচরণ পোশাক পরিচ্ছদ খাওয়া-দাওয়া স্বাস্থ্যসচেতনতা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ সবই স্বামীজীর আলোচনায় এসেছে। নির্মম নিরাসক্তির সঙ্গে স্বামীজী দুটি সংস্কৃতিরই প্রশংসা ও নিন্দা করেছেন-- অবশ্যই রুচি প্রয়োজন ও ঔচিত্য অনুযায়ী। আতিশয্য মাত্রেই নিন্দনীয় হয়েছে তাঁর কাছে। জীবনাচরণে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য যেখানেই দেখেছেন তাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করেছেন। আবার দু'পক্ষের আতিশয্য দেখে একটি আদর্শ আচরণের কথাও বলেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইটি অনেকেই আমরা পড়েছি। ছাত্রাবস্থাতে থেকেই বইটির অংশবিশেষ পাঠ্যও ছিল। তবু স্বামীজীর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে গিয়ে একটু উদ্ধৃতি দিতেই হয়। আমাদের উদ্দেশ্য স্বামীজীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করার সহজাত ক্ষমতাটিকে লক্ষ করা। নির্মোহ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁর সংস্কারমুক্ত বিস্ময়কর অম্লানবদন উচ্চারণ এবং প্রয়োজনমতো ঔচিত্যরেখাটিকে টেনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্যরকমের। পারি ও ফ্রাঁস-অধ্যায়ে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, 'অবিবাহিতা মেয়ে এ দেশে (ফ্রানসে) আমাদের দেশের মতো সুরক্ষিতা। তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বে-র পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে। বে-থা মায়ে বাপে দেয় আমাদের মতো। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনো বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে-পুজো-সর্বত্র নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ। অন্ধকার দেশে বাস করে, সদানিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটার হলে আর দোষ নেই। আর এ কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে। তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না। আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।'

এইসব পর্যবেক্ষণ করতে করতে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন:

'এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে। সেইখানটা হতে সে-জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে।

আমাদের চোখে, এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা --এ দুই ভুল।'

তবু যেহেতু জীবনের সুস্থ সুরুচিকর ভারসাম্যময় একটা 'আদর্শ' তুলনা থেকেই বেরিয়ে আসে সেই আদর্শ— সেই মধ্যপন্থাটিকে দুটি সংস্কৃতির প্রচলিত আচার-সংস্কারের বিচার-বিবেচনায় স্পষ্ট রাখতেই হয়। 'পরিচ্ছন্নতা' অধ্যায়ে স্বামীজী বলছেন,

'হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যাতা হোক! ('তেল চিটে ময়লা') বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হ'ল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ। তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হ'ল। হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর-- দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নীচে — টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।'

এমন অবস্থায় একটা ঔচিত্যবোধ বা আদর্শের কথাই স্বামীজীর মনে হয়েছে:

'চাই কি? --পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা--সব চাই। কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাট পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই-- আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ। আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া-- সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখনো ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না. দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া--কার দোষ? আমাদের দেখ। আমরা মহা অনাচারী!'

শেষ ধমকটি হয়তো নিজেদেরই দিচ্ছেন, তবু 'পবিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা' আর 'সব রকমে পরিষ্কার হওয়া' দু'জাতের উদ্দেশ্যেই বলা। এই ঔচিত্যবোধ স্বামীজীর সদাজাগ্রত। আর একটা ব্যাপারেও তিনি সচেতন। সেটা হলো ইয়োরোপের চোখে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা। আর্যরা ভারতে এসে আদিম অধিবাসীদের (স্বামীজীর ভাষায় 'বুনোদেব') মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করছে। এ মিথ্যা ব্যাখ্যা ও প্রচার চারদিকে চলছে। ইতিহাস প্রমাণ করে, নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়-সমুদ্রের দেশে যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা জাতের মিশ্রণে এক খিচুড়ি জাত হল পাশ্চাত্য। 'উপায় তলোয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহপারলৌকিক ভোগ।' আমাদের এই প্রাচ্য নদনদীপূর্ণ উষ্ণ সমতলভূমি। এখানেও নানাজাতের মিশ্রণ। এখানে বর্ণাশ্রম ছিল মূল কথা। তাতে অন্তত ইয়োরোপীয়দের মতো আত্মরক্ষার জন্যে, ধর্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ হতো না। কিন্তু আর্যেরা মেরেধরে 'বুনোদের' তাড়িয়েছে'— এ কথার প্রমাণ নেই। লড়াই হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিতাড়িত হয়নি কেউই।

অন্যদিকে ইয়োরোপীয়রা যদি নিজেদের আর্য মনে করে থাকে তাহলে ইতিহাসের এমন সাক্ষ্য কি আছে যে তারা কোথাও অবনত জাতিকে তুলেছে? বরং দুর্বল জাতিকে তারা বিনষ্ট করেছে। প্রমাণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ আর আফ্রিকা। * আর্যরা এই

* বিবেকানন্দের সমকালে এবং একটু পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একই রকম বিষোদ্গার করা হয়েছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি:
'অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।' —সফলতার সদুপায়, চৈত্র ১৩১১। আত্মশক্তি।

পাশবিক কাজ কখনো করেননি। স্বামীজী বলছেন 'স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করতেন তাহলে এ বর্ণাশ্রম সৃষ্টি কি হত?' বলছেন 'ইউরোপের সভ্যতার উপায় তলোয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।'

এই মুহূর্তের বাস্তব দৃষ্টিকোণে স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত তর্কসাপেক্ষ। তবু নিছক লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'বর্ণাশ্রম' সমাজের সকলকে নিয়ে, সকলের জন্যে নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী নিয়ে সহযোগিতার একটা সভ্যতর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল ঠিকই। তবে তার মধ্যে যে বিষ ছিল তা তো শূদ্র জাগরণেই প্রমাণ। কিন্তু সে প্রমাণ তিনি এই বইটিতে দেননি। সে প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইটির ইতিহাস-ব্যাখ্যায়, দিয়েছেন 'পরিব্রাজক' এর 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' এবং 'সুয়েজখালে. হাঙর শিকার' অধ্যায়ে। শ্রমজীবীদের উত্থানের জন্য উদাত্ত আহ্বানের সেই কণ্ঠস্বর পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে প্রাণিত করেছে। সে উত্থানের কাজ এখন চলছে, তাই সমাজের সর্বাধিক স্বার্থে চিরকালের আহ্বান পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক জাগরণেরই আহ্বান বলে এ যুগের মানুষের মনেও তা অগ্নিময়।

'বর্তমান ভারত' বইটিও উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই এই রচনাটিও পূর্বোক্ত দুটি রচনার সমকালেই লেখা। পূর্বোক্ত দুটি বইতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, বৈচিত্র্য ও বিচারের কথা আছে। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসকে যে এতো সংহতভাবে সামাজিক দৃষ্টিকোণে স্তরে স্তরে যুক্তি পরম্পরায় প্রকাশ করা যায়, এই স্তরবিন্যাস যে প্রয়োজনীয় তথ্যনির্ভর দৃষ্টিকোণে স্বামীজীর মানসিকতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শুধু শাসক ও শোষকেব সংঘর্ষের থিসিস-অ্যান্টিথিসিস নয়, সামাজিক শক্তির ভবকেন্দ্র যে ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে এবং সেই ভরকেন্দ্রর ভবিষ্যৎ গতিবিধি কোন দিকে—তার একটা সম্ভাব্য রূপ তিনি দিয়েছিলেন যা বাস্তবায়িত হয়েছে অনেকটাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) প্রবন্ধেও এই কাঠামোটির কথা বলেছেন এবং সেটি যে ফরাসি ঐতিহাসিক গিজোর ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস-এই পাওয়া গেছে তাও বলেছেন। দৈববলে বলীয়ান ও মন্ত্রবলে শক্তিমান্ পুরোহিতবর্গই রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন বৈদিক যুগ থেকে। দৈব বলের ওপর মানববল কী করতে পাবে? কাজেই মানববলের কেন্দ্রীভূত রাজারা ছিলেন পুরোহিতবর্গেরই অনুগ্রহপ্রার্থী। তাছাড়া অতীত বংশগৌরবের খুঁটিনাটি ও খ্যাতিবিস্তারের গাথাও পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কাজেই যাঁরা যাগযজ্ঞ করেছেন তাঁরাই পুরোহিতপ্রসাদে কীর্তিত হয়েছেন ভবিষ্যতে। ধর্মাশোকই ব্রাহ্মণ্যজগতে নামমাত্র-শেষ। পরীক্ষিৎ জন্মেজয় পুরোহিত-শক্তিতে শক্তিমান। আর নিজেদের প্রতিপত্তি বিলাসিতার জন্যে পুরোহিতদের তুষ্ট করতে হতো। আর পুরোহিত-তুষ্টি ছাড়া তো প্রতিপত্তি সম্ভব নয়। আর প্রতিপত্তির জন্যে চাই প্রজাশোষণ।

যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য-শূদ্রের গৃহে গেছেন, প্রজারাই রামচন্দ্রেব যৌবরাজ্যে অভিষেক চাইছেন, সীতার বনবাসের জন্যে গোপনে মন্ত্রণা করছেন, কিন্তু রাজ্যের কোনো ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের উচ্চবাচ্য করার প্রমাণ নেই। সম্মিলিত শক্তি একত্রিত করার উদ্যোগচেতনা

প্রজাদের ছিল না। রাজশক্তির নিয়ম-কানুন, করসংগ্রহ, যুদ্ধবিগ্রহ, বিচার দণ্ড পুরস্কার সবই ঋষি পুরোহিতের নির্দেশে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধির মাধ্যমে। রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণের স্বত্বাধিকার বা সেই ধনের আয়ব্যয়ের ওপর প্রজার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অত্যাচারী রাজাদের রাজ্যে সে যুগে সংহত প্রজাবিদ্রোহ ছিল অকল্পনীয়। প্রজাপালক বিখ্যাত রাজারা তো প্রজাদের রাজনির্ভর হতেই শিখিয়েছিলেন। গ্রীক পরিব্রাজকদের বিবরণে ছোটখাট স্বাধীনতন্ত্রের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামীণ পঞ্চায়েতেও স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু কোনো কোনো ধর্মসমাজে—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এবং বিশেষ করে নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে 'পঞ্চে'র ক্ষমতা ও সম্মান, ব্যক্তিগত অধিকার ও সমবায়শক্তি লক্ষণীয়।

বৌদ্ধযুগে পুরোহিতশক্তির অবনতি ঘটে। পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়ী ও উদাসীন। দেবতারা বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত মানবদেবতার কাছে প্রণত হয়েছে। বুদ্ধত্ব মানুষ মাত্রেরই অধিকার। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র এ যুগের নেতা নন্, নেতা চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক ইত্যাদি। এই রাজগৌরবের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির উত্থান। ব্রাহ্মণ্যশক্তিও এই সময়ে উঠে এসে রাজশক্তির সহকারী হয়েছিল। পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তিব বিবাদ মিটে গেছে ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মধর্ম ও ক্ষাত্রধর্ম দুই লুপ্ত হয়েছে। স্বার্থসংঘাতে বৌদ্ধবংশের সমূল নিধনে এই শক্তি বিভক্ত হয়েছে। যাতায়াতের বাহ্য আড়ম্বর, খোশামোদের আত্মতৃপ্তিতে অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণে দুর্বল হয়ে মুসলমান আক্রমণের 'সুলভ মৃগয়া'র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ান।

মুসলমান যুগে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত, তিনিই ধর্মগুরু। ইহুদি ও খ্রিষ্টান মুসলমানদের ততটা ঘৃণ্য নয়। কিন্তু কাফের হলেই নরকভোগ। সংস্কৃত ভাষা শুধু হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ রইল। ব্রাহ্মণ্যশক্তি শুধু রীতিনীতি পবিচালনায় আবদ্ধ হযে রইল। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যবর্তীকালে বাজপুত জাতির পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা যে বিফল হয়েছিল তারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা। মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ্র ক্ষত্রপ- দের সাম্রাজ্যবিস্তারের গৌরব পরে মুসলমান সম্রাটরা ফেরাতে পেরেছিলেন। এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র ও শিখবীরত্বে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করে তাতে পুরোহিতশক্তি বিশেষ সক্রিয় ছিল না। শিখেরা ব্রাহ্মণ চিহ্ন ছেড়ে ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বধর্মে দীক্ষিত করে।

এইভাবে ব্রিটিশ আগমনের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গ রাজশক্তির বিচ্ছিন্ন রূপটিকেই ধরে রেখেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের স্বভাবচরিত্র ভাবতবাসীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যেই আগে পুরোহিতশক্তি পরে ক্ষত্রিয় শক্তির প্রাধান্য দেখা গেছে। কিন্তু বাণিজ্যে ধনবান্ বৈশ্যশক্তি ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাতির মধ্যেই ঘটেছে। ধর্ম ও রাজশক্তির দাপটের পেছনে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যশক্তিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বণিকের মানদণ্ড সে রাত পোহালেই রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল এটাই অভিনব ব্যাপার।

পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তি যথাক্রমে বিদ্যা ও বাহুবলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি মূলত যে সর্বত্র সঞ্চারের মধ্যেই পুঞ্জীকৃত সেটা এই দুটি শক্তিই বুঝতে পারেনি। ফলে সমাজের বিরাট জনসাধারণই উপেক্ষিত হয়েছে। ধর্মের নামে বিপ্লব এসেছে। সমাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌণ। ধর্মভিত্তিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে সাধারণ মানুষ তো তটস্থ ছিল। কাজেই বৌদ্ধবিপ্লব ছাড়া নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষকে কে উদ্ধার করবে? আবার বৌদ্ধ ধর্মেও সদাচার

যখন অনাচারে পৌঁছলো এবং বিদেশী জাতির আক্রমণে ভারতীয় সমাজ বিশৃঙ্খল হলো, তখনো ঐতিহ্য উদ্ধারে চলেছে শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার মুসলমান ও ইংরেজদের আগমনে যে নতুন ধর্মতরঙ্গ এসেছিল কবীর নানক চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজের ও আর্যসমাজের উদ্ভব না হলে এই দুটি ধর্মে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যা যে বেড়ে যেতো তাতে সন্দেহ নেই।

এইভাবেই বাইরের আঘাতে আত্মরক্ষার শক্তি ঐতিহাসিক নিয়মেই জেগে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষা হয়নি। স্বামীজী বলছেন 'বিদ্যা, বুদ্ধি ধন জন বল বীর্য যা কিছু স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্চিত হয়, তা পুনর্বার সঞ্চারের জন্যই'। 'একথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।' সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নামে জনদরদী যে সব রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে ওই 'আত্মবুদ্ধি'ই ঘটেছে, আর তাতেই সর্বনাশ ঘটেছে।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত বৈশ্যশক্তিই ব্রাহ্মণের বিদ্যা কিনে নিয়েছে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশস্ত্র কলকারখানা-সবই বৈশ্যের মুদ্রাশক্তির প্রকাশ। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করতে বৈশ্যকুল সব সময়েই সচেষ্ট। আবার এও ঠিক, বৈশ্যশক্তি যেহেতু সর্বত্রগামী সেহেতু অজ্ঞ হলেও এই শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি কলাকৌশল দিয়ে সর্বত্র আনাগোনা করছে এবং এই শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীর একপ্রান্তের সংস্কৃতি-সভ্যতা বিলাস বিদ্যা অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু দোষ একই। সাধারণ মানুষ থেকে তারা সরে যাচ্ছে আর মৃত্যুবীজ সেখানেই ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে গুণগত জাতিত্বে শূদ্র এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিজ্ঞান বাণিজ্যবুদ্ধি নিয়ে যে রাজত্ব করছে, তা যদি প্রজাকল্যাণে নিয়োজিত না হয়, তাহলে ব্যবধান বাড়বে বলেই স্বামীজী মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় স্বামীজীর ধমনীযোগে সমাজ হৃৎপিণ্ডের শক্তি সঞ্চারের মৌলিক সূত্রটিকে নির্ভর করেই সমাজ-'রথের রশি'টিকে গণবাহুবলে টেনে 'কালের যাত্রা'য় এগিয়ে দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এইটিই বড় শিক্ষা। 'বর্তমান ভারত' বইটি এই অর্থেই ভবিষ্যৎ ভারতের এমন কি বিশ্ব ব্যবস্থারও ম্যানিফেস্টো। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আসছে তা যতই উদারনৈতিকতার বেশ ধরে আসুক না কেন, স্বামীজীর কথিত 'চলমান শ্মশান' কিন্তু পাশাপাশিই চলছে। কাজেই স্বামীজীর সাবধানবাণীর প্রয়োজন অবশ্যই ফুরোয়নি। এই প্রাসঙ্গিকতাই স্বামীজীর সংস্কৃতিচর্চার মূল্যকে এখনও অম্লান রেখেছে। আর এই অম্লান মূল্যেই এর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য। কেননা এই মূল্যটি আছে বলেই প্রায় শতবর্ষ আগেকার স্বামীজীর ভ্রামণিক ইতিহাসচর্চা এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একালের পাঠকের সহিতত্বে সেতুবন্ধন ঘটিয়ে দিয়েছে।

স্বামীজীর বাংলা চিঠিপত্রের কথা অবশ্যই একটু বলতে হয়। কারণ যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের যুগে তিনি এসেছেন, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সেই সংঘর্ষ সংকটের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি। যে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তিনি জীবনটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সামনে রেখে, সেই উদ্দেশ্যটি তিনি তাঁর যুগসংকট থেকেই বুঝেছিলেন। এমনকি যে ভাষায় তাঁর বাংলা রচনাগুলি লিখেছিলেন, সে ভাষামাধ্যমেই তার দ্বন্দ্ব দেখি। যে সময়ে তিনি 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'-এর রচনাগুলি লিখছেন সেগুলির মধ্যে শুধু ক্রিয়ারূপের কথা ধরলে 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুটি চলতি ভাষায় লেখা—যদিও ক্রিয়া ও অন্যান্য

পদগুলিতে মাঝে মাঝেই সাধু-চলিত মিশে গেছে। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' একেবারেই বঙ্কিমী ঢঙে লেখা। যদিও প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদে সমাসবদ্ধ বিশেষণগুলিই ক্রিয়ার কাজ করেছে—এ ভঙ্গি বঙ্কিমী নয়, সাধারণভাবে ভাষার চালটাই সাধু, স্নিগ্ধগম্ভীর, নির্ঘোষে ছোট-বড় বাক্য যেন একটু মন্থর গতিতে, কিন্তু অনর্গলভাবেই চলছে। মাঝে মাঝে স্বদেশ ও স্বজাতিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে প্রশ্নাত্মক বাক্যই যেন ঔচিত্যের সদর্থকতাকে তীব্র করে তুলেছে। তারই সঙ্গে নির্দেশের উচ্চকিত ঘোষণা যেন একজন গভীর সংবেদনশীল মানুষের প্রাণস্পর্শী আহ্বান. 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?' এই জাতীয় প্রশ্নাত্মক বাক্য যেমন বিপরীত সদর্থক অর্থে শ্লেষের মতোই বুকে বেঁধে, তেমনি 'ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই' কিংবা 'বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ইত্যাদি বাক্যের 'ভাই' সম্বোধনের বিশেষ্যগুলি বার বাব বিশেষিত হয়ে শ্লোগানের দৃঢ়তা ও মর্মস্পর্শিতা পেয়েছে। ফাঁকা বুলির শ্লোগান নয়। সেই তুলনাত্মক প্রেক্ষাপটেই একজন অভিজ্ঞ সংবেদনশীল দৃঢ়চিত্ত দুর্মর আশাবাদীর উদ্দীপ্ত শ্লোগান। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তও স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু তার স্বপ্নোচ্চারণে বিমর্ষতা মিশেছিল। এখানে বিমর্ষতার ছিটে ফোঁটাও নেই। আবার উল্টোদিকে 'পরিব্রাজক'-এর 'ইউরোপ' অধ্যায়ে দেখি, জাহাজে কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী পেয়ার হিনাসান্থ নামে এক ফরাসী পাদ্রী, যিনি সন্ন্যাস ছেড়ে এক আমেরিকান মহিলাকে 'করে ফেললেন বে'। নাম ভাঁড়িয়ে হলেন মঁসিয় লয়জন। তাঁর স্ত্রী মাদাম্ লয়জনের গল্প স্বামীজী বলছেন একেবারেই চলতি বুলিতে:

'গিন্নির ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ বৈরাগ্য সন্ন্যাসের চর্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে--সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধহয় গা কস কস করে। তার উপর মেয়েমদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে; বলে, 'ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে'!! গিন্নির কিছু বিপদ বই কি— আবার বাস হচ্ছে প্যারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ-ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ আছে কিনা। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খাবাপ। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে 'আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। আমি একজন সাধাবণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইনমত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা না হয় সাধুর সেবাদাসী হয়ে থাকতে, তাকে বে করে—গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?'

এই কলকাতার ককনিতে ভরা চলতি ভাষায় স্বামীজীর ভ্রমণ, বিবরণ ও চরিত্র-চিত্রণ একটানা চলেছে। প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা, কিংবা জাহাজ কিংবা জাহাজের লোকজন, আশপাশের দেশের ধর্মসংস্কৃতি ইতিহাসের গল্প যখন বলেন তখন অতোটা ককনির আশ্রয় নেন না। কিন্তু যেই গল্প বলতে শুরু করেন তখনই তাঁকে পুরনো কলকাতার নিজের পাড়ায় দেখতে পাই। এমন কি স্বরভঙ্গি মুখভঙ্গি হাতনাড়া পর্যন্ত যেন ভাষায় ফুটে ওঠে:

'খিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও', বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েছে।' 'ওরে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেনরে বাপু?'

'তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভালো লাগতে লাগলো। থাক্ কালা আর ধলা আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চারপো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌।' কিন্তু মজাটি দেখেছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে।'

ভাবতে একটু অবাক লাগে, এই স্বামীজীই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটির প্রথম গুরুগম্ভীর ভূমিকা-অংশটি লিখেছেন। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' প্রায় গোটা বইটিতেই গুরুগম্ভীর সাধু ভাষা। যদিও ভাষা ভেদ করে একই ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ফুটে ওঠে। আসলে এও এক ধরনের সাহিত্যিক সংকট। আমাদের দেশে উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে এই সাধু চলতির দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়েছে। তারও আগে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে মেয়েদের গৃহশিক্ষা ও সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞানচর্চা পৌঁছে দেবার চেষ্টাতেই চলতির গুরুত্ব বেড়েছে। তাছাড়া নকশা নাটক প্রহসন এবং গল্প উপন্যাসের সংলাপেও এই ভাষাগত দ্বন্দ্ব প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, স্বামীজী সকলের মধ্যেই এই সাধু-চলতির দ্বিধা আছে। বিশেষ করে যাঁরা সৃষ্টিশীল লেখক তাঁদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বেশি। বিবেকানন্দ তো একই দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী। কিন্তু জীবনাচরণের লক্ষ তো বহুজনহিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, সাধারণভাবে বিদ্যাচর্চায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। একই সংস্কৃতিতে C. P. Snow র বিখ্যাত শব্দবন্ধ 'Two Cultures'-এর ব্যবধান সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন: 'আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাই সে দ্বন্দ্ব থাকলেও বিবেকানন্দ গুরু চণ্ডালের একত্র সহাবস্থান ঘটিয়ে ভাষার প্রাণশক্তি আনতে চেয়েছেন। উদ্বোধন-সম্পাদককে তাই কলকাতা-ভিত্তিক চলতি রীতিই ভবিষ্যতের ভাষা হবে রায় দিয়েছিলেন। যদিও তিনি সাধু চলতি দুভাষারই শক্তিমান লেখক—কারণ দুভাষাতেই কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে অনর্গল গুরু-চণ্ডাল একত্র করে গেছেন তিনি। তাঁর সমজাতীয় গদ্যশিল্পীদের মধ্যে অবনঠাকুর, যিনি শুধু ছবি আঁকেন না, ছবি লেখেন, বিনয়কুমার সরকার এবং মুজতবা আলিকেই মনে পড়বে। এঁদের সকলেরই মধ্যে Sarskritisation-এর বিপরীতমুখী এক সর্বগ্রাসী কথকতার ভঙ্গি আছে—এবং সেটা এই একই সংস্কৃতির মধ্যে দুটি ভিন্ন রুচির ব্যবধান ঘোচাবার চেষ্টাতেই।

এসব সত্ত্বেও বলবো, স্বামীজীর চিঠিপত্র পড়লে গুরুচণ্ডাল সাধু চলতি—এ সব জাতপাতের পার্থক্য মনেই থাকে না। যে চিঠি লেখে আর যে চিঠি পায় দুজনের সম্পর্ক যদি আন্তরিক হয় তাহলে মানুষের যে ভাষা অন্তরের ভাব প্রকাশের বাহন তাতে ভাষার অভ্যস্ত রূপ ছাড়িয়ে মনের প্রকাশটিই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ভ্রমণকাহিনী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনাত্মক বিচার কিংবা ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক বিশ্লেষণ, এ সব দায়বদ্ধতা যখন থাকে না তখন অবশ্যই স্বামীজী মন খুলে অনেক ব্যক্তিগত কথাই বলেছেন যা 'পরিব্রাজক'-এ কিছুটা অবশ্যই আছে, কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বা 'বর্তমান ভারত'-এ নেই। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে (৭ অক্টোবর ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমরা দৈব ক্রমে প্রকাশ হই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে।' চিঠিতে মানুষের এই দৈবক্রমে প্রকাশটাই ঘটে। সেখানে লেখকের মনের ভাব আকর্ষণ করে নেবার

সহজাত ক্ষমতা প্রাপকেরও থাকে। স্বামীজীর বাংলা লেখা যা চিঠিপত্র পাওয়া যায় তাতো সবই সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু কোনো কোনো চিঠি ভাষাগত জাতপাতের কথা ভুলিয়েই দেয়। এমনি একটি চিঠির (৪ জুলাই ১৮৮৯) খানিকটা উদ্ধার করছি:

'কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবেও না— শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানা প্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোনো উপায় দেখি না। আমার মাতা ও দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ; মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু আমার পিতার বড়ই দুঃস্থ অবস্থা, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহংকারের বিকার স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।'

এই চিঠির ভাষায় বিবেকানন্দের যে ব্যক্তিগত স্টাইল নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। চলতি ভাষায় লেখাও নয়। প্রচলিত সাধু ভাষাতেই লেখা এই চিঠিটিতে 'দৈবক্রমেই' তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। চেষ্টা করে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়নি। মধ্যবিত্ত পরিবারে হঠাৎ দুর্যোগ এলে এমন অঘটন অনেকই ঘটেছে। কেবল ওই অঘটনের সময়ে বাড়ির বড় ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে কাছাকাছি থাকলে যে অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে তারই ছবি আছে এই চিঠিতে। এবং যাঁকে লেখা সেই প্রমদা মিত্র বিবেকানন্দের সঙ্গে অল্পপরিচয়ে যে পরমাত্মীয় ধর্মবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সেই আত্মীয়তাই বিবেকানন্দের এই তথাকথিত সাধু গদ্যকে অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশের বাহন করে নিয়েছে।

এইরকম আরেকটি চিঠি প্রমদা মিত্রকেই লেখা (৩ মার্চ ১৮৯০)। পওহরি বাবার কাছে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মন ভরেনি। শিক্ষার্থী হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। অথচ তিনি নিজেই যেন শিক্ষার্থী হয়ে নরেন্দ্রনাথকে কাছে পেতে চাইছেন। সুতরাং ব্যর্থ হয়ে লিখছেন, ফিরতে হবে সেই রামকৃষ্ণের কাছেই:

'তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতাও কখনও বাসেননি, ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রই জানে। বিপুল প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি— কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউক, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিযা জোর করিয়া অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপার দয়ানিধে, হে মামৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।'

কেবল ক্রিয়াপদের সাধুত্বের কথা ভেবে এবং রামকৃষ্ণের আগে দুটি বিশেষণ আর 'নরশ্রেষ্ঠ'

'বন্ধুবর' 'মনোবাঞ্ছা' ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের কথা ভেবে এই আন্তরিক প্রার্থনার ভাষাকে কি কৃত্রিম বলবো? চিঠির এই অংশটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার আধ্যাত্মিক আকৃতির যতিস্পন্দিত অনতিদীর্ঘ বাক্যগুলিব কথাই মনে পড়বে। এ ভাষা নিয়মমাফিক চলতিরীতির ভাষা নয়, কিন্তু বাক্যগুলি অকৃত্রিম অনুরাগ ও অনুভূতিরই বাহন। তাই মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের জীবনে যে গভীর সংকট এসেছিল, এই চিঠিতে তারই অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে--সাধু চণ্ডালে মেশামেশি হয়েছে কিনা এ তথ্য গৌণ। সাধু বা চলতি যাই হোক, অভ্যস্ত ভাষাতেই উদ্বেলিত-মনের মানুষ অকৃত্রিম হতে পারে।

আর একটি চিঠির কথা বলি। চিঠিটি প্রথমবার বিদেশযাত্রার (৩১মে ১৮৯৩) কয়েকদিন আগেই লেখা (২৪মে ১৮৯৩) ইন্দুমতী মিত্রকে। চিঠিতে এক মুহূর্তের মধ্যে বিবেকানন্দের অভ্যস্ত সংস্কার প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছেন:

'তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ-মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত। এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা ...'

আমার দৃঢ় ধারণা 'অপিচ' বলে বিবেকানন্দ সামলে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মনে হয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' রচনার পর বৈশ্য ও শূদ্রেবা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে—এই কথাটি লিখতেন না। চিঠিপত্রে মানুষ নরেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ পারিবারিক সংকটে, সন্ন্যাস-জীবনের বিবেক-দংশনে, শাস্ত্রচর্চায় ও যুক্তিসন্ধানে, আধ্যাত্মিক তৃপ্তির আশায়, শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গ সান্নিধ্যের তৃপ্তিতে, সংস্কারমুক্তির ঔদার্যে, বিদ্বেষমুক্ত গঠন-কার্যে ব্যাপক ও বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রসারিত ছায়া ফেলে এগিয়ে এসেছেন।

কিন্তু কবি বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এমন কি 'বর্তমান ভারত'-এর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছেন। এই রচনাগুলিব সমকালেই নিরন্তর দেশ-দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে কবিত্বের উচ্ছ্বাসে অবারিত হয়েছেন। এমন সব স্থানে তিনি ঘুরেছেন যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশ্বখ্যাতি আছে, যার পরিবেশ যে কোনো মানুষকে স্থিতধী করে, কবি-সাধকদের পক্ষে তো সেই সব স্থান Meet nurse for a poetic child। কবি হিসাবে তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অবশ্য তাঁর ইংরেজি কবিতার বিষয় আর একটু ব্যাপক।

প্রথমত, তাঁর বেশ কিছু কবিতা একাধারে সাধক এবং কবির সৃষ্টি। সাধনার যে তৃতীয় স্তরে (ecstasy) সাধক বিচরণ করেন তার সঙ্গে রোম্যান্টিক কবিদের উপলব্ধিতে পাওয়া evanescent visitation of divinity বা দিব্যতার চকিত আভাসের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু 'সুপ্তমীনো হ্রদ ইব' সাধকের নিরুদ্‌বেগ মনটিকে তো প্রকাশ করা চাই। যদি সাধক কবি হন। রূপ রস স্পর্শ গন্ধ দিয়ে শব্দেই তো প্রকাশ কবতে হবে। বিশুদ্ধ যোগাবস্থা তো সাহিত্য নয়। বিবেকানন্দের কবিতায় যে যোগাবস্থার কথা পাই তা তীব্র অনুভূতির স্পর্শেই প্রকাশিত। তাতে ছন্দের সুষম প্যাটার্ন নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। অনুভবের তীব্র তাড়নায় রূপের একটু আভাস দিয়েই পাঠককে তা নাড়া দেয়। এই তাড়নাই রূপের খুঁতগুলিকে গৌণ করে দেয়। তাঁর গদ্য যেমন একই সঙ্গে নির্মম

মায়াভেদী দৃষ্টি এবং বিশ্বসৃষ্টির মায়াঞ্জন, গভীর জীবনবোধ এবং ব্যাপক কাল ও সংস্কৃতি-চেতনা মাঝে মাঝে তীব্র গতি এনেছে, তাঁর কবিতাতেও তাই। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছে আমাদেরই ঔপনিষদিক চিন্তা—ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির প্রকাশ। কাব্যসৃষ্টির মুহূর্ত তাঁর জীবনে কমই এসেছে। কিন্তু যখন এসেছে অতল জলের আহ্বানের মতোই এসেছে। তখন সংসারের ঘর থেকে চৈতন্যের ঘরে পৌঁছে গেছেন তিনি। এ আহ্বানের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেননি, প্রস্তুতিও তাঁর নেই। দেশে বিদেশে জাহাজে মন্দিরে Angels Unawares এর মতোই তাঁকে পেয়ে বসেছে জীবন-দেবতা। লিখে ফেলেছেন কিছু আবেগ তাড়িত শব্দগুচ্ছ। কখনো সুরে ভর করে, কখনো সুর ছাড়াই। কখনো ইংরেজিতে, কখনো বাংলায়। দ্বিতীয়বার তিনি যখন ইয়োরোপ থেকে ফিরছেন (১৮৯৯), ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্ত পেরিয়ে এসেছেন, তখনই 'সৃষ্টি' নামে কবিতাটি রূপ নিয়েছে। সৃষ্টির ভেতরকার আলোড়নকে একই সঙ্গে শ্রুতি ও দৃষ্টিতে ধরতে চাইছেন:

একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরন, অতীত-আগামি-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।।
যেথা হতে বহে কারণ-ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা।
গরজি গরজি উঠে তার বারি
'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ।''

সৃষ্টির কারণ-ধারা বহে আসছে বাসনার উজ্জ্বল বেশ ধরে, আর সেই ধারাজলের তরঙ্গে অস্তিত্ব-জ্ঞানীর গর্জন ভেসে আসছে। রূপে শক্তিতে অগণ্য গতিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারার জন্ম হচ্ছে, আর সৃষ্টির ধ্বনিতে সারা আকাশ মুখরিত হচ্ছে। দশদিগন্ত জ্যোতিতে ভরে যাচ্ছে। কোটি কোটি জীবপ্রাণী উদ্‌ভাসিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সুখ দুঃখ জরা জন্ম মরণ নিয়ে। এই উদ্ভাসনশক্তি-সূর্যের মূলেই আছে সৃষ্টিশক্তি। 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' বর্ণনাতেও দেখি, স্রষ্টার মানস-আকাশে সূর্যচন্দ্র-নক্ষত্রহীন নিরালোকে ছায়ার মতো বিশ্ব ভাসমান। তার মধ্যে অহং-স্রোতের তাড়নায় রূপময় জগৎ সংসার উঠছে ভাসছে ডুবছে। তারপর হঠাৎই যেন ধারাস্রোত বন্ধ হলো। শূন্য শূন্যেই মিলিয়ে গেল—বাক্যমনের অতীতের এই সৃষ্টিমূলের দৃশ্যকলাপ যোগাবস্থায় সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু তার রূপ ফুটে ওঠে কবিরই হাতে। এই হলো যথার্থ মিস্টিকের অনুভূতি। নিউইয়র্কে লেখা (১৬মার্চ ১৮৯৫) My Play is Done কবিতাটিতে বিবেকানন্দ ছলনার স্বপ্নকে ঠেলে দিয়ে আলোর দরোজাটি খুলে দিতে চেয়েছিলেন। তিন চার বছর বাদে লেখা 'সখার প্রতি' (১৮৯৮-১৮৯৯ জানুয়ারি) কবিতায় সেই একই আকাঙ্ক্ষা। তবে তফাৎ আছে—ছলনা থেকে মুক্তির চেষ্টায়। কিন্তু মুক্তি কি শুধু 'এক'-এ লীন হওয়া? শুধুই কি break my chains and make me free? না। এ প্রবঞ্চনার জগতে হৃদয়বান প্রেমিক মানুষ যত দুঃখই পাক, প্রেমই তার সম্বল। পতঙ্গের কাছে অগ্নিশিখা আলিঙ্গনের শিক্ষাটি নিয়ে স্বার্থকে অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে প্রেমের নিখাদ সোনাটুকু নিয়ে কেবলই দিতে হবে 'বহুরূপের ব্রহ্ম'কে। 'অনন্তের তুমি অধিষ্ঠান, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান'। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় বলেছেন, মৃত্যুরূপা কালীই সত্য। 'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া'। এই উপলব্ধিই নির্মম বৈরাগ্য আনে। স্বার্থ আশা নাম যশ চূর্ণ ক'রে হৃদয়কে শ্মশান করো। তাহলে জন্মভয়, মৃত্যুভয় সব দূর হবে। যিনি সামনে রয়েছেন তিনি পরমের আড়ালে চরম। জীবন-মরণ একাকার করে সেই চরমকেই

দেখতে হবে। 'তুমি আঁখি মম তব রূপ সর্বঘটে।' এই হলো মিস্টিক কবির দৃষ্টি। ইংরিজি কবিতায় আবার এই নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে ত্যাগের শিক্ষা নিয়ে দেশব্রতে সমর্পিত হবার কথা আছে। To the Awakened India (১৮৯৮) যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এই যোগী-কবির অন্য একটি চেহারাও আছে। 'পরিব্রাজক'-এর লেখক সেই চেহারাটি অনেকখানি দেখিয়েছেন। সেখানে কোনো দিব্যানুভূতি নেই, হৃদয়কে মহাশ্মশান করে দেখার চেষ্টা নেই। আছে রূপের যন্ত্রণামুক্ত মুগ্ধতা। হতে পারে তা ক্ষণিক, কিন্তু তাতেই চিরকালের মুগ্ধতা লেগে আছে। এই মুগ্ধতার ছবি আছে 'সাগরবক্ষে' আর To an Early Violet কবিতায়। 'সাগরবক্ষে' দেখি

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
* *
ঐ আসে তুলারাশিসম।
পরক্ষণে হের মহানাগ
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম।
আর দেখ প্রণয়িযুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।
* *
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।

রূপরাগের এই জলময়তা ইন্দ্রিয়বিলাসী রোম্যাণ্টিক চেতনারই সম্পদ। তেমনি সদ্যপ্রস্ফুটিত ভায়োলেট ফুল তীব্র তুষার-ঝড়ের ঝাপ্‌টা খেয়েও তপস্যার পর্বে পর্বে বহু গন্ধসম্পদ নষ্ট করেও ধৈর্যের সঙ্গে অবধারিত শুভ্রতায় যে অপরাজিত ভঙ্গিতে সৌরভ ঢালে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' কবিতাটি মনে পড়ে) তাতে ক্লাসিকাল নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

What though thy bed be frozen earth,
Thy cloak the chilling blast;
What though no mate to cheer thy path,
They sky with gloom o'ercast;
* *
Change not thy nature, gentle bloom
Thou violet, sweet and pure,
But ever pour thy sweet perfume
Unasked, Unstinted, sure!

যে কবি রূপবন্ধনভাঙা মৃত্যুপূজারী যোগী, সে এক নিভৃত রূপকারও বটে। কিন্তু রূপভাঙার রোম্যানটিক খেয়াল আর রূপ-গড়ার ক্ল্যাসিক্যাল নিষ্ঠা—দুয়েরই সে মুগ্ধ দ্রষ্টা। একাধারে

রোম্যাণ্টিক আর ক্লাসিক বিবেকানন্দ উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ভাঙাগড়ার মূর্ত প্রতীক হয়ে আছেন।

বিবেকানন্দের ইংরিজি রচনার মধ্যে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনার ওপর জোর দেওয়া আছে যা তাঁর বাংলা রচনায় নেই। তবু মূলত তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে তিনি চরিত্রগতভাবে প্রায় সম্পূর্ণটাই আছেন। তাঁর সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় তিনি নতুন কি দিলেন? শাস্ত্রের সত্য তো তিনি না এলেও থাকতো। কিন্তু ভ্রমণের আকারেই হোক, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনাত্মক বিচারেই হোক বা ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক ব্যাখ্যাতেই হোক কিংবা কাব্যিক অনুভূতির রূপ-অরূপের দ্বান্দ্বিক প্রকাশেই হোক, তিনি তিনটি কাজ করে গেছেন। তিনি শাস্ত্রের জগতে আমাদের সকলের প্রবেশাধিকার দিয়ে গেছেন। আমাদেব শাস্ত্রের মধ্যে আধুনিক মনের উপযোগী স্বচ্ছতা (clarity) ছিল না, মূল বক্তব্যে পৌঁছোবার সোজা রাস্তাটি ছিল না (incisiveness), বিচ্ছিন্ন বক্তব্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি (coherence and unity) ছিল না। বিবেকানন্দ এ তিনটি গুণই তিনি আমাদের দিয়েছেন। তিনি নিছক পণ্ডিত নন, কিন্তু প্রচণ্ড অধিকারী। তিনি শুধু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেননি. তিনি শাস্ত্র পড়ে যা ধারণা করেছেন (realisation) তাই প্রচার করেছেন। কিন্তু কাদের জন্যে? আমাদের সকলের জন্যে। Two Cultures -এর বেড়া তিনি ভেঙে দিয়েছেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন. অন্তত বিবেকানন্দেব সময় পর্যন্ত তা খানিকটা সীমাবদ্ধই ছিল। বিবেকানন্দের প্রচারে বা preacheing-এই সে বেড়া ভেঙে গেছে। এখানেই তাঁর রচনার যথার্থ সাংস্কৃতিক মূল্য।

বাংলা কবিতা ও গিরীন্দ্রমোহিনী

শিশিরকুমার দাশ

কি বলিব লোকনিন্দা ভয়ে কাঁপে মোর অবলা পবাণ
কেমনে সবার মাঝে পশি গাব আমি জীবনের গান।

১

গত শতাব্দীতে বাংলায় মহিলা কবিদের বচনার পরিমাণ খুব সামান্য নয়। তাঁদের লেখা যে সমকালে নিতান্তই অনাদৃত ছিল এমন বলা চলে না। অনেকের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ভালোই ছিল। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের রচনা আলোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী-গুণীরা প্রশংসা করেছেন। বই ছাপার ব্যাপারে তাঁদের কোন প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে নারীর লেখা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে যে নিস্তব্ধীকরণ এবং প্রান্তিকায়নের অভিযোগ তুলেছেন নারীবাদী সমালোচকেরা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কবিদের রচনাগুলি সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে।

আমরা জানি এই লেখিকাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এঁরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও বৌ। ব্রাহ্মসমাজ কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুপরিবারের সদস্যা এঁরা। এইসব পরিবারে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এইসব পবিবারেব পুরুষরা তাঁদের কন্যা ও স্ত্রীদের লেখায় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের রচনা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অতি মূল্যবান গ্রন্থ ''বঙ্গের মহিলা কবি''-তে নারীরচনার যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তার থেকেও সঙ্গত ভাবে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে এই মহিলা কবিদের রচনাকে পুরুষ-শাসিত সাহিত্যধারা উপেক্ষা করেনি। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলার রচনার প্রকৃতি এবং তাদের সমালোচনার প্রকৃতি নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে। একটি প্রশ্ন এই যে, মহিলা কবিগণ যখন লিখেছেন, বিশেষ করে গীতিকবিতা রচনা করেছেন, তখন কি তাঁরা তাঁদের সমকালীন পুরুষ-কবিদের মতোই স্বাধীনতা বোধ করেছেন? না, সমাজ যে লিঙ্গ সংরচন করেছিল, তাঁরা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন পুরোপুরি।

আমাদের সমাজে লিঙ্গ সংরচনায় কতকগুলি ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার প্রথম, এবং প্রধানও বটে, হলো লজ্জা। লজ্জা বিশেষভাবেই নারীর ভূষণ, নারীর প্রশংসনীয় গুণ, ধর্ম। লজ্জার বোধ শারীরিক, মানসিক এবং ব্যবহারিক আচবণের মধ্যে ফুটে উঠে নারীকে পুরুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য দেবে —এটাই সামাজিক আকাঙ্ক্ষা। বিশেষ ধরনের পোষাক, বিশেষ ধরনের আচার ব্যবহার, পরিবার ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, কথাবার্তা বলা, সুর, স্বর, স্বরভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ

অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি ইত্যাদি সবই এই লজ্জাবোধের সঙ্গে জড়ানো। এই লজ্জাবোধ পুরুষের লজ্জাবোধ থেকে পৃথক। পুরুষের লজ্জা মূলত অপমান-সংকোচ-সম্ভ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তার স্বধর্ম নয়। নারীর লজ্জা মূলত চরিত্রগত, তাব স্বধর্ম। লজ্জাশীলা নারী প্রশংসনীয়। লজ্জাশীল পুরুষ ভাষাগত দিক থেকেই দুর্লক্ষ্য প্রয়োগ। লজ্জা আমাদের সংস্কৃতিতে লিঙ্গ-সংরচনার একটি বড়ো উপাদান। সেইরকমই, লিঙ্গ সংরচনার দ্বিতীয় উপাদান, 'দুর্বলতা'। এই উপাদানের ভিত্তির কিছু পরিমাণে জৈবিক সমর্থন দেবেন পুরুষতন্ত্র। অর্থাৎ শারীরিক শক্তিহীনতা নারীব প্রকৃতির নিয়ন্তা। স্বভাবতই এর মধ্যে নিহিত আছে একটি না-কারাত্মক লক্ষণ। কিন্তু আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যে এই দুর্বলতা বা বলহীনতাকে একটি মুখ্য উপাদান করে তোলা হয়েছে লিঙ্গ সংরচনায়। অবলা পরাধীনা ইত্যাদি বিশেষণগুলি নারীর সম্বন্ধে বহু বহু শতাব্দী ধরে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, এই বলহীনতা, এই পরাধীনতা (অর্থাৎ পুরুষাধীনতা) তার বিধাতা-নির্দিষ্ট অবস্থা এই বোধটাও আমাদের ঐতিহ্য অনেক পরিমাণে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই 'লজ্জা' যেমন লিঙ্গ সংরচনায় নারী-পুরুষের আচরণের স্পষ্ট ভেদরেখা তৈরি করেছে, 'দুর্বলতা' বৈধতা দিয়েছে পুরুষ-প্রভুত্বের। দুর্বলের প্রয়োজন রক্ষকের।

দুর্বলতার নানা প্রকাশ আছে। একটি হলো কান্না। বালানাং বোদনং বলম্—এই আপ্ত বাক্যটির মধ্যে একটা ব্যঙ্গ ও ঔদ্ধত্য আছে নিঃসন্দেহে। এই সঙ্গে আছে লিঙ্গ সংরচনার একটি বাচিক অভিব্যক্তি। এই কান্না, এই রোদনের ভূমিকা যেমন ইতিহাসে, তেমনই সাহিত্যে। নারীর persona- য়। পুরুষ যখন কাব্য রচনা করেছেন, বৈষ্ণব কবি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তখন একদিকে যেমন লজ্জা, অন্যদিকে ক্রন্দন-রোদন-অশ্রু হয়েছে সেই "কবি-মুখ"- এর প্রাথমিক প্রসাধন।

আমাদের সব মহিলা কবিরই কাব্যরচনা এই দুটি উপাদানের দ্বারা শাসিত; তাঁদের কাজ করতে হয়েছে এই দুটি অক্ষরেখার মধ্যে। তাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের সমস্যা—সবচেয়ে বড়ো যদি নাও হয়, প্রধান সমস্যা হলো "লজ্জা"। যে সব কথা পুরুষ বলতে পাবে, সেই কথা কি নারী বলতে পারে, কিংবা বলা উচিত? যদি সে-সব কথা নারী বলে, সাহিত্যিক জগৎ কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবে? এখন অন্তত এটুকু সবাই মেনেছেন যে লিঙ্গ হলো একটা নির্মাণ, একটা সংরচনা, চিন্তা-ভাবনা প্রসূত একটা গঠন। তার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সমাজ এবং ইতিহাসের কর্মধারাকে আমরা বুঝতে পারি। আমরা আরো জানি যে লিঙ্গ একটা সামাজিক সম্পর্ক। এমন একটা সম্পর্ক যা অন্য সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে, গড়ে নিচ্ছে। 'নারী' ও 'পুরুষ' শব্দের মধ্যেই যেন সামাজিক কর্মবিভাগের ইঙ্গিত আছে। যেন নির্দেশ আছে কাকে কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে। এমন নির্দেশ আছে কি কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও?

গত শতাব্দীতে বাংলায় যখন গীতিকবিতার জন্ম হলো তখন পেছনে ছিল আত্মমুখীনতার বড়ো তাগিদ। বোধহয়, শুধু আত্মমুখীনতাই যথেষ্ট নয় এই নতুন কাব্যশিল্পকে বোঝার জন্য, এর মধ্যে ছিল সামাজিক প্রভুত্ব এবং ব্যক্তির স্বেচ্ছা-র টানাপোড়েন। গত শতাব্দীর কোন মহিলা কবির পক্ষে নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলি লেখা প্রায় অস্বাভাবিক ছিল

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে
কি ফল লভিলি?

কারণ লিঙ্গ রচনায় যে লজ্জাবোধের কথা বলেছি তা প্রতিবন্ধকতা করত এইরকম স্পষ্ট ভাষণের। এ অবশ্যই কোন নারীর উক্তি হতে পারে। কিন্তু কোন 'শিক্ষিতা' 'ভদ্র' বাঙালী কুলবধূ

কিংবা অনূঢ়া কন্যার পক্ষে এমন উক্তি শিষ্টতা-বিরুদ্ধ। মাইকেল মধুসূদনের 'ব্যক্তিগত' উক্তিও যে বাঙালী শিষ্টতা সম্মত ছিল তা নয়, কিন্তু পুরুষের কবিতায় 'কবিব্যক্তি' এবং 'বাস্তব ব্যক্তি'-র পার্থক্যকে হয়তো সমাজ মেনে নিতে দ্বিধা করত না, কিন্তু নারীর কবিতায় তা হতো অশালীনতা। এক্ষেত্রে দুটি পথ খোলা ছিল গীতিকবির কাছে। একটি পথ হলো নীরবতার। নারীজীবনের কতকগুলি অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে তার 'sexuality' সম্পর্কিত বোধের ব্যাপারে নীরবতা। এই নীরবতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ গত শতাব্দীর গীতিকবিতায় পুরুষের sexuality একটি কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়েছিল। অবশ্যই পুরুষ লেখকেরা নারীর 'sexuality'-কে সম্মুখায়িত করেছিলেন প্রচণ্ডভাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন। তাঁর উপন্যাসে নারীর আকাঙ্ক্ষার, তার যৌন কামনার এবং তার যৌন অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের যে রূপ দেখলাম তা পুরুষ-রচিত। পুরুষ-কল্পিত বলে উপেক্ষণীয় না হলেও, নিঃসন্দেহে পুরুষ-দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শাসিত বটে। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক নারী তাঁদের নিজেদের কথা লিখলেন তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের জীবনের কতকগুলি অভিজ্ঞতা প্রকাশে নীরবতা শ্রেয় বলে মেনে নিলেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের কাব্যজগতের একটা বিশেষ সীমারেখা তৈরি করে নিলেন। অথবা বলব কি সামাজিক শক্তি নারীর গীতিকবিতার একটা গণ্ডি রচনা করে দিল?

২

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) গত শতাব্দীর এক স্মরণীয় কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বারো বছর বয়সে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পনেরো বছর বয়সে। 'জনৈক হিন্দুমহিলা' নামের অন্তরালে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ 'কবিতাহার' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত।"[১] বাংলা সাহিত্যে গিরীন্দ্রমোহিনীর অভ্যর্থনা যে নির্বিঘ্ন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালেও তাঁর কবিতা সমাদৃত হয়েছে। তাঁর কবিতা প্রকাশের আরম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘসময়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেছে। সেই মূর্তিটির রচনায় কোন তথ্যভিত্তি নেই একথা বলা চলবে না, কিন্তু তার পেছনে লিঙ্গ রচনার সামাজিক শক্তি যে বিশেষভাবে সক্রিয় এমন মনে করার কারণ থাকতে পারে। সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছিলেন "গ্রাম্যজীবনের, গ্রামের পরিবেষ্টনে বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনায় ও সেই আবেষ্টনে বাল্যস্মৃতির আলিম্পন রচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর দক্ষতা .."।[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যপাঠের একটি মূল সূত্র রচনার চেষ্টা করেছিলেন।

"তাঁহার আবেগের কেন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার স্বামী। তাঁহার পবিবেশ মূলতঃ গৃহ-সংসার-পরিবেশ।[৩]

তিনি আরো বলেছেন যে গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড তাঁর স্বামী।

"গিরীন্দ্রমোহিনী নরেশচন্দ্রের ছায়াস্বরূপিণী বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। পতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধর্মিণীর তিনি আদর্শস্থানীয়া। পতির জন্য তাঁহার জীবন— নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কিছু নাই, এমনভাবে তিনি অনুপ্রাণিতা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যকে দেখেছেন একজন আদর্শ হিন্দুরমণীর পতিপ্রেম ও ভক্তির ভাষ্য হিসেবেই। গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয় দশ বছর বয়সে। যখন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়, তখন তার বয়স

ছাব্বিশ। এর পরে গিরীন্দ্রমোহিনীর পাঁচটি কাব্য প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ সতর্কতার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়েছেন

> কালের কঠিন বিধানে আজ সে স্বামী পাশে নাই—শরীরী হইয়া নাই। কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশাইয়া আছেন—এই ভাবই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

গ্রাম্যজীবনেব বর্ণনা এবং/ অথবা পতিপ্রেম তথা গার্হস্থ্য জীবনের বন্দনা এই দুই বিষয়ভূমির মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা আমরা পড়েছি। ভবতোয দত্ত আর একটি মাত্রার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৫] গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় তিনি দেখেছেন বস্তুমুখী কাব্য থেকে আত্মমুখী কাব্যে বিবর্তন এবং আত্মমুখিতা থেকে এক ''আত্মপ্রেম''-এর জন্ম। ''বিস্ময়কর'' মনে হয়েছে তাঁর এই পরিবর্তন। 'শিখা' কাব্যের ''কারে ভালোবাসি'' কবিতাটিকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রেখে তিনি বলেছেন '''অশ্রুকণা'-র স্বামিপ্রেমের সঙ্গে এই বিস্ময়কর আত্মপ্রেমের মিল নেই।''

এইসব ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যে গিরীন্দ্রমোহিনী-কাব্য পাঠে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে, যে ইতিহাস 'ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলিকে সমষ্টি চৈতন্যের কাছে নতুন তাৎপর্য সন্ধানের ইতিহাস, যে ইতিহাস ব্যক্তি ও সমাজের আততির জটিল কাহিনী, গিরীন্দ্রমোহিনীব্ ভূমিকা অবশ্য তাব প্রান্তিকেই থেকে যায়, যদি না গিরীন্দ্রমোহিনীর আত্মকথা বর্ণনার বিশেষ নীতিকে লক্ষ্য করি। আগে বলার চেষ্টা করেছি যে লিঙ্গ সংরচনার যে সামাজিক শক্তি তা নারীপুরুষের কর্মবিভাগের মতোই কাব্যেও একটা সীমারেখা তৈরি করতে চাইছিল। নারী গীতিকবির প্রধান সমস্যা এই লিঙ্গ সংরচনাকে নিয়ে। হয় তা সংরচিত লিঙ্গ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা নির্দিষ্ট হবে। নয়তো তা হবে এই সংরচনার বিরোধিতা। গিরীন্দ্রমোহিনী আমাদের বিশেষ আকর্ষণ দাবী করেন, কারণ তিনি এই লিঙ্গ সংরচনাকে প্রশ্ন করতে পেরেছিলেন, আর সেই কারণেই তিনি কবিতার একটা নতুন ভাষা তৈরি করতে চাইছিলেন। আমাদের গীতিকবিতার ইতিহাসে সেটি এক বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার।

নীরবতা যদি হয়ে থাকে একটা বিশেষ 'স্ট্রাটেজি' বা রণনীতি, আর একটি রণনীতি হলো প্রতীক রূপকের গঠন। আধুনিক নারীবাদী সমালোচনায় একশ্রেণীর প্রতীক ও প্রতিমাকে বলা হয়েছে ''ক্লিটোরাল''।[৬] গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনায় দেখা যাবে তার প্রাধান্য। নারীবাদী সমালোচকেরা কেউ কেউ এমিলি ডিকিনসনের কবিতায়, মটরশুঁটি, নুড়ি, জাম, বাদাম, কুঁড়ি, মুক্তা, শিশিরবিন্দু, জলবিন্দু ইত্যাদির একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা লক্ষ্য করেছেন। এগুলি সবই ক্লিটোরাল প্রতিমা। শুধু ডিকিনসনের লেখাতেই নয়, গত শতাব্দীব অনেক লেখিকার রচনাতেই দেখা যাবে এই ক্লিটোরাল প্রতিমা। বেনেট-এর ভাষায় এই প্রতিমার প্রয়োগ যেন ঘোষণা করছে ক্ষুদ্রও হতে পারে মহৎ, তুচ্ছ হতে পারে তাৎপর্যময় এবং মূল্যবান।[৭] আমাদের কবিতায়ও, নারীর আত্মকথনের একটি প্রধান পদ্ধতি এই ক্লিটোরাল প্রতিমার আবির্ভাব। এ যেন এক বিশেষ সংকেত, এই সংকেতের আড়ালে গুপ্ত হয়ে আছে নারীর বিশেষ কথা।

যে-জগৎ থেকে এই কবিতাগুলির জন্ম সে জগৎ স্বভাবতই 'ছোট' এবং পুরুষের 'বিশাল' কর্ম জগৎ থেকে ভিন্ন। ঘরের বাইরে যে জগৎ তার বিরাটত্ব পুরুষ কবিরা ঘোষণা করেছেন বারবার, নারীর রচনা যে গার্হস্থ্য জীবনের 'ছোট', 'সংকীর্ণ' পরিসরে সীমাবদ্ধ একথা সমালোচকেরাও

বলেছেন বারবার। গিরীন্দ্রমোহিনী এই 'ছোট' জগতের কবি, কিন্তু তিনি এই 'ছোট'-র গৌরবায়নের কবিও বটে। তিনি সচেতনভাবে আরেকটা জগৎ গড়তে চাইলেন যা এই বিরাট জগতের প্রতিবাদী। তাঁর এক কবিতায় গিরীন্দ্রমোহিনী প্রশ্ন তুলেছেন

ধরা ভরা যশ আছে জানি তব, জগতেতে বহুমান
অতি ক্ষুদ্র নারী ক্ষুদ্র হৃদি তারি হেথা কোথা তার স্থান

এখানে কথক ও শ্রোতা একীভূতা? ক্ষুদ্রতা কি স্বীকৃতি না ব্যঙ্গোক্তি। ক্ষুদ্রতা কি ঐতিহ্যবাহিত লিঙ্গরচনার সমর্থন বা আবোপিত ক্ষুদ্রতার প্রতিবাদ? 'হেথা কোথা তার স্থান' এ কি বিলাপ, এ কি প্রশ্ন, এ কি চ্যালেঞ্জ? এই দুটি ছত্রের মধ্যে, এর আপাত সারল্যের অন্তরালে একটি গভীর প্রশ্ন নিহিত। এই সূত্র ধরেই গিরীন্দ্রমোহিনীর একটি কবিতা আমরা পড়তে পারি, কবিতাটির নাম নিতান্তই অকাব্যিক 'ছোট জিনিষ'। কিন্তু ক্লিটোরাল প্রতিমা গাঁথা কবিতাটি বাংলা গীতিকবিতার আন্তর ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

ছোট ছোট যুঁইগুলি তুলি, গেঁথে হয় মালা মনোহর
ছোট ছোট বালকের মুখ, আনে প্রাণে স্নেহের নির্ঝর
ছোট ছোট বিহগের ডাক শ্রবণে শুনিতে সুমধুর,
ছোট ছোট তারকার হারে শোভায় গগন ভরপুর,
অতি ক্ষুদ্র শিশিরের কণা, তৃণ আস্তরনে ঝলমল
বিলোড়িত করে দেয় প্রাণ ক্ষুদ্র এক ফোঁটা আঁখিজল
নয়নের ক্ষুদ্র দুটি তারা মরমেতে ঢালে প্রেমধারা
ওগো তাই বলি, তাই বলি তবে, ক্ষুদ্রে কেন অনাদর হবে।

ছোট যুঁই, ছোট পাখি, ছোট তারা, 'অতিক্ষুদ্র' শিশিরের কণা—এই সব প্রতীক বৃক্ষ জগৎ, প্রাণী জগৎ, আকাশলোক, এক বিশালব্যাপ্ত জগৎ থেকে সংগৃহীত। প্রত্যেকটি ছোট বস্তু বা প্রাণীর সঙ্গে আছে বৃহত্তর জগতের একটা পরিপূরকতার সম্পর্ক; যুঁই ও মালা, তারকা ও গগন, শিশিরকণা এবং তৃণ আস্তরণ। সবশেষে চোখের তারা এবং প্রেম, শারীরিক ইন্দ্রিয়দ্বার এবং মানসিক অনুভূতি। ছোট ছোট প্রতীকের তালিকার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে দুটি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক জগতের অস্তিত্বের টানাপোড়েন, প্রাকৃতিক জগৎ থেকে বক্তব্য পৌঁছয় মানসিক জগতে। ইন্দ্রিয়নির্ভর জগৎ স্পর্শ, দৃশ্য, শ্রুতির মধ্য দিয়ে পৌঁছয় গভীরতর ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রেমানুভূতিতে। আর তখনই জাগে একটি প্রশ্ন কিংবা একটি সিদ্ধান্ত: 'ক্ষুদ্রে কেন অনাদর হবে।' কে এই ক্ষুদ্র? বিশ্বজগৎ থেকে প্রতীক সঞ্চয় করে আনেন কবি, প্রাণীজগৎ, ভূমিজগৎ, আকাশজগৎ থেকে। এমনকি মনুষ্যজগৎ থেকেও সংগ্রহ করেন ক্ষুদ্রকে—(ছোট ছোট বালকের মুখ) কিন্তু 'অতিক্ষুদ্র নারী'-র কথা উল্লেখ মাত্রও করে না। একই সঙ্গে নীরবতা এবং পরোক্ষ প্রণালীতে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দেন কে এই ক্ষুদ্র। 'ক্ষুদ্রে কেন অনাদর হবে'—এই উক্তিটি আর প্রশ্ন মাত্র থাকে না, তা উত্তেজনা এবং প্রতিবাদও বটে ('তাই বলি, তাই বলি তবে')। যে লজ্জা, বিনয়, সংযম ইত্যাদির দ্বারা নারীর লিঙ্গ সংরচনা করা হয়েছে তার মধ্যে অবস্থিত থেকেও গিরীন্দ্রমোহিনী একটা আত্মকথা বলার পদ্ধতি খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর মুখ্য প্রতীক হলো 'ছোট'—আমাদের সাহিত্যে 'ক্লিটোরাল' প্রতিমার প্রথম ব্যাপক ব্যবহার তাঁর কবিতায়।

'ছোট' ও 'ক্ষুদ্রত্ব'-এর সংকেত, প্রতীক ও প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি প্রতিমা দেখা যাবে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায়, সাধারণভাবে নারীর কবিতায়। তাকে বলতে পারি রুদ্ধতার সংকেতবাহী প্রতিমা, কিংবা রুদ্ধতার অনুভূতিসঞ্জাত প্রতিমা। রুদ্ধতার সঙ্গে ক্ষুদ্রতা গভীরভাবে জড়ানো। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক

হৃদয়-কৌটায় আমি জনম ভরিয়া
প্রেম হলাহল সখী করেছি সঞ্চয়

জীবন সায়রে কলিকা নলিনী এখনো ফোটেনি ভাল
প্রতিদিন তার সরমে কুঞ্চিত, অরুণ, ঢাল গো আলো।

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মন
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি যদি করে বাস
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস করে
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনেব পানে
কে করে বন্ধন মুক্তি, কে ফুটাবে তারে
নির্দয় মিলন সে তো শত ব্যবধানে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা প্রসঙ্গে এতদিন যে-সব মন্তব্য আমরা শুনেছি তাতে গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এবং বাঙালী নারী (বিশেষত বিধবার) আদর্শের সম্মুখায়ন হয়েছে। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের ছবি রচনার কুশলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর কবিতাকে যতটা সহজ, যতটা সমস্যাহীন ভাবা হয়েছে তা যে ঠিক নয় তার প্রমাণ এই কবিতাংশগুলিই। এই কবিতাগুলিতে আছে এক নারীর উচ্চারণ, তার বিচিত্র এবং কখনও কখনও অত্যন্ত জটিল মনোভাব, যাকে শুধু সহজ-সরল গার্হস্থ্য আবেষ্টনী এবং বিধবার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। যে প্রতিমাগুলি তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে, (যাকে ক্লিটোরাল প্রতিমা নামে অভিহিত করেছি) সেগুলি অবশ্যই পুরুষরচিত কবিতাতেও দেখা যাবে। কিন্তু তাঁর প্রতীক ব্যবহার পুরুষ-রচিত কবিতায় প্রতীক ব্যবহার থেকে স্বতন্ত্র। পাখি, ফুল, অশ্রু, কৌটা এই প্রতীকগুলি নারীর রচনায় তার সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত, বাস্তব অবস্থার ইঙ্গিত, কোন রোমান্টিক অধীরতা বা বেদনা মাত্র নয়। 'আভাষ' গ্রন্থের 'কাকাতুয়া' কবিতাটি স্মরণযোগ্য—

অধরে চক্ষুটি রাখি কি বলিতে এস পাখী
কেনরে দেখিলে মোরে নত কর মাথা?
তুমি কি বুঝেছ হায়, সমদুঃখী দুজনায়
আমারো চরণ সখী, শিকলেতে বাঁধা?

তাই কপোলে কপোল রাখি বেদনা জানাও পাখী
এসো দি, পায়ের খুলে শৃঙ্খল তোমার
যাও সুদূর কাননে গিয়ে, মন খুলে গেও প্রিয়ে
ছার নারী জনমের বেদনা সম্ভার।

ভুলিও না যেতে যেতে উড়িয়া আকাশ পথে
আকুল করিয়া দিক গেও কণ্ঠ তুলে,
অযুত নারীর প্রাণ নর করে বলিদান
হয়েছে, হতেছে, আরও হবে, স্বার্থে ভুলে।

পুরুষ কবিরচিত কবিতায় 'পাখি' বহুক্ষেত্রেই স্বাধীনতার প্রতীক, বন্দী-পাখি পরাধীন জাতির প্রতীক। নারীর রচনায় পাখি বিশেষভাবে নারীর 'সমদুঃখী' এবং স্বয়ং নারী। এই কবিতায় স্পষ্টভাবেই গিরীন্দ্রমোহিনী নারী এবং নরের পার্থক্য ('অযুত নারীর প্রাণ', 'নর করে বলিদান') এবং সেই পার্থক্য জনিত ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে এনেছেন কবিতার পুরোভাগে। নরনারীর দৈহিক পার্থক্য, নরের আধিপত্য অর্থাৎ লিঙ্গ সংরচনা এবং লিঙ্গ আধিপত্যের ইতিহাস প্রাধান্য পায় ব্যক্তিগত বেদনার ওপরে। এই পাখি ও নারীর একাত্মতা এবং ব্যক্তি ও ইতিহাস (নারীর বেদনার ইতিহাস)—এর সমন্বয় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতার একটি প্রধান সূত্র। 'চোখ গেল' কবিতাটির আরম্ভ 'কাকাতুয়া'-র মতই সমদুঃখীর অনুভূতিতে।

অতি গূঢ় মরমের কথাটি আমার
কেমনে জেনেছ তুমি ভাবিয়া না পাই
ভাসায়ে আকাশ নীল, বলি বারবার
চোখ গেল, চোখ গেল, চলিয়াছ গাহি।
আয় আয় কাছে আয় রাখিব না ধরে
কি তোর সে আঁখি-শূল বলিবি কি মোরে?

তারপর কথিকা বলতে থাকেন 'চোখ গেল' পাখির যন্ত্রণাস্বরের মর্মকথা। পাখির যন্ত্রণার নানাকারণ—নীতি, ইতিহাস, সমাজ, ধনবন্টন বৈষম্য।

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখী
চোখ গেল পরাণের মলিনতা দেখি।...
চোখ গেল—সরলতাহীন বসুন্ধরা
চোখ গেল—ধনীদের দীনে ঘৃণা করা
চোখ গেল—মানবের স্বার্থপর প্রাণ
চোখ গেল রমণীর নির্মম পরাণ।

ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সামাজিক মনস্তত্ত্ব—এই সমস্তের মধ্যে অবস্থিত যে নারীর অস্তিত্ব তাই—'চোখ গেল'-র যন্ত্রণাকে তাৎপর্যময় করে তোলে। শুধু এই ইতিহাস মাত্র নয়, তার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকে এক ব্যক্তিগত মানবিক সম্পর্ক। এক অন্ধকারের কাহিনী, এক নির্বাপিত দীপশিখার কথা। আর সেই কথা থাকে অপ্রকাশ্য, কিন্তু নিঃশব্দ নয়।

চোখ গেল—মেঘে ঢাকা চাঁদিমার রাতি
চোখ গেল—নিভ নিভ বন্ধুতার বাতি

চোখ গেল, চোখ গেল চোখ গেল পাখি
আর হইবে না বলা যা রহিল বাকী।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে 'পাখি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ 'ক্লিটোরাল' প্রতিমা। আর প্রতিমার তাৎপর্য অনুসরণ করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম নারীর নিজস্ব কথা বলার প্রচেষ্টা। বাংলাসাহিত্যের সমালোচকেরা তাঁর কবিতাকে অনুশাসিত, শাস্ত্রানুমোদিত কাব্যাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেয়ে তাঁর কবিতার মৌলিক জগৎকে মান্যতা দিতে চাননি। তাঁর কবিতায় মূল জগৎ যে নারী, নারীর যন্ত্রণা, এবং নারীর প্রতিবাদ এই কথাটি অনুক্ত থেকে গেল আমাদের কবিতার শাস্ত্রীয় ইতিহাসে। 'বদ্ধ মুকুল', 'কলিকা', 'কুঁড়ি' ইত্যাদি প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতার 'ঝরে যাওয়া' এবং 'দলে-যাওয়া'-র রূপক প্রকৃতপক্ষে শুধু আত্মমুখীন রোম্যান্টিকতা মাত্র নয়, নারীর ইতিহাসের রূপক।

ঘাসের বনে মুক্তামালা ছড়িয়ে ফেলে চপলবালা—..
তারেই পর নিশির শিশির বলে যাচ্ছে লোকে পায়ে দলে

এই কবিতার সঙ্গে সাফো-র অতি বিখ্যাত দলিত পুষ্পের প্রতিমার[৮] একাত্মতা তাই এক কাব্যিক ঐতিহ্যের আকস্মিক উদ্ভাসমাত্র নয়। নারীর কবিতার নিজস্ব ধারার অন্তর্গত।

যেখানে মলিন কিছু, যেখানে দলিত
সেইখানে প্রাণ মোর হয় উচ্ছলিত
মনে হয় ও যেন আমার প্রতিচ্ছায়া
মিশে যাই ওর সনে হই এক কায়া।

'মলিন', 'দলিত' এবং 'ক্ষুদ্র' এই বিশেষণগুলি যেমন তাঁর কবিতার জগৎ-এর চাবি, তেমনই পাখি, পিঞ্জর বিশেষ্যগুলি। 'পিঞ্জরের পাখি'র সঙ্গে তুলনা করেন তিনি নিজেকে —এই প্রতিমা অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ। নারীর persona-য় পুরুষ কবিরাও এই প্রতিমার বহুল প্রয়োগ করেছেন —কিন্তু এক পদক্ষেপ এগিয়ে, তিনি এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন এই প্রতিমার ব্যবহারে: ''স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা নারীদেহে ওরে সখি।' নারীদেহ পিঞ্জর, হৃদয় স্বাধীন, কিন্তু এই দেহে স্বাধীনতা কি সম্ভব? এই দেহের ভিত্তিতেই সমাজ লিঙ্গ রচনা করেছে। এই যে দেহ ও হৃদয়ের দ্বৈততা, কোন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, এই দেহ বিশেষভাবেই নারীদেহ, আর হৃদয় 'স্বাধীন' যা biological sex নিরপেক্ষ। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতার প্রধান আকর্ষণ, বাংলা কবিতার ইতিহাসে, আমাদের সমাজের লিঙ্গ সংরচনার ভাষ্য রচনায়। যতটা সহজ, সরল এবং নির্বিঘ্ন মনে হয়েছিল, তত সরল সহজ নির্বিঘ্ন নয় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা।

৪

দুটি কবিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দুটিতেই আছে পশু প্রতিমা। এই প্রতিমাগুলি 'ক্লিটোরাল প্রতিমা'র বিপরীতে। হঠাৎ যেন ক্ষুদ্র, রুদ্ধ, দলিত, মলিন প্রতিমার মধ্যে যে হতাশা ও বেদনাবোধ, দৈন্য ও অবসাদ আছে তার বিপরীত অনুভূতি, ঘৃণা, ক্রোধ, উপেক্ষা এমনকি জয়ের বোধ উদ্ভাসিত হচ্ছে এই পশু প্রতিমাগুলির মধ্যে।

সাহসী বিড়াল

বিছানার পরে বসিয়া গম্ভীরে গল্প শুনি আনমনে

সঙ্গিনী সকলে বসে মিলে দুলে কেহ কহে কেহ শোনে।
কোথা হতে কোথা চলে যায় কথা কত মিঠা ছাই পাঁশ
আকাশ পাতাল ভাবি চিরকাল সবে করে পরিহাস।
সহসা এ কি এ না বলে না কয়ে কোথাকার দেশাচারে,
বিড়ালের শিশু লাফাইয়া আশু বসিল অঙ্কের পরে
নয় চেনাশুনা কি নাম জানি না এ বড় গায়ের জো'র
সবার সাক্ষাতে বিনা আদেশেতে বসিল অঙ্কেতে মোর,
পশুর প্রণয়, বড় ভাল নয় নখ-দাঁতে ভয় করি
না চাই সভ্যতা, বিশ্বপ্রেমিকতা গায়েতে রাখিয়া সরি।

এই কবিতাটির মধ্যে একটি গার্হস্থ্য পরিবেশের কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু কবিতাটির বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে এটি একটি নিরীহ গার্হস্থ্য পরিবেশের কবিতা মাত্র নয়। এবং বিড়ালটি গৃহপালিত একটি জন্তু মাত্র নয়। একটি পরিচিত, পারিবারিক আবেষ্টনীর তৃপ্তিতে যে-কবিতার আরম্ভ তা হঠাৎ ধাক্কা খায় বিড়াল শিশুর ('ক্ষুদ্র') আচরণে। পশুটি লাফিয়ে উঠল 'অঙ্কের' ওপর, প্রথমেই সে লঙঘন করল 'দেশাচার'। গৃহপালিত এক পশুর কাছে 'দেশাচার' মান্য করার দাবী হয়তো করতেও পারেন কথিকা। আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয় এই পশু অপরিচিত, অনাত্মীয় ('নয় চেনাশুনা কি নাম জানি না')। সম্পূর্ণ শারীরিক শক্তিতে ('এ বড় গায়ের জোর), কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে সে এক নারীর কোলে এসে বসল। সেই নারীর অনুমতির অপেক্ষা সে রাখেনি। সকলের সামনে 'বসিল অঙ্কেতে মোর'। অঙ্কে বসার ঘটনাটিকে কথিকা তাঁর কাহিনীর পুরোভাগে আনতে চান, দ্বিতীয়বার এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এব পরের বর্ণনা আরো সংকেতময়, আরো সূক্ষ্ম। ঘটনা শেষ কিন্তু কথিকাও ঘটনাটিকে সামান্য তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর অনুভূতিকে ঘিরে আছে এক আকস্মিক শারীরিক শক্তির ভ্রূক্ষেপহীন আবির্ভাব। এই শক্তি এক পশুর শক্তি, ভালোবাসা ('পশুর প্রণয়') পশুর যে-প্রণয় তার একটা ভয়ঙ্করতা আছে। তার নখ, দাঁত দুই-ই ভীতিকর; একদিকে নখ এবং দাঁত যেমন পশুর অস্ত্র, তেমনই প্রণয়ের শারীরিক প্রকাশের পথও। এই প্রণয়কে ভয়, না কি ভয় দেশাচারকে, সভ্যতাকে? এবার কবিতায় শুনি আগের বক্তব্য থেকে বিপরীত সুর। যে পশুকে ভৎর্সনা করেছিলেন কথিকা দেশাচারকে অমান্য করার জন্য, এখন সেই পশুকে কি তিনি মেনে নিলেন? এমন ঘোষণা করলেন 'না চাই সভ্যতা'। আরো জটিল হয়ে ওঠে তাঁর উক্তি, যখন বলেন 'বিশ্বপ্রেমিকতা' গায়েতে রাখিয়া সরি'। কবিতার অন্বয় আর সহজ থাকে না। তৃপ্ত সুখী গার্হস্থ্য আবেষ্টনীর মধ্যে অভ্যস্ত এক নারীর জীবনে অকস্মাৎ যে প্রণয়বোধ সমস্ত পাশবিক এবং শারীরিক উপলব্ধি নিয়ে আবির্ভূত হয় তাকে আর শুধু প্রতীক ও প্রতিমার মধ্যে বদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয় না। একটা অর্থহীনতা, অস্পষ্টতা, ব্যাকরণগত উদ্ভ্রান্তির মধ্যে শেষ হয়, আত্মকথন। কী এর অর্থ—'গায়েতে রাখিয়া সরি'? কিন্তু কথিকা এই বিড়াল প্রতিমার অন্তরালে নিহিত অনুভূতিকে স্পষ্টতর করে দেন কবিতায় শিরোনামে 'সাহসী' বিশেষণ যোগ করে। এই বিড়াল গার্হস্থ্য আশ্রমের পোষা, নিরীহ জীবমাত্র নয়। এ এক সাহসী বর্বর, সভ্যতাবিরোধী এক পশু, এ এক তীব্র প্রণয় কামনার প্রতীক, এই কবিতা এক প্রণয়ের শক্তিতে আক্রান্ত রমণীর আত্মকথা।

এবার পড়া যাক দ্বিতীয় কবিতাটি—

ডিটেকটিভ

দিনরাত পাছে পাছে ঘুরিত নিয়ত
তস্করের মত—ওরে তস্কর প্রহরী
আর কি করিবি মোর ওরে দৃঢ়ব্রত?
যাহা ছিল লয়েছিস এক এক করি।
জীবন-আকাশ হতে চন্দ্রের কিরণ
নেছিস আঁখির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ।
মুহূর্ত রাখনা কভু মিনতি কাহার,
ভীষণ কর্তব্যনিষ্ঠ। জানি সে তোমার
ক্ষমতা অতুল যত, এবে থাক বসে
কুকুরের মত মোর শয্যার পারশে
চেয়ে চেয়ে মুখে কর চরণ লেহন।
একদিন দেব ফেলে অস্থি কয়খানা
মন-সাধে বসে' বসে' করিস চর্বণ।

একজনকে সম্বোধন করা হচ্ছে যে একই সঙ্গে প্রহরী এবং তস্কর। সে যে তস্কর তা বুঝি অভিযোগের গুরুত্ব থেকে—সে এক এক করে সমস্ত নিয়েছে, নিয়েছে আকাশ থেকে চাঁদ, জীবন থেকে আলো। কিন্তু এই তস্কর কর্তব্যনিষ্ঠ, 'দৃঢ়ব্রত'। কথিকার সঙ্গ সে ছাড়েনি, আরো কিছু নেবার আকাঙ্ক্ষা আছে তার। এই তস্কর আবার প্রহরী। কিন্তু কাকে সে পাহারা দিচ্ছে। কার কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য তার পাহারা? কবিতার নামকরণে দেখি সে ডিটেকটিভ। যে তস্কর সে প্রহরী। যে প্রহরী সে ডিটেকটিভ। তাহলে কি-সে, কিছু অনুসন্ধানও করছে? কিসের অনুসন্ধান? কার অনুসন্ধান? সে কি সন্ধান করছে কথিকারই কোন গোপনীয় রহস্য? রহস্য উন্মোচনই তো ডিটেকটিভের কাজ।

যে-স্বচ্ছতা ও সরলতা গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতার মূল লক্ষণ বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। কবিতা জটিল হয়, দুরূহ হয়—এমনকি কখনও দুর্বোধ্যও হয়ে ওঠে— তার কারণ অনুভূতির জটিলতা, বহু বিপরীত অনুভূতির মিশ্রণ। আর নারীর রচনায় অনুভূতির জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে সমাজানুমোদিত, কবিতার শাস্ত্রীয় অনুশাসন। শুধু সাংকেতিকতার সাহায্যে নারী যেমন তার আত্মকথা বলার পথ তৈরি করে নিচ্ছে। তেমনই এক সামাজিক ভয় তাকে বাধ্য করেছে এই আত্মকথাকে গোপনীয়তার আবরণে ঢেকে রাখতে। তস্কর-প্রহরী-ডিটেকটিভ যেমন পরস্পর বিরোধী তেমনই অপহরণ রক্ষণ এবং উন্মোচন, অপরাধ এবং শাস্তি মেশানো এক ক্রিয়া-কর্মের ঐক্যে জড়ানো।

এই কবিতার মধ্যেও আছে এক পশুপ্রতিমা। প্রথমে অস্পষ্ট তার অবয়ব কিন্তু দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'দিনরাত পাশে পাশে ঘুরিত নিয়ত'— এই বাক্যের মধ্যেই আছে সেই পশুপ্রতিমা। তা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'প্রহরী' শব্দের মধ্যে—কিংবা 'কর্তব্যনিষ্ঠ' শব্দে। একেবারে অবয়ব পূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কথিকা এবার ব্যবহার করেন উপমা—'কুকুরের মত মোর শয্যার পারশে'। আর যে-মুহূর্তে এই পশুপ্রতিমা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল অমনি কবিতার মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরিবর্তন কথিকার চরিত্রের পরিবর্তন।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই তস্কর-প্রহরী-ডিটেকটিভ ছিল কর্তা—actor—সেই অপহারক, সেই

দৃঢ়ব্রত। সেই কর্তব্যনিষ্ঠ, তার ক্ষমতা অতুল। এবার সে হয়ে উঠল অকারী—passive, আর কথিকা হয়ে উঠলেন actor। এবার কথিকা কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এবার কথিকা আদেশ দিচ্ছেন।

এবে থাক বসে
কুকুরের মত মোর শয্যার পারশে।
চেয়ে চেয়ে মুখে কর চরণ লেহন।

এর আগে পর্যন্ত কাহিনীতে প্রাধান্য ছিল অতীতের—যখন এই তস্কর প্রহরী কথিকার সর্বস্ব অপহরণ করেছে (যাহা ছিল লয়েছিস এক এক করি)। এখন কথিকা নিয়ন্ত্রণ করছেন কর্মকে, বর্তমান এখন কাহিনীর কেন্দ্রীয় কাল। কিন্তু এখানেই শেষ নয় কাহিনী। এর একটি ভবিষ্যৎ খণ্ড-ও আছে। কথিকা জানেন এই কুক্কুরের, এই পশুর 'মন-সাধ' কথিকার দেহ 'চর্বণ' কবা। এই পাশবিক প্রতিমার সাহায্যে কথিকা বলছেন এক জটিল আত্মসংগ্রামের কাহিনী—এক নারীর দেহলুব্ধ এক তস্করের কথা। কথিকা আশ্বাস দিচ্ছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে, নায়িকার অহঙ্কারে—'একদিন ফেলে দেব অস্থি কয়খানা'। দেহ নয়, শুধু অস্থি। তার বক্তব্য যেন—'এখন তুমি আমাকে দেখ, আমার মুখ দেখ, আমার চরণ লেহন কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে দেবার মালিক আমি। এবং তোমাকে যা দেব তা আমার অস্থি, দেহ নয়। আমার জীবন নয়, আমার মৃত্যু।'

এই যে তস্কব-প্রহরী-ডিটেকটিভ থেকে কুকুরে পরিবর্তন, এই যে দৃঢ়ব্রত, কর্তব্যনিষ্ঠ অতুলক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অপেক্ষমাণ লালায়িত, পশুতে পরিবর্তনের কাহিনী এ এক অর্থে নায়িকার মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনী। মৃত্যু জীবনের প্রহরী, আবার মৃত্যু তস্কর। আবার ডিটেকটিভের প্রতিমা (যা কবিতা-দেহে নেই, আছে শিরোনামে) ইঙ্গিত দিচ্ছে এক রহস্য উন্মোচনের, সত্য উদ্‌ঘাটনের, অপরাধের গ্রন্থিমোচনের। আর সেখানে কবিতাটি হয়ে উঠছে রহস্যজটিল।

মৃত্যুই যদি হয় এই কবিতার কেন্দ্রীয় প্রতিমা, তবু তার সঙ্গে নিহিত রয়েছে এক সংরাগের অনুভূতি। একটি পশুর সঙ্গে লড়াই চলেছে এক নারীর। সেই পশু নারীটিকে অধিকার করার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে তাকে রক্ষা করার নামে। সে নিষ্ঠুর (মুহূর্ত রাখনা কভু মিনতি কাহার) সে পাশবিক। শেষ চারলাইনে এই পশুর সঙ্গে সংগ্রাম—একই সঙ্গে আঘাত করবে ও আহত হবার ইচ্ছার সংমিশ্রণ—যাকে মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন algolagnia। একটা নিষ্ঠুরতাকে আর একটা নিষ্ঠুরতার দ্বারা প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত কথিকা হয়তো বিজয়িনী হয় নৈতিক শক্তিতে, কিন্তু তার মূল্য তার মৃত্যু। নারীর কবিতায় এই অনুভূতিকে সংহত করেছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। যেমন অশ্রুসজল ভঙ্গিতে তিনি লিখেছিলেন নারীর আত্মকথা 'কীটদষ্ট কুসুম' প্রতিমার সাহায্যে—

জানি আমি জানিরে কুসুম
বুকে তোর কি ব্যথা বিষম
মরণের কীট তোর সুবাসের তলে
কাটিতেছে প্রতি পলে পলে
বসে আছি মরিবার তরে
তুমি আমি। এ আকাশ তলে।

তেমনই লিখছেন পশুপ্রতিমার অন্তরালে এক নিষ্ঠুর আত্মযন্ত্রণার ইতিহাস।

উল্লেখসূত্র:

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধকচরিতমালা, ৫৫, পঞ্চম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ১৯৬৩-৪, পৃ ১৩।

২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য় সং ১৯৫৫, পৃ ৪৪৮।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ ১৮।

৪. তদেব পৃ ১১।

৫. ভবতোষ দত্ত, কাব্যবাণী, প্যাপিরাস সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯১ 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী' পৃ ১৮৩-১৮৬।

৬. ক্লিটোরাল প্রতীককে সোজা ভাষায় বলা চলে ছোট কিন্তু তাৎপর্যময় বস্তুর প্রতীক; কবিতায় ছোট বস্তু বা তথাকথিত 'তুচ্ছ' ঘটনার গৌরবায়ণ অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু 'ক্লিটোরাল' কথাটা আধুনিক। হ্যাভেলক এলিস গ্রীক সাহিত্যে বহুব্যবহৃত মিরট্‌ল বেরী (myrtle bery)-কে ক্লিটোরাল প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। (দ্রষ্টব্য *Studies in Psychology of Sex* Vol III, 1900) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Paula Bennelt, *Critical Clitoridectomy . Female Sexual Images and Feminist Psychoanalytic* ; VeVe A, Clark এবং আরো কয়েকজন সম্পাদিত *Revising the Word and the World*, University of Chicago Press, 1993, pp 115-39.

৭. ' ... the little could also be great, the insignificant could be meaningful and valuable !' Paula Bennett, তদেব, পৃ ১১৬।

৮. রাখালের পায়ে-দলা হায়াসিন্‌থ ফুলের মতন
আজ পড়ে রয়েছে ধুলায়
তবু রক্তরাগ।
দ্র. শিশিরকুমার দাশ, বহু যুগের ওপার হতে, কলকাতা, ১৯৮৯।

বাঙালীর ইতিহাস সাধনা

অশীন দাশগুপ্ত

কিছুদিন হয় প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' নামে পুস্তিকাটি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমি পুনঃপ্রকাশ করেছেন। এই বইটি হাতে নিয়ে মনে হল প্রবোধচন্দ্র সেনই পুলিনবিহারী সেনের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' বইটি সম্পাদনা করেছেন (বিশ্বভারতী, ১৩৯৫)। মনে হল যে প্রবোধচন্দ্র সেন ইতিহাস-চর্চায় একটা ধারা দেখতে পেয়েছেন। সেই ধারায় অনেক কিছুই এক হয়ে যেত: বঙ্কিমচন্দ্র প্রবোধচন্দ্রের গুরু। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস বিষয়ে বক্তব্য সমানভাবে শ্রদ্ধা করেছেন প্রবোধচন্দ্র। অথচ ইতিহাস বিষয়ে এই দু'জনের বক্তব্য ঠিক এক নয়। তাতে অবশ্য শ্রদ্ধা কমে যায় না। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যে ধারার মানুষ সে ধারায় শ্রদ্ধা জানাতে গেলে বিভিন্নতার কল্পনা করা চলে না। অথচ এই ধারাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং এখন পর্যন্ত এই ধারাটি লোকচিত্তকে অনুপ্রাণিত করছে। এর থেকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসছে। এর উদাহরণ প্রবোধচন্দ্র নিজে। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিকপাল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মেলালেন একটা সম্পূর্ণ নতুন ইতিহাসচেতনা। এরই মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে যে বোধ প্রবোধচন্দ্র তৈরী করলেন সেই ইতিহাসবোধ তিনি যুক্ত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁর বাংলার ইতিহাস-সাধনা আয়তনে ছোট। মনে হয় যেন একটি পুস্তক-তালিকা মাত্র। আসলে কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে অনেকগুলি ভাবনা এই ছোট পুস্তিকাটিতে বিধৃত আছে। সে ভাবনা একটু নেড়ে চেড়ে দেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলি প্রবোধচন্দ্রের লেখায় বাঙালী জাতিটি কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। প্রবোধচন্দ্র কখনই ধর্মের উপরে জোর দেননি। কিন্তু তাঁর লেখার বাঙালীয়ানা অনস্বীকার্য। কাজেই প্রশ্ন ওঠে এই বাঙালী কারা? এখানে একটা কথা স্বীকার না করলে চলে না: এখনকার দিনে বাঙালী বলতে আমরা বুঝি ভাগীরথীতীরে শহুরে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজটিকে। এরাই এখন বাঙালীত্বের দাবী করে রয়েছে, এরই একটা বিকল্প তৈরী হয়েছে ঢাকায়। অন্য বিকল্পটি ঘরের কাছে—বাংলার গ্রাম-সমাজে। একথা স্পষ্ট যে গ্রাম-সমাজ এই শহুরে সমাজের সঙ্গে এক নয়। কিংবা নিম্নবিত্ত বা নিম্নবর্ণের মানুষ এই সমাজের লোক হতে পারে না। কিন্তু সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালী সকলেই। সময়ে সময়ে এক একটা গোষ্ঠী এগিয়ে আসে, আবার পড়ে যায়। বাঙালী একটা মস্ত বড় বর্ণনা—এর মধ্যে এঁরা সকলেই রয়েছেন এবং থাকবেন। প্রবোধচন্দ্র এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছেন না। কিন্তু তিনি সতর্কভাবে ধর্মসমাজকে বাদ দিয়ে ভাষাকেই বড় করে তুলেছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এইখানে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য মিলছে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজ

' সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখেছেন। বাংলা ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে জোর দেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রবোধচন্দ্র সেটুকুই তুলে ধরেছেন। এতে করে তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা সম্ভব হচ্ছে। সেই ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাদপুরুষ। সেই ধারাটিই বাঙালী সমাজের প্রাণকেন্দ্র।

এবার দ্বিতীয় কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ মহাজাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর চিন্তায় হিন্দু বা বাঙালী নিজস্ব আসন সবসময় পেয়েছে। কিন্তু যারা হিন্দু নয়, যারা বাঙালী নয় তারা বাদ যেত না। তিনি তো বলে গেছেন যে বৈচিত্র্য-ই ভারতবর্ষের সত্য। এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা সৃষ্টি করাই ভারতবর্ষের সাধনা। আমরা সবাই সে কথা মেনে নিয়েছি। বৈচিত্র্য যে আছে চারিদিকেই দেখা যায়। সেই সঙ্গে ভারতবাসীও আছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ভারতবাসী অন্য কোনো একটা একতার সন্ধান পেয়েছে। সেটা কি বস্তু কিংবা সে কেমন করে পাওয়া যায় এ সম্পর্কে কেউ আমরা কিছু জানি না। কিন্তু কথাটা সত্যবলে মানি। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন—

'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'।

তপস্যার বল থাকলে এই উপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু সেই তপস্যাটা যে কি বা কেমন করে করা যায় তা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি।

তৃতীয় একটা বক্তব্যে এবার আসি। এটিও রবীন্দ্রনাথের এবং এর সঙ্গেও প্রবোধচন্দ্রের বক্তব্যের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজবংশের ঘটনাবলী একটি ক্ষুধিত পাষাণের জগৎ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে কলহ আছে, বিলাস আছে, কিন্তু সাধারণ জীবন নেই। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন সাধারণের জীবন ধরতে না পারলে ইতিহাস কোনদিন ইতিহাস হয় না। তাঁর বিখ্যাত কথায় বলা যায় যে ঐতিহাসিক রথ্‌স্‌চাইল্ডের সার্থক জীবনীকার যিনি হবেন তিনি যীশুখ্রীষ্টের জীবনী লিখতে পারবেন না। এর কারণ রথ্‌স্‌চাইল্ডের জীবনীকারের যেরকম উপকরণ লাগে যীশুখ্রীষ্টের জীবনী লিখতে সেরকম লাগে না। খ্রীষ্টের জীবনীর উপকরণ আলাদা। এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজবংশের বর্ণনা যেন 'নিশীথ রাতের একটি দুঃস্বপ্ন' সৃষ্টি করে রেখেছে। এই ইতিহাসকে যদি পল্লীগ্রামের তুলসীমঞ্চে নিয়ে যেতে হয় অন্যরকম উপকরণ দরকার হবে। তুলসীমঞ্চের ইতিহাসটা দামী। ভারতবাসীর ইতিহাস ওর মধ্যেই লুকানো আছে কিন্তু কোন উপকরণে ওটা লেখা হবে সে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। আজ পর্যন্ত সে কথা কেউ জানেন না। শুধু লক্ষ্য করুন ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতবাসীর ইতিহাস একটু তফাৎ। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেন একটু রাজবংশের দিকে বেশী ঝোঁকা। প্রবোধচন্দ্র একেই বলবেন রাজবৃত্ত। অন্যদিকে ভারতবাসীর ইতিহাস এর থেকেই আসবে। কিন্তু সেটা হবে প্রবোধচন্দ্রের চিন্তাতে লোকবৃত্ত বা লোকজীবনের কথা।

এইবার চতুর্থ বক্তব্যে আমরা আসি। কোন একটি জাতি যখন কোন একটি উদ্দেশ্যকে বিশেষ করে চায় তখন সেই উদ্দেশ্যটিই জাতির কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। বলা যায় এই উদ্দেশ্যই জাতিকে সৃষ্টি করে। সবরকম বিচ্ছিন্নতা ছাড়িয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্য জেগে থাকে। তবে সব সময় সব অঞ্চলে এরকমটি হয়না। কোন কোন সময় কোন কোন অঞ্চলে এরকমটি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রকে এই বিষয়ে উঁচু স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে শিবাজীর মহারাষ্ট্রকে। রাজপুতানাও এই রকম একটি লক্ষ্য নিয়ে একসময় মেতে উঠেছিল। কিন্তু রাজপুতদের অনেক গোত্রে এবং সমাজে ভাগ হয়ে যাওয়ায় একতা এল না। এই এক লক্ষ্যের সাধনা হল না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিখেদের

কথাও ভেবেছেন। শিখ সমাজে নানকের ধর্মমতকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। এই ধর্মমত গুরু গোবিন্দের আমলে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হল। কাজেই উদার শিখ ধর্ম আত্মরক্ষার জন্য একটি ছোট সম্প্রদায়ে পরিণত হল। তারপরে রঞ্জিত সিং-এর সময় শিখেদের মধ্যে রাজবংশ এল। শিখেরা অন্যান্য সব মানুষের মত হিংসার শক্তিকে উপাস্য ভাবতে শিখল। নানকের ধর্মমত হারিয়ে গেল।

এর পরের বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বললেন সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিন লেখেননি। প্রবোধচন্দ্রও সে সম্পর্কে নীরব। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষে একটা মহাজাতি আছে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বক্তব্য এক হয়ে সে মহাজাতির উদ্ভব। কাজেই বিচ্ছিন্নতা সত্য এবং একতাও সত্য। এইখানে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যদ্রষ্টা'। ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানে আমরা তা পাই না। তার চেয়ে আমরা প্রবোধচন্দ্রের বক্তব্যে আসি। প্রবোধচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে অনেক কিছুই দেখতে পেতেন। তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন এবং বার বার বলেছেন যে ইতিহাসের সত্যকে কোন রকমেই গোপন করা চলবে না। রাজবৃত্ত ইতিহাসের কাঠামো। রাজবৃত্ত যতই নীরস হোক না কেন রাজবৃত্ত তৈরী হয়ে গেলে সেই কাঠামোর উপর লোকবৃত্ত তৈরী করা যায়। কিন্তু রাজবৃত্ত না হলে লোকবৃত্ত হয় না। প্রবোধচন্দ্র এই দুইয়ে মিলে পুরাবৃত্ত বলে একটি বস্তুতে বিশ্বাস করতেন। তাঁব মতে ইতিহাসের যা কিছু পাথুরে প্রমাণ সবই পুরাবৃত্তের মধ্যে আছে। কিন্তু এই পুরাবৃত্ত শুষ্ক এবং নীরস। একে সরস না করলে ইতিহাস কখনো ইতিহাস হবে না। ঐতিহাসিকের কাজ এভাবে ইতিহাসকে সরস করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। জনসমাজের মধ্যে ইতিহাসকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রবোধচন্দ্র অনুভব করেছেন। পুরাবৃত্তের সত্যকে একটুও খণ্ডন না করে তাকে সুখপাঠ্য করে তোলা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। ইতিহাস-সাধনা প্রথমে অতীতের সত্য আবিষ্কার করবে। সেই সত্য শুষ্ক হবেই। কিন্তু মিথ্যা হবে না। এর পরের পর্যায়ে সেই সত্যতে রসসঞ্চার করে সাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এইসব মিলিয়ে ইতিহাস-সাধনা।

এর পরে আসে ইতিহাস-চেতনা। প্রত্যেকটি জনসমাজে নিজের অতীত সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী থাকে। সেই ধারণাই সমাজকে গৌরবান্বিত করে এবং কর্তব্যে প্রণোদিত করে। এই ধারণাটি সমাজের ইতিহাস-চেতনা। বলা বাহুল্য যে দেশভক্তির সঙ্গে এই ইতিহাস-চেতনার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এ কথা আমরা সকলেই বুঝি যে কোন জাতি যদি নিজেকে হীন মনে করে তবে কোনরকম কাজ করে ওঠা সে জাতির পক্ষে অসম্ভব হয়। বিদেশীরা যদি সেই জাতির ইতিহাস রচনা করে, বিদেশী চোখে যদি সেই জাতির অতীতকে দেখা হয়, তাহলে এ ধরনের হীনতা অবশ্যম্ভাবী। একথা বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও সেই হীনতার কথা বহুবার বলেছেন। এবং বাঙালীর ইতিহাস লিখতে গেলে এই হীনতার বোধ যে অমঙ্গলজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই হীনতার বিপরীত দিকটা ধারণা করা মোটেও সহজ নয়। এর থেকে তিন রকম কথা ভাবা যায়। প্রথম হল আত্মগৌরব। একথা বোঝা সহজ যে অতীতে জাতি যদি গৌরবজনক কাজ করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের সত্য যদি বলে যে ঠিক এরকম হয়নি তাহলে জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এখানে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান ও অতীত গৌরবের ঠিক মিল পাওয়া যায় না। প্রবোধচন্দ্রের মতে ইতিহাসের সত্য কোনো অবস্থায় গোপন করা চলবে না। তাহলে জাতির গৌরব সন্ধান করা বৃথা। অবশ্য জাতির গৌরব ছাড়া অন্য একটা অবস্থা ভাবা যেতে পারে। সেটা হল জাতির আত্মমর্যাদা। কোনো জাতি যদি সব ব্যাপারে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে

তাহলে সেই জাতির পক্ষে কোনরকম কাজ করা কঠিন হয়। এখন পর্যন্ত ইতিহাসেই দেখা গেছে সব জাতির অতীতে কিছু ভালো কিছু মন্দ আছে। এর ব্যতিক্রম নেই। কাজেই ইতিহাসের সত্যকে মেনে নিয়ে অতীত সম্পর্কে এরকম একটি মিশ্র ধারণা তৈরী করা চলে। এই মিশ্র ধারণা থেকেই জাতির আত্মমর্যাদার সম্ভাবনা উঠে আসে কিন্তু আত্মমর্যাদার জন্য প্রয়োজন আত্মপ্রতিষ্ঠা। যদি কোনো জাতি নিজেকে জাতি বলে না জানে তাহলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই হয় না। এখানে আত্মমর্যাদার কথা ওঠে না—আত্মগৌরব তো দূরস্থান।

ইদানীং লক্ষ্য করছি যে জাতি-কল্পনায় বর্তমান ঐতিহাসিকেরা ক্রমশই মানুষের মনের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ছেন। বেনেডিক্ট্ এ্যাণ্ডারসন (Benedict Anderson) তাঁর *Imagined Communities* (1983) বইটিতে একথা বুঝিয়ে বলেন। তাঁর এই বক্তব্য অন্যান্য ঐতিহাসিকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তার ফলে দেখছি ইদানীং কালের দুটি বই *Imagining India* নাম নিয়েছে। একটি লিখেছেন কল্যাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এইনস্লি এমব্রি (Ainslie Embree), আর একটি লিখেছেন শিকাগো বিদ্যালয়ের রোনাল্ড ইণ্ডেন (Ronald Inden)। মনে হচ্ছে এই ঝোঁকটা চলবে। অবশ্য এর পিছনে আছে ঐতিহাসিকদের মানসিকতার উপর জোর। ফরাসী দেশে যে সার্বিক ঐতিহাস লেখার চেষ্টা হয়েছে তাতে এই মানসিক ইতিহাস লেখার চেষ্টাটা স্পষ্ট। আমাদের দেশেও এই চর্চা শুরু হয়েছে।

এই মানসিকতার চর্চাটি বাঙালীর ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে জরুরী। বাঙালী মানসিকতা যেরকম ভাবে তৈরী হয়েছে বাঙালী ইতিহাসও সেরকম হবে। এই প্রসঙ্গে এলে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার একটি সমস্যার কথা বলতে হয়। ধর্মসমাজের উপর জোর দিলে যেমন অন্য ধর্মের প্রতি একটি বিরূপ মনোভাব তৈরী হয় সেইরকম মাতৃভাষার উপর জোর দিলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সত্য তৈরী হতে পারে। যেমন পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, কি পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন রকম ভক্তির আয়োজন দেখা যায়। এই ভক্তির বিরুদ্ধে কোনো সত্য কথা বলা চলে না। একটা কথা বললেই এই বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রে শিবাজী মহারাজের প্রতি ভক্তির আধিক্য দেখতে পাচ্ছি। এরকম ভক্তি চললে ইতিহাস চর্চা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ যদি বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে চলে তাহলে ইতিহাস চর্চাই উঠে যাবে।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাঙালীর ইতিহাস চর্চার উপর যে বিশ্বাস রেখেছেন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এই আলোচনায় অবশ্যস্বীকার্য। প্রবোধচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে খুবই উঁচু স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে মাতৃভাষায় যদি আবেদন করা না হয় তাহলে কোন প্রেরণাই কাজ করে না। বাঙালী যেই হোক না কেন তাদের সাহিত্যচর্চা অবশ্যস্মরণীয়। এই সাহিত্যের সঙ্গে যদি ইতিহাস মেলানো যায় তাহলে হয়ত সিদ্ধি আসবে। এইজন্য রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা সম্পর্কে এই ছোট পুস্তিকাটিতে প্রবোধচন্দ্র অনেক কিছু লিখেছেন। রমেশচন্দ্র একাধারে সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। সে কথা প্রবোধচন্দ্র ভুলতে পারেন না। তাঁর চিন্তায় বাংলা সাহিত্য থেকেই বাংলার ইতিহাস আসে। সাহিত্য ও ইতিহাসের এরকম সংযোজন আর নেই। এর থেকেই প্রবোধচন্দ্র জোর দিয়েছেন নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাসে'র উপর। কিন্তু এই অমূল্য চিন্তার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নির্ভর করে আছে বাঙালীর ইতিহাস-সাধনার উপরে।

'বিশ্বনৃত্য'

জগদীশ ভট্টাচার্য

১

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় নবজীবনেব জোয়ার এসেছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করে একে বলা হয়ে থাকে উনিশ শতকের নবজাগরণ। একে বাঙালির নবজন্মও বলা যেতে পারে। অবশ্য এই নবজন্মের নামগোত্র নিয়ে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ অল্প নয়। কিন্তু একটি মধ্যযুগীয় জাতি এই নবজন্মের ফলে যে একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই আধুনিকতার অর্থ হল মানবসভ্যতায় নবযুগের পদসঞ্চার। য়ুরোপে এই নবযুগের সূত্রপাত হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে। তার পরের অর্ধ-সহস্রাব্দীর ইতিহাসে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবান্দোলন হয়েছে। এই বিভিন্ন ভাবান্দোলনের ফলে জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নবযুগের নব নব লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে এই নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছে ইংরেজ। যে ইংরেজ আমাদের পদানত পরাধীন করেছে সেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নয়। আধুনিক য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে যে ইংরেজ দেখা দিয়েছে তার মাধ্যমেই আমাদের দেশে আধুনিকতার আশীর্বাদ এসেছে। এই দুই ইংরেজের পার্থক্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছোট ইংরেজ' আর 'বড়ো ইংরেজ'। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের কালসীমা নবজাগরণের প্রথম যুগ।

এই প্রথম যুগের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন রামমোহন রায়। তাঁর আবির্ভাব-লগ্নকে বলা যেতে পারে আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে নবযুগের ব্রাহ্ম মুহূর্ত। তিনি সব্যসাচীর মতো একহাতে সংগ্রাম করেছেন ব্রিটিশ মিশনারিদের স্পর্ধিত আক্রমণের বিরুদ্ধে, অন্যহাতে তাঁর সংগ্রাম ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের জরাজীর্ণ স্থবিরত্বের সঙ্গে। এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি নবযুগের যে বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করলেন তা হল বৈদিক ঋষির মহামিলনের মন্ত্র: 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।' অর্থাৎ, এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। মানুষের এই ঐক্যই মানবসমাজের সবচেয়ে বড়ো সত্য। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছেন ভারতপথিক। তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার একসীমা চলে গেছে অতীত ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য পথ চলে গেছে বর্তমান পেরিয়ে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। পদে পদে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে-চলা সংকীর্ণ

আকারের গণ্ডি থেকে এই যে মানবমনের মুক্তি, এর মধ্যেই রয়েছে নবজাগরণের অরুণরশ্মি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আমাদের মনোলোকে মননের মহানদী গিয়েছিল শুকিয়ে। তখন জ্ঞানের বলবান প্রবাহ হয়েছিল অবরুদ্ধ, নবনব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি গিয়েছিল হারিয়ে, মাথা উঁচু করে উঠেছিল নিশ্চল লোকাচারের আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা। স্বভাবতই পরবর্তী শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজের নব আলোকপ্রাপ্ত ইয়ংবেঙ্গল দল সর্ব-সংস্কার-মুক্তির যে দক্ষযজ্ঞে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তার প্রলয়-উল্লাসে আত্যন্তিকতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই আত্যন্তিকতা নবসৃষ্টির প্রেরণায় গভীর প্রশান্তি লাভ করল নবজাগরণের কবিপুরুষ মধুসূদনের সারস্বত সাধনায়। তাঁরই সার্থকতম উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ যখন ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায় আবির্ভূত হলেন তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মহাসঙ্গম ঘটেছে মহানগরীর প্রাণপ্রবাহে। বিশ্বমানবতার এই চতুষ্পথে পৌঁছে বাঙালির নবজাগরণ অগ্রগতির চরম শিখরে উপনীত হল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।'[১] এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের যে-যুগের কথা বলেছেন তা হিন্দু-কলেজীয় ইংরেজি শিক্ষার যুগ নয়, তার পরবর্তী যুগ—যখন ইংরেজি শিক্ষামাত্রই নয়, ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে য়ুরোপের নবযুগের চিন্তাধারা আমাদের নবযুগের চেতনার উদ্বর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। আমরা বলেছি, এই স্তরে উপনীত হয়েই আমাদের নবজাগরণ অগ্রগতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। বাঙালি তখন বিশ্বপথিক হয়ে উঠেছে। একে বিশ্বমানবতাবোধও বলা যেতে পারে। দান্তে ও পেত্রার্কাকে ইতালীয় রেনেসাঁসের কবিপুরুষ বলে আখ্যাত করা হয়। দান্তেই প্রথম বলেছিলেন, 'আমার দেশ হল সারা পৃথিবী'—My country is the whole world. এই বিশ্বমানবতাবোধের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নতুন করে মানবমহিমার মূল্যায়ন। পরলোক নয়, ঈশ্বরও নয়, মানবতাই হল মানবসভ্যতার মধ্যমণি। এই মানবতাই হল মানুষের ধর্ম। দেশ ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই যে মানবতাবোধ, এরই নাম দেওয়া যেতে পারে মানবসাম্যবাদ। আমাদের নবজাগরণের মধ্যে এই মানবসাম্যবাদের চেতনা থেকেই আমরা চেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করার আগ্রহ, পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের প্রেরণা, শিল্পবিপ্লবোত্তর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষকে পণ্যে পরিণত করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আমাদের নবজাগরণের এই মৌল সূত্রগুলি গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষেও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মহাকালের এই রথযাত্রায় উল্টোরথের পালা আরম্ভ হয়েছিল চতুর্থ পাদের শুরু থেকে।

২

বিপিনচন্দ্র পাল উনবিংশ শতাব্দীকে দুভাগে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথম ভাগ ব্রাহ্মযুগ, দ্বিতীয় ভাগ বঙ্কিম-যুগ। বঙ্কিম-যুগ না বলে নব্যহিন্দুযুগ বলাই অধিকতর সমীচীন। এই নব্যহিন্দুযুগ প্রতিক্রিয়াপন্থী। এককালে হিন্দুকলেজের ইয়ং বেঙ্গল দল যেমন প্রগতির নামে আত্যন্তিকতার উপাসনা করেছিলেন, এই নব্যহিন্দুযুগের আর্যধ্বজাধারীর দলও তেমনি হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নামে

চরম প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দিলেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এঁদের পুরোধা। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'চন্দ্রনাথ বসুকে সে যুগের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একমাত্র প্রতীক বলিলে ভুল করা হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বঙ্গের বহু সামাজিক সংস্কার বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীদের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষদিগকে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে, কারণ উভয়কেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন ...।'[১] রবীন্দ্রজীবনীকারের এই মন্তব্য সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। একনিশ্বাসে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম প্রতিক্রিয়াপন্থী হিসাবে উচ্চারণ করা উচিত হয়নি। কিন্তু এই উল্টোরথের দিনে রবীন্দ্রচিত্ত যে বিশেষ ব্যথিত হয়েছিল তা তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'পরিত্যক্ত' প্রভৃতি কবিতায় সুপরিস্ফুট। এই চারটি কবিতা ১৮৮৮ সালের ১৮ থেকে ২৮ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে লেখা। 'বঙ্গবীর' কবিতায় কবি বলেছেন:

মোক্ষমূলর বলেছে "আর্য"
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য।
আরামে পড়েছি শুয়ে!
মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই, —করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক তারে ধিক,
শাপ দি পইতে ছুঁয়ে।

কবির আক্ষেপ চূড়ান্ত ভাষা পেয়েছে 'পরিত্যক্ত' কবিতায়। 'বন্ধু' সম্বোধন করে পরম ক্ষোভের সঙ্গে কবি বললেন:

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান
কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে বন্ধু তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
... ...
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।
... ...
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে,
উজান স্রোতের কাল।

নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি?
...   .
ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলি সাথে তারে
করে দিই একাকার।

এই প্রসঙ্গে 'সোনার তরী'র 'হিং টিং ছট্' কবিতাটির কথা মনে পড়বে। 'পরিত্যক্ত' কবিতায় ছিল আক্ষেপ, 'হিং টিং ছটে' হয়েছে বিদ্রূপ। ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবে কবিতাটি উৎকৃষ্ট। প্রভাতকুমার হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ('বঙ্গভাষার লেখক') সাক্ষ্য উদ্ধার করে বলেছেন, চন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, শশধর তর্কচূড়ামণি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম তেমনি আমার সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা কিছু আছে সকলেই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম। যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম।' এই শ্রেণীর যুক্তিরই উপযুক্ত উত্তর 'হিং টিং ছটে'র স্বপ্নকথা।[৩]

'হিং টিং ছট্'কে বলা হয়েছে স্বপ্নমঙ্গল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, তেমনি স্বপ্নমঙ্গল, অর্থাৎ স্বপ্নের মহিমাকীর্তনই স্বপ্নমঙ্গলের উদ্দেশ্য। রাজা হবুচন্দ্র ভূপ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, তার অর্থ আবিষ্কার করতে গিয়ে রাজ্যসুদ্ধ লোকের মুখে আহার নেই, চোখে নেই ঘুম। অযোধ্যা, কনোজ, কাঞ্চী, মগধ, কোশল থেকে পণ্ডিতের দল এসে শাস্ত্রগ্রন্থাদি ঘেঁটে ঘেঁটে তার কোনো অর্থ খুঁজে পেলেন না। ডাকা হলো ম্লেচ্ছদেশের পণ্ডিত সমাজকে। ফরাসি পণ্ডিত বললেন, 'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে/হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে/ কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান / যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।' ফরাসি পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনে ধিক্কার দিয়ে সবাই বললেন, 'কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক'। অবশেষে এলেন গৌড়ীয় সাধু।—

স্বপ্ন কথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সংবর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসংবাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ।

ধারণা পরমাশক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট--
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট্'।

স্বপ্নের এই 'অতি পরিষ্কার' 'নিতান্ত সরল অর্থ' শুনে 'সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার / সবে বলে পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।' নবীন গৌড়ীয় সাধুর অতি পরিষ্কার এই স্বপ্নমঙ্গল-ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়। তৎকালীন নব্যহিন্দুদের লক্ষ করে অত্যুৎকৃষ্ট স্যাটায়ার হিসাবে সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। কালের গণ্ডি পেরিয়ে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রতিক্রিয়াশীল আত্যন্তিকতার বিরুদ্ধে প্রগতির পুরোধার এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিন্দা নয়, প্রশংসাই দাবি করে।

৩

প্রতিক্রিয়াশীল আত্যন্তিকতার একটা বড়ো উপকরণ হল কূপমণ্ডূকতা। রবীন্দ্রনাথ এই কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে চিরদিন তাঁর ভৎর্সনাবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিশ্বভাবনা বিশ্বপ্রেম তাঁর সাহিত্যের এক মৌলিক উপাদান। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'কবিকাহিনী'। ('বনফুল' তার আগের রচনা হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে পরে।) 'কবিকাহিনী' 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বৎসরে, ১২৮৪ সালের পৌষ থেকে চৈত্র—এই চাব মাসে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ষোলো বছর আট থেকে এগারো মাস। কিশোর কবির মানসলোকে যে কবিসত্তা স্বপ্নতনুতে বিরাজমান ছিল কবিকাহিনীর কবিচরিত্র তারই অভিযোজন। কবির বাল্য কেটেছে প্রকৃতিব কোলে। যৌবনে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা অন্তরঙ্গতর হল। কবিহৃদয়ের উপমান হল সমুদ্র। রবীন্দ্রনাথ 'সিন্ধুহৃদয়' কথাটিই ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতিপ্রেমিক কবি মহাপ্রকৃতিব বন্দনা-গান গেয়ে বেড়াতো। সে মহাপ্রকৃতি 'অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়'কে আশ্রয় করে রয়েছে। দ্বিতীয় সর্গে দেখা দিয়েছে কবিমানসের অতৃপ্তি। শুধুমাত্র নিসর্গ প্রকৃতি কবিহৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পারে না। 'মানুষের মন চায় মানুষেব মন।' দৈবাৎ কবিজীবনে এল অরণ্যদুহিতা নলিনী। কবিকে সে ডেকে নিয়ে গেল তার অরণ্যকুটিরে। দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসলো। কী সুখেই না কাটতে লাগলো তাদের দিনগুলি। কিন্তু তবু কবির মনে তৃপ্তি নেই। কবিবল্লভের নায়িকা বলেছিল 'লাখ লাখ যুগ/হিয়ে হিয় রাখনু/তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' কবির প্রেম তারই অনুরূপ। তাই তার অন্তর চির-অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তি ঘোচাবার জন্যে কবি পৃথিবী পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ করলো। নলিনী মর্মভেদী চোখের জলে কবিকে শেষবিদায় জানালো। তৃতীয় সর্গে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে কবি ফিরে এল নলিনীর কুটিরে। কত দেশদেশান্তর সে ভ্রমণ করেছে। কিন্তু নলিনীকে পাওয়ার পূর্বে তার কাছে প্রকৃতির যে আকর্ষণ ছিল, নলিনীর ভালোবাসা পাওয়ার পর সে আকর্ষণ আর রইলো না। কিন্তু নলিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন সম্ভব হল না। কবি চলে যাওয়ার পরে নলিনীর জীবন শূন্য হয়ে গেল। দিনে দিনে তার নিরানন্দ নিঃসঙ্গ জীবনের দীপশিখা নির্বাপিত হল। শূন্য কুটিরে 'বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।'

পরিণত বয়সে কবির মৃত্যুতে 'কবিকাহিনী' সমাপ্ত হয়েছে। ততদিনে প্রকৃতি ও মানুষের প্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তর লাভ করেছে। 'হিমাদ্রি হোতে ও বুঝি সমুচ্চ মহান' কবি তার সত্তার দোসর হিমালয়ের কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে তার জীবন-সংগীত রচনা কবেছে। বিশ্ব পরিক্রমায় সে দেখেছে 'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে।' তাই তার প্রার্থনা

কবে দেব, এ রজনী হবে অবসান
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক 'স্বর্গ' পূর্ণ করি!

ত্রিকালজ্ঞ কবিকণ্ঠ বলছে :

দূরভবিষ্যৎ সেই পেয়েছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

করুণার্দ্র কবিকণ্ঠের এই মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতটি 'কবিকাহিনী'র মহত্তম সম্পদ। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত।

'কবিকাহিনী' সমকালীন সমালোচনায় প্রশংসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ভারতীর রচনাগুলির মধ্যে 'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা'র জন্য লজ্জিত বোধ করেছেন। 'কবিকাহিনী' সম্পর্কে বলেছেন, 'যে-বয়সে লেখক আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে-কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে,— লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও নহে— যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে, তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।'[৪]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অত্যন্ত কঠোর হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। কারণ 'কবি-কাহিনী'তেই বিশ্বানুভূতির বীজ উপ্ত হয়েছিল। যথাকালে তা মুকুলিত ও পল্লবিত হবে। 'জীবনস্মৃতি'তে সদর স্ট্রিটের যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে সেখানে এই বীজ একটা জীবন্ত শিশুবৃক্ষের আকার গ্রহণ করেছে। ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখতে দেখতে যে অনুভূতির উদয় হয়েছিল তার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।'[৫] সেইদিনই কবি লিখলেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।' 'আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর,/কেমনে পশিল গুহার আঁধারে/প্রভাত-পাখির গান/না জানি কেন রে এত দিন পরে/জাগিয়ে উঠিল প্রাণ।' নির্ঝরের রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বলে কবিতার শেষ স্তবকে এসেছে মহাসাগর। 'কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,/দূর হতে শুনি যেন

মহাসাগরের গান।' কবিজীবনে এই কবিতার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে কবি বলছেন, 'সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।'[৬] কবি দিন কয়েকের মধ্যে লিখলেন 'প্রভাত-উৎসব।'

বললেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'প্রভাত-উৎসব' একই প্রেরণার উৎস থেকে উৎসারিত। বলেছি, নির্ঝরের রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বলে তার পরিণতি হয়েছে মহাসাগরে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের (১৯৩৩) এই মহাসাগরই হয়েছে মহামানব। রবীন্দ্রনাথ বললেন মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছেন সংক্ষেপে তার ভূমিকা লেখা হয়েছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। তিনি বলছেন, 'এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।'[৭] লক্ষ করার বিষয় হল বাহাত্তর বৎসর বয়সে মানুষের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'কেই স্মরণ করেছেন। অথচ বলছেন, 'মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয়নি।'[৮] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে। কবির বয়স তখন একুশ পেরিয়ে বাইশ চলছে। তাকে কবি বলছেন 'বালকের কাঁচা লেখা।' তিনি যে সতেরো বছর বয়সের লেখা কবিকাহিনীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিশ্বানুভূতির কাব্য হিসাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পর 'কড়ি ও কোমল'-এর 'আহ্বানগীত'-এর উল্লেখ করতে হয়। কবি বলছেন :

চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব-হৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।

মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।

বিষয়গৌরবে কবিতাটি প্রশংসনীয়, কিন্তু ভাষার আড়ষ্টতা তখনো ঘোচেনি। তাই এ-কবিতাও কবির বিচারে উত্তীর্ণ হবার কথা নয়।

৪

বিশ্বানুভূতির কবিতা হিসাবে 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্য' ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য। 'সোনার তরী'তে

আরো দুটি কবিতা আছে যাতে বিশ্বানুভূতি বা সর্বানুভূতি ভাষা পেয়েছে, 'বসুন্ধরা' আর 'সমুদ্রের প্রতি'। বসুন্ধরা কবিতায় বিশ্বানুভূতি চির অতৃপ্ত। কবি বলছেন, 'ইচ্ছা করে আপনার করি যেখানে যা-কিছু আছে', ...'ইচ্ছা করে মনে মনে/স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে/দেশে দেশান্তরে।' তাই জননী বসুন্ধরার কাছে কবির ঐকান্তিক প্রার্থনা :

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, —গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি ভেঙেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্রদিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানি যত,...।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবি সিন্ধুকে বলেছেন, আদিজননী, বসুন্ধরা তার একমাত্র সন্তান। নিজেকে বলছেন পৃথিবীর শিশু :

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার— বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই।

মাতামহীর সঙ্গে এই নিগূঢ় রক্তের সম্পর্ক কবিচিত্তে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। উপনিষদের ভাষা 'সর্বানুভূ'কে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, কবি এখানে সমুদ্রানুভূ। এই ভাব বৌদ্ধ 'মেত্তিভাবনা'র সহোদর। একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের অপরিমেয় মানস বিশ্বভুবনে সম্প্রসারিত করার নামই মেত্তিভাবনা বা মৈত্রীভাবনা। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় এই মেত্তিভাবনারই অন্য নাম বিশ্বভাব বা সর্বানুভূতি। আদিজননীকে সম্বোধন করে কবি বলছেন,

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকার প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবির সর্বানুভূতি চতুর্দশাক্ষর পয়ার ও অষ্টাদশাক্ষর মহাপয়ারে গ্রথিত হয়েছে। ছন্দবিজ্ঞানী আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দরীতিকে বলেছেন মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত। লক্ষ করলে দেখা যাবে উভয়ক্ষেত্রেই ছন্দ প্রবহমান, কিন্তু সমিল। উদাত্ত গম্ভীর ভাবপ্রকাশের জন্য মিশ্রবৃত্ত ছন্দ সর্বার্থসাধক। কিন্তু সুললিত গীতিকবিতার সার্থক বাহন কলাবৃত্ত ছন্দ। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় কলাবৃত্ত ছন্দ সুমধুর ধ্বনি-সংগীতে কর্ণরসায়ন হয়ে উঠেছে।

৫

'বিশ্বনৃত্য' পনেরোটি সুগঠিত স্তবকে গ্রথিত। মাত্রাসংখ্যা নিম্নরূপ :

৬ + ৬ + ৬ + ৩
৬ + ৬ + ৬ + ৩
৬ + ৬
৬ + ৬
৬ + ৬ + ৬ + ৩

বিপুল গভীর/মধুর মন্দ্রে/
কে বাজাবে সেই/বাজনা।১।।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।২।।
টুটিবে বন্ধ মহা আনন্দ,।৩।।
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,।৪।।
হৃদয়-সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।৫।।

প্রথমেই নজরে পড়ে 'নৃত্য' কথাটি। পনেরো স্তবকে নৃত্যের ভাবনা এসেছে চার বার।

প্রথম স্তবকে 'উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য', পঞ্চম স্তবকে 'গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল/ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল', অষ্টম স্তবকে 'নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম/বাহুতে বাহুতে ধরিয়া/' এবং চতুর্দশ স্তবকে 'জগৎ মাতানো সংগীততানে/কে দিবে এদের নাচায়ে।' প্রথম স্তবকের অর্থ হল, নেচে উঠবে চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। পঞ্চম স্তবকের অর্থ, গ্রহমণ্ডল আনন্দে পাগল হয়ে চিরচঞ্চল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। অষ্টম স্তবকের অর্থ, ছয় ঋতু অবিবাম গতিতে ঘুরে ঘুরে আসে। চতুর্দশ স্তবকের অর্থ, জগৎ-মাতানো সংগীতের সুরবিস্তারে কে এদের পুলকিত করে তুলবে!

এই নৃত্য বা নাচের তাল পরিদৃশ্যমান হয়েছে 'ক্ষণিকা'র নববর্ষা কবিতায় :

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি নৃত্যময় সংগীতে কথা স্বভাবতই মনে পড়ে :

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তা তা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।।
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দ ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ--
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।।

নটরাজের প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ' ধ্রুবপদ-এর অনুষঙ্গে মনে হতে পারে ওটি নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এই গানের ভাষাটি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ভক্ত কবীরের একটি দোহা থেকে। তার প্রথম পংক্তি হল 'নাচো রে মেরা মন মত্ত হোই।' ...দিন রাত বাজে প্রেমের রাগিণী (প্রেমকী রাগ বজায় রৈন দিন) ...তাই শুনে আনন্দে নাচে জন্মমৃত্যু।...হাসিকান্নায় জাগে জগৎ। ...কবীর স্পষ্ট ভাষাতেই বলছেন, প্রেমের রাগিণীতে তাঁর মন মত্ত হয়ে থাকছে, আর সেই আনন্দেই সৃষ্টিকর্তা পাচ্ছেন আনন্দ।*

'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়ও যে তালে ছন্দ বাজছে তা হল 'বিপুল গভীর মধুর মন্দ্র'। আনন্দের উৎসারই এই কবিতার প্রেরণা। যে বেদনায় মানসীর 'পরিত্যক্ত' প্রভৃতি কবিতা রচিত, সেই বেদনাই বিশ্বনৃত্য কবিতায় লগ্ন হয়ে আছে। কবিতার একাদশ ও দ্বাদশ স্তবক-দুটিতে পরিস্ফুট হয়েছে সেই বেদনা :

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি-সমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরান,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসার-স্রোত জাহ্নবীসম
বহুদূরে গেছে সরিয়া।

এ শুধু উষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে আছে এক মহানির্বাণ
আঁধার-মুকুট পরিয়া।

এই নিরানন্দ দুর্গতির গতিহীনতার বিরুদ্ধেই বিশ্বনৃত্যের আবাহন!

ওগো কে বাজায়— বুঝি শোনা যায়--
মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

এই বাজনা শুনে 'দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু/ বন্ধনপাশ নাশিবে/অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে/অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।' নিসর্গলোকে গ্রহমণ্ডলের চিরচঞ্চলতা, সহস্রশির-নাগিনী সিন্ধুর উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গ, বন্ধুর শিলাসরণে নির্ঝরের কোমল কণ্ঠে কুলুকুলু সুরের কলধ্বনি এবং বিচিত্র সাজে সজ্জিত ষড়্ঋতুর নিয়মিত আগমন নির্গমনের গতিচক্রে আবর্তিত হয়ে এসেছে জীবলোকের জন্ম-মৃত্যুর রস-রহস্য। কবি বলছেন, অন্তর-আসনে বসে কে কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর বাজাচ্ছে। তারি শাসনে 'মহান মানব-মানস' সর্বদা উদয়-বিলয়ে বিঘূর্ণিত হচ্ছে। এই বিশ্বনৃত্যে যোগ দেবার জন্য কবির ব্যাকুলতা ভাষা পেয়েছে ত্রয়োদশ স্তবকে :

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।

যারা জড়তায় মৃতবৎ হয়ে আছে তাদের জীবনে বিশ্বনৃত্যের হিন্দোল দোলায়িত হোক্, এই বাসনা ভাষা পেয়েছে উপান্ত স্তবকে :

জগৎ-মাতানো সংগীত-তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজাল পাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

অন্তিম স্তবকে প্রথমের পুনরাবর্তনে কবির বক্তব্য শবলিত হয়ে সমে এসে পৌঁছেছে। ব্যক্ত হয়েছে কবির অভিপ্রায়! 'বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে বাজুক বিশ্ব বাসনা।' কবিতার স্তবকে স্তবকে কবির বিশ্বানুভূতি সুললিত কলাবৃত্ত ছন্দে সার্থক কাব্যরূপ পেল। একথা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে যে জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।' শান্তিনিকেতন ভাষণাবলীর 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে...চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানাদিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্ববোধকে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছেন 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'মানবসত্য' নিবন্ধে। বলেছেন, মানুষ জীবসত্তাকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ করতে পারে ত্রিজত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উত্তুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানবের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষ জাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীত কালে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈবি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষজাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান-- একদিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

'তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক।'[১১]

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় এই ত্রিজত্ব লাভ করলেই মানুষ হয় সর্বানুভূ। অর্থাৎ তখনই তার মধ্যে সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতি সত্য হয়ে ওঠে। মহাকালের যাত্রায় উল্টো রথের দিনে বিশ্বনৃত্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতিকে ধ্যান করেছেন। তাতেই রচিত হয়েছে তাঁর সমগ্র কাব্যের ভূমিকা। জীবনের শেষ দশকে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বর্ণিত মানুষের ত্রিজত্বের ভিত্তিতে সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতিও পেয়েছে নতুন মাত্রা।

উল্লেখসূত্র :

১. 'কালান্তর' গ্রন্থের 'কালান্তর' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী চতুর্বিংশ খণ্ড পৃ ২৪৭।
২. 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সং, ১৩৭৭, পৃ ২৫৪।
৩. তদেব পৃ ৩২৪।
৪. 'জীবনস্মৃতি', ভারতী, রর(বি) ১৭, পৃ ২৫৪-৩৫৫।
৫. তদেব, পৃ ৩৯৬।
৬. জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি, রর ১৭৭, পৃষ্ঠা ৩৯৬, পাদটীকা।
৭. 'মানুষের ধর্ম', রর(বি)-২০, পৃ ৪২৬।

৮. তদেব।

৯. দ্রষ্টব্য : 'তপোভঙ্গ', 'রবীন্দ্রকবিতাশতক' -৩, পৃ ৯।

১০. রর(বি), চতুর্দশ খণ্ড পৃ ৫১২।

১১. 'মানবসত্য', 'মানুষের ধর্ম', রর(বি)-২০, পৃ ৪২১।

মানুষের পরিচয়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিলেত থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে যান অন্নদাশংকর রায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু আই. সি. এস. অফিসার হিসাবে তিনি যে বঙ্গভূমিকেই তাঁর কাজের জায়গা বলে বেছে নিয়েছেন, এই খবর শুনে কবি বিশেষ খুশি হননি। বলেছিলেন, "তুমি বেঙ্গল চেয়ে নিলে কেন? আমি ইউ. পি. চাইতুম।"

ইউ. পি. অর্থাৎ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস (এখনকার উত্তরপ্রদেশ) নেহাতই কথার কথা। কিংবা বলা যায়, নিতান্ত একটা উদাহরণ মাত্র। আসলে বাংলার পরিবর্তে অন্য যে-কোনও প্রদেশকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে তিনি চাইতে পারতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন চাইতেন? চাইবার ইচ্ছাটা যদি হত রবীন্দ্রনাথের না-হয়ে অন্য-কারও তা হলে স্বচ্ছন্দে বলা যেত যে, বঙ্গভূমি সম্পর্কে তিনি বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা বলা যাচ্ছে না। কেননা, ভাবতভূমির যে অঞ্চলে তিনি জন্মেছেন, যার ভাষা সংস্কৃতি ও ভূপ্রকৃতি থেকে নিরন্তর তিনি নিষ্কাশন করেছেন তাঁর প্রাণরস ও শিল্পকর্মের প্রেরণা, সেই বঙ্গভূমি সম্পর্কে তাঁর মমতা যে কত গভীর ছিল, সে তো তাঁর রচনাসম্ভার থেকেই আমরা জেনেছি। দেখেছি যে, কবির এই মমত্ববোধের স্বাক্ষর সেখানে অবিরল ফুটছে।

কর্মক্ষেত্র হিসাবে অন্য কোনও প্রদেশকে চেয়ে নেবার যে ইচ্ছা, তার কারণ তা হলে ভিন্ন। সেটা এই হতে পারে যে, বাঙালি তার আজন্ম-পরিচিত সামাজিক ও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না-থেকে আরও ব্যাপ্ত হোক, আরও বিস্তৃত হোক, এই ছিল তাঁর কামনা। তিনি চেয়েছিলেন, সে পরিচিত হোক অন্য ভাষা ও ভিন্নতর সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে। প্রাদেশিক পরিচয়ের মধ্যেও অগৌরবের কিছু নেই, কিন্তু তার গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে দেশটাকেও সে চিনুক, এবং দেশভিত্তিক পরিচয়ের মধ্যেও যে তার আত্মপরিচয় বিধৃত হয়ে আছে, সেটা জানুক। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকেও সে তার আত্মীয় বলে গ্রহণ করুক। সে বাঙালি হয়ে জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু নিতান্ত বাঙালি হয়েই যেন সে অতিবাহন না করে তার জীবন। তুলনায় যা তাঁর ছোট পরিচয়, তার থেকে আরও বড় পরিচয়ের ক্ষেত্রে তার উত্তরণ ঘটুক।

উনিশ শতকের যে বাঙালি মনীষীদের আমরা ভারতপথিক বলে জানি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই একজন। বাঙালি হিসাবে তাঁর যে পরিচয়, তাকে অম্লান রেখেও তাই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ভারতীয় হিসাবে তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্রে। আবার তাতেও যে তিনি তৃপ্তি মানেননি, খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন তাঁর আরও বড় পরিচয়, তাও আমরা বুঝতে পারি, যখন তাঁকে বলতে শুনি—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া/ দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া। বস্তুত, বাঙালিয়ানা আর ভারতীয়তার সীমানা ছাড়িয়ে তিনি যে মনুষ্য-পরিচয়কেই তাঁর বৃহত্তম ও চূড়ান্ত পরিচয় হিসাবে ইতিমধ্যে শনাক্ত করতে পেরেছেন, তাতে আর তখন আমাদের কোনও সংশয় থাকে না। তিনি বিশ্ব-নাগরিক, প্রদেশ কিংবা দেশের গন্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন, গোটা বিশ্বপৃথিবীই তাঁর ঠিকানা। সব দেশের ঘরই তাঁর ঘর, সব ঘরের সব মানুষই তাঁর স্বজন। যার চেয়ে বড় পরিবার আর হয় না, সেই মনুষ্য- পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে তাঁর চূড়ান্ত পরিচয়কে তিনি তখন চিনে নিয়েছেন।

প্রাচীন কালের ভারত-মানস সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তাই মনুষ্য-পরিচয়কেই মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় বলে জানার ও গ্রহণ করার এই ব্যাপারটা সে-কালের শাস্ত্রে কিংবা সাহিত্যে কতটা ব্যক্ত কিংবা বিম্বিত হয়েছিল, অথবা আদৌ হয়েছিল কি না, তা অন্যেরা বলবেন। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, গত শতকে ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাবনা-চিন্তায় যে প্রবল আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, এবং — রেনেসাঁসের সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ না-থাকা সত্ত্বেও — যাকে আমরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস বলে গৌরববোধ করে থাকি, অন্তত এ-কালে তারই পুরোবর্তী চিন্তানায়করা প্রথম ওই চূড়ান্ত পরিচয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। তাঁরাই প্রথম নানাভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, আমরা যে বাঙালি বেহারি গুজরাতি কি মরাঠি, হিন্দু মুসলিম শিখ কি খ্রিস্টান, এ-সব পরিচয়ের কোনওটা‌ই অগ্রাহ্য করার নয় ঠিকই, কিন্তু এগুলির সবই আমাদের ছোট-পরিচয়। এই অর্থে ছোট যে, এর যে-কোনও একটিকে যখন একান্তভাবে আমরা আঁকড়ে ধরি, তখনই ছোট হয়ে যায় আমাদের বৃত্ত, আমরা গুটিয়ে যাই এক-একটা খোলসের মধ্যে। তাঁরা এই খোলস থেকেই আমাদের বেরিয়ে আসতে বলেন; জানিয়ে দেন যে, গুটিয়ে যাওয়া নয়, ছড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেই আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। সেই সার্থকতা যদি অর্জন করতে হয়, তবে ছোট-পরিচয়ের বৃত্ত ছেড়ে বড়-পরিচয়ের, মনুষ্য-পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

উত্তরণের পথে বাধা কি নেহাত কম? আছে ভিতরের বাধা, আজন্মলালিত অভ্যাসে যা তৈরি হয়। আছে বাইরের বিঘ্ন, অভ্যাসগুলি বর্জন করলে কে কী বলবে, এই উদ্বেগ ও আশঙ্কা যাকে শক্তি জোগায়। আছে, বর্ণাভিমান, জাত্যভিমান, ধর্মাভিমান, দেশাভিমান। অন্য বর্ণ , অন্য জাতি, অন্য ধর্ম ও অন্য দেশের মানুষদের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকে যা আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। অধিকাংশ মানুষই এসব বাধাবিঘ্নের গন্ডি অতিক্রম করতে পারেন না। কিন্তু যাঁরা বড় মাপের, বড় মনের শিল্পী স্রষ্টা ও ভাবুক, সমস্ত বাধাবিঘ্নই তাঁরা অক্লেশে পেরিয়ে যান। মানুষের ওই চূড়ান্ত পরিচয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের তৃপ্তি নেই।

পরিচয় প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। সেটা এই যে, আমাদের গুটিকয় পরিচয় আমরা জন্মসূত্রেই পেয়ে যাই। জন্মসূত্রেই আমরা বাঙালি। একই সঙ্গে, হিন্দুর ঘরে জন্মালে হিন্দু, মুসলমানের ঘরে জন্মালে মুসলমান, শিখ-পরিবারের সন্তান হলে শিখ, খ্রিস্টান-পরিবারের সন্তান হলে খ্রিস্টান। ধর্মের মধ্যেও আবার রয়েছে নানা বর্ণ ও শ্রেণী, শাখা ও সম্প্রদায়। জন্মগ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই সেসব বর্ণ, শ্রেণী, শাখা ও সম্প্রদায়েরও একটা-না-একটার লেবেল সেঁটে যায় আমাদের কপালে। এই যে এতগুলি পরিচয়ের কথা এখানে জানানো হল, আবার বলি, এর সবই আমাদের জন্মসূত্রে লব্ধ, কোনওটাই আমাদের উপার্জিত নয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নানা উপার্জিত পরিচয়ও আমাদের জুটে যেতে থাকে। কে কোন ইস্কুল

কিংবা কলেজের ছাত্র, সেটা তাঁর একটা পরিচয়। তার পরবর্তী পর্যায়ে নানা রকমের বৃত্তির পরিচয়েও আমরা পরিচিত হই। ইনি ডাক্তার, উনি ইঞ্জিনিয়ার, তিনি ব্যবহারজীবী, রাজনীতিক, ইস্কুল কি কলেজের শিক্ষক, সমাজকর্মী বা অন্য কিছু। রাজনীতিক হলে আবার তিনি কোন দলের রাজনীতিক, বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী না মধ্যপন্থী, সেটাও একটা উল্লেখ করার মতো পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, যেমন বাম, তেমন দক্ষিণ পন্থাবও যে আছে নরম চরম ইত্যাদি গলিঘুঁজি, তা তো আমরা জানিই। ইনি দক্ষিণ-ঘেঁষা বামপন্থী, উনি বাম-ঘেঁষা দক্ষিণপন্থী, এ-সব পরিচয়ের কথা কি আমরা অহরহ শুনতে পাই না?

প্রদেশভিত্তিক পরিচয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এই পরিচয়েই এ-দেশের বাদবাকি এলাকার মানুষরা আমাদের চেনে। ভারতবর্ষের যেখানেই আমরা যাই না কেন, সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে আমরা বাঙালি মাত্র, অন্য কিছু নই। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে গেলে অবশ্য অন্য কথা। তখন দেখব, অন্যান্য দেশের মানুষরা আমাদের বাঙালি বলে চিনছে না, চিনছে ভারতীয় বলে। বস্তুত আমাদের পাসপোর্টে ওই ভারতীয়-পরিচয়টাই লেখা থাকে, বাঙালি-পরিচয়ের কোনও উল্লেখ সেখানে থাকে না।

ভারতীয়-পরিচয় যে বড়-পরিচয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওটাই যৎপরোনাস্তি পরিচয় কি না। অর্থাৎ পরিচয়েব সীমানা কি ওখানেই শেষ হয়ে গেল? ওর চেয়েও বড় কোনও পরিচয় কি আমাদের থাকতে পাবে না? কিংবা অন্য কথায়, এমন কোনও অবস্থা কি আমরা কল্পনাই করতে পারি না, যখন ভারতীয়-পরিচয়ের চেয়েও বৃহৎ কোনও পরিচয় লেখা হবে আমাদের?

পরলোক সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার নেই। তবে এটা জানি যে, প্রায় সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থেই এর একটা উল্লেখ রয়েছে বটে। আছে আমাদের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেও। তা পরলোক বলে সত্যিই যদি কোনও জায়গা থাকে, তবে অনুমান কবি, চিত্রগুপ্ত বলে একজন হিসাবরক্ষকও সেখানে থাকবেন হয়তো, আর তাঁর সামনে একটা খাতাও হয়তো খোলা থাকবে। কথা হল সেই খাতায় আমাদের নামের পাশে কোন পরিচয় লিখবেন তিনি? সেখানে কি আমাদের ভারতীয় পরিচয়ের উল্লেখ থাকবে? নাকি, নেহাতই যদি না এই পার্থিব জীবনটা অমানুষের মতন যাপন করে থাকি, তবে শুধু এইটুকুই সেখানে লেখা হবে যে, পৃথিবী থেকে আর একটা মানুষ এল?

যাঁরা বড মাপের, বড় মনের স্রষ্টা কিংবা শিল্পী কিংবা ভাবুক, মনুষ্য-পরিচয়ের সন্ধানে বেরিয়ে অবশ্য পরলোক নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় না তাঁদের। আমরা যে-ভাবে দেখি, সেইভাবে, অর্থাৎ নানা ভৌগোলিক সীমানায় খণ্ড-খণ্ড করে, এই ইহলোককেই তাঁরা দেখেন না। মনের দিক দিয়ে তাঁরা বিশ্বনাগরিক। তাই গোটা পৃথিবীই তাঁদের ঘর, গোটা মনুষ্যসমাজই তাঁদের স্বজন। যদি বলি যে, উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যাঁরা প্রবক্তা, মনুষ্য-পরিচয়ের উপরে আঙুল রেখে এই রকমের বৃহৎ একটি ধারণার ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজকে তাঁরা সামগ্রিকভাবে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন, তা হলে হয়তো ভুল বলা হবে না।

মানুষের ছোট-ছোট পরিচয়ের প্রসঙ্গে বলি, এগুলি যে তার বড়-পরিচয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, এমন কোনও কথা নেই। দাঁড়াতেও পারে, না-ও দাঁড়াতে পারে। অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র তখনই, যখন ওই ছোট-ছোট পরিচয়কেই সে তার একান্ত পরিচয় বলে আঁকড়ে ধরে। অর্থাৎ সে যখন নিতান্ত হিন্দু, নিতান্ত মুসলমান, নিতান্ত বাঙালি, নিতান্ত বেহারি কি এইরকমের

নিতান্ত-কিছু একটা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবা যাক। তাঁর অনেক পরিচয়ের একটা তো অবশ্যই এই যে, তিনি জমিদার-বংশের সন্তান। শুধু তা-ই নয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য পুত্রের তুলনায় এমনকী জমিদারি-পরিচালনার কাজটাও যে তিনি অনেক ভাল জানতেন, তাও আমরা শুনেছি। কিন্তু তা-ই বলে তিনি নিতান্ত জমিদার ছিলেন না। তা যদি হতেন, তবে 'দুই বিঘা জমি'র মতন কবিতা লেখার কথা মনেও আসত না তাঁর। ওই কবিতায় আমরা কী দেখছি? না নিজে জমিদার হয়েও, জমিদারের পক্ষে নয়, জমিদারের দ্বারা উৎপীড়িত নিগৃহীত একজন প্রজার পক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। জমিদার যে পরস্বাপহারক, প্রজার মুখ দিয়ে এই কথাটা বলিয়ে নিতে তাঁর কোনও কুণ্ঠা হয়নি। (এ জগতে হায় সে-ই বেশি চায়, আছে যার ভূরি-ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।) এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। যা প্রমাণ করে যে, তাঁব যেটা ছোট-পরিচয়, জমিদার-পরিচয়, তাকে তিনি অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকেন না, অতি অক্লেশে তাকে ছাড়িয়ে যান।

তাঁর বাঙালি-পরিচয়ের বেলাতেও এই একই ব্যাপার ঘটতে দেখি। বঙ্গভূমি ও বাঙালি সমাজ সম্পর্কে, আমরা গোড়াতেই বলে নিয়েছি, তাঁর মমত্ববোধের অন্ত নেই। বাংলা তাঁর কাছে 'সোনার বাংলা', যাকে তিনি ভালবাসেন, যার আকাশ-বাতাস তাঁর প্রাণে বাঁশি বাজায়, যার 'মুখের বাণী' তাঁর কানে সুধার মতো লাগে। আর বাঙালি জনসমাজ? তাঁর প্রার্থনা, এই সমাজের পণ আশা কাজ ভাষা, সবই সত্য হোক। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা লক্ষ করি যে, যা নিয়ে তাঁর এত গৌরববোধ, এত ব্যাকুলতা, সেই বাঙালি-পরিচয় কখনওই তাঁর ভারতীয়-পরিচয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে গোরা বলে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোনও সমাজের কোনও বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" বলা বাহুল্য, এ-উক্তি একটি উপন্যাসের একটি চরিত্র মাত্রের নয়। এ-উক্তি রবীন্দ্রনাথেরই। তাঁরই কথাকে তিনি গোরার মুখে বসিয়ে দিয়েছেন।

আবার তাঁর এই ভারতীয়তাকে পরম ধনের মতো বুকের মধ্যে আগলে রেখেও তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ব-নাগরিক, মনুষ্য-পরিচয়ই যে মানুষের চূড়ান্ত পরিচয়, এই সত্যকে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন। তাঁর কোনও পরিচয়ই এই শেষ পরিচয়ের সঙ্গে কোনও বিরোধ ঘটায় না।

এইবারে বলি, জন্মসূত্রে আমরা যেমন বাঙালি এবং, একই সঙ্গে, হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান, তেমনই আবার আমরা যে মানুষ, এই পরিচয়ও কিন্তু ওই জন্মসূত্রেই পাওয়া। অথচ এই চূড়ান্ত পরিচয়টাই আমরা মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। অন্য ভূ-ভাগের অন্য ভাষার অন্য সংস্কৃতির অন্য ধর্মের অন্য বর্ণের মানুষরাও যে আমাদের স্বজন,– আর কিছু নয়, মনুষ্য-পরিবারের সদস্য বলেই আমাদের স্বজন, তা আর আমাদের মনে থাকে না। ছোট-ছোট পরিচয়গুলিকেই যৎপরোনাস্তি পরিচয় বলে জ্ঞান করে ছোট-ছোট সব গণ্ডির মধ্যে আমরা সেঁদিয়ে যাই, এবং গণ্ডির বাইরের প্রতিটি মানুষকে শত্রু বলে ভাবতে থাকি।

এমনটা যে শুধু আমরাই ভাবি, তা নয়, গোটা পৃথিবী জুড়েই এই রকমের ভাবনা মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দেয়। মানুষের ছোট-ছোট পরিচয়গুলিই তার একান্ত পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়, আর তারই ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় তার বড়-পরিচয়। দাঙ্গা বাধে, যুদ্ধ বাধে। কখনও ধর্ম নিয়ে, কখনও বর্ণ নিয়ে, কখনও জাতি হিসাবে কে কার চেয়ে বড়, তা-ই নিয়ে। ইতিহাস তার সাক্ষী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ যে হিটলারের আর্যামির অহংকার, তাও তো কারও

না-জানার কথা নয়।

আসলে, যার চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী আর হয় না, সেই মানুষের মধ্যেও রয়ে গেছে এক দুর্মর মণ্ডূকবৃত্তি। কুয়ো থেকে তুলে এনে তাকে বাইরের মুক্ত মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে এটাও তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, সে ব্যাং নয়, সে মানুষ, আর ওই কুয়োটা নয়, এই বিশ্বপৃথিবী তার ঠিকানা। কিন্তু সেটা জানা সত্ত্বেও তার জীবনে মাঝে মাঝে শুরু হয়ে যায় উলটো-রথের পালা, মুক্ত মাঠ থেকে সে আবার ফিরে যায় সেই অন্ধকূপে, তাকেই সে তার একমাত্র ঠিকানা বলে ভাবতে শুরু করে।

যাকে কুয়ো বলেছি, তাকে গলি বলাও চলত। শহরে যখন দাঙ্গা বাধে, কেউ কাজে বেরুলে তার ঘরের লোকজন তখন অস্থির হয়ে ভাবে যে, বাইরের জগৎ থেকে কতক্ষণে সে আবার তার গলির মধ্যে এসে ঢুকবে। কপালে যার বিশ্বজগতের ঠিকানা লেখা, এঁদো গলিটাই তখন তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্বিপাক আর কী হতে পারে!

এই দুর্বিপাক বারে-বারে ঘটে বলেই আমাদের বারে-বারে ফিরে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের মতন স্রষ্টার কাছে, ভাবুকের কাছে। নতুন করে আবার জেনে নিতে হয় আমাদের পরিচয়, আমাদের ঠিকানা।

ভারত-ইতিহাস : মানব-ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ

ভূদেব চৌধুরী

এবারে অবিসংবাদে বুঝবার, মানবারও, নিশ্চয় সময় এলো : ভারতবর্ষে প্রথমতম ইতিহাস-দার্শনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা, এবং আজও রয়েছেন। বিশেষার্থে ইতিহাস-সন্দর্শক!

ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চায় 'সিংহাসন' নিয়ে 'টানাটানি', 'কাটাকাটি মারামারি'র দলিল রচনার একান্ত আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিলেন।[১] আজ শুনি, "রাজকাহিনী ছেড়ে এখন অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতির সমস্যাগুলি, এমন কি মানুষের চৈতন্য ও বিশ্বাসের নানা জটিলতা, ক্রমশই ঐতিহাসিকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।"[২] রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভারতীয় মনঃপ্রকৃতির মধ্যেই সন্ধান করার সঠিক দিশাটি ধরেছিলেন, ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের পাঠককেও। ভেবেছিলেন, 'রাজকাহিনী'ই ভারত-ইতিহাসের সবটুকু হলে, "... এইসমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তার অ-পূর্বতা বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি, একালের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-বেত্তারও কণ্ঠস্বরে :- "প্রত্যেক ঐতিহাসিককেই উৎকৃষ্ট তথ্যসংরক্ষক হতেই হবে। ...তাহলেও আদর্শচেতনা একটি নিয়ামক উপাদান। (ইতিহাসের) মূল্যবান এই কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝাই যাবে না, আদর্শগত কোনো একটা মাত্রা না থাকলে।"[৪] আর, পুরো নয় দশক আগে (১৩১২ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, 'ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনাব দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়।"[৫] 'আদর্শগত' সুনির্দিষ্ট এক 'মাত্রা' অনুসরণ করে প্রথম থেকেই 'ইতিহাসকে' 'যথার্থভাবে পাওয়া'র সাধনায় রত হয়েছিলেন তিনি। তারই টানে তাঁর চেতনায় ভারত-ইতিহাসকে ধরে মানব-ইতিহাসের মাত্রা-পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে ধীরে ধীরে ; প্রথমের পরিণতি, আসলে, পরতরে। বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে,...".[৬] সেই বিকাশমানতার ধারাপথে মানুষের ইতিহাসের, বর্তমানে বহমান তার ক্রান্তি-স্বভাবেরও, দিশেটি ধরা যেতে পারে।

শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, "ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।"[৭] ইতিহাস আসলে মানুষেরই রচনা। অতীতের ভিতের ওপরে, ভবিষ্যতের অজানা-অচেনা প্রত্যাশিতার টানে, বর্তমানের হাতে গড়ে ওঠে ইতিহাসের পথরেখা ; কখনো বিশেষিত ব্যক্তি, কখনো বা সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অসংজ্ঞান উদ্যমে। দেশ ও সময়ের প্রতিক্রিয়া ভেদে মানুষের

উন্মোচনের প্রকৃতি ও প্রকরণও পৃথক হয়ে থাকে। আর, ওই বিভিন্নতার টানেই দেশে দেশে ইতিহাসের চরিত্রের পার্থক্য ঘটতে পারে। কালের পরিসরে সেই সব বিশিষ্ট চরিত্রেরই বিচিত্র বিস্তার।

ইতিহাসের আন্তর্দৈশিক এই পার্থক্য, তথা স্বাতন্ত্র্যেরও, দিশে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, — "নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসেব ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা, কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে— ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে— নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই।"[৮] বস্তুত সুনির্দিষ্ট দেশকালে নিবদ্ধ, দেশ-কাল-বাহিত, বিশেষ জনগোষ্ঠী-নিষেবিত মানুষের চিত্ত-তলশায়ী ওই 'মূল অভিপ্রায়'-এর গভীরেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের চরম গম্যস্থান, তার পরিণামী পরিচয়, সন্ধান করেছেন। অন্যপক্ষে, প্রচলিত ইতিহাস-ভাবনার নিরিখে, "ঐতিহাসিকেরা যে জনগোষ্ঠীতে বাস করেন, এবং কর্মরত থাকেন, তার ভাব-ভাবনাকে সংশোধন না করে বরং তাকে বিশদ করে তোলেন।"[৯] সংশোধন করার নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই ইতিহাসের নয়। অথচ কোনো গোষ্ঠী-জীবনের চলার পথের পরিচয় কেবল অনুপুঙ্খ বিস্তারিত করেই ইতিহাসের দায়মুক্তি ঘটে না বলেই রবীন্দ্রনাথ সর্বদা মনে করেছেন। মানুষের চলে-ফেরার মূলগত প্রচ্ছন্ন 'অভিপ্রায়'এর গভীরে তলিয়ে, তাব পরিণামের দিশাটিকেও ধরতে চেয়েছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে। 'আদর্শগত' এই বিশেষ 'মাত্রা'র টানেই ইতিহাস-সন্দর্শক রবীন্দ্রনাথ অনন্য।

আর, পৃথিবীজোড়া জাতিসমূহ ইতিহাসের ভেতর দিয়ে যে 'সমস্যার মীমাংসা' খুঁজে ফেরে, তারও পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে।"[১০] মনে রাখতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যতদিনে ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তখন অজস্র খণ্ড-বিচ্ছিন্ন, ছোটো-ছোটো বৃত্তবন্দী, জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ক্রমশ সংহত হয়ে এক ধরনের সমপ্রভ চারিত্রিক সংবদ্ধতা অর্জন করতে পেরেছিল। ইতিহাসের মনস্বী অন্বেষ্টা দেখেছেন, —ভূগোল, অর্থ-রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ত্রিস্তরেই বিপুলায়ত জনগোষ্ঠীর[১১] ধারাবাহিক সংহতি অনুধাবনীয় মাত্রায় রূপরেখায়িত হয়ে উঠছিল আনুমানিক ৭৭৫, ১৪৭৫, ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের ধাপে ধাপে। বস্তুত ইতিহাসে পাশ্চাত্ত্য জনগোষ্ঠীর প্রথম অধিষ্ঠানেব পর থেকেই 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে পশ্চিম অপরাপর সমকালীনদের দেয়াল-ঠেঁসা করে, আপন আর্থ-রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের জালে জড়িয়ে নিয়েছে', যদিও তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি থেকে এখনো তারা অপহৃত হয়ে যায়নি। এবং পশ্চিমেব 'প্রবল চাপ সত্ত্বেও এখনো তাদের আত্মাকে তারা আপন বলে ভাবতে পারে।'[১২]

এইভাবে, প্রতীচ্য ঐতিহাসিক, বিশ্ব-ইতিহাসের ধারায় পাশ্চাত্ত্য জনগোষ্ঠীব একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েও, অপরাপর জনগোষ্ঠীর ক্ষীয়মাণ আত্মিক স্বাতন্ত্র্যকে, দেখি, স্বীকার করে নিয়েছেন। এ-সব মোটামুটি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ এবং তদুত্তর কালের বিবরণ। বলাবাহুল্য, বিশেষিত এই মননের প্রকরণ ও সিদ্ধান্ত ইতিহাস সন্ধানে প্রযুক্ত পূর্বনির্দিষ্ট এক মূল্যমানের ওপরে নির্ভরশীল, যেখানে প্রথম থেকেই স্বীকাব করে নেওয়া হয়েছে, বিগত কিছু শতাব্দী ধরে স্বয়ম্পূর্ণ সব সার্বভৌম 'নেশন'-ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার দরুন 'নেশন'-ভূমিকতাকেই ইতিহাস অধ্যয়নের নিরিখ রূপে সাধারণভাবে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে।[১৩]

অন্যপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ, উনিশ শতকেই, তাঁর ইতিহাস-ভাবনার শুরু থেকে, অন্তর্লগ্ন 'সমস্যা', 'অসামঞ্জস্য' এবং তার 'মীমাংসা'র প্রবণতা ও প্রকরণ অনুসারে পৃথিবীজোড়া ইতিহাসের মোটা পরিকাঠামোটিকে দুই স্ব-তন্ত্র ভাগ করে দেখেছেন। তার একটা ভাগ পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে সর্বায়ত প্রাধান্যে বিরাজিত ছিল ; য়ুরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে এসে যাকে আমরাও ইতিহাসচর্চার একমাত্র পদ্ধতি বলে মেনে এসেছিলাম, অথচ রবীন্দ্রনাথ যার নিরাকরণে ছিলেন সতত নিয়োজিত। পূর্বকল্পিত কোনো নিরিখে ভর না করে, ওই মৌল 'সমস্যা'র বাস্তবিক মান গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। তারই সূত্রে, তাঁর অনুভাবনায় ইতিহাসের এই চারিত্রিক বিভাজন। উচ্চকণ্ঠ পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস-চরিত্রের সমান্তরাল ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, তখনো অনুচ্চারিতপ্রায় প্রাচ্য ইতিহাসের নিজস্ব মান-মাত্রা। পাশ্চাত্ত্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাস 'নেশন'-রাষ্ট্রশক্তির চাপে নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথ ভাবেন, প্রাচ্যে ইতিহাসের বিকাশ সামাজিক বিস্তারের ধারাপথে। স্পষ্টই বলেছেন, রাষ্ট্র 'নেশন'-কেন্দ্রিক একমুখী সার্বিক ইতিহাস-সন্ধানের প্রেক্ষিতে, "একথা আমাদের বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো।"[১৪] বুঝিয়েছেন, "...ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।"[১৫] "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদের পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।"[১৬]

পশ্চিমে-পূর্বে ইতিহাস-চরিত্রের এই পার্থক্য আসলে তাদের পরিপার্শ্ব-প্রভাবিত স্বভাবের উৎসজাত বলেই ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : "প্রত্যেক জাতির এক-একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনাটি লইয়াই সেই জাতির লোক আঁট বাঁধে। নর্মানে স্যাকসনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না, তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড়ো ভেদ রহিল-- রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্য প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হইতে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজশক্তিতে নানা প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপনের ইতিহাসই ইংলন্ডের ইতিহাস।"[১৬]

অন্যপক্ষে, "আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজার প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে এক দিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।"[১৭]

'সমাধান' কি পাশ্চাত্ত্য দেশের 'সমস্যা'রও হয়েছে ? রাষ্ট্রীয় সংঘাতের অতি ভয়ানক এক তুঙ্গরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পৃথিবীকে আতঙ্কিত করেছিল পারমাণবিক অস্ত্রে দৃপ্ত, বিবদমান দুই মহাশক্তির পক্ষচালনায়। একটির, সোভিয়েট রাষ্ট্রের, অকস্মাৎ বিলুপ্তির উপলক্ষে জগৎজোড়া উৎসাহ-ভাবনার শেষ ছিল না, এবারে বুঝি শক্তিবৈরের অবসান হল। কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পেরোতে-না পেরোতেই দেখা যাচ্ছে, স্বার্থসিদ্ধির লেলিহান দাহ দিকে দিকে আবার উত্তাল।

সে হিসেব পরে হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের তথ্য-সন্নিবেশিত সিদ্ধান্তটি অনুধাবন করে এগোতে

হয়। দুই পৃথক জনগোষ্ঠীর জীবনধারার অন্তর্লীন 'কার্যকারণ সম্পর্কের' টানেই পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস একান্তভাবে রাষ্ট্রভিত্তিক ; প্রাচ্যের, ভারতবর্ষের, সামাজিক। তাই নিয়ে দুই ইতিহাসের চরিত্রগত তফাতও। রবীন্দ্রনাথ সে তফাতেরও মূলে পৌঁছাতে চেয়েছেন-- ''রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর'', আর তাই, 'য়ুরোপের রাজত্ব' কেবল রাজার নয়, 'সমস্ত রাজ্যের' বলেই, ''জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলন্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।''[১৮] য়ুরোপের, তথা পাশ্চাত্ত্যের, 'সাধনার বিষয়' রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বলেই ধর্মের প্রভাব তার জীবন-বৃত্তে উল্লেখনীয় ছাপ ফেলতে পারে না।

অন্যপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ভাবেন, ''প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।''[১৯]

'ধর্ম' শব্দের একটা নূতন, তথা মৌলিক, তাৎপর্য পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের কাছে। ভারতীয় ভাষায় 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ধরে রাখে', মানুষের পক্ষে ধারয়িত্রী শক্তির দ্যোতক সে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, ''প্রত্যেক যথার্থ রিলিজন-এই একটা করে বৈপ্লবিক 'চ্যালেঞ্জ'-এর মুদ্রা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সব 'রিলিজন'-এ সে মুদ্রাঙ্কন বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একান্ত আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়েছে তারা।''[২০] য়ুরোপেও রিলিজন-এর মৌল বৈপ্লবিক স্পন্দনের প্রণোদনা লুপ্ত হয়েছে এই আনুষ্ঠানিকতার চাপে। নিতান্ত পৃথক এক প্রসঙ্গে, খ্রিস্টীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার সূত্র ধরে, রাধাকৃষ্ণন রিলিজন-এর, গোঁড়া পরিকল্পনায় গড়া, বেশ কিছু উপাদানের এক তালিকা রচনা করেছিলেন-- ''পৃথ্বীতলশায়ী কবর, পবিত্রগ্রন্থ, (গোঁড়া) ধর্মসংস্কার, ক্লান্তিকর ধর্মব্যাখ্যা, সাম্প্রদায়িকতা, শহীদসম্মান, পরধর্ম-বিরোধিতা, প্রায়শ্চিত্ত, সন্ত, পাপী, দুঃখতীর্ণ স্বর্গলোক।''[২১] রবীন্দ্রনাথ যেমন ভেবেছেন, দেখেছি, য়ুরোপে, পাশ্চাত্ত্যে, প্রাণিক উত্তাপের অভাবে 'রিলিজন' এই আনুষ্ঠানিক চরিত্রেই আজ সর্বব্যাপক। ভারতবর্ষেও, প্রতীচ্যারোপিত প্রভাব বশে, 'ধর্ম' আজ 'রিলিজন'-এর সমার্থক।

রবীন্দ্রনাথ, তাহলেও, ধর্মকে গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতা-মুক্ত 'ধারয়িত্রী শক্তি' রূপে চিহ্নিত করেই থামলেন না, প্রাচ্য, তথা ভারতবর্ষের জীবন-চরিত্রের মৌল প্রবণতা, সমাজধর্মের ভিত্তি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর ইতিহাস-চিন্তার পক্ষে এ অনুভব তাৎপর্যবহ, বহমান পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ইতিহাস ভাবনার পক্ষেও।

পৃথক-চরিত্র 'সমস্যা', এবং তার পৃথকপন্থী 'মীমাংসা' সাধনের তাগিদেই পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য, তথা ভারতবর্ষের, ইতিহাসের ধারা পৃথক পথে প্রবাহিত হয়েছে। তার প্রকরণই কেবল ভিন্ন নয়, অন্তঃপ্রবণতা অনেকটাই পরস্পর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের চোখে, দেখেছি, য়ুরোপের, তথা পশ্চিমের, ইতিহাস রাষ্ট্রগৌরব-কেন্দ্রিক ; আর, ''...রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। ...পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি ; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।''[২২] এই দ্বিতীয়োক্ত প্রবণতাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ; 'ধর্মনীতি' আসলে যেখানে 'সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র'র দিশারি। অন্যপক্ষে, দেখেই এসেছি, প্রথমোক্ত বিরোধমূলক--পরসংঘাতী প্রবণতাই পশ্চিমা ইতিহাসের কুঞ্চিকা। তাহলেও,

রবীন্দ্রনাথ ভাবেন, ব্যাপকতর ভূমিকায়, মানুষের অন্তঃশীল 'সমস্যা' আর তার 'সামঞ্জস্য' সাধনের আকৃতি বশে, কখনো কখনো স্থানিক ইতিহাস সর্বমানবিক আবেদনের আকর হতে চায়, হয়ে উঠতে চায় 'মানব-ইতিহাস'।

বুঝিয়েছিলেন, ভারত-ইতিহাসের ধারায় বৌদ্ধযুগ, আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ।[২৩] তারপরেই, হিন্দু-যুগের উপান্তে, শুরু হয়েছিল বিদেশী পরাক্রম-প্রভাবিত আধুনিক যুগ ; মুসলমান-শাসিত সময় পেরিয়ে যুরোপ-শাসন ও সংসর্গেরও সময় ধরে। তাই, তাঁর ভাবনা, 'বর্তমান যুগকে ঠিকমতো' চিনতে হলে ওই বৌদ্ধ 'সন্ধিযুগের সঙ্গে' ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়া চাই। যুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তার সঠিক রূপ ধরতে পারেননি ; তাঁরা 'হীনযান সম্প্রদায়ের' তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান বিবেচনাকেই মুখ্য করেছেন বলে। কিন্তু 'মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর।''[২৪]

ইতিহাসের বিকাশের ধারায়, তাহলে, দুটি পথের দিশা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনে। এক, বিশেষ জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও পারিপার্শ্বগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-নির্ভর তথ্যাবলির স্বাতন্ত্র্যে-মণ্ডিত জীবনেব ইতিহাস। দেশভেদে সে ইতিহাস পৃথক, বিভিন্ন হয়েই থাকে। ইতিহাসের চলার আরো এক পথের দিশে রবীন্দ্রনাথ ধরতে, ধরাতে, চাইলেন; সদ্য দেখি, সে যাত্রা 'হৃদয়ের' পথে। এই অর্থেই কী, সাম্প্রতিক ইতিহাসের সন্ধানও 'মানুষের চৈতন্য ও বিশ্বাসের নানা জটিলতা' ভেদ করে এগোতে চায়? অবহিত হয়ে সে কথাও ভাববার।

রবীন্দ্রনাথের দিশে ধরেই এগোই যদি, দেখি, ইতিহাসের চাল দু-পেয়ে, বিরোধ ও বিরোধমুক্তির;— বাইরের 'অসাম্য'-'অসামঞ্জস্য', আর 'অন্তরে মিলিতেই' হওয়ার টানাপোড়েনে তার গতির ধারাবাহিকতা। একই মানব-গোষ্ঠীর ভেতরেও নৈসর্গিক কারণেই বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য, বিরোধের শেষ নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্য, তথা একই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদ-স্বাতন্ত্র্যের পরিণামী সংঘর্ষ! ইংলন্ডের রাষ্ট্রিক গঠনে যেমন দেখিয়েছিলেন, মূলাবধি রাজা-প্রজার স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য ও সংঘর্ষ! আবার এই অনিবার্য ভেদ-স্বাতন্ত্র্যের সংঘাত ভারতবর্ষেব সামাজিক জীবন-পটভূমিকায় প্রতি ধাপে কেমন 'অন্তর-মিলনে'র মুখাপেক্ষী হয়ে হয়ে এগিয়েছে, তারই কালানুক্রমিক দীর্ঘ বিবরণ ধরা আছে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে।[২৫] অন্যত্র বুঝিয়ে বলেছেন, এই দ্বৈততা আসলে মানুষের অন্তঃস্বভাবেরই। —''জীবনের সকল বিভাগেই মানুষ এই দ্বৈততায় প্রকাশিত ; আধারিত তথ্যের গণ্ডীতে বাঁধা তার অস্তিত্ব, আর গভীরতর তাৎপর্যলোকে তার উদ্বর্তন।''[২৬] তাই নিয়ে ইতিহাসেরও দুই মাত্রা। এক, তথ্য-নিবেশিত দৈশিক স্বাতন্ত্র্যের চরিত্রে সে বিভিন্ন ; আর এক, কোনো গভীরতর তাৎপর্য-বশে সর্ব-সীমাতিক্রান্ত মানুষের সত্যপ্রতিষ্ঠ 'মানব-ইতিহাস'। ইতিহাসের গঠনে 'তথ্য' আর 'সত্য'-র ভূমিকাও, আসলে রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পিত।[২৭]

সন্দেহ নেই, মানুষের দেশকালানুক্রমিক অভিব্যক্তির তথ্যকুঞ্চিকা নিয়েই ইতিহাসের উন্মোচন। আর অভিব্যক্তির মৌল প্রেরণাবশেই মানুষও প্রকৃতির জীব। অস্তিত্ব রক্ষার আত্যন্তিক তাগিদে সেও আর সবার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতারত। এই প্রবণতাই মানবিক অস্তিত্বের 'অবধারিত তথ্য'। 'তাকে খেতে শুতে হবে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে, সন্তানকে জন্ম দিতে এবং পালন করতে হবে।' তবু আরো এক 'গভীরতর তাৎপর্য' মানুষ আবিষ্কার করেছে, যা তার 'মানবধর্ম'[২৮] তা 'সত্য' ধর্ম। আর এ-দুয়েতে মিলেই মানুষের 'পরিপূর্ণ সত্তা', অথচ মূলত তারা

দুই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি এবং বৃত্তি।—"দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায় ; মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।"[২৯]

মানুষের এই দুই প্রবণতা : আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযোগিতা, আত্মপ্রসারের জন্য সহযোগিতা। তারই টানে মানুষ গড়েছে রাষ্ট্র, গড়েছে সমাজ। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, দেখেছি, রাষ্ট্রের উৎসেই প্রতিযোগিতার সংঘাত ; সমাজের প্রাণ সহযোগিতা-সামবায়িকতায়। মানুষের অভিব্যক্তির ধারায় টিকে থাকবার জৈব তাগিদটাই ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে পরপীড়ন, পরদমনের প্রখরতায় ক্ষমতামুখী আগ্রাসী হয়ে ওঠে। একদিকে তার প্রতাপের লোভ, অপর সবাইকে নির্জিত করে নিজে বাড়বার নেশায় ; আর একদিকে লোভ অপ্রমেয় লাভের, আর সকলকে বঞ্চিত করে নিজের পুঁজি বাড়াবার। তাই নিয়ে গড়ে 'নেশন', আর্থ-রাজনৈতিক আগ্রাসনের যথেচ্ছাচারী মত্ততায়। ফলে, "তারা (শারীরসংঘর্ষজীবী জনগোষ্ঠী) তাদের শক্তিকে সংগঠিত করেই চলেছে, কেবল প্রকৃতি কিংবা প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীর উৎপীড়ন থেকে মুক্ত থাকতে পারার সংগত সীমা অবধিই নয়, তারও চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ হাতে রাখতে, যা অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে।"[৩০] মানুষের নিয়ত বাড়ন্ত জ্ঞান-বুদ্ধি তার শারীর প্রতাপকে বহুগুণিত—অমেয় করে তোলে বিবর্ধমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ একাগ্র তুঙ্গায়নে। সব মিলিয়ে রাষ্ট্রমদমত্ত মানুষ আজ "তার শক্তি-সেবান্ধতা, আর অর্থ-সেবী পৌত্তলিকতাবশে, বহুলাংশেই, আদিম বর্বরতায় ফিরে গেছে, সেই বর্বরতা—যার পথ বুদ্ধির ভয়ানক আলোয় আলোকিত।"[৩১]

বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নিয়ে বিদগ্ধ মহলেও বিভ্রান্তি রয়েছে। অথচ তাঁর স্পষ্টোক্তি আছে,—"বিজ্ঞানের আধুনিক অনুসরণ সম্পর্কে আমার বিভিন্ন-সাময়িক আশঙ্কা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নির্দেশিত নয়, কারণ বিজ্ঞান নিজে থেকে ভালো বা মন্দ হতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভ্রান্ত ব্যবহারের (বিরুদ্ধে)।"[৩২] এই 'ভ্রান্ত ব্যবহারের" আতঙ্কজনক পরিণতি সবটাই নেশন-রাষ্ট্র-সর্বস্ব অবলম্বিত শারীর শক্তির— ইংরেজি করে যদি বলি, 'ফিজিক্যাল পাওয়ার'-এর। তার মাত্রাছাড়া চাপে বিশ্বমানুষ আজ কেবল 'আদিম বর্বর' হয়ে নেই, আদিমতম জৈবতায় পর্যুদস্ত। জৈবিক অস্তিত্বের ভিত্তি নিরচ্ছিন্ন সন্দেহ আর শঙ্কায়। নিছক টিকে থাকবার 'প্রতিযোগিতা'য় জীব কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, পাছে পাশের যে-কেউ তাকে গিলে খায়। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ কি তার করাল ছায়াই নখদন্ত বিস্তৃত করে নেই?

বিজ্ঞানের কথাতেই ফিরি যদি, পারমাণবিক শক্তি শক্তির কী নিঃসীম সম্ভাবনা খুলে দিয়ে আছে মানুষের সামনে! তার গঠনমূলক ব্যবহার বস্তু-নিগূঢ় পৃথিবীতেই স্বপ্নের স্বর্গকে বাস্তবিক করে তুলতে পারত, পারে আজও। কিন্তু হলো কই? অভাবিত, অমেয়, সে শক্তির উদ্ভবই তো নেশন-রাষ্ট্রের দানবিক আক্রোশে, তার লোভে! তাই নিয়ে মানুষ আজ নিজের গড়া শক্তির সামনে ক্রিমি কীটের মতো ভয়ে কুঁকড়ে আছে। দুই বিশ্বপরাক্রমীর এক দল বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরেও একমেবাদ্বিতীয় মহাপরাক্রমীর অন্তরে ভয় আজ আতঙ্কের সকল সীমা ছাড়িয়েছে। কে কোথায় কত মারণাস্ত্র গড়েছে, গড়ছে, কিংবা আরো যদি কেউ কেউ গড়ে ফেলে? ভয়ের সঙ্গে সন্দেহ, কেবল অস্তিত্বের জন্যেই নয় ; আগ্রাসনের শ্বাসরোধী লিপ্সায়। তাই নিয়ে একেবারে হালের কালের 'মুক্ত বাণিজ্যের' ছদ্মবেশে 'গ্যাট', 'ডব্ল্যু টি ও'-র মতো আরো কত দাবার ঘুঁটি। চারদিকে 'মানুষ-পশুর হুহুঙ্কার'। চূড়ান্ত বিনাশ থেকে তাকে রুখবে কে?

ওইখানেই রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন নতুন ছাঁচটি নিয়ে, অধঃপতন-রন্ধ্রমুখী ইতিহাসের মুক্তির দিশেটি ধরতে। অথচ, তারও পরে, তাঁর তিরোধানের পরে, এরই মধ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গত প্রায় অর্ধশতাব্দীতে, ইতিহাসের আদলটিও দুরন্ত দ্রুত গতিতে ভোল পাল্টাবার পথে ঝুঁকে চলেছে। বিজ্ঞানের অবিরল অমেয় চলিষ্ণুতা মানুষের আবস্থানিক দূরত্বকে একটা মাত্রায় প্রায় বিচূর্ণ করে দিয়েছে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে মুহূর্তের সংঘটন প্রায় পরমুহূর্তে অপবতম প্রান্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। এ কেবল অবগতির নৈকট্য নয়, পারস্পরিক সংঘট্ট-সংঘর্ষের অমোঘতাও তার মজ্জায়। ইরাক-কোয়েত-এর প্রতিবেশি-সংঘাতে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্ত থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও ছুটে এসে জটলাকে ঘোরতর করে তোলে, কেমন চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে। অতএব, ভাববার সময় এলো, কোনো বিশেষ অবস্থান-নিবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মানুষ নয় আর, সকল আবস্থানিক দূরত্ব-পার্থক্য মুছে-যাওয়া পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস কি আজ এক অভিন্ন পথে চলবে, --চলতে পারে? সে প্রশ্নের জবাব খোঁজবার অবকাশও নেই আজ নীরন্ধ্র অন্ধ চক্রপথে ঘুরে, ছুটে, ফেরা মানুষের। তবু, ওই জান্তব চক্রচাপেই, চোখে পড়ে, পৃথিবী-জোড়া মানুষ আজ একই ভয়-লিপ্সা-আগ্রাসিতার যূপকাষ্ঠে জেনে-না-জেনে গলা বাড়িয়ে রেখেছে। অর্থ-রাজনীতি-সর্বস্ব রাষ্ট্রতান্ত্রিকতাব খড়্গ মানুষের মাথার ওপরে। ভারতবর্ষও সেই ডামাডোলে আত্মবিস্মৃত, আত্মবিচ্যুত। ওই একই তো ছাঁচ এদেশেও, সমাজ-খোঁয়ানো রাষ্ট্রান্ধতার বীভৎস সংঘাত-আতঙ্ক!

কেবলই টিকে থাকতে চাওয়ার অন্ধ জৈব ঝোঁক মানুষের মধ্যে পাশব হিংস্রতার তাণ্ডবে টেকা-না-টেকার সংকট-শঙ্কায় বিহ্বল করতে চাইছে আদিগন্ত মানুষের ইতিহাসকে আজ ; ভারতবর্ষেও। পরিত্রাণের দিশে ধরতে আরো হানাহানি, আরো ভয়ের দাপটে, পূর্বে-পশ্চিমে, কেবলই দিশে হারিয়ে যায়। আঁধির এমন আঁধার যেদিন জমাট হয়ে যায়নি, তখনও অনন্য ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির বশে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকাতেই মানব-ইতিহাসের মুক্তির দিশাটি ধরতে চেয়েছিলেন ; ধরেও ছিলেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ তখন ; স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক ঝড় দেশ জুড়ে, চোখ নয় কেবল, চেতনা-রগড়ানো ধুলো উড়িয়ে ফিরছিল। ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসের 'ষণ্ডামি' অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখনই রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে' পারার প্রয়োজনীয়তার কথা পেড়েছিলেন , বুঝিয়েছিলেন অকাল-প্রয়াত স্বামী বিবেকানন্দ ওই পথেই এগিয়েছিলেন।[৩৩] পৃথিবী তখনো অত খাটো হয়ে পড়েনি। অথচ, পশ্চিম তার রাষ্ট্রাধিকার-প্রমত্ততা নিয়ে চেপে বসেছে ভারতবর্ষের বুকের ওপরে ; তাকে বিতাড়নের প্রতিস্পর্ধী উদ্যোগের ডামাডোলে ভারতের রাজনৈতিক মহলে অন্তর্বিরোধ তখন মাত্রা ছাড়িয়েছিল। রাজনীতির চরিত্রই নিহিত রয়েছে আত্মস্বার্থের জন্য পরনাশনে ; শেষ পর্যন্ত যা আত্মনাশনের অনিবার্যতায় বিপর্যস্ত হয় : রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের এই বোধের ওপরেই আপন ভাবনাকে চালনা করেছিলেন। সে বোধের অমোঘতা আজ পৃথিবীজোড়া পরনাশন-গৃধ্নু মানুষের সার্বিক আত্মনাশন-বিভীষিকায় প্রকটিত। আর রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, দেখিয়েওছিলেন,—ভারত-ইতিহাস সমাজ-ভিত্তিক মূল্য-চেতনায় উদ্ভাবিত বলেই কালের বিভিন্ন ধারায় বিরোধের মধ্যেও মিলনের দিশেটি কেমন ধরে রেখেছিল। তারই ফলে, "...স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।"[৩৪] এবং তারপরেও, এ ধারার ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অবস্থান-প্রসূত এই মৌল চরিত্র বশেই, ভারতীয় অবস্থানের পরিধি ধরে, কিংবা

ভারতীয়ের দ্বারাই, পূর্ব ও পশ্চিমের অনুরূপ মিলন ঘটুক ; এই ছিল সেদিন তাঁর অভিপ্রায়।[৩৫]

আর ভারতের অভ্যন্তরে, অথবা বাইরেও, সে মিলনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি,--কোনো প্রয়োজনেরই তাড়না থাকবে না ; মনুষ্যত্বের মৌল প্রেরণাই হবে একমাত্র,--এ ভাবনাও ছিল রবীন্দ্রনাথের আগাগোড়া।[৩৬] মনুষ্যত্বের পরস্পরবিরোধী দ্বিমাত্রিকতার কথাও তিনিই পেড়েছিলেন, দেখেছি, 'প্রতিযোগিতা' আর 'সহযোগিতা'য় প্রতিমুখী পথে। কেবল টিকে থাকার, টিকিয়ে রাখার, আত্যন্তিক প্রেরণাকে বলেছিলেন 'পশুধর্ম্ম' ; বলেছিলেন, 'পশুধর্ম্মের উপরে একটা মানবধর্ম্ম আছে। দৈহিক জীবনের চেয়েও একটা বড় জীবন আছে মানুষের।'[৩৭] ওইখানেই আসলে মানুষ 'মনে মনে মিল পায়, মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।'

'পশুধর্ম্ম' কোনো তিরস্কৃত অভিধা নয় ; দেখেছি, আসলে সে দেহ-ধারণের, দেহরক্ষণের, জীব-জৈবনিক আকৃতি। মানুষেরও অস্তিত্বের ওইখানে ভিত। দেহে বেঁচে, তারপরে দেহকে পেরিয়ে মনে, --মনের মিলনে, বাড়তে পারাতেই মানুষের মুক্তি। "এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম, এই মিলনেই মানুষের কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।"[৩৮] আর ইতিহাস তো সভ্যতারই![৩৯] মানুষের সভ্যমনের ইতিহাস।

কিন্তু এ মিলন নিছক শারীরিক সান্নিধ্য নয় একেবারেই ; সমাজলগ্ন পূর্ব, আর রাষ্ট্রজীবী পশ্চিমের! যেমন ঘটে গেছে আজ। রবীন্দ্রনাথ পুরোটা দেখে যাননি ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, যাবার আগে তখন, কেবল আঁচ করে গিয়েছিলেন। আমরা আজ স্তব্ধ হয়ে আছি সেই অনৈসর্গিক নৈকট্যের বিষফল দেখে। গোটা পৃথিবীটাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, একের ওপরে আরেক, মানুষের ঘাড়ে মানুষ-- গোষ্ঠী, ব্যক্তি নির্বিশেষে, দেশের মাথায় দেশ। নড়ে বসবার, দম ফেলবার ফাঁকটুকুও রইল না একেবারেই। কেবলই গিলে খাবার, তলিয়ে দেবার অস্থির লালসা ; কেবলই তলিয়ে যাবার সম্ভাবনাক্রান্ত অন্তহীন ভয়। তারই থেকে পরিত্রাণের জন্যে 'অন্তর-মিলন' ; নিছক অঙ্গ-ছাপানো সর্বাঙ্গীণ 'মিলন' ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

আর সে মিলনেরও চেষ্টাতে দুটো ছাঁচের চেহারা দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; বলেছিলেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"[৪০] পাশাপাশি থাকতে গেলে একত্র হয়ে পড়তেই হয়। কিন্তু একত্র হওয়া, এক হওয়া নয়। য়ুরোপে নানা মানুষ নানা স্বার্থ-অভীষ্ট-উদ্দেশ্য নিয়ে, একত্র জটলা করে আছে। তাতে একের সঙ্গে অপরের ঠেলাঠেলি রেশারেশি অশেষ। আজ তার দাপট পৃথিবী জুড়েই। কিন্তু আসল মিলন, অনেকে যখন কেবল নৈসর্গিক দায়ে একত্র হয়ে পড়ে না, আপন ইচ্ছা আর আগ্রহে যখন এক হয়ে যেতে পায়! ওইখানে মানুষের মনের ভূমিকা ; তার সামবায়িক ইচ্ছার। 'সমবায়' শব্দের একটা অর্থ 'নিত্যসম্বন্ধ'-ও।[৪১] যে বাঁধন চির অটুট। মানুষে মানুষে পার্থক্য অন্তহীন, তাতে একতার 'নিত্যসম্বন্ধ' জাগে সামঞ্জস্যের প্রেরণায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মৌল গুণ এবং প্রবণতা অক্ষুণ্ণ রেখেও অপর সকলের সঙ্গে অটুট বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার সে কৌশল।--"যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।"[৪২]

ওই 'যথাযোগ্যতা', ওই 'সংযম'টুকুতেই মনের কারিগরি। কোনো কিছুই একান্ত, একাগ্র, উৎকট হয়ে উঠবে না। যেমন হয়ে উঠেছে পৃথিবী জুড়ে আজ মানুষের 'পশুধর্ম্ম'। আরো পাঁচটা উপাদান, তথা-- পারিপার্শ্বিক আর সকলের সঙ্গে ভারসমতায় সংযোজিত হয়ে যেতে পারলেই একের সঙ্গে

সবাই মিলে গড়ে ওঠে সামবায়িকতার 'নিত্যবন্ধন'। সমাজের মূলে তার ভিত গড়া রয়েছে, ভারতবর্ষের জীবনে তার চেহারা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইখানে জীব-জীবনের আত্যন্তিকতা থেকে মানব-জীবনে উত্তরণের চাবিকাঠি।

আজকের সংকটের ছবিটি হচ্ছে, বিজ্ঞানের অমেয় শক্তির নৈসর্গিক চাপে পৃথিবী জোড়া মানুষ ছিট্‌কে এসে একত্র জট পাকিয়ে গেছে, বদ্ধ জলায় আটকে পড়া ব্যাঙাচিদের মতো। তারই ঠেলায় অসাড়, স্তব্ধ মানুষের 'অন্তরে' সামবায়িক ইচ্ছা জাগল না পারস্পরিক 'সামঞ্জস্য'--পারস্পরিক ভারসমতা গড়বার অভিপ্রায়ে। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক স্ব-সর্বস্বতা থাকবেই, প্রকৃতির নিয়মে। কিন্তু তাকে যথাযোগ্য মাত্রায় সংযত করার 'ধর্ম'-টিকে খুঁজে পেতে হবে মানুষের চেতনায়। 'সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র'-র স্ফুটতম সে চেতনা। ভারত-ইতিহাসের যা কেন্দ্র। সবই থাকবে, সকলেই সামলে চলবে ; 'সামঞ্জস্যে'র স্বচ্ছ স্বতস্ফূর্ত বিধানে। আধুনিক পৃথিবীজোড়া মানুষের ঐকান্তিক 'সমস্যা'র ওইখানে 'মীমাংসা'র পথ। সামাজিক সামবায়িকতায় রাষ্ট্রীয় যুযুধানতার স্ব-সমর্পণের ভারসমতায়।

পৃথিবী জুড়ে আজ যে প্রলয়-ডঙ্কা, চেতনা-নিরোধী ঢক্কা নিনাদে, আচ্ছন্ন করতে চাইছে মানুষের, --সভ্যতার, --ইতিহাসের পথ, তারই আঁচটুকু মাত্র মনে ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জন্মদিনে--তিরোধানের মাত্র সাড়ে তিন মাস প্রায় আগে, উৎকণ্ঠ উচ্চারণ করেছিলেন, ''আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।''[৪৩]

সে 'ইতিহাস' ভারত-ইতিহাসের নিশানা ধরে মানব-ইতিহাসে উত্তরণের!

উল্লেখসূত্র :

১। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' : ''ইতিহাস'' (বিশ্বভারতী সংকলিত, ১৩৬২) পৃ-১।

২। দ্র. রণবীর চক্রবর্তী, ''প্রাচীন ভারতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে'' : 'ইতিহাস গ্রন্থমালা ২', অশীন দাশগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক)--- 'সম্পাদকের ভূমিকা' পৃ-৭।

৩। রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-২।

৪। "Every historian has to be a good chronicler.. but ideology is the key equipment You cannot realise this important cause effect relationship (of history) if you do not have an ideological dimension".- Extracts from a speech of Irfan Habib. reported in the 'Statesman'. Calcutta, November 8 1995

৫। রবীন্দ্রনাথ, 'ইতিহাস-কথা' : ''শিক্ষা''. রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী) দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ৫০।

৬। রবীন্দ্রনাথ, 'পূর্ব ও পশ্চিম' : ''সমাজ'' রবীন্দ্ররচনাবলী (তদেব) তদেব, পৃ- ২৬২।

৭। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ; পূর্বোক্ত, পৃ ৪।

৮। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' · ''ইতিহাস'' (পূর্বোক্ত) পৃ ৪০।

৯। cf "Historians generally illustrate rather than correct the ideas of the communities within which they live and work. ." *A Study of History* by Arnold J Toynbee 'abridgement of Volumes I - V, by D C Somervell' . Abridged Vol. 1 p. 15

১০। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' : ''ইতিহাস'' (পূর্বোক্ত) পৃ-৭৫

১১। মূলের সর্বত্রই 'society' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; তার অভিপ্রেত তাৎপর্য 'সমাজ' নয়, 'জনগোষ্ঠী'ই। 'সমাজ' শব্দ পৃথক্ তাৎপর্যবাহী ; রবীন্দ্রনাথ তা বুঝিয়েছেন।

১২। cf Arnold J Toynbee. *A Study of History*. op cit. pp. 21-23

১৩। Cf ibid p 15

১৪। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' : "আত্মশক্তি"- রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৫২২

১৫। রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' : "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ- ৭৫

১৬। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' : "আত্মশক্তি" : রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ৫২৬

১৭। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' : পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫-৭৬

১৮। দ্র রবীন্দ্রনাথ, 'সমাজভেদ' : "স্বদেশ", রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) একাদশ খণ্ড, পৃ-৪৮৬।

১৯। দ্র রবীন্দ্রনাথ, তদেব।

২০। cf "Every true religion has a note of revolutionary challenge This has disappeared in established religions which have become purely formal"- S Radha Krishnan - "Recovery of Faith" (Orient Paperback - 1955) p 54

২১। cf --- "catacombs. sacred books. dogmas, tedious exegeses, schismatics. martyrs. heretics. purges. saints. sinners and paradyse beyond the present vale of tears" ibid

২২। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' : "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ- ৬।

২৩। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা'- "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ-৭৯।

২৪। দ্র. তদেব

২৫। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' : "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ- ১২-৫৫।

২৬। "In all departments of life man shows this dualism–his existence within the range of obvious facts and his transcendence of it in a realm of deeper meaning" Rabindranath Tagore. *The Religion of Man*, (1975) p. 127

২৭। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণচরিত্র', "আধুনিক সাহিত্য", রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) নবম খণ্ড, পৃ- ৫৫৪।

২৮। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, "শান্তিনিকেতন পত্রিকা" ১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা, পৃ-১ '১০ বৈশাখ বুধবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশের মর্ম্ম'।

২৯। দ্র. রবীন্দ্রনাথ "মানুষের ধর্ম", রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) বিংশ খণ্ড, পৃ-৩৭৩।

৩০। "They have organised their power till they are not only reasonably free from the tyranny of Nature and human neigbours, but a surplus left in their hands to employ against others " Rabindranath Tagore. *Nationalism* (1917) pp.14-15

৩১। "With his cult of power and idolatry of money he (man) has, in great measure, reverted to his primitive barbarism whose path is lit up by lurid light of intellect".

Rabindranath Tagore - 'The Modern Age' *Creative Unity* (1959). p. 121

৩২। "My occasional misgivings about the modern pursuit of Science is directed not against Science. for Science by itself can be neither good or evil. but it's wrong use "-

Rabindransth Tagore, Letter addressed to Professor Gilbert Murray dated 15 September 1934 Cf S K Ghosh (Ed) 'Challenges of Our Time' *Tagore For you* (1966) pp 115-116

৩৩। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'পূর্ব ও পশ্চিম' ; পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬৫-২৬৬।

৩৪। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ; "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ- ৩৪।

৩৫। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ · পূর্বোক্ত পৃ- ২৬৫-২৬৬।

৩৬। "ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব।" দ্র. রবীন্দ্রনাথ- তদেব।

৩৭। দ্র. রবীন্দ্রনাথ, "শান্তিনিকেতন পত্রিকা" : পূর্বোক্ত।

৩৮। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' "ইতিহাস" (পূর্বোক্ত) পৃ- ৭৫।

৩৯। cf. Arnold J Toynbee. *A Study of History*, op cit pp 1-27

৪০। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' : পূর্বোক্ত, পৃ ৭।

৪১। রাজশেখর বসু, "চলন্তিকা" (ষষ্ঠ সং), পৃ ৫৪৯।

৪২। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' : পূর্বোক্ত, পৃ ৭।

৪৩। রবীন্দ্রনাথ "সভ্যতার সংকট", রবীন্দ্ররচনাবলী (পূর্বোক্ত) ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ. ৬৪০।

রবীন্দ্রনাথ ও নাইটহুড : গ্রহণ-বর্জনের ইতিবৃত্ত

প্রশান্তকুমার পাল

তেসরা জুন ১৯১৫ ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে অন্যান্য বৎসরের মতো খেতাব বিতরণ করা হল রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে-- এবারের প্রাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বোলপুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রাসবিহারী ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন, রাজনৈতিক নেতা গান্ধীজী নিঃশর্তে ইংরেজের যুদ্ধপ্রয়াসে সাহায্য করবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন-- খেতাব বা মেডেল দিয়ে তাঁদের বাহবা দেওয়া হল, এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন? তরুণ বয়স থেকেই তিনি ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করে অজস্র নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছেন-- কলকাতার গোয়েন্দাদপ্তরে সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল যথেষ্ট উপরের দিকে। এ কথা ঠিকই তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ রবীন্দ্রানুরাগী অ্যাণ্ডরুজেব ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই সিমলায় অ্যাণ্ডরুজের একটি রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তাঁকে 'Poet Laureate of Asia' অভিধা দিয়েছিলেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টর উপাধি দিতে গিয়ে বলেন : 'I can only hope that the retiring disposition of our Bengal poet will forgive us from thus dragging him into publicity once more and recognise with due resignation that he must endure the penalties of greatness.' এর অনেক আগেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সরকারি কর্মচারীদের পুত্রদের ভর্তির নিষেধাজ্ঞা তাঁরই নির্দেশে প্রত্যাহৃত হয়েছিল। স্বভাবতই এই কারণে রবীন্দ্রনাথ হার্ডিঞ্জের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাই আমেরিকায় থাকার সময়ে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের সংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌঁছয়, তিনি ঘটনাটির নিন্দা করেছেন। পরে হার্ডিঞ্জ কলকাতায় এলেই রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়েছেন। নানা কারণে সব আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু এইসব ঘটনা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিচয়বাহী।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য ভাইসরয় যদি রাজার কাছে তাঁকে নাইটহুডে ভূষিত করার প্রস্তাব করেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু কেবল এইটিই যদি কারণ হত, তাহলে এই উপাধি তাঁকে দেওয়ার কথা ৩ জুন ১৯১৪ তারিখে। কিন্তু তখন এই উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হল তখনই যখন য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়ে ইংলন্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন--ভারতীয় জনবল আর অর্থসাহায্য ছাড়া যুদ্ধ চালানো তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভব

বললেও চলে। সুতরাং ভারতবাসীকে খুশি করার দরকার ছিল। উপাধি-লোলুপ ভারতীয়দের উপাধি বিতরণ করায় বিন্দুমাত্র খরচ নেই, অথচ লাভের পরিমাণ যথেষ্ট। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা রবীন্দ্রনাথ আদৌ এই উপাধি গ্রহণে রাজি হবেন কিনা সেই সন্দেহ হার্ডিঞ্জ ও তাঁর পরামর্শদাতাদের মনে ছিল, যেখানে গোখলের মতো রাজভক্ত K. C. I. E. উপাধির প্রস্তাব কয়েকমাস আগেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে 'বাজিয়ে' দেখবার ভার অর্পিত হল অ্যান্ডরুজের উপর। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ দিল্লির ভাইসরিগাল লজ থেকে কোনো ব্যক্তি (স্বাক্ষরটি পড়া যায়নি) একটি 'Private' চিঠিতে অ্যান্ডরুজকে লেখেন :

My Dear Andrews

A suggestion was made to the Viceroy some little time ago that it would be an appropriate and graceful act on the part of His Majesty to confer a Knighthood upon Rabindranath Tagore in recognition of the name he has established in India and Europe and of his genius as a poet - The Viceroy would be very happy indeed to make a recommendation in this sense, if he thought that Rabindranath would appreciate the honor, but he hesitates to do so, because he has just a shade of doubt whether Rabindranath would do so.

So he asked me to write and entrust to you the delicate task of ***sounding*** Rabindranath Tagore on the subject-you are so close a friend of his that I feel sure you will be able to elicit from him his real feeling in the matter.

The times are very strenuous, but however much we may feel the strain in India, I fancy it must be doubly severe in most of the European countries. ...

P.S. An early answer would greatly oblige.

(স্থূল বক্রাক্ষর আমাদের)

এই পত্রের কী উত্তর দেওয়া হয়েছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু এর পরেই ১৯ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ৪ মার্চ ব্যারাকপুরে গবর্নরের উদ্যানবাটিকায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন-- ফাল্গুনীর গান রচনায় ব্যস্ত ছিলেন বলে তিনি সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। জানা নেই, এইসব ঘটনা একই সূত্রে জড়িত কিনা— কিন্তু অ্যান্ডরুজ যে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, খানসাহেবের মতো উপাধি-লোলুপের দলে রবীন্দ্রনাথকে না ফেলার মতো বোধ যদি আমাদের থাকে, তাহলে বলতেই হবে উপরোধের কাছে হার মানার প্রবণতা আমরা তাঁর মধ্যে অনেকই দেখেছি— আগে ও পরে। যাই হোক, তাঁর সম্মতি পেয়ে কৃতজ্ঞ হার্ডিঞ্জ মে ১৯১৫ সিমলা থেকে নিজেই তাঁকে লেখেন :

Dear Sir Rabindranath Tagore

I have much pleasure in informing you that, upon my recommendation, the King Emperor has been pleased to confer a Knighthood upon you as a mark of his Majesty's appreciation of your literary talents.

Yrs. sincerely
Hardinge of Penhurst

--সিমলা থেকে ২ জুন ১৯১৫ এই সংবাদটি প্রচারিত হয়, পরের দিন সব সংবাদপত্রে এর উল্লেখ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে অজস্র টেলিগ্রাম ও চিঠি আসতে থাকে। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে দেখা যায়, এই তারিখেই ইংলন্ড থেকে রোটেনস্টাইন, অ্যান্ডারসন, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, জিমি লরেন্স এবং দেশ থেকে লর্ড কারমাইকেল, দ্বারভাঙার মহারাজা, বিকানিরের মহারাজা, কাশীর মহারাজা, পিঠাপুরমের রাজা, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে টেলিগ্রামে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চিঠিও লিখেছেন অনেকে। কিন্তু কারোর-কারোর চিঠির সুরটি আন্তরিকভাবেই মধুর নয়। ৩ জুন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী লেখেন : 'Shall I congratulate or condole with you ; whichever you please', ৪ জুন ভাগিনেয়ী স্বয়ম্প্রভার স্বামী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : '...From harassment by the C. I. D. to such a distinction, clearly shows a change in the policy of the government ' একই দিনে বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন : 'অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আপনাকে অন্য কথা লিখিব'--ইঙ্গিতটি অস্পষ্ট নয়। অমল হোমকে অনেক পরে ১৬ আগস্ট ১৯১৯-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন : 'নারায়ণের সময় সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন।' ড রাসবিহারী ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নাইটহুডে ভূষিত হন, এই বিষয়ে The Amrita Bazar Patrika ৫ জুন সম্পাদকীয় টীকায় লেখে 'We must, however, confess that the old familiar names Dr. Rash Behari and Rabi Babu sound sweeter in our ears than Sir Rashbehari and Sir Rabindra Nath '

রবীন্দ্রনাথ উপাধি লাভ করে পুলকিত হয়েছিলেন কিনা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে তাঁর মনোভাবের কথা প্রকাশ করেছেন দার্জিলিং থেকে অ্যাণ্ডরুজকে লেখা পত্রে ১৫ জুন : 'I am hopelessly lost in the wilderness of correspondence, distributing thanks to all quarters of the globe, till not an atom of gratitude is left in my nature'.

৬ জুন একটি টেলিগ্রাম পাঠানোর পর দার্জিলিঙের বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে তাঁকে লেখা হয়। ১১ জুন : 'The Government of India have enquired whether you are likely to be in England in the near future to receive the honour of Knighthood by accolade. I should be much obliged if you would kindly let me know as early as possible.' জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণের ভয়ে তখন ইংলন্ড যাওয়ার সমুদ্রপথ যথেষ্ট বিপজ্জনক, সেই কারণেই য়ুরোপের বদলে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। এইরকম কথাই সম্ভবত তিনি সরকারকে জানিয়েছিলেন। তাই কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই নাইটহুডের Letters Patentটি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

George the Fifth by the Grace of God

of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyound the seas, King, Defender of the Faith, do all to whom these presents shall come greeting. Know Ye that We of Our especial grace certain knowledge and mere motion have given and granted and by these

Presents Do give and grant unto Our trusty and well beloved Rabindranath Tagore, Esquire of Bolpur, Bengal, the degree title honour and dignity of a Knight Bachelor, together with all rights, precedences, privileges and advantages to the same degree, title, honour and dignity belonging or appertaining. In Witness whereof We have caused these our letters to be made patent. Witness Ourself at Westminster the eighteenth day of June in the sixth year of Our reign.

By Warrant Under the Kings Sign Manual

Muir Mackenzie

'His Majesty's appreciation of your literaty talents' রবীন্দ্রনাথকে নাইটহুড দেওয়া হচ্ছে বলে হার্ডিঞ্জ তাঁকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই Letters Patent-এ তার কোনো উল্লেখ নেই– সম্ভবত মধ্যযুগ থেকে নাইটদের যে ভাষায় Letters Patent দেওয়া হত, 'Rabindranath Tagore, Esquire of Bolpur, Bengal' কথাগুলি বসিয়ে সেই বয়ানটিই অবিকল এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে।

জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীরা তাঁদের কর্তাবাবুর সম্মানপ্রাপ্তিকে ক্যাশবহির মলাটে ব্যবহার করেছেন চামড়ার উপরে এম্‌বস্‌ করিয়ে : 'SIR, DR, RABINDRA NATH TAGORE K.T.D L./CASH BOOK 1324 B.S.' –এমন কি রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করার পরেও তাঁরা বেশ কয়েক বছর এটি ত্যাগ করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও এটি লেটারহেডে বা অন্য কিছুতে ব্যবহার করেছেন, এমন কোনো নিদর্শন আমরা পাইনি। ইংলন্ডে মুদ্রিত তাঁর বইতে উপাধিটি থাকলেও আমেরিকান সংস্করণগুলিতে সাধারণত 'Sir' ব্যবহৃত হয়নি। The Modern Review, June 1917 [p.660] -তে 'Tagore in America' শীর্ষক বিবরণে লেখা হয়েছে · 'In five or six papers we find invariably the statement, expressed with some amount of surprise, that the poet preferred to be called *Mr* Tagore rather than Sir Tagore. The *Chicago Ils Herald* writes on Oct. 22. 1916 - ' Despite his Nobel prize and recent knighting by the English King, he is still plain Mr. Tagore.' Another paper, The *Portland M E Press*, says :- "Mr. Tagore, as he prefers to be called." এর থেকেই নাইট উপাধিকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন, সেই বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

হার্ডিঞ্জের কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে নূতন ভাইসরয় চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলের প্রথম দিকে ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক সমঝোতার বাতাবরণ রক্ষিত হচ্ছিল, কারণ তখনও য়ুরোপেব রণাঙ্গনে ইংরেজ যথেষ্ট অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলেছে। তাই বালগঙ্গাধর টিলক ও অ্যানি বেসান্টের হোমরুল আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিব্রত হয়ে ভারতসচিব মন্টেগু ২০ আগস্ট ১৯১৭ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, যথাশীঘ্র ভারতশাসন আইনের সংস্কার করে তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বশাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করবেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি স্বয়ং ভারতে এসে সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করলে য়ুরোপীয় যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। জার্মানির পরাজয় ও মিত্রপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিটিশ সরকারের মনোভাবেরও বদল ঘটে। ভারতরক্ষা আইনের সুযোগ নিয়ে সরকার সন্ত্রাসবাদ রোধ করার নামে

বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, অস্বাস্থ্যকর জায়গায় অন্তরীণ করে রাখা, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য জবরদস্তি প্রভৃতি অত্যাচার এতদিন চালিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধশেষে এই ক্ষমতা বজায় রাখার মতলব নিয়ে সরকার ব্রিটিশ বিচারপতি সিডনি রাউলাটের (১৮৬২-১৯৪৫) সভাপতিত্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের পন্থাপদ্ধতি নির্ণয় করার দায়িত্ব দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে (১০ ডিসেম্বর ১৯১৭)। জুলাই ১৯১৮ এ প্রায় যুগপৎ রাউলাট কমিটির রিপোর্ট ও শাসন-সংস্কার বিষয়ে মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এক হাতে দিয়ে আর-এক হাতে কেড়ে নেওয়ার ব্রিটিশ কূটনীতির এই নমুনা দেখে অন্তত রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য হননি—মন্টেগুর ভারত-সফরের পরেই 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: 'অতএব ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে-করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের 'মাইন' সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমাব ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনেব অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তাবপরে লোনাজলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।' একেই বলে দূরদর্শিতা! ১১ নভেম্বর ১৯১৮ যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ায় ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ছিল আর ছয়মাস মাত্র। তাই 'ছোটো' ইংরেজেরা এতদিন যে অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে তাকে স্থায়িত্ব দান করতে তড়িঘড়ি ১৯ জানুয়ারি ১৯১৯ Rowlatt Bill *Gazette of India*-তে প্রকাশ করে ৬ ফেব্রুয়ারি বড়োলাটের শাসন পরিষদের উদ্বোধনী দিবসেই বিলটি পেশ করে। দেশীয় সদস্যদের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৮ মার্চ বিল পাশ হয়। ২১ মার্চ ভাইসরয়ের সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়, যার গালভরা নাম হল Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919।

গান্ধীজী এতদিন কয়েকটি রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। তিনি এই আইনের প্রতিবাদে সারা দেশে ধর্মঘট আহ্বান করলেন। প্রথমে তারিখটি ৩০ মার্চ নির্ধারিত হলেও পরে এটি পরিবর্তিত হয় ৬ এপ্রিল। কিন্তু সংবাদটি সর্বত্র প্রচারিত না হওয়ায় ৩০ মার্চেই অনেক জায়গায় ধর্মঘট হল, দিল্লি ও পাঞ্জাবে পুলিশ ও উন্মত্ত জনতার সংঘর্ষে অনেকে হতাহত হয়। গান্ধীজি তখন বোম্বাইতে ছিলেন, দিল্লি ও পাঞ্জাবের হাঙ্গামা থামাবার জন্য তিনি সেখানকার উদ্দেশে রওনা হলে পুলিশ তাঁকে পথিমধ্যে আটক করে বোম্বাইতে ফেরৎ পাঠায়। দিল্লি ও পাঞ্জাবে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা দমনের উদ্দেশ্যে লেফটেনান্ট গভর্নর মাইকেল ওডায়ার সেখানে সামরিক আইন জারি করেন। ১০ এপ্রিল অমৃতসরের ভার জেনারেল ডায়ার ও লাহোরের ভার জেনারেল জনসনের উপর অর্পিত হয়। দুই নরপশু হিংস্র উল্লাসে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। লাহোর ও গুজরানওয়ালায় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। ভয়াবহ ঘটনাটি সঙ্ঘটিত হল ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে একটি মেলা হত। এবারে অমৃতসরে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে একথা না জেনে বহু নরনারী সেখানে সমবেত হয়। সামরিক শাসক Reginald E. H. Dyer (১৮৬৪-১৯২৭) একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় ও কোনোরকম সতর্ক না করে নিরস্ত্র পুণ্যার্থীদের উপর মেসিনগান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। একটি সংকীর্ণ প্রবেশপথ ছাড়া উদ্যানটি ঘেরা থাকায়

জনতার পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাও ছিল না। সরকারি হিসাবেই ৩৭৯ জন লোক নিহত হয়, আহতের সংখ্যা হাজারের বেশি। আহতদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা না করেই ডায়ার সদলবলে প্রস্থান করে। পরে হান্টার কমিশনের কাছে সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলে, সে কাজ তার নয়, গুলি ফুরিয়ে না গেলে কেউই বেঁচে ফিরত না।

সামরিক আইন থাকায় পাঞ্জাবের খবর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তখন বাইরে প্রকাশ পেত না। লাহোর ও গুজরানওয়ালায় বোমাবর্ষণের কথা সরকারি কাগজে বেরোলেও জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর গোপন ছিল অনেকদিন। কিন্তু বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও কিছু-কিছু সংবাদ দেশের অন্যত্র গুজবের আকারে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমনই কিছু খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। তাঁর অন্তরের উত্তাপ বিশ্বরাজনীতিকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হল 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধমালায়। ২২ মে ১৯১৯ শেষ প্রবন্ধটি লিখে রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই কলকাতায় চলে আসেন। রওনা হবার আগে শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে বালিকা রাণুকে লিখলেন: 'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।' এর কয়েকদিন পরে ২৯মে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসেন। তাঁর কন্যা সীতা দেবী লিখেছেন, "তিনি স্বয়ং কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'যেরকম চারিদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে কি করে আর ভালো থাকব? ... অল্পক্ষণ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন।" এই সময়ের কয়েকটি দিনের বর্ণনা পাওয়া যায় কালিদাস নাগের ডায়েরিতে। তিনি ২৮মে লেখেন: 'প্রশান্তর FRS confirmed হয়েছে জেনে তাকে congratulate করতে এলুম, তারপর বিচিত্রায় এসে কবির সঙ্গে দেখা— Punjab ও present discontent সম্বন্ধে যে চিঠি পড়লেন, শুনে অবাক।' সম্ভবত পাঞ্জাবের ঘটনা প্রসঙ্গে অন্যের লেখা কোনো চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন। ২৯ মের বিবরণ 'দুপুরে ছট্‌কুকে সঙ্গে করে প্রশান্তকে নিয়ে কবির কাছে এসে গান শেখা—কী চমৎকার সব সুর এসেছে—কান জুড়িয়ে গেল।' ৩০মে কালিদাস লিখলেন: 'কবির কাছে এসে গান শিখে হঠাৎ তাঁর এক নতুন মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।' এই বর্ণনাগুলি মূল্যবান। ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ পেরেছেন ততক্ষণ সংগীতশিক্ষা প্রভৃতি স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তৃতীয় দিন গান শেখানোর পরে আর সংযম রাখতে পারেননি। কালিদাস নাগ লেখেননি, কিন্তু অনুমান করা যায়, ব্রিটিশ সরকারের পাশবিকতা ও দেশনেতাদের নির্বীর্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ তখন তীব্র হয়ে ফেটে পড়েছে।

এই কয়েকটি দিনের অন্য একটি চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসার পরে তিনি ছিলেন তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই ঐতিহাসিক সময়ের বিবরণ পাঁচটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের ঠিক এক মাস আগে ৬ জুলাই ১৯৪১ তাঁকে দিয়ে তারিখসহ স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই দলিলটি প্রশান্তচন্দ্র রানী মহলানবিশ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এখন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। অবশ্য তার অনেক আগেই প্রশান্তচন্দ্র "'লিপিকা'-র সূচনা" শিরোনামে রচনাটি শারদীয় দেশ ১৩৬৭ (পৃ ২১-২২)-সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেবার তিনি বেড়াতে না গিয়ে কলকাতাতেই ছিলেন। সংবাদপত্র ও চিঠির মাধ্যমে এবং লোকের মুখে পাঞ্জাব ও

জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর তখন কিছু-কিছু করে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। এমন সময়ে 'রুচিরাম সাহনির কাছ থেকে শুনে অনেক কথা একদিন বনোয়ারিলাল চৌধুরি কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন।' সেইসব শুনে রবীন্দ্রনাথ এত অস্থির হয়ে উঠলেন যে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রথীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে, তাই প্রশান্তচন্দ্রই তাঁর মেজমামা ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডেকে আনলেন। তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

'কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে থাকেন। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি গল্প তো নেইই। .... শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটেছে তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না এটা কবির পক্ষে অসহ্য। Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজি থাকেন তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews মহাত্মাজির কাছে চলে গেলেন।'

অ্যান্ডরুজের বার্তার জন্য রবীন্দ্রনাখ অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রশান্তচন্দ্রও দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে কাটান। একটি বড়ো চেয়ারে হেলান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার গল্প বলতে গিয়ে গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানবাড়িতে কাটানো দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে সম্ভব হলে সেখানে গিয়ে কয়েকটি দিন কাটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রশান্তচন্দ্র খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সেই বাগানবাড়ি তখনকার মালিক বনোয়ারিবাবুর এক শরিকের হাতে। তিনি জানালেন, রবীন্দ্রনাথ যতদিন ইচ্ছা সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন। ঠিক হল একদিন গিয়ে দেখে আসবেন, থাকার ব্যবস্থা পরে হবে।

'ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন। সকাল বেলা পুরোনো বাড়ির দোতলায় পশ্চিমের বারান্দায় কবি বসে আছেন। Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন কী হোলো? কবে যাবেন? Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব—গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন, কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বল্‌লেন, যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাবে যেতে রাজি নন্— "I do not want to embarrass the Government now" —শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বল্‌লেন না।'

সেইদিনেই বা দু'একদিনের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পেনেটির বাগানে যান। কিছুক্ষণ থেকে তিনি বলেন, সেই পেনেটির বাগানে আর ফেরা যায় না। এরপর তাঁরা ফিরে আসেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি তাঁকে বিকেলে নিয়ে আসতে বলেন। যথাসময়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র শোনেন, একটু আগে একটি ঠিকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছেন—কোথায় যাচ্ছেন কাউকে কিছু বলে যাননি, অথচ এইসব ব্যবস্থা করতেন প্রশান্তচন্দ্র নিজে। জয়গোপালবাবুকে নিয়ে তিনি বিচিত্রা লাইব্রেরির ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

'... বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে—সাড়ে সাতটা পৌনে আটটা হবে—কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তারপরে তিনজনে পুরোনো বাড়ির বড়ো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় সিঁড়ির পাশে বসবার ঘরে গিয়ে বসলুম। পাঁচ সাত মিনিট কথা বলতে বলতেই দেখলুম,' যে, কবি খুব ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক। জয়গোপালবাবু নিজেই উঠে পড়লেন। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি—কবি আমাকে পিছু ডেকে বললেন, প্রশান্ত, একটা কথা শুনে যাও। আমি জয়গোপালবাবুকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলুম। পশ্চিমের বারান্দা অন্ধকার। কবি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। কাল তুমি এখানে এসো না।' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন? 'তা জানবার দরকার নেই। তোমাকে বারণ করছি। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। কাল তুমি এখানে আসবে না। আমি বারণ করে দিচ্ছি।' দেখলুম কবি খুব বিচলিত। কিছু না বলে চলে এলুম।

... রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয়নি—হয়তো চারটে হবে—উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। ... জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলায় ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন দরোয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেম পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন—সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার, তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলাম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে—বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে। কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়োলাটকে তার পাঠানো—খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এইসব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল।'

অমল হোম লিখেছেন: 'অ্যান্ড্রুজ সাহেবের কাছে শুনেছি, ৩০শে (৩১শে) মে সকাল রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে তাঁর চিঠিখানি দেখালেন, তখন সেটাকে একটু মোলায়েম করে দেবার জন্য কবিকে

অনুরোধ জানালে, তিনি সাহেবের দিকে এমনি করে তাকিয়েছিলেন যা তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না কোনোদিন— 'Such a look as I had never seen in the eyes of Gurudev before or after!'

রবীন্দ্রনাথ কবে চিঠিটি লেখেন এই নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লেখা চিঠির অন্তত দুটো খসড়া তিনি করেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের লেখার সঙ্গে দেশ-এ খসড়ার প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, সেটি স্বাক্ষরিত ও তারিখ আছে মে ৩০ ১৯১৯। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপর খসড়াটি স্বাক্ষর ও তারিখহীন। দুটি খসড়া মেলালে বোঝা যায়, অনেক কাটাকুটি করা পূর্বোল্লিখিত খসড়াটিই আগে লেখা। আর ভাইসরয়কে পাঠানো চিঠিটির তারিখ মে ৩১, ১৯১৯। সরকারি চিঠিপত্রে এই তারিখটিই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, চিঠিটিতে প্রদত্ত ঠিকানা '5 Dwarakanath Tagore Lane' —সরকারের পক্ষ থেকে লেখা চিঠিগুলি এই ঠিকানাতেই প্রেরিত হয়।

পত্রটি ঐতিহাসিক। সারা ভারতের পৌরুষ যখন কঠোর শাস্তির ভয়ে নপুংসকের ভূমিকা নিয়েছে, তখন বাংলার একজন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল নির্ভীক ধিক্কারবাণী:

5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta, May 31st, 1919

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by out rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authourity, relentlessly careful in smoethering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is binding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily

afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,
Rabindranath Tagore

কালিদাস নাগ ডায়েরি-তে লেখেন: 'ভোরে উঠেই কবির কাছে এসে দেখি Chelmsford - কে তাঁর Kt. hood resign দিয়ে এক চিঠি লিখেছেন—শোনালেন, গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল।' ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এইদিন রবীন্দ্রনাথের '২ খানা বিলাতী চিঠি ...৩ খানা পত্র' প্রেরিত হয়েছে—হয়তো এই চিঠিরই প্রতিলিপি তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছেন। আর একটি হিসাবে রয়েছে 'গুরুদেবের লেখার টাইব করার জন্য জন্য শ্রীযুত সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া যায় ১২' টাকা।

পত্রের প্রতিলিপি বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়। দৈনিক বসুমতী-র সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এইদিনই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে পত্রটির বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (শনিবার ৩১ মে ১৯১৯) বৈকালিক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল কর্তিকাটি নষ্ট হয়ে গেলেও মাইক্রোফিল্মে এর একটি প্রতিলিপি দেখা যায়। বঙ্গানুবাদটির জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২১-২২ ও অমল হোম: পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ৭১-৭৩।

এই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ অসীম সাহসেব পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন রাউলাট অ্যাক্ট পাশ হয়ে গেছে। সুতরাং রাজার প্রতি অসম্মানের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার ও কঠিন শাস্তি দেওয়া অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথও জানতেন সে কথা। তাই ঠাট্টার সুরে ১ জুন রাণুকে লিখেছেন: 'তোমাদের সোলনে আমাকে যেতে লিখেছ, কিন্তু সিমলা সোলনের খুব কাছেই। যদি আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না, তোমাকে দুই চক্ষের জল বর্ষণ করতে হবে। আমি ভিতু মানুষ, আমি রাজদ্বার থেকে দূরে থাকি।' কিন্তু এই সময়ে তিনি রাজদ্বারের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির ফলে দেশে ও বিদেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একসময়ে রবীন্দ্র-বিদূষণে যিনি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই সাহিত্য-সম্পাদক ১৮ জ্যৈষ্ঠ লেখেন: 'শ্রীচরণকমলেষু/ "এই ত তোমার যোগ্য কথা।" / প্রণত / শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি'। ২ জুন জগদীশচন্দ্র বসু দার্জিলিং থেকে লিখলেন: 'বন্ধু তুমি ধন্য।' ২১ জ্যৈষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৬ ছত্রের

একটি কবিতা লিখে তাঁর 'নীরব নিবেদন' জানিয়ে যান।

বিশপস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক Rev. Gordon Milburn -কে রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধের কপি পাঠিয়েছিলেন, ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি ৪ জুন তাঁকে লেখেন: " ' At the Cross Roads' deals with questions about which you will not want the opinion of an Englishman & much has happened since it was written. Things seem now to have reached a state when it is useless to have opinions : nothing but decapitation of O' Dwyer by order of the Government & public exposure of his head in the streets of Lahore is likely to be of much use. But I am afraid there is no chance of that happening. What a devil the man must be.' ইংরেজদের মধ্যে তখন অনুরূপ মনোভাব সুলভ ছিল না। ও'ডায়ারের প্রাপ্য শাস্তি পেতে দেরি হয়েছিল, ১৯৪০এ একজন শিখ লন্ডনে তাকে হত্যা করে। অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংবলিত একটি সংবাদপত্র-কর্তিকা রোটেনস্টাইনকে পাঠান, তিনি ১১ জুলাই রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ' How can I not approve of it? You have not put off, but have put on dignity.'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন মৃত্যুশয্যায়। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের সংবাদ বসুমতীর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শনিবার। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: 'রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।' ২৩ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পক্ষান্তরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা ইংলিশম্যান রবীন্দ্রনাথের পত্রকে ব্যঙ্গ করে লিখেছে: 'It will not make ha'porth worth of difference. As if it mattered a brass farthing whether Sir Rabindranath Tagore approved of the Government's policy or not! As if it mattered to the reputation, the honour and the security of British rule and justice whether this Bengali poet ramained a Knight or a plain Babu!'

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে এই ধরনের প্রতিবাদ আশা করেননি। তাঁর পরামর্শদাতাদের একজন এই বিষয়ে মন্তব্য লেখেন: 'The insolence of resigning an honour conferred by the King for literary attainments on the ground of disagreement with the policy of Government is patent.' ১১ জুন 'Private' টেলিগ্রামে চেমসফোর্ড ভারতসচিব মন্টেগুকে জানান [Telegram P., No. 655, 11th June 1919, 1-30 p.m.]

A letter dated 31st May has been addressed to me by Rabindranath Tagore announcing his desire to resign Knighthood, which was con-

ferred on him in June 1915, as a protest against the policy followed by Government in dealing with the recent troubles in the Punjab. He, however, communicated it to the press before its receipt here. As there are no Insignia and no Letters Patent to be handed back as an outward sign of renunciation, the case it not parallel with that of Subramaniya Ayyar and the title can, it is presumed, only be revoked by His Majesty by whom it was granted. I propose to reply, in view of the advertisement that would be given to Tagore and of the fact that grant of his request might be interpreted as admission of mistaken policy in the Punjab, that I am unable myself to relieve him of his title and in the circumstances, do not propose to make any recommendation to His Majesty on the subject. Please let me know by telegram if this view is concurred in.

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের চিঠি পাওয়ার দশদিন পরে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে S. R. Hignell ১২ জুন তাঁর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে লেখেন: 'The matter is receiving attention and a further communication will be made to you in due course.'

১২ জুন ভাইসরয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে সেইদিনই Sir T. W. Holdnass [?] -এর কাছে তাঁর মতামতের জন্য প্রেরিত হয়। তিনি ১৩ জুন নোটে লেখেন:

The Pol. A. D. C. has discussed the matter with the Home Office (wh. looks after Knight-bachelorhood) and with Sir F. Ponsonly.

The only way by wh. a Knight-bachelor can be released of the Honour is by "degradation". This means the issue of Letters Patent notifying his degradation. It was done in the case of Sir Roger Casement. It wd. be quite inapplicable in the present case. The Viceroy's action is right.

We should send copy of the telegram to Ld. Stamfordham saying that you propose to concur with the Viceroy.

Lord Stamfordham ১৪ জুন Windsor Castle থেকে লেখেন:

I have shewn the King your letter of today and the copy of the private telegram from the Viceroy regarding Sir Rabindranath Tagore's desire to resign his Knighthood. His Majesty approves of the Viceroy's proposed procedure. Later on, if it is necessary to degrade him, Letters Patent would have to be issued to that effect.

এরপর পূর্বোক্ত S. R. Hignell ২০ জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ' ... His Excellency the Viceroy is unable to relieve you of your title of Knightbood, and that, in the circumstances of the case, he does not propose to make my recommendation on the subject to His Majesty the King Emperor.'

রবীন্দ্রনাথ মন্টেগুর কাছেও টেলিগ্রাম করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি ভাইসরয়কে জানান [Tele-

gram P. No. 1544, 23rd June 1919, 11-25 p.m. (Recd. 25th, 9 a.m)]: ' ... Rabindranath Tagore has wired to me his letter to you for submission to the King if I think fit. Please convey reply to him from me in the same sense as that of answer proposed in your private telegram of the 11th instant.' ২৬ জুন প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে উক্ত মর্মে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি পাঠানো হয় এবং এইখানেই সরকারপক্ষ থেকে ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এই বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, কিন্তু সরকারি দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 'Sir' -ই থেকে যান। তাতে রবীন্দ্রনাথের কিছুই এসে যায়নি, কারণ তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে চাননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে সংঘটিত অন্যায়ের প্রশমন ও প্রতিবিধান করা। সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১০ জুন পাঞ্জাব থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়, ভাইসরয় বাধ্য হন পাঞ্জাবের ঘটনাবলির তদন্ত করার জন্য কমিশন গঠন করতে। সেই কমিশন কতটা নিরপেক্ষ ছিল বা ডায়ারকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ও ইংলন্ডের ইংরেজরা ফান্ড গঠন করে যে নীচ অমানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ আলাদা।

নাইটহুড-ত্যাগ নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নিয়ে তাকে আরও তীব্র করার নির্বুদ্ধিতা সরকারপক্ষ দেখায়নি—একে নীরবে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু তাদের রাজাকে অপমান করার 'insolence' তারা কোনোদিন ক্ষমাও করেনি। বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯২১-এ আমেরিকায় গেছেন, তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বাধা দিয়েছে। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি ইংরেজ বন্ধুদের অনেকের আচরণে উত্তাপের অভাব অনুভব করেছেন।

স্বদেশেও এই উপাধিত্যাগের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিচিত্র ধরনের। পাঞ্জাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে পাঞ্জাবের ঘটনাবলি ও শাসনসংস্কার নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয় ২৬ জুন তারিখে। এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

That this meeting of the citizens of Calcutta gratefully records its appreciation of the protest entered by Sir Sankaran Nair and Rabindranath Tagore against the policy pursued by the Government of India in relation to the Pubjab disturbances and records respectfully and with regret the fact that His Excellency Lord Chelmsford has lost the confidence of the public and this meeting humbly beseeches His Imperial Majesty to recall Lord Chelmsford.

কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক স্বীকৃতি কেবল এই প্রস্তাবটুকুতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। জগদীশচন্দ্র ছাড়া আর-কোনো বড়ো মাপের ব্যক্তি এই কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাননি, পক্ষান্তরে গান্ধীজি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে ৬ জুন একটি চিঠিতে লিখেছেন: ' The Punjab horrors have produced a burning letter from the poet. I personally think it is premature. But he cannot be blamed for it.'

রাজনৈতিক নেতারা রবীন্দ্রনাথের উপাধিত্যাগকে সর্বাধিক অসম্মান করেন ডিসেম্বর ১৯১৯ অমৃতসর কংগ্রেসে। সেখানে ইংরেজের অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সভা কাঁপানো অনেক বক্তৃতা

হয়েছিল, কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের একটি উল্লেখ ছাড়া কোনো বাঙালি বা অবাঙালি নেতার মুখে রবীন্দ্রনাথের উপাধি-ত্যাগের ঐতিহাসিক পত্র সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারিত হয়নি। অমল হোম এই বিষয়ে একটি ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করানোর জন্য কী চেষ্টা করেছিলেন আর তার কী পরিণতি ঘটেছিল, তার বিবরণ আছে তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' (১৩৬৮) গ্রন্থের 'অমৃতসর কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি' (পৃ ১০৫-১৩) প্রবন্ধে। এখনও কোনো-কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ উপাধি ত্যাগ করতে কেন ৫৬ দিন সময় নিয়েছিলেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলেছেন। ধন্য গবেষণা!! ১০ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে বড়ো দুঃখে লিখেছিলেন:

'আমাদের কত যে দুঃখ কত যে দায়িত্ব তার সীমা নেই—অথচ আমরা কেবল দুঃখটাকেই বহন করে চলেছি দায়িত্বকে গ্রহণ করচি নে এইটেতেই আমরা কেবলি নেবে যাচ্ছি। সকল বড় বড় দেশেই এমন সকল বীর আছে যারা দুর্গতিকে চরম বলে কিছুতেই স্বীকার করে না—যারা নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে উপহাস করে। আমরা আলস্য ঔদাস্য বশত দুর্গতির সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে বসে আছি—এমন কি, তার পক্ষসমর্থন করে তার প্রশংসা করে তার বলবৃদ্ধি করচি। সেইজন্যে এতদিন আমি বড় দুঃখ পাচ্ছিলুম যে, আমাদের দেশের যুবকেরাও এই ভীরুতা এই কপটতাকেও আত্মশ্লাঘায় পরিণত করে আস্ফালন করে বেড়াচ্চে। এতদিন এই নিয়ে কেবলি লড়াই করেছি এবং দেশের লোকের কাছ থেকে নিয়ত মার খেয়েচি।'

সূত্র ও কৃতজ্ঞতা:
রবীন্দ্রভবন
অমল হোম : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : 'লিপিকা'-র জন্মকথা
ভানুসিংহের পত্রাবলী
সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি
কালিদাস নাগ : ডায়েরি
চিঠিপত্র ১১
The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XV
অ্যান্ড্রু রবিনসন।

দি সান্‌সেট্‌ অব্‌ দি সেঞ্চুরী

নেপাল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধে দু-দু'টো বিশ্ব বা মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে; —প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং তার প্রায় ২২ বছর পর শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। সাম্রাজ্য প্রসার, পরদেশ লুণ্ঠন ও আগ্রাসন এবং যুদ্ধের পৈশাচিক বর্বরতা কিশোর বয়সেও কবির মনেও যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা তাঁর 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) ও পরবর্তী অন্যান্য রচনায় আমরা লক্ষ্য করি। এরপর আসে প্রথম মহাযুদ্ধ।

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার পর কবিমানসে যে গভীর প্রতিক্রিয়া হয় এবং এইকালে তাঁর বিভিন্ন কবিতা গান প্রবন্ধ নিবন্ধ বক্তৃতা ভাষণ এবং শান্তিনিকেতনে মন্দিরে কথিত ভাষণে আমরা তাঁর যন্ত্রণাভোগের এবং বক্তব্যের পরিচয় পাই। এই 'প্রথম মহাযুদ্ধ' চলাকালেই জাপানে ও আমেরিকায় প্রদত্ত কবির সেই বিখ্যাত 'ন্যাশনালিজম্‌'এবং যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। যুদ্ধের মূল কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার প্রলয়ঙ্করী পরিণাম সম্পর্কে কবির সতর্কবাণী এবং বিচার বিশ্লেষণ এই *Nationalism* গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধকালীন সেই প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা ও ডামাডোলের মধ্যেও এবং ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্রের কড়া সেন্সরের প্রাচীরও কবির এইসব বক্তৃতা ও বাণীর পথরোধ করে দাঁড়াতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য, অল্পকাল পরেই রোম্যাঁ রোলাঁর উদ্যোগেই কবির এইসব বক্তৃতার অংশবিশেষ পুনঃপ্রচারিত হলে ইউরোপের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তা কম বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। বস্তুত, ইউরোপের স্বাধীন ও বিবেকী বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তানায়কদের রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি যতখানি আকৃষ্ট না-করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছে কবির *Nationalism* গ্রন্থের বক্তব্য এবং তাঁর সতর্কবাণী।

লক্ষণীয়, এই সময় ইউরোপের অতি স্বল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবী—Conscientious War-resister বা বিবেকের নির্দেশে যাঁরা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যাশানালিজম বিরোধী বক্তৃতায় ঠিক সে ধরণের যুদ্ধ-বিরোধিতা করেননি। প্যাসিফিস্ট বা 'কোয়েকার'দের মত তিনি নিছক শান্তির জন্য প্রচারও করেননি। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ঠিক যুদ্ধও ছিল না, — যে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শ ও লোভরিপুর তাড়নায় স্বদেশের বা জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিকেই পরমার্থ জ্ঞান করে পরদেশ লুণ্ঠন ও পররাজ্য গ্রাস করা হচ্ছে, যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বেদীমূলে

ন্যায়নীতি, মানবধর্ম ও বিবেকবুদ্ধিকে মুহূর্তেই পদদলিত করা হচ্ছে, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই মহাযুদ্ধ। যে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের মদ খেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতি উন্মত্তের মত আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে—সেটাই কবির আক্রমণের মূল লক্ষ্য। Chauvinism, Nationalism হচ্ছে সবচেয়ে উত্তেজক মদ (powerful anaesthetic) যা মানুষের সব বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে দেয়। এই মহাযুদ্ধ এই হানাহানি রক্তপাত—আজকের যতকিছু অনিষ্টের মূল এই ন্যাশানালিজম। এই জন্যই কবি তাঁর বক্তৃতা-গ্রন্থের নামকরণ করলেন *Nationalism*। একথা এমন করে, সেদিন পৃথিবীতে কোনো লেখক শিল্পী বা বুদ্ধিজীবী বলতে পারলেন না। অবশ্য কবির এই ন্যাশানালিজম-বিচারে রাজনীতি-বিজ্ঞানের পরিভাষাগত দিকে ও কিছু টেকনিক্যাল ভুল হয়েছিল, বস্তুত 'ন্যাশনালিজম্' বলতে কবি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ইম্পীরিয়ালিজম এবং 'এম্পায়ার বিল্ডিং'-এর উন্মাদনার কথাই বোঝাতে বা বলতে চেয়েছেন।

অনেকের ধারণা, মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই বুঝি যুদ্ধ ও ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে এইসব চিন্তাভাবনার প্রথম সূচনা হয়। কিন্তু এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়; — যুদ্ধ শুরু হলে এ সম্পর্কে নতুন কথাও কিছু বললেন না। অচিরেই পৃথিবী জুড়ে যে একটা মহাযুদ্ধ আসছে—একথা মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় ১৩/১৪ বছর আগেই কবি যেন তাঁর অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করে হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, —বিশেষ করে তাঁর 'ন্যাশনালিজম্'-বক্তৃতামালায় যুদ্ধের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই মহাসংকটের কার্যকারণ সম্পর্কে কবির বিচার-বিশ্লেষণ বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনাকালেই তিনি তার মূল কথাগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, এই কালের বিভিন্ন রচনায়, ভাষণে ও উপদেশমালায়। বহির্বিশ্বের নিদারুণ ঘটনাপুঞ্জের অভিঘাত কবির মনে পাশ্চাত্ত্যসভ্যতা সম্পর্কে যে গভীর সংশয়, বীতরাগ ও সন্দেহ জন্মেছিল, এ প্রসঙ্গে সেটাও স্মরণ রাখা দরকার।

উনিশ শতকের শেষভাগটা হচ্ছে সাম্রাজ্যপ্রসারের শেষ যুগ। এশিয়া ও আফ্রিকার বুকে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে ইউরোপের বড়ো বড়ো শক্তিগুলি তখন নিজেদের মধ্যেই হিংস্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এইকালে যে দুটি বড়ো ঘটনায় কবির মন সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হয়েছিল, সে দুটি হলো : দক্ষিণ আফ্রিকার 'বোয়ার যুদ্ধ' ও চীনের ঐতিহাসিক 'বকসার বিদ্রোহ'। এই দুটি নগ্ন আক্রমণ ও আগ্রাসনের প্রচন্ড অভিঘাতে কবির মনে পাশ্চাত্ত্য দেশ ও রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে যে তীব্র ঘৃণা বীতরাগ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, তা তাঁর এইকালের রচিত বেশ কিছু কবিতা গান এবং বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পায়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই 'বঙ্গদর্শন'-এ (নবপর্যায়) কয়েকটি প্রবন্ধ ও রচনায় ইউরোপের বড়ো বড়ো প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির অবিরাম যুদ্ধ-বিরোধ ও সংঘর্ষের মূল কারণগুলি নির্দেশ করতে গিয়ে কবি যে অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তা রীতিমত বিস্ময়কর এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণও বটে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন-১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ; র. র. ৪র্থ খন্ড।। পৃ: ৪১৮-২৪) কবি লিখলেন:

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কন্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।"

"ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

... "রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ সত্যভঙ্গ প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্য ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

'ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুব ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে।"

কবি এই 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধে আসন্ন মহাযুদ্ধের সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বললেন: পরদেশ লুণ্ঠন এবং সাম্রাজ্যপ্রসার অভিযানে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছে এরই ফলে এক সর্বনাশা মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গ দর্শন'-এ 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক রচনায় (আষাঢ় ১৩০৮) এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বললেন:

"য়ুরোপে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। ...

"য়ুরোপেও অবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক-একজন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুই দন্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকার দুই একজন লোক তর্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কী করিয়া! **বাণিজ্য-জাহাজে উনপঞ্চাশ পালের হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারিসারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে? ... বর্তমান কালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে।"**

এর অল্পকাল পরেই 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বিরোধমূলক আদর্শ' শীর্ষক (১৩০৮ আশ্বিন) একটি রচনায় ইউরোপের এই 'ন্যাশানালিজম' ও 'প্যাট্রিয়টিজমের' স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কবি লিখলেন:

.... "**মিথ্যার দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহাই নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন।** গায়ের জোর ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশানতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনো য়ুরোপে দেখিতে পাই না।"

... "স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনো প্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। **এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এস্থলে বিরোধ বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"**

বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি হ'তে এমন আরও কিছু মূল্যবান উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। এখানে যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বঙ্গদর্শনের এসব প্রবন্ধে ইউরোপের ন্যাশানালিজম প্যাট্রিয়টিজমের এবং তার

অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও যুদ্ধ-সংঘর্ষের উৎপত্তির কার্যকারণ-রহস্য যত সুন্দর ও সার্থকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এমনটি তাঁর পরবর্তীকালের 'ন্যাশানালিজম' বক্তৃতাগুলিতেও হয়নি। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে বেশ কিছু অত্যন্ত মূল্যবান বিচার-বিশ্লেষণ আছে যা তাঁর *Nationalism* বক্তৃতামালায় বর্জিত বা বাদ পড়ে গেছে। জাপানের পথে (১৯১৬) কবি জাহাজে বসেই ইংরেজীতে *Nationalism* গ্রন্থের বক্তৃতা বা ভাষণগুলির খসড়া করেছিলেন। বস্তুত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলির মূল কথাটাই তাঁর *Nationalism in the West* বক্তৃতায় পরিমার্জিত সূত্রাকারে বলার চেষ্টা হয়েছে, —তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে তর্ক ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ও যুক্তিশৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে কবি বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে ন্যাশানালিজম সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন, *Nationalism in the West* রচনায় তার অনেকখানি বাদ পড়ে গেছে। তাতে করে কবির ঐ বক্তৃতার ধার ও ঔজ্জ্বল্য কিছুটা যেন হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া আরও একটা বড়ো কথা, —এসব কথা কবি যে মহাযুদ্ধ বাধার ১৩/১৪ বছর আগে বলে গেছেন, রোমাঁ্যা রোলাঁ, আইনস্টাইন, অ্যাঁরি বারব্যুস প্রমুখ ইউরোপের মনীষী ও চিন্তানায়কেরা তা জানতেও পারলেন না। —যে দূরদর্শিতা ও সঠিক বিচারশক্তি ইউরোপে তাঁদের কারুর পক্ষেই অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি, ভারতবর্ষের মতো পরাধীন ও পিছিয়ে পড়া দেশের কবির পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব হল।—এটাই পরম বিস্ময়।

বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধগুলি নিয়েই যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে তাঁর ন্যাশানালিজম-বক্তৃতামালার খসড়া শুরু করেছিলেন তার আর একটা বড়ো প্রমাণ *Nationalism* গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতার ইংরেজী তর্জমা (*The Sunset of the Century* শীর্ষক কবিতায়) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিগত শতাব্দীর শেষ দিনটিতে রচিত 'নৈবেদ্য'-র সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটির (৬৪ সংখ্যক) অংশবিশেষ তর্জমা করতে গিয়ে কবি লিখলেন:

The Sunset
of the Century

(Written in Bengali on the last day of the last Century)

1.

The last sun of the century sets amidst
the blood-red
clouds of the West and the whirlwind of
hatred.
The naked passion of self-love of Nations,
in its drunken
delirium of greed, is dancing to the clash
of steel
and the howling verses of vengeance.

এ কবিতার রচনাশৈলী আঙ্গিক নিতান্তই গৌণ, এর বিষয়বস্তু এবং ভাব ও অগ্নিস্রাবী ভাষাটাই প্রধান বিচার্য।

'নৈবেদ্য'-র মূল কবিতাটি ছিল এই:

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে

অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।...
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

লক্ষণীয়, মূল কবিতায় শেষের দুটি চরণের ইংরেজী তর্জমায় কয়েকটি কথা প্রায় বর্জিত হয়েছে। —'কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি' ... সরাসরি এ ভাবে না বলে কিছুটা ঘুরিয়ে (howling verses of vengeance) বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: 'কবিদল চীৎকাবিছে জাগাইয়া ভীতি'— কোন কবিদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করে কবি একথা বললেন?

'বোয়ার যুদ্ধ' এবং এই কালের প্রায় অবিরাম যুদ্ধ-সংঘর্ষ ভবা দিনগুলিতে রাডইয়ার্ড কিপলিং প্রমুখ কতিপয় ইংরেজ কবি "ব্রিটিশ এম্পায়ার এবং ইংরেজ জাতিব মহিমা প্রচার করে কবিতা রচনা করে চলেছিলেন। বলা বাহুল্য, কিপলিঙদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য'-র এই কবিতায় ("কবিদল চীৎকারিছে ...") তাঁদের তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত করেছেন। স্মরণ রাখা দরকার, এই কালেই কিপলিঙের *'The Vampire' ' Recessional', 'The White Man's Burden' 'The Old Issue', 'The Absent-minded Beggar'* কবিতাগুলি রচিত হয়।

সহায়সম্বলহীন বোয়ারদের হাতে বারবার সুশিক্ষিত ইংবেজ সেনারা বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সমেত শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলে কিপলিঙের টোরি রক্ত ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে বোয়াবদের নিঃশেষে খতম করে দেবার জন্য কিপলিং তার অগ্নিস্রাবী কবিতাগুলি রচনা করেন। বোয়ার অধিনায়ক পল্ ক্রুগারকে চিবিয়ে বা বটিকার মতো গিলে খেয়ে ফেলবার ('Killing Kruger with your mouth') আহ্বান জানালেন। প্রসঙ্গত তাঁর এই সময়কার রচিত *'The Old Issue'* কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৯ সালে কবিতাটি ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, বিলেতের Times পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কিপলিঙের জীবনীকার Charles Carrington তাঁর *'Rudyard Kipling'* গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন (পৃ ৩৬৩)

It was published in *The Times*, on the twenty-ninth, under the title of 'The Old Issue'. To a modern reader, steeped in the propaganda of the anti-imperialists, this poem has become almost un-intelligible. A war against Kruger, Rudyard suggested, was a war for liberty, which should rally the English to their old traditions of resistance against tyranny.

Cruel in the shadow, crafty in the sun,
Far beyond his borders shall his teachings run.

Sloven, sullen, savage, secret, uncontrolled,
Laying on a new land evil of the old–

Long-forgotten bondage, dwarfing heart
and brain–
All our fathers died to loose he shall
bind again.

ক্যারিংটন আরও লিখেছেন .

A few days later the storm broke and Rudyard immediately set himself to two tasks of war work: one was to form a volunteer company in the village at Rotongdean, the other was to raise money for the Soldiers' Families' Fund.

এম্পায়ারভক্ত যুদ্ধোন্মাদদের ক্রুদ্ধ রণহুঙ্কার ও গর্জন—আর আক্রান্ত পদপিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর ভয়ার্ত চিৎকার এবং ক্রন্দনরোলের মধ্যে খৃষ্টীয় উনিশ শতকের শেষ সূর্যাস্তবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

এইভাবে উনিশ শতকের ইউরোপের ভদ্রবেশী ছদ্মবেশ খসে পড়ে। ঘটনাস্রোতই তার বীভৎস নগ্নরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গেল।

দেশবাসীর কাছে কবির প্রশ্ন: এই ইউরোপ তার মহদাদর্শের কোন্ দিকটি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে, যাকে আমরাও আপন বলে গ্রহণ বা বরণ করে নেব। জাতীয়তাবাদের-ধ্বজাধারী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সর্বনাশা পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী করে কবি 'নৈবেদ্য'র আরও কয়েকটি কবিতায় লেখেন:

"একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে।
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।"

কবি তার ইংরেজী তর্জমা করে লিখলেন—

2

The hungry self of the Nation shall burst

in a violence
of fury from its own shameless feeding.
For it has made the world its food.
And licking it, crunching it, and swallowing
it in big morsels,
It swells and swells
Till in the midst of its unholy
feast descends the sudden
shaft of heaven piercing its heart of grossness.

'নৈবেদ্য'র "এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ-রেখা" কবিতাটির মূলভাবটি তর্জমা করে কবি লিখলেন:

3

The crimson glow of light on the horizon is not
the light of thy dawn of peace, my Motherland.
It is the glimmer of the funeral pyre burning
to ashes the vast flesh,–the self-love of the
Nation,–dead under its own excess.
Thy morning waits behind the patient dark of
the East,
Meek and silent.

এই শতাব্দীর একেবারে উষালগ্নেই যুদ্ধবাজ এই লুঠেরা সমাজ-সভ্যতার বিরুদ্ধে এতোখানি ঘৃণা, এতোখানি তীব্র বিষোদগার করে সমকালীন বিশ্বের আর কোনো কবি এমন শক্তিশালী কবিতা রচনা করেছেন বলে জানা নেই। এইসব রচনা ও কবিতা ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

কোন্ বইটা ঠিক বই

শঙ্খ ঘোষ

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন থেকে একটি বইয়ের এক পৃষ্ঠা অনুলিপি করে আনতে বলেছিলাম কোনো এক যুবককে, অল্প কিছুদিন আগে। বইটি ছিল 'পথের সঞ্চয়'-এব প্রথম সংস্করণ। আমার দরকার ছিল তার ভূমিকা অংশটুকু, কেননা চল্‌তি সংস্করণগুলিতে — অথবা রচনাবলীতে — সে-ভূমিকা আর নেই। অল্প দিনের মধ্যে সেটা হাতে পেয়ে যাব এই ভরসা নিয়ে যখন বসে আছি, যুবকটি তখন বিস্মিত ভাবে জানান এসে : না, প্রথম সংস্করণেও নেই তেমন-কোনো ভূমিকা।

নেই? এতটাই ভুল করলাম তবে? অন্য কোনো বইয়ের সঙ্গে কি মিলিয়ে ফেললাম তাকে? লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার একটি বই হিসেবে চিহ্নিত কোনো-একটি 'পথের সঞ্চয়'-এর সূচনায় ভূমিকা তো একটা দেখেছিলাম বলেই মনে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহভুক্ত কপিটির মধ্যেও যদি না থাকে সেটা, তবে সে-মনেপড়ার উপর আর ভরসা রাখি কী করে!

স্মৃতির এই সমস্যা নিয়ে যখন বেশ বিপন্ন আছি, সাহায্য কবলেন এক বন্ধু। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে এনে দিলেন 'পথের সঞ্চয়'-এর প্রথম সংস্করণ। এই তো, সে-বইয়ের আখ্যাপত্রে তো ঠিকই লেখা আছে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-১', ঠিকই তো সেখানে আছে সেই গ্রন্থমালা বিষয়ে এক পৃষ্ঠার এক সূচনাকথাও।

রবীন্দ্রভবনের বইটি কি তবে প্রথম সংস্করণ নয়? তাই বা কেমন করে হবে? রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে একবারই ছাপা হয়েছে সে-বই, উনিশশো উনচল্লিশ সালে, আর ভবনের বইটি সে-বছরেরই। দুটো বই তখন পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে হলো, আখ্যাপত্র ছাড়া কোথাও কোনো প্রভেদ নেই আর। তাহলে? মুদ্রিত অবস্থায় হাতে পৌঁছবার পর হয়তো লেখকের মনে হয়েছিল 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' হিসেবে সংগত নয় সেটি, হয়তো সে-কারণেই ভূমিকাটি সরিয়ে নিয়ে আখ্যাপত্র ছাপা হয়েছে নতুন করে, নতুন বাঁধাইয়ের পরে সেটিই প্রচারিত হয়েছে 'পথের সঞ্চয়'-এর মূল বই হিসেবে। ভূমিকাসুদ্ধ মুদ্রণের একটি-দুটি কপি হয়তো পড়ে ছিল এখানে-ওখানে, তারই কোনো-একটা আমাদের কারো কারো হাতে এসে পৌঁছেছে হঠাৎ।

আজ যদি রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে হয়, তাহলে সেই ভূমিকাটির অস্তিত্ব কি কোথাও থাকবে, না কি থাকবে না? প্রাথমিক পরিকল্পনার সেই ইতিহাস জানবার কি কোনো তাৎপর্য আছে, না কি নেই?

এই বিশেষ ভূমিকাটি থাকা-না-থাকায় যে বইটির কোনো চরিত্রবদল ঘটে, তা হয়তো নয়। একই সংস্করণ দুই ভিন্ন চেহারায় ছাপা হয়েছিল, কৌতূহলজনক এই বিবরণটুকু ছাড়া হয়তো আর বেশি কিছু ভাববার নেই ওখানে। কিন্তু একই সংস্করণের এমন দুই ভিন্ন চেহারা যে বেশ জটিল রকমের তথ্যবিপর্যয়ও ঘটিয়ে দিতে পারে কখনো কখনো, রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি বইতে তার উল্লেখযোগ্য চিহ্ন ছড়ানো আছে মনে হয়। এর অন্যতম এক উদাহরণ হলো 'চিঠিপত্র' সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডটি।

মুসোলিনি আর ফ্যাসিবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক সম্পর্ক আর সম্পর্কচ্ছেদের ইতিহাস নিয়ে বিস্তর বিচার হয়েছে দেশে-বিদেশে, খুবই সমৃদ্ধ সেই বিচার। কিন্তু বছর পনেরো আগে পর্যন্ত সে-বিচারে জরুরি এক তথ্য কেন বর্জিত হতো, সেকথা বুঝতে পারিনি অনেকদিন। ইটালির আতিথ্য থেকে রোম্যাঁ রলাঁর তত্ত্বাবধানে পৌঁছবার পর ইওরোপের প্রগতিবাদীদের সঙ্গে কথাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরেছিলেন ফ্যাসিবাদ বা মুসোলিনির যথার্থ রূপ, উনিশশো ছাব্বিশ সালের সেই টানাপোড়েনের কথা আমরা জানি। কিন্তু মুসোলিনিকে তখন কতখানি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? অনেক আলোচনার পর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে বয়ান তিনি লিখে দিয়েছিলেন, তার ভিতরে যথার্থ উপলব্ধির চাপ ছিল কতখানি? ছাব্বিশ সালের পরবর্তী কাল জুড়ে এসব বিষয়ে কী ছিল তাঁর মনোভাব? এই কথাগুলির বিচারের কাজে, ঐতিহাসিক পারম্পর্য বুঝবার কাজে, মনে হয়েছিল উনিশশো তিরিশ সালে রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠির বড়ো-একটা ভূমিকা আছে। মুসোলিনির উদ্দেশে জানানো কয়েকটি কথার মুশাবিদা সঙ্গে পাঠিয়ে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তিনি, অশ্রুকাতর ফর্মিকি না কি তাঁকে ব'লেছেন 'মুসোলিনিকে একখানা চিঠি লিখলেই সমস্ত জঞ্জাল সাফ হয়ে যায়। আমি তাঁকে বলেছি, চিঠি লিখব। চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠাই। যদি দ্বিধার কারণ না থাকে পাঠিয়ে দিস্। চিরকাল ইটালির সঙ্গে ঝগড়া জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়।' এর সঙ্গে মুসোলিনির জন্য যে মুশাবিদা, তার কোনো কোনো লাইন ছিল এ-রকম: 'I earnestly hope that the misunderstanding which has unfortunately caused a barrier between me and the great people you represent . ..will not remain permanent...' । সমস্ত ইতিহাসটা বুঝবার পক্ষে রথীন্দ্রনাথ বা মুসোলিনিকে লেখা উনিশশো তিরিশের এই চিঠি কি একটা বড়ো রকমের দলিলই নয়?

এই প্রসঙ্গের গবেষকদের কারো কারো কাছে কথাটা তুলতে গিয়ে সে-সময়ে জেনেছিলাম যে এমন-কোনো চিঠির নাকি দেখাই পাননি তাঁরা। রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলি তো সংকলিত আছে 'চিঠিপত্র'র দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সেই দ্বিতীয় খণ্ড খুঁজে দেখেছেন তাঁরা, অচ্ছিন্ন সেসব কপিতে কোথাও ওই বিশেষ চিঠির কোনো অস্তিত্বই নেই।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রভবনের একাধিক কপি মিলিয়ে দেখতে হয়েছিল তখন। আর, 'পথের সঞ্চয়'-এর ভূমিকা না পেয়ে হতাশ এবং বিস্মিত সেই যুবকটির মতো আমারও জেগেছিল বিস্ময় আর হতাশা : ঠিক, কোথাও নেই ও-চিঠিটি। 'যদি দ্বিধার কারণ না থাকে' তো চিঠিটি মুসোলিনিকে পাঠাতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুমান করা যায় যে দ্বিধাই ছিল রথীন্দ্রনাথের, পাঠাননি আর সেটা। পাঠাননি, কিন্তু নষ্টও করেননি। তাঁর কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র মুদ্রিত হয়ে যাবার পরে হয়তো নতুনভাবে তাঁদের নজরে আসে ওই টুকরোটাও, নতুন কোনো অপ্রিয় বিতর্কের আশঙ্কায় হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সরিয়ে দিতে চান ওটা। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ছাপা (আর

আজও পর্যন্ত কোনো নতুন সংস্করণ না হওয়া) এই 'চিঠিপত্র' দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি ভিন্ন প্রথম সংস্করণ হয়ে রইল তাই।

আজ আমরা এর কোন্ প্রথমটাকে বলব যথার্থ প্রথম? কোন্ বইটা রবীন্দ্রনাথের ঠিক বই? মুসোলিনির কাছে লেখা ওই চিঠিটি সুদ্ধ যেটি, না কি সে-চিঠি বর্জিত বইটি? কোন্ বইটি থাকবে রবীন্দ্ররচনাবলীতে— ভূমিকাসুদ্ধ 'পথের সঞ্চয়', না কি ভূমিকাহীন 'পথের সঞ্চয়'? রবীন্দ্ররচনার সম্পাদনা করেন যাঁরা, তাঁদের কাছে নিশ্চয় এটা জটিল এক সমস্যা।

একটা-দুটো পাতা থাকা-না-থাকাটা অবশ্য একমাত্র সমস্যা নয়। লেখার সূচনায় 'পথের সঞ্চয়'-এর কথাটা যে তুলেছিলাম, তার অন্য কারণও আছে। কিন্তু সে-কারণে পৌঁছবার আগে আরো একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

অধ্যাপনা-জীবনের একেবারে গোড়ায়, 'সাহিত্যের পথে' বইটির 'বাস্তব' প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলছিলাম ছেলেমেয়েদের সামনে। আলোচনাসূত্রে বই থেকে খানিকটা অংশ পড়ে শোনাবার দরকার হলো। ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ছি আমি; ছেলেমেয়েদেরও কারো কারো সামনে খোলা আছে বই। হঠাৎ লক্ষ করি যে তারা কিছুটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, শোনায় আর দেখায় তারা মেলাতে পারছে না ঠিক। 'কিছু কি অসুবিধে হলো?' জানতে চাই আমি। 'বইয়ের সঙ্গে মিলছে না তো'—বলে ওঠে তারা। 'মিলছে না? সে কী!'

তাদের হাত থেকে বই নেবার পর সেই প্রথম নজরে এল (লক্ষ করা উচিত ছিল আগেই) যে, নতুন মুদ্রণে এ-বইয়েরও সংস্কার ঘটে গেছে অনেক। উনিশশো ছত্রিশ সালে ছাপা প্রথম সংস্করণটিই আমার হাতে আছে পারিবারিক সূত্রে, আর ওদের হাতে স্বভাবতই পরবর্তী বই। আমি পড়ছি 'দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছেড়ে নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ংবর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করে থাকেন', আর ওরা দেখছে 'দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ংবর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।'

ভিন্নতাটা তবে সাধু-চলিতের, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু কীভাবেই-বা ঘটতে পারে ওই ভিন্নতা? ছত্রিশে এ-বইয়ের প্রথম মুদ্রণের পর রবীন্দ্রনাথ তো এর দ্বিতীয় প্রকাশ দেখে যাননি আর, বিশ্বভারতীর রচনাবলীতে এ-বই প্রথম ছাপা হয়েছে সাতচল্লিশ সালে, লেখকের মৃত্যুর ছ-বছর পর। বদল যদি কিছু ঘটে থাকে, তাহলে সে তো লেখকের করা নয়, সম্পাদকের।

না, সম্পাদক ভাষা বদল করেননি। বদল করেছেন শুধু বিবেচনা। 'বাস্তব' লেখা হয়েছিল উনিশশো চোদ্দ সালে। সবুজপত্রে তা ছাপা হলেও সবুজপত্রের ভাষারীতি সেখানে গৃহীত হয়নি, অভ্যস্ত সাধুভাষাতেই সে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার বাইশ বছর পর, প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের পথে'র অন্তর্গত করবার সময়ে পঁচাত্তর বছর বয়সের প্রবীণ লেখক যে এর ভাষাগত পুনর্মার্জনার শ্রমসাধ্য দায় তুলে নিয়েছিলেন, তার কোনো কারণ নিশ্চয় ছিল? যে-বইতে প্রায় সমস্ত লেখাই উত্তরকালের, সব লেখাই যেখানে চলিত ভাষায়, সেখানে 'বাস্তব' আর 'কবির কৈফিয়ৎ' নামে লেখাদুটির ভাষাকে সাধু থেকে চলিতে পাল্‌টে দেওয়া সংগত মনে হয়েছিল তাঁর, বইটিকে একটি অখণ্ড চেহারা দেবার জন্য।

অন্যপক্ষে, রচনাবলীর সম্পাদকেরা ভেবেছেন, পাঠকদের কাছে লেখার আদিরূপটা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল কর্তব্য। ফলে এই প্রভেদ।

'সাহিত্যের পথে'র লুপ্ত সংস্করণ আর চল্‌তি সংস্করণে এই প্রভেদটা অবশ্য আংশিক, দুটিমাত্র প্রবন্ধের, হঠাৎ কারো চোখ এড়িয়ে যেতেও পারে। কিন্তু ভাষাগত এই বদলটাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই 'পথের সঞ্চয়' বইতে। কেননা গোটা সেই বই আমরা সব সময়েই পড়ে আসছি সাধুভাষায়, আর 'পথের সঞ্চয়' নাম দিয়ে যে বইটি প্রস্তুত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর আটাত্তর বছর বয়সে, তার সমস্তটাই ছিল চলিত ভাষায় ঢেলে সাজানো। এ-বইয়ের অন্তর্গত লেখাগুলি উনিশশো বারো সালের। ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ছড়ানো সেই লেখা থেকে নির্বাচন করে আর পুনর্মার্জন করে তাঁর পরিকল্পনামতো যে-বইয়ের চেহারা এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ, বর্তমান 'পথের সঞ্চয়' থেকে তার দূরতম কোনো আন্দাজ পাওয়াও শক্ত। 'আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য' — চল্‌তি 'পথের সঞ্চয়' বইতে এইরকমের বাক্য পড়তেই আমরা অভ্যস্ত, ওইরকমই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর ওইরকমই ছাপা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। কিন্তু সাতাশ বছর পরে তাকে বইয়ের চেহারা দেবার সময়ে তিনি একে পালটে দিয়ে বললেন 'কেবলমাত্র অভ্যস্ত পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।'

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করছেন যে উদ্ধৃত এই বাক্যে কেবল ভাষারই বদল ঘটাননি লেখক, খানিকটা বদল ঘটেছে তাঁর অভিপ্রায়েরও। এর কোন্‌টাকে আজ বলব রবীন্দ্রনাথের লাইন? তাঁর নিজের হাতে সংস্কার-করা উত্তরকালীন কথাটা, না কি সম্পাদকের পরিশ্রমে উদ্ধার-করে-আনা তার আদিরূপ?

কেবল ভাষাবদল বা অল্পস্বল্প অভিপ্রায়ের বদল নয়, লেখকের বই থেকে সম্পাদকের বই পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আরো অনেকরকম বদল দেখতে পাব আমরা। তার অন্যতম একটি হলো, একই বইতে নতুন উপাদান জুড়ে দেবার বা পুরোনো উপাদান ছেড়ে দেবার সমস্যা। আর এ-সমস্যারও চূড়ান্ত চেহারা আছে বোধহয় 'পথের সঞ্চয়' বইটিরই মধ্যে।

'পথের সঞ্চয়' যে উনিশশো বারো সালের লেখাগুলি থেকে সংকলন, একথা আগে বলেছি। কিন্তু কতটা সংকলন? সেবার বিদেশে যাবার আগে, যাবার পথে, এবং পৌঁছবার পর ভ্রমণপ্রাসঙ্গিক অনেকগুলি লেখাই ছাপা হয়েছিল তাঁর; কিন্তু উনচল্লিশ সালে সে-পথের যতটুকু তিনি সঞ্চয় রাখতে চাইছিলেন, তার মধ্যে ছিল অনেক নির্বাচন। তেরোটি লেখা বেছে নিয়েছিলেন তিনি, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন সমকালীন কয়েকটা চিঠির টুকরো, জুড়ে দিয়েছিলেন কুড়ি সালের বিলেতযাত্রারও একটা অভিজ্ঞতা।

আজ যে 'পথের সঞ্চয়' আমরা পাই, তার প্রবন্ধসংখ্যা বাইশ। অর্থাৎ, প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এই বই। নটি প্রবন্ধ যে বেড়েছে, সেটাই এ-দুই বইয়ের একমাত্র দূরত্ব নয়, তারই সঙ্গে কমে গেছে চিঠির টুকরোগুলি, কমেছে উনিশশো কুড়ির অভিজ্ঞতাটাও। বোঝা যায়, সম্পাদকেরা চেয়েছিলেন 'পথের সঞ্চয়'-এর পথটাকে উনিশশো বারো সালের মধ্যেই সীমায়িত রাখতে, সেইসঙ্গে এও চাইছিলেন যে সে-সময়ের পুরো ইতিহাসটাই রক্ষিত থাক এর মধ্যে। এ-চাওয়ার যে কোনো যুক্তি নেই তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক, এ-চাওয়ার ফলে আমরা যে বইটি পাই তা আর লেখকের অভিপ্রেত বই নয়,

সে-বই সম্পাদকের সুসম্পাদিত বই। পাঠকের এতে একধরণের সুবিধে হবার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বইটাকে জানবার অধিকারও তো পাঠকেরই অধিকার? বিশেষ একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথ কেন আর কীভাবে সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর নিজের লেখাগুলির, তার থেকে তাঁর মনেরই তো কিছু আন্দাজ পাওয়া সম্ভব?

একথা আরো বিশেষ করে মনে হয়, তাঁর বর্জন করবার পদ্ধতিটা লক্ষ করলে। 'বিচিত্র' নাম দিয়ে উনিশশো কুড়ি সালের 'বিলাতযাত্রীব পত্র' তিনি জুড়ে নিয়েছিলেন এর সঙ্গে, কিন্তু বইয়ের অন্তর্গত করতে চাননি উনিশশো বারোব 'আমেরিকার চিঠি', এখনকার বইতে যা আছে। ইংল্যান্ড আর আমেরিকাকে কি তাহলে স্বতন্ত্রই রাখতে চাইছিলেন তিনি? একই সময়ে লেখা হলেও 'আনন্দরূপ' বা 'খেলা ও কাজ', 'সীমা ও অসীম' কিংবা 'সীমার সার্থকতা'কে নিতে চাননি তিনি এ-বইতে, নেননি 'শিক্ষাবিধি' বা 'লক্ষ্য ও শিক্ষা'। সে কি বিষয়গত বিশিষ্টতার কারণে? এমন কি হতে পারে যে তাঁর মনে হচ্ছিল ওই শেষদুটি প্রবন্ধ যুক্ত হতে পারে তাঁর 'শিক্ষা' নামের সংকলনে, আর 'সীমা'-প্রসঙ্গগুলির ঠিক-ঠিক জায়গা হলো 'শান্তিনিকেতন'?

'শান্তিনিকেতন'। এই আরেকখানা বই, যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই পাল্টে দিয়েছিলেন পরে, নামচিহ্নিত কয়েকটি গদ্যলেখার সংকলন হিসেবে না রেখে তাকে একটা ছেদহীন নামহীন প্রবাহ দিতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় সংস্করণে। সেখানেও আমবা দেখতে পাব গ্রহণবর্জনের এক বিপুল ইতিহাস। উনিশশো নয় থেকে ষোলো সালের মধ্যে ছাপা সতেরো খণ্ড 'শান্তিনিকেতন' দুখণ্ডে সংকলিত হলো উনিশশো পঁয়ত্রিশে। কিন্তু এই সংকলনের সময়েও মূল বই থেকে রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে দিয়েছেন অনেক অংশ, জুড়েও নিয়েছেন কিছু। উনিশ সাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বলা যে মন্দিরভাষণগুলি তাঁর ছিল, তার অনেকটাই সাজিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এই দ্বিতীয়টিতে। কিন্তু রচনার আদিরূপের উপর নির্ভরশীলতা বিশ্বভারতীর এতই বেশি যে সম্প্রতিকালের 'শান্তিনিকেতন' বইতে আমরা সেই যোজিত অংশগুলি আর দেখতে পাব না, রচনাবলী-মুদ্রণেও না, স্বতন্ত্র মুদ্রণেও না। এমনকী, দেখতে যে পাব না সেটাও ঠিকভাবে জানিয়ে দেন না সংকলয়িতারা, বলেন শুধু এইটুকু যে দ্বিতীয় সেই সংস্করণে 'বহু অংশ বর্জিত হয় এবং নানা স্থানে পাঠ পরিবর্তিত হয়'। 'বর্জিত' আর 'পরিবর্তিত' শব্দদুটি থেকে কিন্তু ধারণা করা শক্ত যে উনিশশো উনিশ থেকে একত্রিশ সালের মধ্যে বলা প্রায় কুড়িটি ভাষণ বেশি আছে রবীন্দ্রনাথের পরিমার্জিত ওই সংস্করণে। 'শান্তিনিকেতন' নামে বইখানির অব্যাহত প্রচলন থাকা সত্ত্বেও, পঁয়ত্রিশ সালে গ্রন্থভুক্ত এতগুলি রচনার কথা পাঠকেরা আজ আর জানতেই পারবেন না সহজে, স্বতন্ত্র মুদ্রণেও না, রচনাবলী মুদ্রণেও না।

কোন্ 'শান্তিনিকেতন' তবে ঠিক 'শান্তিনিকেতন'? রবীন্দ্রনাথেব হাতে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত বইটি, না কি এখনকার চল্‌তি বইখানা? আবার, ভালোভাবে লক্ষ করলে এ-প্রশ্নটাও উঠবে, রচনাবলী আর স্বতন্ত্র মুদ্রণের 'শান্তিনিকেতন'ও কি একই বই? কানাই সামন্তর সম্পাদনায় যে সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ চলছে উনিশশো পঁচাত্তর সাল থেকে, সেখানে এমন ছটি লেখা যুক্ত আছে পরিশিষ্টে, রচনাবলীতে যা নেই। আবার, রচনাবলীর 'ত্যাগ' 'ত্যাগের ফল' 'প্রেম' আর 'সামঞ্জস্য' লেখা-চারটি কানাই সামন্তর সম্পাদনায় 'ত্যাগ' 'প্রেম' 'বিরোধের সামঞ্জস্য' নামে তিনটে লেখায় পুনর্বিন্যস্ত। কোন্ 'শান্তিনিকেতন'-এর কাছে যাবেন আজ পাঠক?

গ্রহণবর্জনের যে-কথাটা এতক্ষণ হলো, তার ঝোঁকটা ছিল সম্পূর্ণ-কোনো রচনার সংযোজন বা সম্পূর্ণ রচনার বর্জনের উপর। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত বইটিতে পাওয়া যাবে কিন্তু বিশ্বভারতীরটিতে মিলবে না উনিশশো উনিশের আর তার পরের অনেকগুলি ভাষণ, সেকথা বলেছি। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সম্পাদনাটিতে (১৯৩৫) পাব না 'মৃত্যুর প্রকাশ', 'দুর্লভ' 'সামঞ্জস্য' 'মাতৃশ্রাদ্ধ'র মতো বেশ কয়েকটি লেখা। 'পথের সঞ্চয়'-এর দুই ভিন্ন সংস্করণেও সামূহিক গ্রহণবর্জনের এ-রকম উদাহরণ আমরা আগে লক্ষ করেছি।

কিন্তু আরো একটা দিক আছে এই গ্রহণবর্জনের। 'শান্তিনিকেতন' বা 'পথের সঞ্চয়'-এর (বা অনুরূপ আরো অনেক বইয়ের) দুটি ভিন্ন সংস্করণেই যেসব রচনা আছে, তারা কিন্তু সব সময়ে একই চেহারায় নেই। নতুনভাবে সম্পাদনা করবার সময়ে তাঁর এই গদ্যরচনাগুলির লাইনের পর লাইন, কখনো অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ বা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বর্জন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, আবার যোজনাও করেছেন কিছু। পরিমার্জিত 'শান্তিনিকেতন' প্রকাশের সমকালে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'এবার প্রুফ দেখতে গিয়ে সমস্তটা তন্ন তন্ন করেই দেখা হয়েচে।' সেই তন্ন তন্ন দেখায় যে কতটাই মন দিয়েছিলেন তিনি, তা ধরা আছে এর শব্দবদল ভাষাবদল বিন্যাসবদলের ইতিহাসের মধ্যে। অংশবর্জনের ধরণ থেকে একথা হয়তো অনুমান করা যায় যে ভাষণকালীন অনেক অনিবার্য বিস্তার বা পুনরুক্তিকে সংবৃত করে আনতে চাইছিলেন তিনি উত্তরকালীন এই প্রকাশে, শিরোনাম বর্জন করে যেমন একে দিতে চাইছিলেন এক ধারাবাহিক রূপ।

কেবল ভাষাবদল নয়, কেবল রচনাবর্জন নয়, অংশবর্জনের উদাহরণ হিসেবেও আবার আমরা পৌঁছতে পারি 'পথের সঞ্চয়'-এর প্রসঙ্গে। পুরোনো লেখার কতদূর পরিমার্জন যে তিনি চাইছিলেন তা বোঝা যায় এ-বইয়ের অংশবর্জনের পরিমাণ লক্ষ করলেও। সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধের কথা মনে করা যাক এখানে। মাসিক পত্রিকায় ছাপা 'বন্ধু' লেখাটির চোদ্দ অনুচ্ছেদকে আট অনুচ্ছেদে ছোটো করে এনেছেন তিনি, 'স্টপফোর্ড ব্রুক' বারো থেকে হয়েছে সাত, 'কবি য়েট্‌স্' পঁচিশ থেকে তেরো, 'যাত্রার পূর্বপত্র' সত্তর থেকে নেমে এসেছে একেবারে পঁচিশে।

'শান্তিনিকেতন' বইয়ের বর্জনপ্রকৃতি লক্ষ করলে যেমন মনে হতে পারে যে পুনরুক্তির দায় থেকে সরে আসতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ, এখানে তেমন ভাবা শক্ত। এখানে হয়তো তিনি ছেঁটে দিতে চেয়েছেন তাঁর ভাবনার ডালপালা। বারো সালে 'কবি য়েট্‌স্' প্রবন্ধটি যখন লিখছিলেন, ইয়েট্‌স্ প্রসঙ্গে কথা বলবার সূত্রে তখন সাহিত্যপ্রসঙ্গেই কয়েকটি মৌলিক ভাবনার উত্থাপন করেছিলেন তিনি। 'বিশ্বজগতের কবি' আর 'সাহিত্যজগতের কবি' যে দুই ভিন্ন গোত্রের মানুষ, ইয়েট্‌সের কবিপ্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে সেই ভিন্নতার ব্যাখ্যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর তারই জন্য সে-লেখায় চলে এসেছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর সুইনবার্নের তুলনা। বিশ্বজগৎ কীভাবে কবির নিজের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর নিজের দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, সেই কথা তিনি তোলেন এ-লেখায়, সেখানে বলেন বার্নস-এরও কথা। অর্থাৎ, ইয়েট্‌সকে বুঝবার জন্য সামগ্রিক এক পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে ওঠে লেখাটির মধ্যে। এভাবে দেখলে, পূর্ণাঙ্গ এই লেখার কোনো অংশটিকে আর বর্জনীয় বলে বোধ হয় না।

তবু কেন বইতে নেবার সময়ে এসব অংশ ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ? কেবল এই লেখাটিতেই নয়,

প্রথম সংস্করণে 'পথের সঞ্চয়'-এর অন্যলেখাগুলিরও অনুরূপ সম্পাদিত চেহারা দেখে মনে হয়, এর মধ্যে আছে কোনো একটা কার্যকারিতার ঝোঁক, কেন্দ্রীয় কথাটিকে সংক্ষেপে পৌঁছে দেবার ঝোঁক, সম্পাদিত লেখাগুলি যেন হয়ে দাঁড়ায় মূল লেখাগুলির সারমর্ম মাত্র।

নিজের লেখার এমন আমূল সম্পাদনা কববার অধিকাব নিশ্চয় লেখকমাত্রেরই আছে। কিন্তু এ-সম্পাদনা কি নিছক খামখেয়াল, না কি এর অন্য কোনো কারণও থাকা সম্ভব?

এই প্রশ্নের সামনে এসে আবার বর্জিত সেই ভূমিকাটির কথা মনে পড়ে আমাদের। তবে কি সত্যি সত্যি 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত করেই লেখাগুলির সংগ্রহ আর সম্পাদনা করতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ? লুপ্ত সেই ভূমিকাটিতে বলা ছিল 'শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া'র আয়োজন করেছেন তাঁরা, আর সেইজন্য 'ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত' করবার দিকে লক্ষ্য আছে এর, যদিও 'রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না'। 'সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়া'র জন্য 'সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার' একটা আদর্শ কি এইভাবে দেখাতে চাইছিলেন তিনি? সেইজন্যই কি এত সংক্ষেপীকরণ আর কথ্য বাংলায় ঢেলে সাজানো?

দুই 'পথের সঞ্চয়'-এর আরো একটা প্রভেদ হলো এর রচনাগুলির বিন্যাসে। বিন্যাসবদলের এ-লক্ষণটাও রবীন্দ্ররচনা-সম্পাদনার সময়ে বারে বারেই দেখা গেছে, যার অনেক উদাহরণের অন্যতম একটা হলো 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব'? কিন্তু ও-নামে কি কোনো বই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলীতে? না, রচনাবলীতে কোথাও তা নেই, সেখানে আছে শুধু 'শব্দতত্ত্ব'। কেননা, উনিশশো নয় সালে ওই নামেই প্রথমে ছাপা হয়েছিল বইটি, অনেকদিন পর পঁয়ত্রিশ সালে তাকে আমরা পেয়েছি 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' হিসেবে। দ্বিতীয় এই সংস্করণের সময়ে কেবল যে নামেরই বদল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা নয়, বদল করেছিলেন আরো কিছু। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, রচনাবলীতে পরিবর্তিত সেই সংস্করণের কোনো জায়গা হয়নি, এমনকী গ্রন্থপরিচয়ে তার বিবরণও আছে সামান্যই: '"বাংলা শব্দতত্ত্ব" নামে যে "দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত)" অগ্রহায়ণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পরবর্তীকালে রচিত শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে সংযোজিত হইয়াছিল, এই সংযোজন অংশ রচনাবলী-সংস্করণ-বহির্ভূত।' কেন বহির্ভূত? এর কোনো কারণ বলা নেই কোথাও। বলা নেই জরুরি এই খবরটাও যে সেসব সংযোজন ছাড়াও 'সবুজপত্র'তে প্রকাশিত 'ভাষার খেলা' নামের একটি লেখার ঈষন্মাত্র সংশোধন করে তাকে এ-বইয়ের প্রবেশক-রচনার মর্যাদায় ব্যবহার করেছিলেন লেখক, আর এই সংস্করণ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে উৎসর্গ করে সঙ্গে লিখেছিলেন কয়েক লাইনের একটি ভূমিকা। কিন্তু বিশ্বভারতীর রচনাবলীতে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামের কোনো বই যেমন আমরা পাব না, তেমনি পাব না এই 'ভাষার খেলা' লেখাটিকেও। পাব না এ-বইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া একটি 'শব্দচয়ন'কেও, অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা-বিষয়ক ব্যবহারযোগ্য এক তালিকা ছিল যেটি। রচনাবলীর 'শব্দতত্ত্ব' বইতে আমরা পাব না 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' 'বাংলা নির্দেশক' 'বাংলা বহুবচন'(তেরোশো

আঠারো বঙ্গাব্দের লেখাটি) বা 'স্ত্রীলিঙ্গ'-র মতো জরুরি লেখাগুলিকেও।

সে কী! এতগুলি লেখা পাওয়া যাবে না বিশ্বভারতীর প্রকাশনায়? না, তা পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে খুচরো বইতে। অর্থাৎ এখানেও, বই হলো তিনখানা, 'শান্তিনিকেতন'-এর মতোই। পঁয়ত্রিশ সালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণত সংশোধিত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', রচনাবলীর অন্তর্গত 'শব্দতত্ত্ব', আর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'। স্বতন্ত্র বইটি কি রবীন্দ্রনাথের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ? না, তাও নয়। স্বতন্ত্র বইতে সংগ্রহ করা হয়েছে ভাষাশব্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা আর মন্তব্য, দুটি বইকে মিলিয়ে এবং সেইসঙ্গে আরো অনেক রচনা যুক্ত করে এক সম্পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেওয়া হয়েছে এর। কিন্তু তখনও, বইটির সামগ্রিক বিন্যাসে, গ্রাহ্য করা হয়নি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কোনো ক্রম, প্রথম থেকে লেখাগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে শুধু কালানুক্রমে, যেমন কালক্রমে সাজানো আছে 'পথের সঞ্চয়'-এর লেখাগুলি। এসব সংস্করণ থেকে আজ আর বুঝবার উপায় নেই কীভাবে এব লেখক নিজে সাজাতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখা।

আরো একবার তাহলে ফিরে আসি আমরা 'পথের সঞ্চয়'-এর কথায়। যে-কটি প্রবন্ধ এর দুটি সংস্করণেই আছে, তার সূচি-পারম্পর্যটা একটু লক্ষ করা যাক :

লেখকেব বিন্যাস	সম্পাদকেব বিন্যাস
যাত্রার পূর্বপত্র	যাত্রার পূর্বপত্র
বোম্বাই শহর	বোম্বাই শহর
যাত্রা	জলস্থল
জলস্থল	সমুদ্রপাড়ি
সমুদ্রপাড়ি	যাত্রা
লণ্ডনে	অন্তর বাহির
বন্ধু	লণ্ডনে
ভাবুক সমাজ	বন্ধু
স্টপফোর্ড ব্রুক	কবি য়েট্‌স্‌
কবি য়েট্‌স্‌	স্টপফোর্ড ব্রুক
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি	ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ
অন্তর বাহির	ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি
সংগীত	সংগীত

লেখাগুলির সঙ্গে যুক্ত তারিখ লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারব যে পুনর্বিন্যস্ত করবার সময়ে সম্পাদকেরা একটা সহজ নীতি স্থির করে নিয়েছেন, রচনাকালের (কিংবা অভাবে, প্রকাশকালের) পরম্পরায় তাঁরা সাজিয়ে দিয়েছেন লেখাগুলিকে। সেভাবে সাজাবার নিশ্চয় একটা যুক্তি আছে। কিন্তু এব কোনো কোনো অংশে রবীন্দ্রনাথ যে সেই কালক্রম লঙ্ঘন করেছিলেন, তারও পিছনে কোনো যুক্তি ছিল কি? প্রবন্ধের বই বা কবিতার বইতে এ-রকম ওলটপালট প্রায়ই করেন তিনি। করেন যে, তাব একটা কারণ হয়তো রচনার অন্তর্গত ভাবের দিকে তাঁর প্রণিধান। সেই প্রণিধানে, বিভিন্ন সময়ে কবিতা বা গানের সংগ্রহে তিনি বারবার ভেঙে দেন কালক্রম, কল্পনা করেন যে এই নববিন্যাসের ফলে একটি থেকে অন্য লেখায় পৌঁছতে পৌঁছতে তৈরি হয়ে উঠছে ভাবের একটা

ধারাবাহিকতা। সবসময়ে কি হয়ে ওঠে তা? সেটা তর্কসাপেক্ষ হতে পারে। ভাবের এই বিচারটা এত বেশি আপেক্ষিক, তার অস্তিত্ব এত বেশি ব্যঞ্জনানির্ভর যে সে-প্রসঙ্গে সকলে সমমতবর্তী না-ও হতে পারেন। কিন্তু তবু, লেখকের নিজস্ব সেই পরিকল্পনা কী ছিল, সেটাও বোধহয় আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার।

অন্তত 'পথের সঞ্চয়'-এর লেখককৃত বিন্যাসে স্পষ্ট একটা যাত্রাপথ লক্ষ কবা শক্ত নয়। কালক্রম ছেড়ে দিয়ে এখানে যেভাবে তিনি লেখাগুলিকে সাজান, তার থেকে আমরা বুঝতে পারি এক রচনা থেকে অন্য রচনায় কীভাবে পৌঁছচ্ছে পাঠকের মন। ইওরোপের পথে কেন তিনি চলেছেন আবার, তার একটা যুক্তি দিয়ে বইয়ের সূচনা। তারপরেই আছে জাহাজে উঠবার আগে বোম্বাই শহর নিয়ে তাঁর ভাবনা। যাত্রা শুরু হলো এবার : বাসা বদল করবার ডাক, চলার ধর্ম, আর সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কের আনন্দ নিয়ে এবার কথা বলছেন যাত্রী। চলতে চলতে মনে হচ্ছে মানুষেব মধ্যে দু-রকম জাতির কথা, স্থলের টানে বেঁধে-থাকা মানুষ আর জলের টানে দূরে-যাওয়া মানুষ। দূরে-যাওয়া কর্মশক্তিময় সেই মানুষদের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় শুরু হলো জাহাজের ডেক থেকে, সেসব মানুষের সঙ্গে মানসিক একটা বিনিময় ঘটছে যাত্রীর। আর তারপর এসে তাঁর লণ্ডনে পৌঁছনো, অনেকদিন পরে আবার। লণ্ডনে এসে প্রথমে আশ্রয় মিলল হোটেলে আর তারপরে মিলল এক বন্ধু রোটেনস্টাইন। এঁরই সূত্রে যোগ তৈরি হলো তাঁর ইংল্যাণ্ডের ভাবুক সমাজের সঙ্গে। সেই সমাজের একজন স্টপফোর্ড ব্রুক। সেই সমাজের এক কবি ইয়েট্‌স্। লণ্ডন থেকে বেরিয়ে 'স্টাফোর্ডশিয়রে এক পল্লীতে' কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন আরেক বন্ধু অ্যান্ড্রুজ, চিনে নিতে পারলেন ও-দেশের পল্লীকে, ওদেশের পাদ্রিকে, 'সমস্ত দেশ জুড়ে পাদ্রির দল বসে থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাই-বৃত্তি করতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না' কেন, বুঝে নিতে চাইছেন তার কারণ।

এই পর্যন্ত পৌঁছবার পর, যাত্রাসূচনা আর বোম্বাই শহব থেকে পল্লীগ্রামের এই পাদ্রিসমাজে পৌঁছবার পর, সমকালীন রচনা থেকে এবার দু-একটি শিল্পপ্রসঙ্গের উত্থাপন করছেন লেখক : অন্তরবাহির আর সংগীত। জাহাজে বসে তরঙ্গকলশব্দ শুনতে শুনতে গানের তাত্ত্বিক ভাবনায় পৌঁছনোর কথা আছে এব প্রথমটিতে, আর দ্বিতীয়টিতে আছে লণ্ডনের গীতশালায় 'চারহাজার কণ্ঠে যন্ত্র ও সংগীত' শুনতে শুনতে ইওরোপীয় আর ভারতীয় সংগীতের তুলনাবিচাবের ভাবনা।

শেষবলা এ-দুটি লেখার মাঝখানে 'বিচিত্র' নামেব ছোটো একটি সংকলন এসে অবশ্য ভাবক্রম আর কালক্রম দুটোই দেয় ভেঙে, উনিশশো কুড়ি সালের বিদেশযাত্রার ওই ছিন্ন বিবরণাংশ কেন যে ও-দুই লেখার মধ্যবর্তী হাইফেন হয়ে আসে, সেটা বোঝা যায় না ভালো। কিন্তু এ-অংশটুকুর কথা ছেড়ে দিলে 'পথের সঞ্চয়'-এর রচনাগুলির রবীন্দ্রনির্দিষ্ট পারম্পর্যকে কি বেশ যুক্তিসংগতই লাগে না?

তার মানে এ নয় যে, প্রচলিত সংস্করণের পূর্ণতর সমৃদ্ধতর 'পথের সঞ্চয়'কে আমরা নিষ্প্রয়োজন কিংবা অসংগত বলে ভাবছি। এমনকী, এ-বইয়ের লুপ্ত ভূমিকাটির পুনরুদ্ধার করে তাকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'য় ফিরিয়ে নেবার কথাও ভাবছি না আমরা। বস্তুত, ভূমিকাসুদ্ধ বইটি ছাপা হয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বর্জন করেছিলেন তাকে, এতে আজ আর সংশয় করা চলে না। কেননা, ভাদ্র মাসে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-১' হিসেবে ছাপা হবার কিছু পরেই,

ও-বছরেরই চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'বিশ্বপরিচয়' বইটির পঞ্চম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণকে দেখা গেল 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-১' পরিচয়ে। লোকশিক্ষার প্রথম বই নামে 'পথের সঞ্চয়'-এর কোনো দাবি রইল না আর।

ঠিক। কিন্তু তবু, রচনার বা তার প্রকাশের ওই ইতিহাসকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি না। তুচ্ছ করতে পারি না এই গ্রন্থসংকলনে রবীন্দ্রনাথের মূল পরিকল্পনাটিকেও। ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে সেই ভূমিকাটির অস্তিত্বও যেমন বইটির কোনো পরিশিষ্টে থাকা দরকার ছিল, তেমনি দরকার ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত চেহারাটিও আমাদের দেখতে দেওয়া। দেখতে দেওয়া যে, বর্জনযোজন ছাড়াও, সংস্কার করতে গিয়ে কোনো কোনো লাইনেরও কেমন আমূল বদল করেন তিনি, 'কবি য়েট্‌স্‌'-এর মতো কোনো লেখায় 'ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন, ইঁহারা সাহিত্যজগতের কবি'র মতো লাইনকে কীভাবে একেবারে নতুন চেহারায় করে দেন 'এঁরা সাহিত্যজগতের গ্রন্থপ্রবাহিণীব কবি'। 'গ্রন্থপ্রবাহিণীর কবি'র মতো কোনো শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ রচনাবলীর কোনো অংশে থাকবে না কেন কোথাও?

পাঠকহিসেবে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মুদ্রিত লেখাই নিশ্চয় আমরা গ্রন্থভুক্ত দেখতে চাই, এবং দেখতে চাই তাকে পূর্ণ অবয়বেই। কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা এও বুঝতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ চেহারা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের বইয়ের। যদি কিছু বর্জন করে থাকেন তিনি, যদি সংযোজন করে থাকেন, যদি কোনো ভাষা বদল করেন তিনি বা করেন কোনো রূপের বদল, রচনাগুলির বিন্যাসে যদি থাকে তাঁর নিজস্ব কোনো ধাঁচ, তাহলে তার সবটাই আমাদের জানতে দেওয়া শোভন। সম্পাদনার কাজে তাই সংগত বলে মনে হয় : রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত সংগঠনটি অক্ষুণ্ণ রেখে যোজনীয় অংশগুলিকে পরে কোথাও সাজিয়ে দেওয়া। তাঁর কবিতার বইয়ের সম্পাদনায় প্রায়ই সেটা ঘটেছে, কিন্তু বারে বারেই সেটা লঙ্ঘিত হয়েছে রচনাবলী-ভুক্ত তাঁর গদ্যবইগুলির বেলায়।

এটা ঠিক, 'পথের সঞ্চয়'-এর মতো কোনো বইতে বদলটা এত সর্বাত্মক যে কোনো আংশিক যোজনা দিয়ে একই সঙ্গে দুই পাঠের স্বাদ এনে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এসব সময়ে, দুটি চেহারাকেই পরপর তার সম্পূর্ণতায় সাজানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, উনিশশো ষাট সালে যেভাবে ছাপা হয়েছিল স্বতন্ত্র-সংস্করণ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', তার মুদ্রিতপাঠ আর খসড়াপাঠকে একইসঙ্গে গেঁথে নিয়ে।

সম্পাদনার সময়ে কখনো কখনো আমাদের প্রবণতা হয় উৎসমুখে ফিরে যাবার, পিছন দিকে ফিরে যাবার। আমরা খুঁজতে থাকি কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ, কিংবা তারও আগে পত্রিকায় তার প্রকাশরূপ, অথবা তারও আগে সে-লেখার কোনো পাণ্ডুলিপি। অসংগত কি এই সন্ধান? একেবারেই তা নয়। এ-রকম খোঁজ থেকে ব্যবহারযোগ্য তথ্য মিলতে পারে অনেক, এর থেকে কখনো কখনো আমরা দীর্ঘকালপ্রবাহিত গুরুতর মুদ্রণবিচ্যুতির কোনো কোনো চমকপ্রদ আবিষ্কারে পৌঁছতে পারি, একাধিকবার যে-রকম চমক আমাদের দিয়েছেন কানাই সামন্ত। এ-রকম খোঁজ থেকে আমরা রচয়িতার নির্মাণপ্রক্রিয়াটা জানতে পারি, বুঝতে পারি তাঁর রুচিপরিবর্তনের বা মতিপরিবর্তনের ইতিহাসও। কিন্তু রচয়িতার নিজস্ব পরিণত সিদ্ধান্তকে গৌণ করে দিয়ে তাঁর অতীত রূপটাকেই প্রধান বলে ভাবতে পারি না আমরা। যে-লেখক বারে বারেই নিজেকে পালটে নিতে চান, মার্জিত করে নিতে চান নিজেকে, কোন্‌ লেখাটাকে আমরা তাঁর যথার্থ বলে জানব? একাধিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে পরিণত যে চেহারাটা তিনি

পৌঁছে দিয়েছেন লেখাকে, সেইটে? না কি, প্রথম যেভাবে তিনি তা ছেপেছিলেন, সেইটে? না কি, আরো আগে পৌঁছে, পাণ্ডুলিপিধৃত রূপটাই তাঁর আসল রূপ? একথা আমাদের মনে রাখতেই হয়, পাণ্ডুলিপি বেশ বড়ো একটা দলিল নিশ্চয়, কিন্তু কখনোই তা শেষ কোনো প্রমাণ নয়। কবিমাত্রেরই, লেখকমাত্রেরই, এই প্রবণতা আছে যে পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণকালে হয়তো তিনি পালটে দেন তাঁর লেখা, পালটে দেন পত্রিকা থেকে সে-লেখাকে বইতে নেবার সময়ে, কিংবা সংস্করণ থেকে সংস্করণে। কী করে আমরা ধরে নেব যে লেখক অনেক বিবেচনা করেই পালটে দেননি তাঁর রচনা?

পালটে কি তিনি ভালোই করেন সব সময়ে? না-ও হতে পারে তা। আমাদের অল্পবয়সে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা লাইন নিয়ে মুগ্ধ ছিলাম আমরা : 'একটি কথার দ্বিধাথরোথরো চূড়ে/ ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী'। চুয়ান্ন সালে 'অর্কেস্ট্রা' বইটির নতুন সংস্করণে সুধীন্দ্রনাথ যখন কথাগুলিকে হঠাৎ পালটে দিয়ে বললেন : 'একটি কথার দ্বিধাথরোথরো চূড়ে / বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী', তখন আমাদের বন্ধুদের সমবেত বিলাপধ্বনির কথা ভুলতে পারি না এখনও। 'ভর করেছিল'কে 'বাসা বেঁধেছিল'? দ্বিধাথরোথরো চূড়ায় বাসা বাঁধা? না, হতে পারে না তা। কিন্তু আমাদের মনের মতো না হলেও, কবি নিজে সেটা করেছেন বলে তাকে মুছে ফেলতেও পারি না নিশ্চয়। আমাদের ভালো না লাগলেও অন্য কারো একে সংগত বলে মনে হতে পারে, কবির নিজেরই যেমন হয়েছিল। কী করব তখন আমরা? আমরা কেবল কবিকৃত শেষ পাঠটিকে জায়গামতো রেখে এই খবরটুকু সাজিয়ে দেব যে এর আছে এক প্রাক্তন ভিন্নতর পাঠ। পাঠক তাঁর নিজের রুচিমতো নির্বাচন করে নিন কোন্‌টি তিনি চান, সে-স্বাধীনতা তাঁর। সমালোচক তাঁর নিজের তত্ত্বমতো স্থির করে নিন কোন্‌টিতে তিনি স্বস্তি পান, সে-স্বাধীনতা তাঁর।

তাই, রবীন্দ্রনাথকে—বা, অন্য কোনো লেখককে—পরিমার্জিত করে নেবার ইচ্ছেয় বা সুসম্পূর্ণ করে তুলবার প্রেরণায় আমরা পালটে দিতে পারি না তাঁর বইয়ের বা লেখার নিজস্ব সংগঠন। 'পথের সঞ্চয়' বা 'শান্তিনিকেতন', 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বা 'সাহিত্যের পথে',—এ হলো বিচ্ছিন্ন কয়েকটা উদাহরণ মাত্র, এই বইগুলি নিয়েই যে আমাদের সমস্যা তা নয়! আমাদের বলবার কথা শুধু এইটুকু : এসব বইতে বা এর তুল্য আরো অনেক বইতে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সম্পাদনার সঙ্গে উত্তরকালীন সম্পাদনাকে মেলাতে যদি যাই, তবে সেই মিলনটাতে চাই এক যৌগিক পদ্ধতি, কোনো মিশ্র পদ্ধতি নয়। যে-পদ্ধতিতে পাঠক জানতে পারেন কোন্‌টুকু রবীন্দ্রনাথের সাজানো আর কোন্‌টুকু তা নয়, সেই পদ্ধতিই আমাদের চাই। তার বদলে যদি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতিটাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে চাই আমরা, তবে হঠাৎ-হঠাৎ কোনো-একখানা পুরোনো রবীন্দ্রকৃত সংস্করণ হাতে পেয়ে পাঠক হয়তো বিমূঢ় মনে ভাববেন : একই বইয়ের এমন দু-রকম চেহারা কেন! দুখানা 'পথের সঞ্চয়', তিনখানা 'শান্তিনিকেতন' বা তিনখানা 'শব্দতত্ত্ব'র খোঁজ পেয়ে তিনি ভাববেন: কোন্ বইটা তবে রবীন্দ্রনাথের ঠিক বই?

এ-প্রশ্নের কোনো সংগত উত্তর দেবার জন্য নিশ্চয় তৈরি থাকতে হবে ভবিষ্যতের সম্পাদকদের।

রবীন্দ্রভাবনা : পস্টারিটির পথে

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন বলা হয় কাব্য 'সহৃদয়হৃদয়-সংবাদী' অর্থাৎ সহৃদয়ের হৃদয়ে সংবাদ বহন করাই তার কাজ তখন কাব্যের কথা বলা হলেও কবি যেন অনেকটা আড়ালেই পড়ে যান। অথচ তিনিই তো মুখ্য, কাব্য তাঁর মাধ্যম, তাঁর হাতিয়ার। নিজের অনুভবগুলিকে নিজের মধ্যেই বন্দী রেখে সুখ নেই তাঁর, তিনি সরিক খোঁজেন যিনি অংশভাক হবেন সেই অনুভূতিগুলির যা একান্তই তাঁর নিজের। কাব্য সঙ্গী ধরার জাল। আর বিচিত্র ব্যাপার হল, সে জাল যাঁরা পাতেন তাঁরা অনেকেই সমকালের সরিকে শুধু সন্তুষ্ট নন, চান উত্তরকালের সঙ্গী, এমন সঙ্গীও যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না কোনোদিন। আসলে এ শুধু সঙ্গীর সন্ধান নয়, ভিন্নতর এক বাসনারও অভিব্যক্তি—নিজের আয়ুর সীমা ছাড়িয়ে বাঁচার ইচ্ছা, মর্ত্যলোকে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা।

দেশকাল নির্বিশেষে কবিরা এই বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন, এখনও দেখছেন। রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন, এই দলেরই দলী। তবে তাঁর স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নকে ঘিরে তাঁর ভাবনা এমন বিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে দীর্ঘ জীবন জুড়ে অসংখ্য কবিতায় যে তা হয়ে উঠেছে রীতিমতো উদ্দীপক। পস্টারিটির -পথ-চাওয়া কবির সেই ভাবনার স্বরলিপি রচনা সহজ নয়। বিশেষত স্বল্প পরিসরে। তবে অনভিপ্রেত সংক্ষেপেও একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা চলতে পারে হয়তো।

কপিবুক-যুগের গণ্ডী পেরিয়ে সন্ধ্যাসংগীতেই কিশোর কবি নিজের পায়ে ভর দিয়ে সুরু করেছেন নিজের পথে চলা। স্বকণ্ঠের সেই প্রথম রচনায় তাঁর প্রত্যয়ী ঘোষণা শুনি—'কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়' ['অনুগ্রহ'] এবং অব্যবহিত পরেই অকুণ্ঠ উচ্চারণে বলে চলেন—'অবশেষে হইবে সে বশ/ জগতে রটিবে মোর যশ,/ বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়, / ... চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি, বরষিবে কুসুম আসার, /বেঁধে দেবে বিজয়ের মালা শান্তিময় ললাটে আমার।' ['সংগ্রাম সংগীত']

বয়স্ক পাঠকের মুখে কৌতুকহাস্যের আভাস ফুটতে না ফুটতে কিন্তু এই দৃপ্ত পংক্তিগুলি পড়তে পড়তেই একেবারে ভিন্ন স্বর এসে পড়ে অতর্কিতে—'দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিল না চেয়ে/ যত গান গাই/ বুঝি কারো অবসর নাই/ বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে—/ভালো সখা আর গাহিব না।' ['গান-সমাপন']

কবির কাব্যের উদ্দিষ্ট তো পাঠক। ঘটনা ও চরিত্রপ্রধান আখ্যান কাব্যের কবিও পাঠকের দিকে তাকিয়ে লেখেন। বাংলা মহাভারতের জনপ্রিয় কবির কবিতায় দেখি কবি আর পাঠক এক সুতোয় বাঁধা—'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান'। নব্যযুগেব দিকপাল কবিও পাঠককুলকে ভুলে থাকতে পারেন না—রচনা করতে চান সেই 'মধুচক্র, গৌড়জন যাহে / আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

আর গীতিকবির তো কথাই নেই, সেখানে 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে'। কাজেই পাঠকের রাগবিরাগ স্পর্শকাতর কবিমনে তরঙ্গ তোলে। বয়স, মনের পরিণতি, কিংবা মনের ধাতু অনুসারে স্পন্দনের তারতম্য ঘটে অবশ্যই।

সন্ধ্যাসংগীতের কবির গীতোচ্ছ্বাসে এই তরঙ্গাঘাত বেশ তীব্রই। আশা ও আশাভঙ্গের দোলাটা বেশ প্রবল।

প্রভাতসংগীতে কবি অনেক সাবালক। পূর্বপর্যায়ের অতিপ্রত্যয়, সেই সঙ্গে পাঠক-প্রসঙ্গে অতি উচ্ছ্বাস অনেকটা সংযত। 'অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,/ জনমেছি দু-দিনের তরে—/যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে/ গান গাই আনন্দের ভরে। /এ আমার গানগুলি দু দণ্ডের গান/ রবে না রবে না চিরদিন—/ পূরব আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস, /পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।' ['অনন্তজীবন']। কিন্তু কবিতায় কবির এটাই শেষ কথা নয়। আরও যা আছে তার ইঙ্গিত ভিন্ন। পশ্চিমে বিলীন হওয়ার আপাতচিত্রকে অতিক্রম করে অন্যকিছু দেখছেন কবি। কিংবা বলা যায়, অনুভব করছেন। 'আকাশ-সমুদ্রতলে গোপনে গোপনে/ গীতরূপ/ হতেছে সৃজন,/ ... নাই তোর নাই রে ভাবনা/ এ জগতে কিছুই মরে না।' [ঐ] এ অনুভব যে খুব একটা পরিচ্ছন্ন রূপ পেয়েছে এমন একেবারেই নয়। তবে অনুভবে ভিন্ন এক মাত্রা দেখা দিয়েছে এই যা।

প্রকাশের সব জড়তা কাটিয়ে প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণে পস্টেরিটি প্রসঙ্গে মনেব কথাটা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।/ এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে/ জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই'।/ ['প্রাণ'] এ তো কাব্য-বিশেষের কবিতা-বিশেষের পংক্তি নয়, সমগ্র কবিজীবনের মূল সুর বিধৃত এর মধ্যে। সনেটের এই পংক্তি দুটির প্রসঙ্গে নিজেই জানিয়েছেন —'আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে।' কবিতাটি সনেট। এর চোদ্দ পংক্তির নিবিড় বুনটে পিনদ্ধ অবয়বটি চোখে পড়ে বটে, কিন্তু এর আপাত দৃঢ়বদ্ধ রূপের অভ্যন্তরে আছে সংশয়ের দোলায় অস্থির এক মনের ছবি। চোদ্দ পংক্তির কবিতিকায় 'যদি' এই একই অব্যয়ের বারংবার ব্যবহার সেই অস্থিরতাকেই সূচিত করে। বাঁচার আগ্রহ, অমর আলয়ের স্বপ্ন অচিরেই সংশয়ে আকুল। কবিতার মধ্যদেশেই ত্যক্ত হয়েছে অমরতার আশা, পরিবর্তে 'বাঁচি যতকাল তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই'—এই স্বল্পে সন্তুষ্টি। এবং শেষে করুণ বিনতি—'হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তাব পরে হায়/ ফেলে দিয়ো ফুল যদি সে ফুল শুকায়'। হতাশাসূচক অব্যয়টি প্রারম্ভিক দ্বিপদের প্রত্যয়ী উচ্চারণকে কোথায় এনে ফেলেছে। অবশ্য এতে কবিতার ক্ষতি হয়নি কোনো। বরং এক জীবন্ত হৃদয়ের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে তৈরী হয়েছে আলোছায়ার বিচিত্র ছবি, কড়ি ও কোমলের যুগ্ম সংগীত।

শুধু এ কবিতায় নয়, এ কাব্যের আরও বহু কবিতায় (অন্তত আটটিতে) এই ভাবনার অনুরণন। সুন্দর ভুবনের প্রতি, মানবের প্রতি অনুরাগ যত বেড়েছে ততই প্রবল হয়েছে স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা 'জীবন্তহৃদয়'কে অধিকার করে। কিন্তু আশ্চর্য, এরই পাশাপাশি রয়েছে ভিন্ন চিন্তার স্রোত। বিশ্ব রঙ্গভূমিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা, চলমান জীবনের বিপুল বিবর্তনের বৃহৎ পটভূমিকায় জীবনকে দেখার আর সেই সঙ্গে নিরাসক্তির সাধনা তাঁকে পেয়ে বসেছে এ বয়সেই। 'মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,/ সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগযুগান্তর।' ['ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি']। ধ্রুবপদের মতো আউড়ে যাচ্ছেন মনে মনে। মানব-জীবন স্থায়ী নয়, মানব-সৃষ্টিও অস্থায়ী, এই নির্মম সত্যে কিন্তু ভিতরে ভিতরে পীড়িত হচ্ছে তাঁর কবি-মন। তাই দেখা যায় এহেন অবস্থায় কবি আশ্রয় খোঁজেন

— নৈর্ব্যক্তিক মানব-সমাজে বা মানব-হৃদয়ে নয়, ব্যক্তিক সম্পর্কের সূত্র ধরে কোনো ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে, মনে। নাসিক থেকে পত্র-কবিতায় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে লিখছেন গভীর আগ্রহে—'এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা/ অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা/ .... এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে, /আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।/ ... এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে। যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি, / এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।/ যবে হায় সব গান/ হয়ে যাবে অবসান/ এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি'। শুধু কড়ি ও কোমলে নয়, পরেও দেখা যাবে যখনই বৃহৎ বিশ্বের মমত্বহীন মূর্তি প্রকট হয়েছে কবির কাছে তখনই আশ্রয় খুঁজেছেন তিনি ব্যক্তির মধ্যে। খুঁজেছেন শান্তি আর সান্ত্বনা।

কড়ি ও কোমলে মনের আর একটি প্রবণতা ধরা পড়ে এই সূত্রে বা এই উপলক্ষে। ভাবনাটি প্রথম দেখা দেয় প্রশ্নের আকারে।—'সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়/ সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে।/ আমি কি দিইনি ফাঁকি কতজনে হায়;/ রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।' ['প্রত্যাশা']।

এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নিজেই।—

'নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে/ পুরুষের মতো যত মানবের সাথে/ যোগ দিতে পারি নাকো লয়ে নিজ বল/ সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে/ বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।' ['স্বপ্নরুদ্ধ']। তাঁর মনে হয়, ঊর্ণনাভের মতো শুধু সূক্ষ্ম জাল বুনে চলেছেন নিজের চারিদিকে। নিজেকে মনে হয় জীবন-বিচ্ছিন্ন। অনেকগুলি কবিতায় 'কাজ'-এর কথা এসেছে 'গান'-এর বিপরীতে, অন্তরে জেগেছে কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ। 'আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে' এই আর্তি নিয়ে বলেন—' প্রেম কি ঘরের কোণে শুধু গাহে গান?/ তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ/ যদি না করিতে পারি কারো কোনো কাজ।' ['জাগিবার চেষ্টা'] বলেন, 'গান গাহি বলে কেন অহংকার করা/ শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে'/ ... কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা;/ প্রাণে মরে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়।/ কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,/ মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান; ... তার পরে একসাথে এসো কাজ করি,/ কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি।' ['কবির অহংকার'] অনেক পরে লেখা বিখ্যাত একটি কবিতার কথা পাঠকের মনে পড়ে যাবে যেখানে 'খেলাবার বাঁশি' ফেলে কর্মের আহ্বানকে স্বীকার করতে চেয়েছেন কবি কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে। সেখানেও ম্লান মুখের, নতশিরের কথা আছে। বোঝা যায়, ঐ কবিতা শুধু ঐ সময়ের ফসল নয়, বহু আগেই এর সূচনা ঘটেছে। ধূমায়িত অসন্তোষ বহন করেছেন কবি দীর্ঘদিন। তারপর সত্যি একদিন 'কাজের আহ্বানে' সাড়া দিয়েছেন। পদ্মাতীরে তার সুরু, আমৃত্যু তার ব্যাপ্তি। মানবহৃদয়ে স্থান পাবার জন্য কর্মযোগের সাধনার দরকার শুধু সাহিত্য-সাধনা যথেষ্ট নয় এই সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ নম্রশিরে স্বীকার করে নিয়েছেন যৌবনেই এবং এই স্বীকৃতি তার প্রমাণ দিয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায়—জনশিক্ষার প্রসারে, পল্লী সংগঠন-চেষ্টায়, দেশহিতের অজস্র দুরূহ দায়গ্রহণে। শুধু শুভ চেষ্টায় নয়, অশুভের বিরুদ্ধে, অন্যায় আর অসংগতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে। এই কর্মসাধনার সঙ্গে তাঁর কবিধর্মের কোনো বিরোধ নেই। বরং আছে গভীর সংগতি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানে আর নয়। একটু পরেই অবশ্য ফিরে আসতেই হবে প্রসঙ্গটিতে।

কড়ি ও কোমলের আলোচিত সনেটের আর্তি অসামান্য কাব্যরূপ (পরে গীতরূপ) নিয়ে দেখা

দিয়েছে মানসীতে। 'তবু মনে রেখো' প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ-গীত এবং ধ্বনি-মুদ্রিকায় বিধৃত গানটি জানিয়ে দেয় এ শুধু মানসী পর্বের নয় রবীন্দ্র-মনেরই প্রায়-জীবনব্যাপী আকৃতির অভিব্যক্তি।

মানসীর পব সোনার তরী। পরিণত জীবনাভিজ্ঞার কাব্য। গ্রন্থসূচনায় কবির বক্তব্যটি শোনা যাক। এই বক্তব্য যাকে বলে 'প্রণিধানযোগ্য' নানা দিক থেকেই। কবি বলেছেন—

'এইখানে নির্জন-স্বজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, কাজ করেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।'

আমরা লক্ষ করেছি, সোনার তরীর বহু আগেই রবীন্দ্র-মনে গভীর অসন্তোষ জাগিয়েছে আপন নৈষ্কর্ম্য-দশা। জোড়াসাঁকোর কবির কর্মহীন রাত্রিদিন যে তীব্র অশান্তি আর অসন্তোষ জমিয়ে তুলছিল পদ্মাতীবে হল তার অবসান। সাহিত্য-সাধনা আব কর্ম-সাধনার দুটি পথ পাশাপাশি দেখা দিল, চলতে থাকল পাশাপাশি সারা জীবন জুড়েই। রোমাণ্টিক কবির কাব্যসাধনা আর বাস্তব-জীবন-নিষ্ঠ কর্ম সাধনা সহজ ছন্দে মিলেছে রবীন্দ্রজীবনে ও মনে।

এবার আসা যাক পস্টারিটির মূল প্রসঙ্গে। সোনার তরীর গ্রন্থ-সূচনায় সমাপ্তির সংশযাত্মক বাক্যটি চোখে পড়ার মতো।—

'তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি।'

নাম-কবিতার অন্তিম পংক্তিগুলি কানে বেজে উঠবে।—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী/ আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এই নির্মম প্রত্যাখ্যান-জনিত শোচনীয়তার মূর্তি এঁকেই কবিতার করুণ সমাপ্তি। 'শ্রাবণগগন ঘিরে/ ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,/ শূন্য নদীর তীরে / রহিনু পড়ি—/ যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' ['সোনার তরী'] সংসার কর্মীর কর্মটি নেয়, উত্তরকালের জন্য তা সমর্পিত থাকে, কিন্তু ভোলে কর্মীকে। কালের এই নির্মম ভূমিকার কথা পরে আসবে রবীন্দ্র-কবিতায় বার বার। তবে কবিমনের ভাবনায় দেখা দেবে বিচিত্র বিমিশ্রতা। সে আলোচনা ক্রমশ। কাল যাই বলুক, যাই করুক, কর্মী কিন্তু বলতেই থাকে 'আমি থাকব, আমি থাকতে চাই।' তার মধ্যে যা আছে তাকে বিশুদ্ধ অহংকার ভাবলে অবিচারই করা হবে। অন্তত কবি যখন বলেন নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা তখন সে তো শুদ্ধ অহংকার নয় বরং তার উল্টো। অহংকারের মধ্যে থাকে একধরণের অসাপেক্ষতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা কিংবা তারই ভাণ। কবির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু প্রকাশ করে কবির সাপেক্ষতাকেই। তিনি নির্ভরশীল তাঁর পাঠকের উপর। আপাত অহংকারের একটা ছদ্মবেশ কখনো থাকলেও আসলে তিনি সন্নত, তিনি প্রসাদপ্রত্যাশী। তাঁর অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা নিজের মধ্যে নয়। অনেকের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বের বিস্তার। তিনি অসাপেক্ষ একক নন, সাপেক্ষ সামাজিক। অলংকার শাস্ত্রে পাঠককে বলা হয় সহৃদয় সামাজিক। কথাটা কিন্তু কবি সম্বন্ধেই খাটে বেশি, অনেক বেশি।

চিত্রা কাব্যে বহুপঠিত, বহু শ্রুত, বহু আলোচিত কবিতা '১৪০০ সাল'-এ আপাত অহংকারের ছদ্মবেশে কবির কাঙালপনাই প্রকাশ পেয়েছে।' যশের কাঙাল ঠিক নয়। সংবেদনার। কবির উচ্চারণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে কথা। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার

কবিতাখানি/ কৌতূহল ভরে'— ['১৪০০ সাল']। এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে কবির কৌতূহলই। আর সে কৌতূহলে নানা রঙের মিশল। তাতে সুখ আছে, আছে ভয়, প্রীতি আছে, আছে প্রার্থনাও। বিশ্বাস যেমন আছে, তার সঙ্গে মিশে আছে সংশয়ও অনেকখানি।

কিন্তু অন্য একটি কারণেও কবিতাটির অপরিমেয় গুরুত্ব। এই প্রথম—বোধ হয়, এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন অনাগত যুগের কবি, তাঁর উত্তরসূরির কথা, কবিতায় বললেনও তাঁর প্রসঙ্গে। —'আজি হতে শতবর্ষ পরে/ এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি/ তোমাদের ঘরে?/ আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন/ পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।' ['১৪০০সাল']। এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের ভাবনায়। পরে দেখব সেই অনাগত যুগের কবি-বন্ধুর উদ্দেশে তাঁর সাদর আহ্বান-বাণী পাঠাচ্ছেন তিনি, জানাচ্ছেন নম্র নমস্কার।

এরপর আরও স্পষ্ট হয়ে পাশাপাশি বইতে থাকবে রবীন্দ্রমনের দুই ভাবনার ধারা—দুই ভাবনা দুই মেরুর। আর ধারা দুটি কখনো সমান্তরাল, কখনো সংলগ্ন, কখনো বা পর্যায়ান্বিত। ধাবা দুটি আকাঙ্ক্ষা আর ঔদাসীন্যের, আসক্তি আর নিরাসক্তির। যদিও এর সূচনা হয়েছে অনেক আগে অর্বাচীন বয়সেই অবিশ্বাস্যভাবে, তবু সে সূচনামাত্রই। আগেই বলেছি তার কথা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবনেব এক গুরুত্বপূর্ণ কাব্য হল ক্ষণিকা। পরিণত জীবনাভিজ্ঞার ফসল। রূপেও অনন্য—হাল্কা-চালে-বলা ভারী কথা। এ কাব্যেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ না-থাকার কথাটা বলেছেন প্রবলভাবে, কিন্তু বলেছেন প্রবল আনন্দের সঙ্গে। 'থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—/ থাকবে না ভাই কিছু।/ সেই আনন্দে চলরে ছুটে / কালের পিছু পিছু।' ['শেষ']। ক্ষণিকাব হাল্কা চালের কথা কবি বলেছেন, সকলেই বলেন। কিন্তু এর মধ্যে যে গতির তীব্রতার প্রসঙ্গ আছে তার কথা বিশেষ কেউ বলেন না। গতির কথা রবীন্দ্রকাব্যে প্রথমাবধিই, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু বলাকাকে 'গতিবাদের' কাব্য বলে চিহ্নিত কবা হয়। কিন্তু বলাকার অনেক আগে ক্ষণিকাতেই পাই তীব্র গতিকে। উপবের পংক্তিগুলি যার দোলায় দোলায়িত। যা ঝাঁকুনি দেয় পাঠক মনকেও। পড়তে পড়তে অনুভব করি যেন ছুটন্ত এক গাড়িতে বসে আছি সহযাত্রী সব। আর সেই ধাবমান বাহনে বেগের দমকটা সম্ভোগ করছি সবাই। হাল্কা চালে ভারী কথা রবীন্দ্রকাব্যে হলেও আমাদের কাব্যে কিছু নতুন জিনিস নয়, বিশেষত লোককাব্যে। কিন্তু ক্ষণিকার ঐ বেগ একেবারে চমকে দেয়। চলতি ভাষায় হসন্তের ধাক্কাগুলি অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে কী নিবিড়ভাবে যুক্ত।

গীতাঞ্জলির গান-কবিতায় কথা আরম্ভই হয়েছে অহংকার-মুক্তির প্রার্থনায়। 'সকল অহংকার হে আমার/ ডুবাও চোখে জলে।' [১ সংখ্যক]। এবং এ কথার সূত্রেই এসে পড়েছে অনিবার্য পংক্তিটি —'আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে।' সোনার তরীর করুণ বিনতির একেবারে প্রতিবাদ কবির নিজেবই মুখে। এবং সেইসঙ্গে কী অনায়াস উচ্চারণ—'বহুদিনের বাক্যরাশি/ এক নিমেষে যাবে ভাসি।' [৫৯ সংখ্যক]। 'নামের কারাগারে' বন্দী ভক্ত রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চাইছেন—'নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ,/ বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে।' [১৪৪ সংখ্যক]। অতএব বেশ কিছু দিন পরম শান্তিতে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের। পাঠক পাঠিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, উত্তরকালের স্থায়িত্ব নিয়েও না।

এরপর বলাকা পর্ব। বন্ধন-মুক্তির চেতনায় উদ্দীপ্ত কবি সৃষ্টি ও প্রলয়কে নিয়ে জীবনকে চিনেছেন তার প্রকৃত স্বরূপে। এখানেও সোনার তরীর করুণ বিনতির প্রতিবাদ আছে। কিন্তু গীতাঞ্জলির মতো বিবৃতিধর্মী গদ্যাত্মক বাক্যাবলীতে নয়, অসামান্য কবিত্বের উচ্চগ্রামে বাঁধা

সুরে— 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,/ তাই তব জীবনের রথ/ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার/ বারম্বার।/ তাই/ চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।' [৭ সংখ্যক]। ছবিটা এখানে একেবারে উল্টো। সোনার তরীর 'কর্তা' 'কীর্তির'ব সঙ্গে থেকে যেতে চায়। থাকার জন্য কাঙালের মতো প্রার্থনা তার। আর এখানে 'প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,/ রুধিল না সমুদ্র পর্বত।/ আজি তার রথ চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে/ নক্ষত্রের গানে/ প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।' [৭ সংখ্যক]। মহিমান্বিত এই কর্তা কীর্তিকে গ্রাহ্য করে না, 'তার আমন্ত্রণ লোকে লোকে/ নবনব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে'। সে মুক্ত, সে স্বরাট।

দার্শনিকতার এই উচ্চ গ্রামে বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি। কবির বাঞ্ছিত দুর্বলতা নিয়ে দেখা দেন রবীন্দ্রনাথ আবার অব্যবহিত পরেই। সেখানে ঘড়ির দোলকের মতো আসক্তি অনাসক্তির দুই কোটীতে চলাচল চলতেই থাকে তাঁর। দোলায়মান কবিচিত্তের ছবি ফোটে কবিতাগুলিতে। আমরা পাঠক অনুভব করতে পারি তাঁর সজীব হৃৎস্পন্দনকে। শিশু ভোলানাথ কাব্যে দেখি তিনি হাত পেতেছেন শিশু ভোলানাথের কাছে—'খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি'। কবুল করতে কুণ্ঠা নেই—'ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত/ দেখতে পাই নে পথ,/ তাকিয়ে থাকি পরশুদিনের পানে,/ ভবিষ্যৎ তো চিরকালই/ থাকবে ভবিষ্যৎ/ ছুটি তবে মিলবে বা কোনখানে?' ছুটির রাজা শিশুর কাছে দীক্ষা চান—'শিশু হবার ভরসা আবার/ জাগুক আমার প্রাণে/ লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে, ভবিষ্যতের মুখোশখানা খসাব একটানে/ দেখব তারেই বর্তমানের কালে।' ['শিশুর জীবন']। শিশুর মতোই দেখেছেন পথের বাউলকে—'সমস্ত দিন ধরে/ যেন মাতন ওঠে ভরে/ তোমার ভাঙন-লাগা গানে।' ['বাউল']।

এর পর যে কাব্যখানির উল্লেখ করতেই হয় সে হল পূরবী। সারা কাব্যজুড়েই ভাবীকালের ভাবনা। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পূরবীর সুর শান্ত, গম্ভীর, অপ্রমত্ত। সব উচ্চারণ ধীর লয়ে, নিম্নকণ্ঠে। দৃষ্টান্ত হাজির করি কিছু—'আমি তব হব সাথি,/ হে শেফালি, শরৎ-নিশির-স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত/ প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত/ অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বৃক্ষতলে,/ সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে। ['যাত্রা']। 'অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন;/ যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।' ['উৎসবের দিন']। 'উদাসীন রজনীর কালো কেশ সব দেবে মুছে,/ ... তাব পরে দিন যায় অস্ত যায় রবি;/যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।/ তুই হেথা কবি,/ এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস/ আপন বাঁশিতে ভরি, গানে তারে বাজাইতে চাস।' ['ছবি']। 'মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়?' ['পদধ্বনি']। 'খুলে দেয় নীরবের দ্বার/ নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে/ সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থতীরে।' ['সমাপন']। এ কবিতাগুলির সুর মোটামুটি একই। না থাকার কথাটাই এখানে অবলম্বন।

কিন্তু ভিন্নতর সুরের কবিতা আছে পূরবীতেই। উপভোগ্য একটি করুণ-মধুর রসের কবিতা উদ্ধার করতে লোভ হচ্ছে।—'ক্ষমা করো, যদি গর্বভরে/ মনে মনে ছবি দেখি,—মোর কাব্যখানি লয়ে করে/ দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী/ একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি/ আকাশেতে শশী/ ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা।/ কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা;/ হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে/ হয়তো ভাবিছ, ''যদি থাকিত সে বেঁচে,/ আমারে বাসিত বুঝি ভালো।''/ হয়তো বলিছ মনে, ''সে নাহি আসিবে আর কভু।/ তারি লাগি তবু/ মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।'' (ভাবীকাল)। লক্ষ করার, পূর্ববর্তী না থাকার কবিতাগুলিতে অনাসক্ত মনের প্রকাশের

পাশে কী আশ্চর্য ব্যতিক্রম এখানে। আরও লক্ষ করার, যা আমরা আগেও দেখেছি, কবির লক্ষ্য এখানে ব্যক্তিবিশেষ। কবিতার 'একলা' শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যে ভরা। পাঠক সাধারণ নয়, উত্তরকালের কাব্যানুরাগী সমাজ নয়, কবির আশ্রয় এখানে একলা একজন পাঠক অথবা পাঠিকা। কবিতা একলা কবির বার্তা একলা পাঠিকার কাছে। শুধু বার্তা নয়, সেই সঙ্গে কিছু প্রত্যাশার কথাও, কাল্পনিক কিছু স্বগতোক্তি দূরকালের সপ্তদশীর। যার মধ্যে আশ্বাস আছে, সান্ত্বনা আছে কিছু। দ্রষ্টব্য, এ কবিতাটি লেখা হয়েছে আণ্ডেস জাহাজে, ৬ নভেম্বর ১৯২৪। সময়ের অনুষঙ্গ ছায়া ফেলেছে কবিতায়। একদিন পর ৭ই নভেম্বর লিখেছেন 'বেদনার লীলা'। সে কবিতার সুর কিন্তু একেবারে আলাদা। তার বক্তব্য হল, সৃষ্টির কাজটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে থাকা-না-থাকার কোনো গুরুত্বই নেই। স্থায়িত্ব-নিরপেক্ষ তার সার্থকতা। সৃষ্টি হল লীলা। ক্ষণিকের হলেও সে মহার্ঘ। কিন্তু পূরবী কাব্যে 'বিস্মরণ' নামে একটি কবিতা পাই যার মধ্যে আছে অন্য এক ইঙ্গিত। এ দিক থেকে ঐ রচনা দল-ছাড়া। 'শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি/এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—/ সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে/ নতুন কুসুম দোলে।' ('বিস্মরণী')। তবু, স্বীকার করতেই হয়, পূরবী কাব্যে না-থাকার কথাটাই বড়ো। আর তাই কবি সান্ত্বনা খোঁজেন সৃষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে। 'প্রাণগঙ্গা' কবিতাও সেই সান্ত্বনা-খোঁজার কথাই বলে। 'এ পূজার কোনো ফুল নাই যদি ভাসে চিরদিন,/বিস্মৃতির তলে হয় লীন,/ তবে তার লাগি কহ,/কার সাথে আমার কলহ?/ প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান/ধন্য হয়ে যাক মোর গান।' ('প্রাণগঙ্গা')

লেখন-নামে যে ক্ষীণতনু কবিতিকা কবি লেখেন নানা উপলক্ষে, নানা দেশে, সেখানে ভাবীকালের ভাবনার সব রূপেরই প্রতিনিধি পেয়ে যাই। লেখন যেন নানা-রঙা ভাবনার প্রজাপতিদের ওড়ার ছবি। একটু নমুনা দিই-- 'আমার লেখন ফুটে পথধারে/ ক্ষণিক কালের ফুলে/চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে। চলিতে চলিতে ভুলে।' 'ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে/পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।/ তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হাল্কা কথার গান/ হয় তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।' 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল/ক্ষণকালের ছন্দ/ উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল/সেই তারি আনন্দ।' 'ভীরু মোর দান ভরসা না পায়/মনে সে যে রবে কারো,/হয়তো বা তাই তব করুণায়/মনে রাখিতেও পার।' 'ফাগুন শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে,/ ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।' এ যেন দীর্ঘ কবিতার দীর্ঘ-পরিসরে-বলা নানা কথার সংক্ষিপ্তসার। হ্রস্বতার জন্যই বক্তব্য স্পষ্টতায় ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে ভাবনা-বৈচিত্র্যের চেহারাটাও।

এই থাকা-না-থাকার দ্বন্দ্ব, আর তাই নিয়ে ভাবনার দোটানা চমৎকার রূপ পেয়েছে মহুয়ার একটি কবিতায়, অবশ্যই একটু ভিন্ন অনুষঙ্গে। তা হোক, তবু কথাটা একই।— 'যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—/যে যায় সে যায় চলে,/যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,/যে যায় তাহারে ভোলে।/তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে/ বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে/'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে/ এই কথা বুকে দোলে।' ('বিদায় সম্বল')।

কিন্তু এরপর রবীন্দ্রজীবন পরমায়ুর শেষ সীমার দিকে যতই এগিয়েছে ততই দুর্লভ হয়েছে ক্রমশ ঐ ছলনা, ঐ বিভাস ললিতের সুর। দুর্লভ কিন্তু অলভ্য একেবারেই নয়। পূরবীর মতো পরিশেষ কাব্যটিকেও গুরুত্ব দিতে হয় এই ভাবনার দিক থেকে। সমগ্র কাব্য জুড়ে শুধু এই ভাবনারই অনুরণন। তুলনায় এ কাব্যে জায়গা জুড়েছে অনেক বেশিই!

জীবনের যে অধিদেবতাকে তিনি স্মরণ করেছেন নানা উপলক্ষে তাঁর প্রতি সম্বোধন প্রায়ই দাঁড়িয়েছে 'রুদ্র' শব্দে এসে, যাঁর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকেছে। গোধূলির ধূসর প্রহরে বিশ্বরসে শেষবারের মতো দেহমন প্রাণ ভরে নিতে গিয়ে সর্বাগ্রে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন খ্যাতি, আর খ্যাতির দুরাশা। 'রাখিতে চাহি না কিছু,/আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,/ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে/ সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।' ('পান্থ')। এই সময় থেকে (১৩৩৮) বিশেষভাবে তাঁর লেখায় কবিখ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, কীর্তির প্রতি উদাসীনতা স্পষ্টতর হয়েছে এবং বারবার উল্লিখিত হয়েছে মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালবাসার কথা। 'দূর করি সর্বকর্ম, সব তর্ক, সকল দুরাশা,/ বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালবাসা'/ ['জন্মদিন'] । 'না থাক খ্যাতি, না থাক কীর্তিভার,/ পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,--/ আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে/ সেই বারতা রইল আমার গানে।' ['আছি']। জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার লাভের সৌভাগ্যেই ধন্য হয়েছেন তিনি, ধন্য হয়েছেন মর্ত্যজীবনের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করে, আর সেই সঙ্গে জীবনকে ভালবাসতে পেরে। যদিও সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এবং কাব্যের বিচিত্র রচনায় আগাগোড়াই ছড়িয়ে আছে এই ভালবাসার কথা, তবু যেন মনে হয় অজস্র কথার মধ্যে এই একটি কথাই ক্রমশ স্ফুটতর হতে হতে প্রধান হয়ে উঠেছে শেষ দিকের রচনায়। 'এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,-- কত ভালোবেসেছিনু আমি।' পরিশেষ কাব্যে 'বর্ষশেষ' কবিতার এই পংক্তিদুটিকে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রধান কথা বলে ধরে নিতে পারি অনায়াসে। আর লক্ষ করার-- এই ভালবাসার সূত্র ধরেই চলে আসছে আর এক ভাবনা পস্টারিটি-প্রসঙ্গে। অনাগতকালের উত্তরসূরির কথা ক্রমশ অধিকার করছে রবীন্দ্রনাথের মন। স্বাগত জানাচ্ছেন কবি সেই নবীনের রথযাত্রাকে। 'কালের মন্দিরে পূজাঘরে/যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে/যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,--/ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবিরে অক্ষয়,/ তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,/ প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।' ['লেখা']। বিজয়া আর প্রতিমা-বিসর্জনের অনুষঙ্গে এ লেখায় বিষাদের ছায়া এসে পড়েছে সন্দেহ নেই, তবু শেষ পর্যন্ত বহমান জীবনে উত্তরসূরির মধ্যে থেকে যাওয়ার কথাটা আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ থাকা আগে-আগে বলা নিজের সৃষ্টির থাকা নয়। নতুন কবির নতুন সৃষ্টির মধ্যে থাকা নিগূঢ় হয়ে, অনুস্যূত হয়ে। 'কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি'-- এই ভাবনা অন্তর্হিত এখানে। শুধু যেটা লক্ষ করার, নির্মোহ হতে গিয়েও সম্ভব হচ্ছে না ঐ মোহটুকু সম্পূর্ণ জয় করা। থেকে-যাওয়ার বিকল্প এক মূর্তিকে আশ্রয় করছে মন থাকা ও না-থাকার সন্ধিতে। আর এই ভাবনায় উৎসাহ যোগাচ্ছে তাঁকে প্রকৃতির সাক্ষ্য। এক বসন্তের সৃষ্টি ধূলিসাৎ হয়, তার বাণীই কিন্তু বয়ে আনে অন্য বসন্তের নতুন সৃষ্টি-সম্ভার। পরিশেষ কাব্যের ঠিক পরের এক-জোড়া কবিতায় ['নতুন শ্রোতা ১,২'] আবার এসেছে এই প্রসঙ্গ। আখ্যানের একটু ছায়া আছে এতে, ফলে কবির অনুভব এবং কাব্যের স্থানকালবাধিত বিষয় অনেক সাকার হয়ে অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু অন্য ঢঙে বলা নয়, একটু অন্য সুরও লেগেছে এখানে। 'সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে/ নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।' আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বিধাটুকু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেনি। এই আসর ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে থাকার কথাকে আর পাওয়া গেল না। জোড়া-রচনার দ্বিতীয়টিতে আরও কিছু কথা আছে নতুন কালের রুচিবদলের প্রসঙ্গে। এ কথাটা নতুন। ১৯২৭-এ এ কবিতা লেখা। বিশ্বকাব্যে নতুন কালের প্রবল পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তখন।

হৃদয়াবেগ, মনের রঙ দূরের আকাঙ্ক্ষা সেখানে সেকেলে বলে ধিকৃত, অমিশ্র বাস্তবের মননদীপ্ত, মোহমুক্ত ভাষ্যই যেন উদ্দিষ্ট। এই রুচিবদলের ভাবনা রবীন্দ্রমনকে ভাবিয়েছে কম নয়। বেশ একটা ভালো সময় জুড়েই ভাবিয়েছে। একটু তুলে ধরি সেই ভাবনার দৃষ্টান্ত।–

'সাহিত্য বড়ো ক্ষণস্থায়ী। দেখলুম তো-- কী দেশের কী বিদেশের সাহিত্যের অবস্থা। একদিন যাকে নিয়ে লোকে এত হৈ চৈ করেছে, দুদিন বাদে মনে হয়েছে তা ছেলেমানুষি। এ থাকে না, এমনি হতে বাধ্য। ভাষা যে নদীর কলস্রোতের মতোই, কেবলি যাচ্ছে আর নতুন আসছে। আজকের ভাষা কাল থাকছে না। তাই আমিও মেনে নিয়েছি ; দুঃখ নেই মনে। যতদিন আমি আছি, তার পরে দোরে তোমরা তালা বন্ধ করে দিয়ো– বাতি নিভিয়ে দিয়ো; –আমার কিছু বলার থাকবে না।...সাহিত্যে বেশির ভাগ হচ্ছে unsubstantial, তাই ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রস মরে যায়। ...তাই এক এক সময় ভাবি এত কেন লিখেছি জীবনে।'

[২৩ এপ্রিল, ১৯৪১ আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ]

বছর দুই আগে অমিয় চক্রবর্তীকেও লিখেছিলেন একটি চিঠিতে--

'বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকমের চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যেব আদর্শ।' [শান্তিনিকেতন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯]

ঠিক এই সব বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে ছন্দোবদ্ধ কবিতায়। পরিশেষের বহু কবিতার ছত্রে ছত্রে এই একই ভাবনা যাকে দুর্ভাবনাও (অবশ্যই সাময়িক) বলা চলে। যেমন খুশি উদ্ধার করে দিই, কবির মনের আবহাওয়াটা বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না।-- 'তার পরে গেল কাল,/ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।/ এ লজ্জিত বই/ কোনো ঘরে এর স্থান কই।/নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়/ভেবে নাহি পায়/এ লেখাও কোনো মন্ত্রে করেছিল জয়/সেদিনের অসংখ্য হৃদয।/...চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরা তার/বিকায় না আব। ['পুরনো বই']। 'আজ তোমাদের কালে/প্রবাসী অপরিচিত আমি।/আমাদের ভাষার ইশারা/নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে। ঋতুর বদল হয়ে গেছে,–/...রুচি, আশা, অভিলাষ/যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,/তার হল রসবিপর্যয়।/কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল/আমার বাগানে ফোটে না সে,.... তাই যেন শেষ করে দিয়ে যাই চলে/স্তুতিনিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।' ['আগন্তুক'] । পরিশেষ কাব্যের সীমা ছাড়িয়ে এই ভাবনার ঢেউ লেগেছে পরবর্তী পুনশ্চতেও। 'আব একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে/ বেড়াই ধাক্কা খেয়ে' ['নতুন কাল'] । অতি-চেনা কবিতা 'ছেলেটা'-তেও এই আক্ষেপ-- 'আমি বললুম, সে ত্রুটি আমারই,/থাকত ওর নিজের জগতের কবি,/তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে/ও ছাড়তে পারত না।/কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে/আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি।' ['ছেলেটা']।

সুতরাং উত্তরকালের পাঠক সমাজের উপর আর কবির ভরসা থাকে না। পরিশেষের নিজের জন্মদিনে লেখা একটি কবিতায় নিজের মৃত্যু-পরবর্তী শোকসভার সকৌতুক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন-- 'সেদিন যেন কবির তরে/ভিড় না জমে সভার ঘরে,/না হয় যেন উচ্চস্বরে/শোকের সমারোহ/ সভাপতি থাকুন বাসায়,/ কাটান বেলা তাসে পাশায়,/নাই বা হল নানা ভাষায়/ আহা উহু ওহো।/নাই ঘনাল দলবেদলের/কোলাহলের মোহ।' পাঠক-সমাজ সম্বন্ধে এই কথা কবির। লঘু সুরে। কিন্তু অন্য কথা আছে এবং সেখানে লঘুতার স্পর্শ নেই একেবারে। 'জানি আমি এই বারতা/রইবে অরণ্যেতে/ওদের সুরে কবির কথা/দিয়েছিলেম গেঁথে।' ['দিনাবসান']।

পাঠকসমাজের উপর ভরসা থাকে না এ হেন অবস্থায়, আগেই দেখেছি, কল্পনায় কোনো পাঠক বিশেষ (আসলে পাঠিকা) দেখা দিয়েছে ভরসাস্থল হয়ে। অনেকটা স্বরচিত সান্ত্বনার মতো। কিন্তু সেইসঙ্গে অন্য ভাবনাও আছে এবং সে হল প্রকৃতি-ভাবনা, বৃহৎ জীবন-ভাবনা। যে বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছেন আবাল্য, যার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে সঞ্জীবিত তাঁর চেতনা, যার অকৃপণ দানের প্রত্যুত্তরে তাঁর জীবনব্যাপী সৃষ্টির অজস্র সম্ভার উৎসর্গীকৃত, সেই প্রাণময় প্রকৃতির নিত্যলীলার মধ্যে তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসার সুরটি থেকে যাবেই, এই বিশ্বাসে তৃপ্তি খুঁজেছে তাঁর মন। যদিও পাশাপাশিই ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে অনিত্যতার বোধ, আর সেইসঙ্গে নিরাসক্তির সাধনা। 'সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে/ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।/সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়। /...চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি/আনন্দের বেগে।' ['ধাবমান', পরিশেষ]। পরিশেষের বহু কবিতায় এই নির্মম গতির নির্মোহ উপলব্ধি। কিন্তু কবির মোহ কি অত সহজে ছাড়ে? সে পুনশ্চ আত্মপ্রকাশ করেছে পুনশ্চে। কোনো কুণ্ঠাই নেই তার। আর আশ্চর্য, নিরাসক্তি আর আসক্তি একই কবিতায় বসেছে একাসনে, পাশাপাশি। আবার এসে গেছে মনের-চোখে-দেখা সেই পাঠিকার কথা— 'কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,/স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,/একদিনের দায় টানি কেন আর একদিনের পরে,/ ...দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে/ ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে!' জীবনের পঞ্চম অঙ্কে প্রবেশ করে এই উচ্চারণ তো বেশ স্বাভাবিকই। কিন্তু এরপরই শুনি— 'তখন দেখি তুমি যে আছ একালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে!/ তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে/আর আমাকে নেই প্রয়োজন/তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে এই ছিল আমার ভয়—/এই ছিল আমার আশা।...আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে/তোমাদের বাণীর অলংকারে/তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থ-শালায়,/পথিকবন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।/ যেন সময় হলে একদিন বলতে পার/মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন, লাগল তোমাদেরও মনে।/দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।/কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে। সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব/এই ইচ্ছা।/ যেন গর্ব করে বলতে পার/আমি তোমাদেরও বটে' ['নতুন কাল', পুনশ্চ]। নিঃসঙ্গ এক অনুরাগিণী পাঠিকাকে উদ্দেশ করে এই সব বলা। তাকে দাঁড় করিয়েছেন নির্মম কালের বিপরীতে। ঘড়ির দোলকের মতোই দুলছেন কবি, তাঁর মন ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করে চলেছে মোহময় আর নির্মোহ অবস্থাকে। এই অবিরাম যাওয়া-আসাই কবি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে ‌নে দেয়। তাঁর দুর্বলতাটুকু স্পর্শ করে আমাদের মন।

কিন্তু এরপর দেখা যাবে তিনি যেন আর প্রশ্রয় দিতে চান না এই দুর্বলতাকে। অনাসক্তির সুর স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পাচ্ছে ক্রমশ। এদিক থেকে শেষ সপ্তক কাব্যটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় বোধ হয়। 'প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।/পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া/দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।' ['ছয় সংখ্যক', শেষ সপ্তক]। 'নিখিল বিশ্ব' রবীন্দ্র-চেতনাকে অধিকার করেছে, কোন্ শৈশব থেকেই। সদর স্ট্রিটের বাড়ির সেই অবিস্মরণীয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে তার সূচনা। সোনার তরী পর্বে 'মুক্তদ্বার অন্তরে' বৃহৎ বিচিত্র বিশ্বেরই আনাগোনা। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই রবীন্দ্রচেতনায় এই বিশ্ব ক্রমপ্রসারিত। যৌবনের বিশ্ব আর শেষ পর্যায়ের বিশ্ব এক নয় একেবারেই। জীবনের উপান্তের দিকে যতই এগিয়েছেন কবি ততই তাঁর মন, বুদ্ধি, হৃদয় আর বোধকে অধিকার করেছে স্থানকাল-অবাধিত এক বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। মহাবিশ্ব, মহাকাশ-সৃষ্টি-স্থিতি-

প্রলয়ের মহানাট্যলীলা কখনো উদ্দীপিত করেছে তাঁর চৈতন্য, কখনো মগ্ন করেছে তাঁকে সুগভীর ধ্যানলোকে। ধাবমান কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের বিপুল বেগ, ছায়াপথ, মায়াপথে আচ্ছন্ন তাঁর চেতনায় জীবধাত্রী শ্যামলা ধরিত্রী স্থান পেলেও নিতান্তই ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। আর তারই সঙ্গে তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে মানুষী জীবনের কীর্তি, খ্যাতি, নাম এ সবের একদা-অনুভূত মহিমা লক্ষ করেছেন, যুগ যুগ ধরে যে সৃষ্টির ধারা বয়েছে এই পৃথিবীতে তা নামহারা। সেই অনাম রূপতাপসদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন। মুক্তি যেন পেয়েছেনও। উপলব্ধি করেছেন— 'নামের পূজার অর্ঘ্য,/ভাবীকালের খ্যাতি,/সে তো প্রেতের অন্ন;/ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ করা।' বলেছেন নিজেকে— 'তার পিছনে ছুটে/ সদা বর্তমানের অন্নপূর্ণার/পরিবেষণ এড়িয়ে যেয়ো না মোহান্ধ।' উপলব্ধি করেছেন— 'এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে/ আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল।' সেই হিল্লোল যেমন প্রকৃতির পাতায়, ফুলে ফলে তেমনি মানুষের সৃষ্টিতেও। প্রকৃতির সদ্যমুহূর্তের দান যেমন মানুষের দানও তেমনি। তাই কবির বক্তব্য— 'যখন কোনো গান করেছি রচনা,/সেও আপন অন্তরে/এইরকম পাতার হিল্লোল,/হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক./প্রকাশের হর্ষবেদনা।/সেও তো এসেছে বিনানামের অতিথি,/তার যেটুকু সত্য/তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে/তার বেশি আর বাড়বে না একটুও/নামের পিঠে চড়ে।' গম্ভীররসের এই কবিতায় নাম-প্রসঙ্গে এই সকৌতুক-মন্তব্যের লঘু প্রকাশভঙ্গিটি নজরে পড়ার মতো। এ কবিতায় এর পরবর্তী ভাবনা হল— 'বর্তমানের দিগন্তপারে/ যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত/ সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে/যখন ঠেলাঠেলি চলবে/লক্ষ লক্ষ নামে নামে,/তখন তারই সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে/বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার/আমারো নামটা,/ধিক থাক সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।/জীবনের অল্প কয়দিনে/বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ/দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।/সেই অন্ধকারকে সাধনা করি/যার মধ্যে বসে আছেন/বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত/ প্রকাশিত যিনি আনন্দে।' [আট সংখ্যক কবিতা]।

'স্মর নিত্যমনিত্যতাম্'-এই বচনকে অন্তরে বরণ করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যায়ের কাব্যে জীবনের ক্ষণিকতা, নশ্বরতাই বহু কবিতার উপজীব্য হয়েছে, আর সেখানে রঙ্গমঞ্চের অতিপ্রিয় চিত্রকল্পটি এসেছে বারংবার। 'একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে/ সরে যাব নেপথ্যে।' [চোদ্দ-সংখ্যক কবিতা]। 'যে নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে/স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান,' ['নাট্যশেষ', বীথিকা]।

বিরাট এই রঙ্গশালাটি। অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে তার অস্তিত্বের বিস্তার, যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয় জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ যা সংখ্যা-গণনার অতীত। তারই মধ্যে ধরার অতিক্ষুদ্র ভূমিকায় মানব-যুগের সীমা আঁকা, ক্ষুদে-ক্ষুদে মাপে। সেখানে মহেন্দজারো, সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর বুদ্বুদের মতো 'ফুটে আর টুটে পলকে।' কল্প-কল্পান্তের এই বিরাট পটভূমিকায় 'অমরতার আয়োজন/শিশুর শিথিল মুষ্টিগত/ খেলার সামগ্রীর মতো/ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।' ['একুশ সংখ্যক']। নামের প্রসঙ্গেই চলে আসে আবার বহু-উক্ত 'দুই-আমি'র কথা।—'শুরুতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে;/ ঐ একটা অনেককালের বুড়ো,/ আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে/ আজ আমি ওকে জানাচ্ছি/ পৃথক হব আমরা।/ ঐ প্রাচীন, ঐ কাঙাল।/ ... ঐ বৃদ্ধ ঐ বুভুক্ষু। ['বাইশ সংখ্যক', শেষ সপ্তক]। অমরতা সম্পর্কে নির্মোহ রবীন্দ্রনাথের অসামান্য

আত্মপ্রকাশ ঘটেছে পত্রপুটের 'পৃথিবী' কবিতাটিতে। বহুপরিচিত হলেও পংক্তিগুলি, শব্দ প্রয়োগগুলি আর একবার স্মরণ করা যাক।—'আমিও রেখে যাব কয়মুষ্টি ধূলি/ আমার সমস্ত সুখ দুঃখের শেষ পরিণাম, / রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়গ্রাসী/ নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।/ ...তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,/ সব কীর্তির অবসান।/ আজ আমি কেনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে/ এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে/ তার জন্য অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।/ ... হে উদাসীন পৃথিবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে/ তোমার নির্মম পদপ্রান্তে/ আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।' [তিন-সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট]।

১৯৩৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে লেখা চুয়াত্তর বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা পড়ে মনে হতেই পারে কোনো মোহকে আর কখনো প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। মনকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। ইতি ঘটে গেছে সব প্রত্যাশার। কিন্তু পত্রপুটেই গুটিকয়েক পৃষ্ঠার পর এমন কবিতা পাওয়া যাবে ক'মাস পরে-লেখা, যেখানে 'দুই-আমি'র ঐ কাঙাল আবার ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সেই তরুণী পাঠিকাও। — 'ওগো তরুণী, / ... মুছে-আসা ঝাপসা পথ বেয়ে/ এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে/ তোমাদের আজকে-দিনের নতুন কালে।/ ... আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা বলে/ তোমার অন্যযুগের সখা।' [চোদ্দো-সংখ্যক, পত্রপুট, ১৯শে বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬)]। তরুণী-পাঠিকার কথা স্মরণ করেই যে এ আকাঙ্ক্ষার পুনরাগমন এমন মনে করলে ভুল হবে। পরবর্তী কাব্য প্রান্তিক-এ একই অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন ব্যক্তিবিশেষকে নয়, নৈর্ব্যক্তিক 'সংসার'কে। —'হে সংসাব/ আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে/ বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।' [ছয়, প্রান্তিক, ৪।১০।৩৭]। অবশ্য এখানে রচিত কাব্যের প্রসঙ্গ নেই, শুধুই নিজের কথা। তবু আর্তির এই দীনতা পীড়া দেয় আমাদের, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু স্বস্তি ফিরে আসে অব্যবহিত পরেই যখন দেখি আত্মসংস্থ রবীন্দ্রনাথ অবস্থান বদলেছেন। তখন তাঁর উচ্চারণে ভিন্ন সুর—'কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন/ পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি,/ পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতা দেবীরে/ বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া।/ ... কেহ শুধাবে না নাম, অধিকারগর্ব নিয়ে তার/ ঈর্ষা রহিবে না কারো; অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা/খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।'[এগারো, প্রান্তিক, ১৮।১২।৩৭]।

আরো অনেক ইতিবাচক, আরো অনেক প্রত্যয়ী উচ্চারণ শোনা যাবে বারো-সংখ্যক কবিতায়। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতিই দিতে হবে আমাকে। —'ভৃতি তব সেবার শ্রমের/ সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে; / এক প্রহরের মূল্য আরেক প্রহরে ফিরে নিতে/কুণ্ঠা কভু নাহি তার; বাহিরদ্বারের যে দক্ষিণা/ অন্তরে নিয়ো না টেনে; এ মুদ্রার স্বর্ণলেপটুকু/ দিনে দিনে হাতে হাতে ক্ষয় হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে,/ উঠিবে কলঙ্করেখা ফুটি। ফল যদি ফলায়েছ বনে,/ মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাঙ্গ হল/ ফুল ফোটানোর ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হয়ে যাক/ লোকমুখবচনের নিশ্বাস পবনে দোল খাওয়া।/ পুরস্কার-প্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত/ যেতে যেতে; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান/ মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে; এ জনমে/ শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি/ ... যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,/ সে যে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত,/ নবজাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।' [বারো, প্রান্তিক, ১৮।১২।৩৭]

কীর্তিখ্যাতি নিন্দা প্রশংসার উর্ধ্বে যা তারি কথা। এখানে কবির দৃষ্টি স্থাপিত আসন্ন ভবিষ্যের দিকে। আবার কীর্তিখ্যাতি নিন্দা প্রশংসার উর্ধ্বে যা তারি কথা বলেছেন অতীতের দিকে দৃষ্টি

রেখেও। সেই মহার্ঘ বস্তুটি হল ভালোবাসা। 'আমার সে ভালোবাসা/ সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।' ['জন্মদিন', সেঁজুতি]। এর পরিচয় আগেই পেয়েছি। যথাস্থানে উল্লেখ করেছি সে কথা। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি কবিতার কথা বলা হয়নি, এ কবিতার আগেই লেখা—'দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,/ তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে/ শেষ কথা বলে যাব—/ দুঃখ পেয়েছি অনেক,/ কিন্তু ভালো লেগেছে,/ ভালো বেসেছি।' [পঁয়তাল্লিশ, শেষ সপ্তক]। এই ছত্রগুলি পড়তে গিয়ে প্রতিতুলনায় মনে এসে যায় বহু বহু আগে কাঁচা বয়সে লেখা পরিচিত কবিতাটি—'সোনার তরী'। সেখানেও দুই অব্যক্তের মাঝখানে অস্তিত্বের জগৎ—'ছোটো খেত'-এর কথা আছে। কিন্তু আছে তার সোনার ফসল রাখার কথা, সেইসঙ্গে নিজেকেও রাখার ইচ্ছার কথা, ইচ্ছাপূর্তি না হওয়ায় হতাশা আর বেদনার কথা। কিন্তু ভালোবাসার কথা কোথাও না। নিরীক্ষার বদল হয়ে গেছে। সেঁজুতির কবি ভাবছেন এখন ভালোবাসাই হল 'ছোটো খেত'-এর 'সোনার ফসল'। আর কিছুই নয়। 'ঠাঁই নাই'-এই উচ্চারণ আছে; কিন্তু প্রসঙ্গ বিপরীত। 'কী গেছে তোমার, কী রয়েছে আর/ নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,/ কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার/ নাই বা মিলিল কোনো।' ['পলায়নী', সেঁজুতি] মহাকালের চেহারাও বদলেছে সেঁজুতিতে। মানুষের কীর্তিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে নৌকো বোঝাই করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেওয়াই তাঁর কাজ নয়। সেখানে 'যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল/ চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,/ ডুবিছে ভাসিছে আকাশপাতাল/ আলোক আঁধার বহি।' [ঐ]।

এ কাব্যে আবার এসেছে মরণোত্তর স্মরণ প্রসঙ্গ। কিন্তু পূর্ব-আলোচিত কবিতার কৌতুকমিশ্র লঘু সুরে নয়। বক্তব্য অবশ্য একই। 'যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়/ তখন স্মরিতে যদি হয় মন/ ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়/ যেথা এই চৈত্রের শালবন।' সৃষ্টি সম্বন্ধেও সেই নিরাসক্তি—'যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে/ মিলায়েছে দাম তার ধরি নাই।' [স্মরণ, সেঁজুতি]। কবি-পরিচয় তাঁকে উৎসাহিত করে না। তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ: 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,/ আমি তোমাদের লোক,/ আর কিছু নয়,/ এই হোক শেষ পরিচয়।' ['পরিচয়', সেঁজুতি]।

তবু কাব্যের পালাবদল, রুচিবদলের ব্যাপারটা যে মনের মধ্যে কাজ করেই চলছে ক্ষণে ক্ষণে তারও আভাস মেলে। প্রহাসিনী কাব্যগ্রন্থে নাত্‌নীর সঙ্গে বাদানুবাদের ছলে তার প্রকাশ ঘটে যায় 'মাল্যতত্ত্ব'-নামের উপভোগ্য কবিতাটিতে। লিপিকার 'নতুন পুতুল'-এও ঐ কথা। আকাশপ্রদীপ কাব্যগ্রন্থের 'সময়হারা'য় একই অনুরণন। এ কাব্যের উৎসর্গ-পত্রে স্নেহাস্পদ তরুণ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে যা লিখেছেন তাতেও তাই। লিখেছেন—

'বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক কালের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।' বাক্যে 'এগিয়ে দিলুম' তাৎপর্যপূর্ণ এই ক্রিয়াপদটি লক্ষ করবার। সমকালের অনেক আধুনিকের গুঞ্জন শুধু যে কবির কানে এসেছে এমন নয়, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে'ও প্রবেশ করেছে। কখনো কখনো উত্ত্যক্ত বোধ করেননি, এমন বলা যাবে না। এইসব অভিজ্ঞতা ছায়া ফেলেছে বহু কবিতায়। —'আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ,/ আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ/ সেথা পড়ে আছে/ পূর্বদিগন্তের কাছে।/ নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,/ অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে/ জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা/ অর্থহারা।' ['ভাগ্যরাজ্য',

নবজাতক] কিংবা 'ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী/ এ অপরাধের জন্য যে-জন দায়ী/ তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।/ ... সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,/ ... কৃপণ পাড়ার রাশিকৃত নিয়ে বোঝা/ সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।' ['অবর্জিত', নবজাতক]। এ কাব্যগ্রন্থেই 'রাজপুতানা' নামে একটি কবিতা আছে। সেও এসেছে এই সূত্রেই।—'এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার/ দুর্বিষহ বোঝা।/ হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা/ পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,/ শূন্যেতে হারানো অধিকার।/ ... ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে/ দিনে রাতে।' ['রাজপুতানা', নবজাতক]। কবির সিদ্ধান্ত হল, বিনষ্টির স্বর্গলোকও শ্রেয়, শঙ্করের তৃতীয় নেত্র-নির্গত যুগান্তের বহ্নি সেও পরম সম্মান।

একেবারে অন্তিম পর্বের কবিতায় আর এ সব কথা নেই। সেখানে প্রধান হয়েছে দুটি কথাই, প্রথম বৈরাগ্যের বাণী, নিরাসক্ত মনে। 'খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর/মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ/ যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে/ বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;/ নির্মম ভবিষ্য জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে/ কীর্তির সঞ্চয়ে—। আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।' [১, রোগশয্যায়]। 'কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—/মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে' [২, রোগশয্যায়]। 'আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।/ জানি, কালসিন্ধু তারে/ নিয়ত তরঙ্গাঘাতে/ দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।/' [২৬, রোগশয্যায়]। 'সৃষ্টির চলেছে খেলা/ চারিদিক হতে শতধারে/ কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে।/ সম্মুখে যা কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে;/ নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি,/ তাহাতেই দেয় তারে গতি।/ কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি/ নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকা-আঁকি।/ কাল যায়, শূন্য থাকে বাকি।/ এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিকা/ ছেড়ে দেয় স্থান/ পরিবর্তমান/ জীবনযাত্রার করে চলমান টীকা।/ মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়/ সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়,/ ভুলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ/ ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।' [৩০, রোগশয্যায়]।

এ সবই আয়ুর শেষ সীমায় এসে লেখা, প্রয়াণের মাত্র আট মাস আগে। এই সব উচ্চারণের মর্মকথা হল 'সত্য যে কঠিন,/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।' [১১, শেষলেখা]।

কিন্তু প্রধান কথার এ হল প্রথম যা অদ্বিতীয় নয়। দ্বিতীয়ও আছে। আর সেখানেই জীবনদর্শী জীবন-সাধকের পাশে কবি-রবীন্দ্রনাথের আত্মঘোষণা আয়ুর অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়েও। সেখানে লয় নয়, মৃত্যু নয়, অমৃতের বন্দনা। 'জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া' মাধুরী দান করে যে সেই অমৃত। কিন্তু তার কথা দিয়ে কথা শেষ করার আগে ছোট দুটি প্রসঙ্গ সেরে নিতে চাই।

আগেও দেখেছি, কালবদলের পালাবদলের প্রসঙ্গে উত্তরসূরির কথায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যায়ে সেই উত্তরসূরির প্রতি প্রসন্ন আহ্বান এক প্রগাঢ় পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই আহ্বান শুধু কালের রুচিবদলের সূত্রে নয়, নিজের জীবনসাধনা, সেই সঙ্গে সারস্বতসাধনার অপূর্ণতার সূত্রে। 'নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।'—এই ভাবনার পটভূমিকায়। এখানে 'নিত্য' শব্দটি ছন্দে নিছক মাত্রা-পূরণের জন্য ব্যবহৃত নয়, এর গুরুত্ব অনেকখানি। সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরবর্তী পংক্তির একান্ত আন্তরিক আহ্বানে।—'এসো কবি অখ্যাতজনের/ নির্বাক্ মনের।/ মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার—/প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,/ অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি/ রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।/ ... মূক যারা দুঃখে সুখে,/ নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।/ ওগো গুণী,/ কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।/ তুমি থাকো

তাহাদের জ্ঞাতি,/ তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—/ আমি বারংবার/ তোমারে করিব নমস্কার।' [১০, জন্মদিনে, উদয়ন, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১ সকাল]। এ যে সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, রবীন্দ্রজীবন এবং কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুমাত্র পরিচিত তাঁদের সে কথা বলে দিতে হয় না। শিলাইদহে, বীরভূমের গ্রামে তাঁর বিচিত্রমুখী চেষ্টা—কখনো সাধ্যমতো কখনো-বা সাধ্যাতীত, সফলতা-ব্যর্থতা, জীবনব্যাপী বিচিত্র চিত্তক্ষোভ, চিত্তদাহ যা প্রকাশ পেয়েছে শুধু কাব্যে নয়, নাটকে বা ছোটগল্পে নয়, অজস্র প্রবন্ধে, ভাষণে, চিঠিপত্রে জীবনের প্রায়-শেষদিন পর্যন্ত—তারই মধ্যে তাঁর সংক্ষুব্ধ মনের ছবি জাজ্বল্যমান। সেই নিখাদ যন্ত্রণার জগৎ থেকেই উঠে এসেছে 'এসো কবি' এই একান্ত আন্তরিক আহ্বান। সশ্রদ্ধ অভিবাদনেও অত্যুক্তি নেই কোনো, এখানেও ঐ অকপট আত্মপ্রকাশ। পস্টারিটির পথে রবীন্দ্রভাবনার জগতে কবিতাটির যে বিশেষ গুরুত্ব আছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে আমাকে।

আর একটি ছোট্ট প্রসঙ্গ। এ সময় অনেক ছড়া লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছড়া কিংবা ছড়া জাতীয় কিছু। সংখ্যা প্রায় অবিশ্বাস্য, যা নিয়ে দু'-তিনখানা বই হয়ে যায়। এই বিপুল সময় ব্যয় করেছেন কেন যখন তাঁর সময়ের নিতান্তই টানাটানি! সময় মহার্ঘও বটে, জীবনের সময় তো শেষ হয়ে আসছে! এ কি নিছক খেলা! মনে হয়, সমকালীন জীবনভাবনারই এ এক অদ্ভুত ফসল। বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি আর বেগে আচ্ছন্ন কবির মন মানব-ভাষার অর্থঋদ্ধ সৃষ্টির গুরুত্বকে যেন অস্বীকার করতে চেয়েছেন মাঝেমাঝে তার অস্থায়িত্বের কথা ভেবেও। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র শব্দস্রোতে মানবভাষার অর্থচ্ছিন্ন, শ্রুতিমাত্র-নির্ভর শব্দস্রোতকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এমন দুশ্চেষ্টা বেশিদূর যেতে পারে না। কিন্তু এ ছড়াগুলিতে সেই সাময়িক উজানে-যাওয়ার ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়ে গেল।

অন্তিম পর্বের প্রধান দুটি কথার দ্বিতীয় কথায় আসি এবার। কথা নূতন নয়, আগেও এসেছি এ প্রসঙ্গে। তবু সমগ্র জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনার শেষে তার পুনরুচ্চারণ পায় অন্য এক মাত্রা, নিশ্চিতই বলা যায় এমন কথা।

জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, কাল তা হরণ করে— এই নির্মম সত্যকে স্বীকার করেও প্রশ্ন জাগে কবিমনে. উত্তরকালের জন্য কিছুই কি সঞ্চিত থাকে না কোনো-না-কোনো আকারে? মনে মনে বহুবার-উচ্চারিত এ প্রশ্নের উত্তর আসে অন্তর্লোক থেকে—'আমি জানি যাব যবে/ সংসারের রঙ্গ ভূমি ছাড়ি,/ সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে:/ এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।/ এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।/ বিদায় নেবার কালে/ এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।' [২৬, রোগশয্যায়, উদয়ন, ২৮।১১।১৯৪০]।

এই ভালোবাসার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে আনন্দ আর বিস্ময়। 'শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।/ তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—/ আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি/ জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।' [৩৬, রোগশয্যায়]। আর্যবাণীর অনুবাদে তৃপ্তি হয়নি, কবিতার অঙ্গীভূত হয়েছে মূল শ্লোকও—'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ/ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'

পরবর্তী কাব্য আরোগ্যেও ঐ প্রেমের কথা—'খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,/ বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।/ ... সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে/ অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।' [১৫, আরোগ্য, উদয়ন ৯ জানুয়ারি ১৯৪১ সকাল]। 'অসীমের স্বাক্ষর'—এই কথাটাই আরও স্পষ্ট, আরও প্রত্যয়নিষ্ঠ দৃঢ়তায় দেখা দিয়েছে একেবারে শেষের লেখায় মৃত্যুর অব্যবহিত

পূর্বে—'রাহুর মতন মৃত্যু/ শুধু ফেলে ছায়া,/ পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত/ জড়ের কবলে/ এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।/ প্রেমের অসীম মূল্য সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে/ হেন দস্যু নাই গুপ্ত/ নিখিলের গুহাগহ্বরেতে/ এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।' [২, শেষ লেখা]। '... তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার/ উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;/ কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি, ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।' [৭, শেষলেখা ২৫ এপ্রিল ১৯৪১]। শুধু নিজে ভালোবাসা নয়, ভালোবাসা পাওয়াও আছে এই লীলার মধ্যে। সারাজীবন দিয়েছেন যেমন, পেয়েছেনও তেমনি। 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি' এ তাঁরই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। মৃত্যুর আগে শেষ জন্মদিনে সেই কথাটিরই আনন্দিত উচ্চারণ তাঁর কবিতায়—'তাহাদের হাতের পরশে/ মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে/ নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,/ নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।' [১০, শেষ লেখা, উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ৬ মে ১৯৪১ সকাল]। মাটির পাত্রের এই অমৃতটুকুই উত্তরকালে নিয়ে আশা-নিরাশায় আন্দোলিত অন্তরের সব প্রশ্ন, সব সংশয়ের চির-অবসান ঘটিয়ে কবিকে দিয়েছে এক অপরিমেয় তৃপ্তি, আর মুক্তির অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দ।

বৈদিক ছন্দের কয়েকটি কথা

কৃপাময়ী কাঞ্জিলাল

প্রাচীন ভারতের সনাতন রীতি অনুসারে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ আর্যবংশীয় সুস্থ-সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে ছিল অবশ্যকর্তব্য।[১] বেদপাঠের অর্থ শুধুমাত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ নয়। মন্ত্রপাঠের সময় সেই মন্ত্রের ঋষি ও অধিষ্ঠাতা দেবতার সঙ্গে ছন্দের নামের উল্লেখও আবশ্যিক কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়।[২] অখন্ড বেদের দুই ভাগ (১) কর্মকান্ড ও (২) জ্ঞানকান্ড। কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল আরণ্যক ও উপনিষদ। এই কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড ছাড়াও অখন্ড বেদের ছিল ছয়টি অঙ্গ (১) শিক্ষা (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত (৫) ছন্দঃ ও (৬) জ্যোতিষ।[৩] বেদ অনুশীলনের পক্ষে উপরিউক্ত শাস্ত্রগুলির অপরিহার্যতার জন্যই সম্ভবতঃ ঐ শাস্ত্রগুলিকে বেদাঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।[৪] বেদের সঙ্গে বৈদিক ছন্দের একাত্মতা আরও বেশী অনুভূত হয়েছিল পরবর্তিকালে এবং হয়ত সে কারণেই বেদকেও ছন্দ: সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছিল। পাণিনি তাঁর বৈদিক প্রক্রিয়ায় ছন্দ ও বেদকে অভিন্নরূপে উল্লেখ করেছেন।[৫]

'ছন্দ' পদটি সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইচ্ছা পর্যায়বাচি 'ছন্দ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এই শব্দটি প্রাথমিকভাবে ইচ্ছা অর্থেই প্রযুক্ত।[৬] তার থেকেই হয়ত উপচরিত হয়েছে কবির ইচ্ছায়; যিনি 'অপার কাব্য-সংসারে' 'প্রজাপতি' তাঁরই 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী অনন্য পরতন্ত্রা নবরসরুচিরা নির্মিতি'কে তিনি কোন রূপে উপস্থাপিত করবেন সেই ইচ্ছায়। ছন্দঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে পাপের সংক্রমণ থেকে রক্ষা বা আচ্ছাদিত করে রাখে তাই এর নাম ছন্দঃ।[৭] তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে দেবগণ ছন্দের সাহায্যেই নিজেদের আবৃত করেছিলেন।[৮] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ ত্রয়ী বিদ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ছন্দের সাহায্যেই নিজেদের আবৃত করেছিলেন।[৯] নিরুক্তকার যাস্কও ও আচ্ছাদন অর্থেই ছন্দঃ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।[১০] আচার্য পাণিনির মতে অবশ্য আনন্দ পর্যায় ছন্দ্ ধাতু থেকে 'ছন্দ' শব্দটি উদ্ভূত।[১১] এই সমস্ত উপাখ্যান থেকে বোঝা যায় যে অশুভ ভাবকে আচ্ছাদিত করে মানুষের চিন্তাধারাকে সুসংহত ও সুসমঞ্জস রূপ দেওয়ার জন্যই যে ছন্দের উৎপত্তি,—এমন একটি ধারণা প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল।

ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে আথর্বণ সর্বাণুক্রমণিকায় বলা হয়েছে "ছন্দস্তু-অক্ষরসংখ্যাবিচ্ছেদ-কমুচ্যতে।" অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা দিয়েই যার স্বরূপ নির্ণীত হয় তারই নাম 'ছন্দঃ। 'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ"। ছন্দের আরও একটি লক্ষণ, যেখানে মাত্রা ও অক্ষর সংখ্যা দ্বারা

নিরূপিত বাক্যকেই ছন্দঃ বলা হয়েছে[১১] তা পরবর্তী লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ বৈদিক ছন্দে মাত্রার কোন ভূমিকা ছিল না। কেবল অক্ষরের সংখ্যা দিয়েই ছন্দঃ নিরূপিত হত।

পরবর্তী যগে পদ্যের লক্ষণ করা হয়েছে 'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্'। কিন্তু ছন্দের প্রয়োগ কি কেবলমাত্র পদ্যের ক্ষেত্রে সীমিত? সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস রীতির মাধ্যমে শব্দ বিন্যাস যদি ছন্দঃ শব্দের তাৎপর্য হয় তাহলে এরূপ বিন্যাস তো পদ্যের মত গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক অখণ্ড যে বৈদিক সাহিত্য ছন্দের প্রয়োগ তার সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রসারিত ছিল। সম্ভবতঃ এই তত্ত্বটি সূচিত করার জন্যই আচার্য পিঙ্গল তাঁর বেদাঙ্গছন্দঃ সূত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ের আলোচনার পর তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছেন পাদঃ এই সূত্র দিয়ে। অর্থাৎ এই সূত্রের পূর্বে যে ছন্দগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি যে গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সেই তত্ত্বটিই আচার্য পিঙ্গল তাঁর 'পাদঃ' এই সূত্রটি দিয়ে সূচিত করেছেন। এ কারণেই তিনি প্রথম দুই অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে কেবল পাদের লক্ষণ করেন নি, সমগ্র স্তবকেরই লক্ষণ করেছেন। ঋগ্বেদের সমগ্র অংশ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদের অনেক অংশই রচিত হয়েছে গদ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) বসবস্ত্বাচ্ছৃন্দন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঙ্গিরসদ্রুদ্রাস্ত্বাস্বচ্ছৃন্দন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদা-দিত্যাস্ত্বাচ্ছৃন্দন্তু জাগতেন ছন্দসাঙ্গিরস্বদ্ বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরা আচ্ছৃন্দন্ত্বানুষ্টুভেন ছন্দসাঙ্গিরস্বৎ।

—শুক্ল যর্জুবেদ সংহিতা ১১।৬৫

(২) আকৃতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা মনো মেধামগ্নিং প্রযুজং স্বাহা চিত্তং
বিজ্ঞাতমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা বাচঃ বিধৃতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা
প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহাগ্নয়ে বৈশ্বানরায় স্বাহা।।

—শুক্ল যজুর্বেদসংহিতা ১১।৬৬

উপরিউক্ত যজুর্মন্ত্র দুটি গদ্যে রচিত। কিন্তু প্রথমটিতে রয়েছে যথাক্রমে ঋগ্ গায়ত্রী, প্রাজাপত্যা অনুষ্টুপ, ঋগ্ গায়ত্রী ও সাম জগতী। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, জগতী ও পঙ্‌ক্তি।[১৩] অতএব পদ্য রচনার ক্ষেত্রেই ছন্দের ব্যাপ্তি স্বীকার করলে এই সমস্ত রচনার ছন্দোবত্ত্ব সিদ্ধ হয় না।

বৈদিক ছন্দঃ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কবে থেকে শুরু হয়েছিল, কবে কোন অজ্ঞাতনামা ঋষির ধ্যানে বৈদিক মন্ত্রের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল গাযত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি অথবা জ্যোতিষ্মতী, শঙ্কুমতী, পিপীলিকামধ্যা, অথবা বিরাড্ গায়ত্রী, নিচৃদ গায়ত্রী ও ভূরিগ অনুষ্টুপ-এর মত বিচিত্র সব ছন্দের নাম, আজ আর তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আচার্য পিঙ্গলের ছন্দঃ সূত্রের প্রথম তিনটি অধ্যায় বৈদিক ছন্দকে উপজীব্য করেই রচিত কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে পিঙ্গলাচার্য তাঁর রচনাকে বেদাঙ্গের মর্যাদা দেওয়ার জন্যই প্রথম তিন অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দঃ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার মুখ্য লক্ষ্য ছিল লৌকিক ছন্দ। পিঙ্গলাচার্যের বহু পূর্বে শাঙ্খায়নের শ্রৌতসূত্র. শৌনকের ঋক্‌প্রাতিশাখ্য. পতঞ্জলির নিদানসূত্র, কাত্যায়নের যজুঃসর্বানাক্রমসূত্র, অথর্ববেদের বৃহৎসর্বানুক্রমণী প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক ছন্দ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে। এই সমস্ত আলোচনাগুলি থেকে বৈদিক ছন্দের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

বৈদিক পদ্যচ্ছন্দকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় (১) শুদ্ধ ও (২) মিশ্র। যেখানে মন্ত্রের

পাদগুলি সজাতীয় অর্থাৎ সমানসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট সেখানে শুদ্ধ এবং যেখানে পাদগুলি বিজাতীয় অর্থাৎ ভিন্নসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট সেখানে তাকে মিশ্রসংজ্ঞায় অভিহিত করা যেতে পারে। একাক্ষর উক্তা ছন্দ থেকে সুরু করে ছাব্বিশ অক্ষরের উৎকৃতি ছন্দ পর্য্যন্ত যে নিম্নলিখিত ছন্দগুলির নাম পাওয়া যায় তাদের শুদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে,—

উক্তা (১), অত্যুক্তা (২), মধ্যা (৩), প্রতিষ্ঠা (৪), সুপ্রতিষ্ঠা (৫), গায়ত্রী (৬), উষ্ণিক (৭), অনুষ্টুপ (৮), বৃহতী (৯), পঙ্‌ক্তি (১০), ত্রিষ্টুপ (১১), জগতী (১২), অতি জগতী (১৩), শক্করী (১৪), অতিশক্করী (১৫), অষ্টি (১৬), অত্যষ্টি (১৭), ধৃতি (১৮), অতিধৃতি (১৯), কৃতি (২০), প্রকৃতি (২১), আকৃতি (২২), বিকৃতি (২৩), সংকৃতি (২৪), অভিকৃতি (২৫) ও উৎকৃতি (২৬)। এই ছাব্বিশটি ছন্দকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১) ক্ষুদ্রচ্ছন্দঃ (উক্তা থেকে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত), পথ্যা ছন্দঃ (গায়ত্রী থেকে জগতী পর্যন্ত), অতিচ্ছন্দঃ (অতিজগতী থেকে অতিধৃতি পর্যন্ত) এবং কৃতিচ্ছন্দঃ (কৃতি থেকে উৎকৃতি পর্যন্ত)। এই চার প্রকার ছন্দের মধ্যে পথ্যা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাতটি ছন্দই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধানরূপে বেদে ব্যবহৃত। এই সাতটি ছন্দকে বেদরূপী পরম পুরুষের অথবা যজ্ঞরূপী পুরুষের সাতটি হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে।[১৪] চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম যে ঋগ্বেদ তারও প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি এই সাতটি ছন্দেই রচিত হয়েছিল। অন্য ছন্দগুলি সবই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিদানসূত্রের রচয়িতা পতঞ্জলির মতে এর মধ্যেও মূল ছন্দ মাত্র তিনটি। অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী,—'ত্রয়শ্ছন্দঃ পাদাঃ ভবন্তি, অষ্টাক্ষরা, একাদশাক্ষরা দ্বাদশাক্ষরা ইতি' (নিদানসূত্র ১।১)। অন্য ছন্দগুলি সবই সেক্ষেত্রে 'উদ্ভূত ছন্দ' (Derived metre) এর পর্যায়ে পড়ে।

এই ছন্দগুলি ছাড়া বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে আর একশ্রেণীর মিশ্র ছন্দ। মিশ্র ছন্দে পদ্যের পাদগুলি ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ ভিন্নসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে[১৫] গায়ত্রাধিকারে নাগী, বারাহী, বর্ধমানা অথবা উষ্ণিগ্‌ অধিকারে ককুপ্‌, পুরউষ্ণিগ্‌ অথবা বৃহত্যধিকারে পথ্যাবৃহতী ন্যঙ্‌কুসারিণী বৃহতী, উপরিষ্টাদ্‌ বৃহতী প্রভৃতি ছন্দ এই মিশ্রছন্দেরই নিদর্শন। এই বৈদিক মিশ্রচ্ছন্দগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল পরবর্তী যুগের লৌকিক সংস্কৃতছন্দের অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্তের বীজ।

বৈদিক ছন্দের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অবাধ স্বাধীনতা। কবি যেন এখানে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ। পরবর্তী যুগে লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি প্রায় সবই ছিল বৈদিক যুগে অজানা। কেবল অক্ষরের অর্থাৎ স্বরবর্ণের বা স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা দিয়েই নিরূপিত হয়েছিল ছন্দের সংজ্ঞা, কিন্তু ছিল না গুরু আর লঘু অক্ষরের বিন্যাসক্রম, অথবা যতি অথবা মাত্রা-সংখ্যা সম্পর্কিত কোন নিয়মের অস্তিত্ব। সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা ছিল বৈদিক পদ্যের পাদব্যবস্থায়। 'পাদবদ্ধপদং পদ্যম্‌' এবং 'পদ্যং চতুষ্পদী'। অর্থাৎ পাদচতুষ্টয় সংগ্রথিত পদকদম্বকই পদ্য সংজ্ঞাবাচ্য। কিন্তু এ নিয়ম কেবল লৌকিক সংস্কৃত পদ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈদিক পদ্যের ক্ষেত্রে পাদসংখ্যা কোন নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। এ কারণে একপদা পদ্য থেকে আরম্ভ করে অষ্টপদা পদ্য পর্যন্ত বিভিন্নসংখ্যক পাদবিশিষ্ট মন্ত্র বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছে। পদসংখ্যার মত অক্ষরসংখ্যার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ অনেক শিথিল ছিল। কোন পাদের অক্ষরসংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম হলে 'ইয়াদি পূরণ' অর্থাৎ বিপ্রকর্ষের (ইয়াদি) সাহায্যে সংখ্যা পূরণ করে নেওয়া হত।[১৬] যথা একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র—

'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

গায়ত্রী ছন্দে রচিত এই মন্ত্রটির প্রতিপাদে আটটি অক্ষর থাকার কথা। কিন্তু প্রথম পাদের অক্ষর সংখ্যা সাত হওয়ার অর্থাৎ এক কম হওয়ার জন্য 'বরেণ্যং' পদটি বরেণিয়ং রূপে পাঠ করে অক্ষর সংখ্যা পূরণ করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে 'ইয়াদি পূরণে'র দ্বারা সংখ্যা পূরণ সম্ভব নয় সে সমস্ত ক্ষেত্রের জন্যও পৃথক নির্দেশ দেওয়া ছিল। যেমন, অক্ষর ১ কম হলে বলা হত 'নিচৃদ্' ১ বেশি হলে বলা হত 'ভুরিগ'। আবার ২ কম হলে বলা হত 'বিরাট্' এবং ২ বেশী হলে বলা হয় 'স্বরাট্'। অর্থাৎ বাইশ অক্ষরবিশিষ্ট ঋক্ হলে ছন্দ হবে 'বিরাট্ গায়ত্রী' অথবা 'স্বরাট্ সুপ্রতিষ্ঠা'। এইরূপ তেইশ অক্ষর থাকলে ছন্দ হবে নিচৃদ্ গায়ত্রী। চব্বিশ অক্ষরে শুদ্ধা গায়ত্রী পঁচিশ অক্ষরে ভুরিগ্ গায়ত্রী এবং ছাব্বিশ অক্ষরে স্বরাড়্ গায়ত্রী অথবা বিরাড়্ উষ্ণিক্।[১৮] দৃষ্টান্ত—

নিচৃদ্ গায়ত্রী— অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ
অগ্নিমিন্ধে বিগ্স্বভিঃ।। সামবেদ সংহিতা ১।১।১।২।৯

ভুরিগ্ গায়ত্রী— নষ্টাসবো নষ্টবিষা হতা ইন্দ্রেণ বজ্রিণা
জঘানেন্দ্রো জঘ্নিমা বয়ম্।। অথর্ববেদ সংহিতা ১০।৪।১২

বিরাড়্ গায়ত্রী—ইন্দ্র উক্থামদান্যস্মিন্ যজ্ঞে প্রবিদ্বান্
যুনক্তু সুযুজঃ স্বাহা।। অথর্ববেদ সংহিতা ৫।২৬।৩

স্বরাড়্ গায়ত্রী— অসৌ হা ইহ তে মনঃ ককুৎসলমিব জাময়ঃ
অভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি। অথর্ববেদ সংহিতা ১৮।৪।৪৬

সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যতি সম্পর্কিত প্রশ্ন। পদ্যছন্দের ক্ষেত্রে যে কোন ছন্দেই পাদান্ত যতি আবশ্যিকী। আবার কোন কোন ছন্দের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্টস্থানে পাদমধ্য যতি পদ্যটিকে একটি বিশেষ শ্রুতি মাধুর্যে মণ্ডিত করে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রে যতির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হলেও বৈদিক ছন্দে যতির প্রয়োগ সম্পর্কে ছন্দঃশাস্ত্রের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। অথচ বৈদিক মন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই যে নিয়মিত যতির উপস্থিতি কাব্যসৌন্দর্যকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে তার বহু নিদর্শনই বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি থেকে এর কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—

১। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।। ঋগ্বেদ সংহিতা ১।১১৫।১

২। স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট নেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ঋগ্বেদ সংহিতা ৫।৮।৬

৩। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে

ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।   ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১২১।১

বৈদিক যুগের কবি সৃষ্টি করেছেন আপন আনন্দে। কবি এখানে স্রষ্টা নন, তিনি দ্রষ্টা। রূপে রসে পরিপূর্ণা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি কখনও সুন্দরী কখনও নিষ্ঠুরা ও ভয়ঙ্করীরূপে তাঁদের মধ্যে যে ভয়, বিস্ময় ও মুগ্ধতার আবেগ এনে দিয়েছে সেই আবেগেরই আবেশে তাঁদের চেতনায় ফুটে ওঠা স্তুতি ও প্রার্থনার কবিতাকুসুমের সঙ্কলনই বৈদিক মন্ত্র সাহিত্য। ব্যাকরণের জন্ম যেমন ভাষার জন্মের অনেক পরে, তেমনি ছন্দঃশাস্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছিল কাব্যের আবির্ভাবের অনেক পরে। কাব্যের জন্যই যে ছন্দ, ছন্দের জন্য যে কাব্য নয়, বৈদিক সাহিত্যে তারই প্রমাণ মেলে। ঋষির চেতনায় কাব্যলক্ষ্মী যখন যেরূপে ধরা দিয়েছেন সেই হয়েছে তার ছন্দ। সেই রূপের দিকে তাকিয়েই রচিত হয়েছে পরবর্তী যুগের ছন্দঃশাস্ত্র। 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি/ ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি/ রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' অনর্গলিত স্বাচ্ছন্দ্যই বৈদিক কাব্যের সৌন্দর্যের চাবিকাঠি। এখানে ভাবের স্রোতোধারা তাই আপনছন্দেই বয়ে চলেছে। কোন আরোপিত বিধিনিষেধ তাকে শৃঙ্খলিত করেনি। অনেকক্ষেত্রেই তাই বৈদিক কাব্য পরবর্তী কালের বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ গুণালঙ্কার সমৃদ্ধ কাব্যকে অতিক্রম করে গিয়েছে, 'দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ'।।

উল্লেখসূত্র

১। স্বাধ্যায়মধীয়ীত ... (ঋগ্ ভাষ্যোপক্রমণিকা)
২। যোহ বা অবিদিতার্ষেয়দৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি অবাইধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বা চর্চ্ছতি গর্তং বা প্রপদ্যতে প্র বা মীয়তে। পাপীয়ান্‌মস ভবতি। — কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণী
৩। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দষাং চিতি।
জ্যোতিষামায়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ভবন্তি ষট্।।
৪। ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুনিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।(পাণিনীয় শিক্ষা৪১,৪২)
৫। তে প্রাগ্ ধাতোঃ ছন্দসি পরেহপি। ব্যবহিতাশ্চ (অষ্টাধ্যায়ী১।৪। ৮০, ৮১, ৮২)
৬। ইচ্ছাপর্যায়শ্ছন্দঃ শব্দ ইহ গৃহ্যতে—কাশিকা বৃত্তি ৪। ৪। ৯৩
৭। ছাদযন্তি হ বা এনং ছন্দাংসিপাপাৎ কর্মণঃ।
৮। প্রজাপতিরগ্নিনচিনুত। স ক্ষুরপবির্ভূত্ত্ব হৃতিষ্ঠৎ। তং দেবা বিভ্যতো নোপায়ন্।
তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্। তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।২ ।৬।১)
৯। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভ্রিরাত্মান মাচ্ছাদয়ন্।
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১। ৪। ২
১০। ছন্দাংসি ছাদনাৎ। (যাস্ক-৭। ৩। ১২)
১১। চন্দয়তি আহ্লাদয়তি ইতি ছন্দঃ। ("চন্দেরাদেশ্চছঃ" সিদ্ধান্তকৌমুদী- উণাদি ৬৫৮)

১২। মাত্রাক্ষরনিয়তা বাক্ ছন্দঃ।

১৩। ....আদ্যা ঋগ্ গায়ত্রী .....রুদ্রাঃ প্রজাপাত্যানুষ্টুপ..... আদিত্যাঃ ঋগ্গায়ত্রী.... বিশ্বে সামজগতী...। মহীধরভাষ্য- শুক্লযর্জুবেদসংহিতা ১১।৬৫ আকৃতিং যজুঃ পঙ্‌ক্তি ঃ....মনঃ। যজুস্ত্রিষ্টুপ। ....চিত্তমাযজুর্জগতী। বাচঃ। যজুর্জগতী। ... প্রজাপতয়ে। যজুঃ পঙ্‌ক্তিঃ। মহীধরভাষ্য— শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ১১।৬৬

১৪। চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঅস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যা আ বিবেশ।।

ঋগ্বেদ সংহিতা ৪।৫৮।৩

১৫। পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র — ৩।১২, ৩।১৩, ৩।১৪, ৩।১৯, ৩।২০, ৩।২৭, ৩।২৮, ৩।৩১,

১৬। দৃষ্টান্ত—	গায়ত্রী আসুরী একপদা — অথর্ববেদসংহিতা		১৩।৬।৪
	গায়ত্রী আর্ষী দ্বিপদা—	ঐ ঐ	১৩।৯।৩
	জগতী পঞ্চপদা —	ঐ ঐ	৮।২।৯
	জগতী ষট্‌পদা —	ঐ ঐ	৩।২২।৪
	জগতী সপ্তপদা —	ঐ ঐ	৮।৬।১৭
	বৃতি অষ্টপদা —	ঐ ঐ	১৭।১।১০

১৭। পাদঃ ।। ইয়াদি পুরণ।। (পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র ৩।১,২)

১৮। ঊনাধিকেনৈকেন নিচ্ছদ্ ভূরিজৌ ।। দ্বাভ্যাং বিরাট্ স্বরাজৌ ।। (পি. সু ৩।৫৯।৬০)

মারাঠী ছন্দ

সুনন্দা দাশ

মারাঠী সাহিত্যে পদ্যবচনা প্রধানত সংস্কৃত অক্ষরগণ বৃত্ত এবং প্রাকৃতের মাত্রাগণ বৃত্তের উপর আধারিত। দেশীয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলন ছিল লৌকিক সাহিত্যে। আদি ও মধ্য যুগে লৌকিক এবং দেশীয় ছন্দে কাব্যকবিতা রচিত হয়েছিল। তবে কবিদের বিশেষ প্রবণতা ছিল সংস্কৃত ছন্দের দিকে। মহানুভব সম্প্রদায়ভুক্ত পন্ডিত কবিরা প্রধানত ছন্দকেই অবলম্বন করছেন। সংস্কৃতের বিভিন্ন বৃত্ত তাঁরা প্রয়োগ কবেছেনই, উপরন্তু নানা মিশ্রবৃত্ত তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলির নামকরণও করেছেন। ডিম্ভ কৃষ্ণমুনির রুক্মিণীস্বয়ম্বরা এবং ওঙ্কারমুনির লক্ষ্মণস্বয়ম্বরা কাব্যে এই রকম বহু বৃত্ত সম্পর্কে গ্রন্থকাবদের নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা পরবর্তীকালেও বজায় থাকল। রামদাস বামন, অনন্তকবি, আনন্দতনয় এবং তারও পরে মোরোপন্তের হাতে আরো নতুন নতুন বৃত্ত উদ্ভাবিত হল।

মারাঠী কবিদের প্রিয় একটি প্রাচীন ছন্দ আর্যা। গাথার ছন্দ হিসাবে প্রাকৃতের যুগ থেকেই এটির প্রচলন ছিল। অপভ্রংশ যুগে সংমিশ্রিত গাথানুষ্টুভী রূপ লাভ করার পর মারাঠীতে এটি আর্যা ছন্দে পরিণতি লাভ করেছিল। মহানুভব কবি সম্প্রদায় তুকারাম-কালীন বহু কবি এই আখ্যানকাব্য-রচয়িতা বেশ কিছু সংখ্যক কবি আর্যা ছন্দকে তাঁদের ভাবপ্রকাশের উপযোগী মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে মোরোপন্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে যেমন এই ছন্দ মাধ্যমটিকে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তাঁর অনুগামী বহু কবিকেও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

মারাঠীর দেশীয় ছন্দ বলতে প্রথমেই ওবী-অভঙ্গের নাম করতে হয়। এটি লোকসাহিত্যের ছন্দ। স্ত্রীগীতের ছন্দরূপে ওবীর প্রচলন ছিল বহু প্রাচীন কাল থেকে। ছান্দসিকেরা তার নাম দিয়েছেন গেয় ওবী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সন্ত কবিরা এই ছন্দ গ্রহণ করছেন ভক্তিগীতি রচনার জন্য। সে ছন্দকে বলা হয় গ্রান্থিক ওবী। কেউ কেউ মনে করেন, ওবীর সঙ্গে কন্নড়ের ত্রিপদীর বেশ মিল আছে। এই মিল থাকা অবশ্য বিচিত্র নয়। কারণ মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক পাশাপাশি অবস্থিত। রাজনৈতিক কারণে কর্ণাটকের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল।

শুধু কর্ণাটক নয় তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রের সঙ্গেও মহারাষ্ট্রের সম্বন্ধ ছিল। শিবাজীর পিতা শহাজী রাজে তাঞ্জাবরে শাসক ছিলেন। অন্ধ্রের বহু ব্রাহ্মণ ও শ্রমিক মহারাষ্ট্রে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সন্তদের পর্যটনের মাধ্যমে উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর প্রভাব কবিকৃতিতে পড়ে। নতুন ছন্দোরূপেরও প্রচলন হয়। সাকী, অষ্টপদী, ঘনাক্ষরী, দোহা তার উদাহরণ। বাংলার অমিত্রাক্ষরের প্রভাবে এসেছে বৈনায়কবৃত্ত। ইংরেজি ফ্রি ভার্সের আদর্শে

রচিত হয়েছে গদ্যকবিতা—মুক্তশৈলী।

১. মারাঠীর ত্রিবিধ ছন্দ

মারাঠীতে তিন রকমের ছন্দোরীতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগেও এই তিন রীতির প্রয়োগ দেখা যায়: ১. গণবৃত্ত ২. জাতিরচনা এবং ৩. অক্ষরছন্দ বা ছান্দস রচনা। প্রথম দুটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতরীতির অনুবর্তন। তৃতীয়টি মারাঠীর মৌলিক রীতি।

গণবৃত্ত : মারাঠীতে সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রয়োগ মহানুভব সম্প্রদায়ের রচনাতেই দেখা যায়। ভাস্কর (কবীশ্বর ব্যাস) তাঁর ঈশস্তুতি কাব্যে নানা বৃত্ত প্রয়োগ করেন। তার পর একশ বছর ধরে অন্যান্য মহানুভব কবি নানা বৃত্তে কবিতা রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এঁদের রচনায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন কবির রচনায় নতুন নতুন বৃত্তের প্রয়োগ দেখা দিতে থাকল। কৃষ্ণমুনি ১৫৭৪ শকাব্দে লেখা তাঁর রুক্মিণীস্বয়ম্বর কাব্যে অনেক নতুন বৃত্ত রচনা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র-বহির্ভূত বৃত্তনির্মাণ ও কাব্যে কবিতায় প্রয়োগের এই প্রবণতা আরো বহু কবির মধ্যে দেখা যায়। মুক্তেশ্বরের রামায়ণ অনুবাদে, বামনের কবিতায় নতুন বৃত্তের প্রয়োগ বহু। বামনের রচনা ক্লিষ্ট মনে হলেও সে-সময় 'সুশ্লোক বামনাচা' এই প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। বিঠ্ঠল এবং আনন্দতনয়ের কবিতা একারণে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। অনন্তকবি, দেবরাজ, প্রমাণিকা, বিবুধপ্রিয়া, বিভাবরী, শ্যেনিকা ইত্যাদি নানা অভিনব বৃত্ত তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেছেন। মোরোপন্তের নাম এ প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিক যুগের কোনও কোনও কবি সংস্কৃত ছন্দে কাব্যরচনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাধব জুলিয়ন ও আনন্দরাম টেকাড়ের নাম করা যেতে পারে।

জাতিরচনা : গেয় জাতিরচনা মূলত প্রাকৃতের ছন্দ। সংস্কৃতের মতো এতেও লঘুগুরুভেদ আছে। এতে পর্বগুলি ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হয়ে থাকে। লঘু অক্ষরে এক মাত্রা এবং গুরু অক্ষরে দু মাত্রা গণনা করা হয়। মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রাচ্ছন্দ নামের বদলে প্রাচীন জাতি নামটিরই অনেক পক্ষপাতী।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহানুভবপন্থীদের কবিদের পদে এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। জ্ঞানেশ্বরও তাঁর কিছু পদে এ ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। নামদেব, একনাথ ও তাঁর অনুগামী কবিরা, পঞ্চদশ-ষোড়শের মহানুভব কবিরা, তুকারাম, রামদাস, অষ্টাদশ শতকের মোরোপন্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা এবং অজস্র অল্পশক্তিমান কবি এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক যুগে মাত্রাবৃত্তে কবিতা রচনা করেছেন মাধব জুলিয়ন এবং আরো কেউ কেউ।

অক্ষরবৃত্ত বা ছান্দস : এই ছন্দ অক্ষরমূলক। পর্বে প্রতিটি অক্ষরে ২ মাত্রা ধরা হয়। লঘু গুরু ভেদ করা হয় না। পর্বগুলি আট বা ছয় অক্ষরের হয়ে থাকে।

অক্ষরচ্ছন্দের অনেক প্রয়োগ আছে মারাঠীতে। ভক্তিগীতির ছন্দ ওবী-অভঙ্গ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আদিকাল থেকেই এর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞানেশ্বর, মহানুভব সম্প্রদায়ের অনন্তমুনি কারঞ্জকর, এলহন কবি, শাঙ্গধর, ভীষ্মাচার্য, গোপালরাম দর্যাপুরকর, লক্ষ্মীধরকবি প্রভৃতি; একনাথ, বারকবী ও লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের অনেক কবি; তুকারাম, বামন, বিঠ্ঠল, নাগেশ, অনন্তকবি, আনন্দতনয়, রঘুনাথ পণ্ডিত, মোরোপন্ত প্রমুখ বহু শক্তিমান কবি অক্ষরচ্ছন্দে কবিতা পদ ও কাব্য রচনা করেছেন। অল্পশক্তিমান কবির সংখ্যাও অনেক। আধুনিক কালের অনেক কবি পুরনো ছন্দোরূপের অনুশীলন করেছেন।

২. প্রাচীন নির্দশন

'মানসোল্লাসে'র কিছু কিছু পদে মারাঠী ছান্দস এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ৪৩ সংখ্যক এই পদটিতে ছান্দসের লক্ষণ আছে:

'জেণে রসা' তলউণু'
' মৎস্যরূপে' বেদ আণিয়লে'
' মনুশিবক ' বাণিয়লে'
' তৌ সংসার' সায়রতারণ'
' মোহতো রা' বো নারায়ণু' ।।

পদটিতে আটমাত্রার পর্ব। লঘুগুরু-নির্বিশেষে প্রতিটি অক্ষর দু মাত্রার। মারাঠী ছান্দস অর্থাৎ অক্ষরচ্ছন্দের বৈশিষ্ট্যও তা-ই।

নিচের এই পদটিতে আট মাত্রার মাত্রাবৃত্তের (জাতিরচনা) প্রাক্‌রূপ সহজেই নজরে পড়ে।

' কূর্মিনাগিম' ন্দর মে বচেদ'-
' মচেশালা নু' সুবরিগ্রমৃত'
' সাধিসি কোট' দেবনেপগীগে-'
' বরজো সুবররু' পে পাথালু-'
' পৈশিদাণ তুহরি' ণ কছ
পুচ মাচণি' ।।

আদি মারাঠী কবির রচনা

মারাঠী সাহিত্যে সর্বপ্রাচীন যে কবিতা পাওয়া যায় সেগুলির রচয়িতা একজন মহিলা কবি। তিনি মহানুভব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নাম মহদাইসা বা মহদম্বা। তিনি রচনা করেছিলেন 'ধবল' গীত। বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রীগীত ধবল লোকসমাজে বহু আগে থেকে প্রচলিত ছিল। এই গান একটি বিশিষ্ট ছন্দে রচিত। মহদম্বা সেই ছন্দ মাধ্যমে ভক্তিগীত রচনা করেন। তাঁর পদগুলি কখনো অন্ত্যমিলযুক্ত কখনো কখনো পর্বমিলযুক্ত।

অন্ত্যমিলযুক্ত ধবল
তব রাও। চিন্তা করী।। কবণা দ্যাবী। সলক্ষণিক কুম-। রী
য়া ত্রিভুব। নামাঝারী।। রূপে সুন্দর। বাখাণে মুরা-। রী ।।
পর্বমিল : সীতলে জলে। সপরীমলে। গললে করনী। দিঘলে চন্দ-। নে ।।

৩. ছন্দোপরিচয়

বাহুল্যবোধে সংস্কৃত গণবৃত্ত ছন্দের পরিচয় এখানে দেওয়া হল না। অন্য দুই শ্রেণীর ছন্দের বিশিষ্টতা এবং মারাঠী কবিদের প্রায়োগবৈচিত্র্য দেখানো হল।

জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রাচীন ধারার প্রয়োগ যেমন পাওয়া যায় তেমনি প্রাচীন ধারার বাইরে আসারও প্রচেষ্টা দেখা যায়। মারাঠী ছান্দসিকেরা মাত্রাবৃত্ত রচনা বিচারের ক্ষেত্রে পুরনো মানদন্ডই ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বিভিন্ন ছন্দ কাঠামোর মধ্যে ফেলে এগুলিকে তাঁরা বিচার করেছেন। একারণে মাত্রাবৃত্তের নানারকম নামকরণ করা হয়েছে পুরনো জাতি ছন্দের বিশিষ্টতা স্মরণে রেখে। গেয় ছন্দ ছিল বলেই এর এত প্রকারভেদ রক্ষিত হয়েছিল।

এই ছন্দে আট, সাত, ছয় ও পাঁচ মাত্রার পর্ব হয়ে থাকে। মাত্রাসংখ্যা অনুযায়ী পর্ব তথা ছন্দের

স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়েছে। আটমাত্রার পর্ব হলে পদ্মাবর্তনী, সাতমাত্রার অগ্ন্যাবর্তনী, ছয় মাত্রার ভৃঙ্গাবর্তনী এবং পাঁচমাত্রার হরাবর্তনী। পদ্যে পদ্মাবর্তনীর প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি। পদ্মাবর্তনীর দৃষ্টান্ত:

মাগিল রাজধ-। রা বহুতা বহু। ধৈর্য উদার্য ক-। লাভরণী।
বর্ণিতি বন্দী-। প্রচুরোজ্জ্বল। সুন্দর মঙ্গল। কীর্তি জনী।।

(ডিম্ভকবি, রুক্মিণীস্বয়ম্বর)

ভৃঙ্গাবর্তনী:

কোণি গাডি-। লে প্রিয়া। সাংগ অজি তু-। লা।
নেত্র পুসুনি। পুসত রাম। লক্ষ্মণা-। লা।।

আধুনিক কালের কবির রচনা থেকে উদাহরণ পরে দেওয়া হয়েছে।

অক্ষরবৃত্ত বা ছান্দস: মারাঠী অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই সেকথা আগে বলা হয়েছে। ওবী অভঙ্গ ঘনাক্ষরী প্রভৃতি এই ছন্দে লেখা। আদি মধ্যযুগের সব কবি এই ছন্দোমাধ্যমটি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক কালেও অনেক কবি এই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। মাধব জুলিয়নের 'সঙ্গমোৎসুক ডোহ' এই ছন্দে লেখা। বা. না. দেশপান্ডে এ জাতীয় ছন্দ প্রয়োগ করেছেন সবচেয়ে বেশি। রেভরেন্ড টিলক তাঁর 'উপাসনাসঙ্গীতা' এই ছন্দে লিখেছেন। মারাঠী মুক্তচ্ছন্দ আসলে ষন্মাত্রিক ছান্দসভিত্তিক। উদাহরণ পরবর্তী অংশে দেওয়া হয়েছে।

৪. প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের ছন্দ

যে যে ছন্দপ্রকারগুলি আদি ও মধ্যযুগের মারাঠী সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে পড়ে ওবী-অভঙ্গ, ঘনাক্ষরী, দিন্ডী, ধবল, আর্যা, সাকী। আর্যা ছাড়া সবই ছান্দস শ্রেণীভুক্ত। সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল। এই ছন্দগুলি ছাড়া গণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেরও বহুল ব্যবহার ছিল, তা বলাই শ্রেয়।

ওবী-অভঙ্গ

মারাঠীর প্রাচীন ছন্দের অন্যতম হল ওবী। স্ত্রী-গীতে ছন্দটির প্রচলন ছিল গেয় ওবীরূপে। পরে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক ভক্তিমূলক রচনায় সন্ত কবিরা এর প্রয়োগ করেন। লিখিত সাহিত্যের ছন্দোরূপকে গ্রান্থিক ওবী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন কন্নড় ত্রিপদীর সঙ্গে ওবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ওবী ও অভঙ্গ সমার্থক নাম। সন্তকবিদের পদরচনাগুলির একটি প্রকার হল অভঙ্গ। সেগুলি ওবী ছন্দে রচিত। এই কারণে অভঙ্গ ছন্দের নাম হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে অভঙ্গ হল ওবীর মালা। মহানুভব গোষ্ঠীর কবিরা অভঙ্গসদৃশ রচনাকে সর্বত্র ওবী বলে উল্লেখ করেছেন।

ওবী-অভঙ্গ অক্ষরমূলক ছন্দ। এক এক অক্ষরে এক এক মাত্রা ধরা হয়। সাধারণত ২২ অক্ষরে ওবী গঠিত হয়। পর্বভাগ এই রকম: ৬ ৬ ৬ ৪। সাড়ে তিন পর্ব-বিভক্ত ২২ অক্ষরের এই ওবীকে বলা হয় বড়ো (মোঠা) অভঙ্গ। 'ছন্দোরচনা'-র গ্রন্থকার মাধবরাও পটবর্ধন একে 'দেবদ্বার' নামে অভিহিত করেছেন। নামটির ইঙ্গিত জ্ঞানেশ্বরের লেখাতেই আছে:

৬		৬		৬		৪
দেবাচিয়েদ্বারী	:	উভ্যা ক্ষণভরী	:	তেণে মুক্তি চারী	:	সাধীয়েল্যা।।

৬		৬		৬		৪
হরি মুখে ম্হণা	:	হরি মুখে ম্হণা	·	পুণ্যাচী গণনা	:	কোণ করী।।
৬		৬		৬		৪
অসোনি সংসারী	:	জিহ্বে বেগু করী	:	বেদশাস্ত্রউভারী	:	বাহ্যা সদা।।
৬		৬		৬		৪
জ্ঞানদেব ম্হণে	:	ব্যাসাচিয়ে খুণে	:	দ্বারকেচে রাণে	:	পান্ডবা ঘরী।।

উদ্ধৃতিটিতে তৃতীয় চরণে স্ত্রউ এবং চতুর্থ চবণের পান্ডবা দ্রুত উচ্চারণ করতে হবে।

ওবী-অভঙ্গের আর একটি প্রকারভেদ আছে। তাকে বলা হয় লঘু বা ছোট (লহান) অভঙ্গ। এতে থাকে ৮ অক্ষরের বা ৭ অক্ষরের চারটি পর্ব। একে দেবীবর অভঙ্গ বলেছেন কেউ কেউ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভক্তকবি নামদেব এই দু রকমের অভঙ্গের গঠনবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর দুটি পদে। মোঠা অভঙ্গ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন·

সহা সাড়েতীন চরণ জাণাবে। অক্ষরে মোজাবী চৌকচারী।।
পহিল্যাপাসোনি তিসর্য়া পর্যন্ত। অঠরা গণিত মোজ আলে।।
চৌকচারী আধী বোলিলো মাতৃকা। বাবীসাচী সংখ্যা শেবটীল।।
দীড চরণাচে দীর্ঘ তেঁ অক্ষর। মুমুক্ষু বিচার বোধ কেলা।।
নামা ম্হণে মজ স্বপ্ন দিলে হরী। প্রীতীনে খেচরী কেলী আজ্ঞা।।

নামদেবের মতে অভঙ্গ হল প্রচুর দীর্ঘ অক্ষরসমন্বিত রচনা। এতে বাইশ অক্ষরের সাড়ে তিন চরণ। (পর্বকে নামদেব বলেছেন চরণ)। প্রথম তিন পর্বে আঠারো অক্ষর; শেষে চার অক্ষর। মোট বাইশ অক্ষর মিলে একটি চৌকা।

লহান (লঘু) অভঙ্গ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

মুখ্য মাতৃকাঞ্চী সংখ্যা। সোলা অক্ষরে নেটক্যা।।
সমচবণী অভঙ্গ। নহে তাল-ছন্দো-ভঙ্গ।।
চৌক পুলিতা বিসর্গ। গণ যতি লঘু দীর্ঘ।।
জ্ঞানে এখাদা নিরালা। নামা ম্হণে তো নিরালা।।

ষোল অক্ষরযুক্ত এবং দুই পর্বে আবর্তিত এই অভঙ্গে কখনও তাল-ছন্দ ভঙ্গ হয় না।

জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ (১৬শ), তুকারাম (১৭শ), রামদাস প্রভৃতি বহু ভক্তকবি এই ছন্দে কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন। মহানুভবপন্থী সমস্ত কবিদের রচনাতে এই ছন্দের প্রয়োগ আছে। লিঙ্গায়ত ও জৈন ধর্মাবলম্বী কবিরা ওবীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও পরবর্তী কালে এই ছন্দে খ্রীষ্টমাহাত্ম্যপ্রচারমূলক কাব্য লিখেছেন।

ঘনাক্ষরী

মারাঠী ঘনাক্ষরী ছন্দ লঘু অভঙ্গর অন্যতর রূপ বলে মনে হয়। ঘনাক্ষরীতে আছে চারটি পর্ব। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব আট অক্ষরের; চতুর্থ পর্বটি সাত অক্ষরের। আরম্ভের সময় তালি বাজিয়ে এর আবর্তন দেখানো হত। ঘন অর্থাৎ গুরু কিংবা আঘাতযুক্ত অক্ষর প্রযুক্ত হয় বলে এর নাম ঘনাক্ষরী। বামনকবির স্ফুট কাব্যে, বিঠ্ঠলকবির বিদ্বজ্জীবন কাব্যে, অনন্তের কুশলব-এ, রঘুনাথ পন্ডিতের নলদময়ন্তী স্বয়ম্বরাখ্যান কাব্যে, মোরোপন্তের ঘনাক্ষররামায়ণে বিষ্ণুদাস ভাবের সীতাহরণ কাব্যে ঘনাক্ষরী ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অবো কৈকেয়ি হে কায়: কেলে তুবাঁ হায় হায়। ৮ ৮
ন স্থণবে তুজ মায় : জন্মোজন্মী বৈরিণী। ৮ ৭
(বামন স্ফুটকাব্য ১, ভরতভাব ১৪)

সাগরা তজ্জলকণ : দেতো কায় ? ভাবেপণ।
ঘনাক্ষর রামায়ণ : রামভদ্র বাহিলে।।
শ্রীরামাচ্যা নামে তাপ : নাশে ভঙ্গে সারা তাপ।
ঐসা অন্যত্র প্রতাপ : কোণাহী মন্ত্রী নসে।।
(মোরোপন্ত. ঘনাক্ষর রামায়ণ)

এটিও গেয় কাব্যের ছন্দ। কেউ কেউ মনে করেন এই ছন্দ উত্তর ভারত থেকে মহারাষ্ট্রে গিয়েছে। তবে তার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই।

আর্যা (গীতি)

প্রাকৃত অপভ্রংশব গাথা নামক ছন্দ থেকে মারাঠী আর্যা বা গীতি ছন্দের উদ্ভব। গাথা ছন্দ প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্রে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কীর্তন-রচয়িতা কবিরা এই ছন্দটির বহুল প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে মোরোপন্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এটি মৃদঙ্গ বা তবলার ঠেকাসহযোগে গেয় ছন্দ।

প্রকটী প্রথম ভগীরথ নৃপ লোকী সুরনদী সতী আর্যা।
তসি হে ময়ূর নাহী তরি সর্বালা ন দীসতী আর্যা।। (মোরোপন্ত, নামসুধাচপক)

দিন্ডী-প্রাকদিন্ডা

দিন্ডী মারাঠীর একটি বিশেষ প্রচলিত ছন্দ। করুণরস সৃষ্টিতে বা শান্ত-গম্ভীর বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য কীর্তনে এবং নাটকে দিন্ডীর ব্যাপক প্রযোগ ছিল। আধুনিক কালেও ছন্দটি বিশেষ জনপ্রিয়।

দিন্ডীর লক্ষণ নির্দেশ করে মাধবরাও পটবর্ধন বলেছেন, দোন ব্রীড়া (⏑ - - -) কিংবা পুষ্প (- - - -) য়া গণাচ্যা মধ্যে এক 'র' গণ বা 'ত' গণ ঘাতল্যানে দিন্ডীচা চরণ সিদ্ধ হোতো।

দিন্ডী গেয় ছন্দ। দাদরার মতো ৬ মাত্রার তালে আবৃত্ত হয়।

- ⏑ - - - - - - ⏑
ধু ন্দ ঝা লা তু - ঝা দর-বার।।
পুপ্য বস্ত পাতাল লোকি নেলা

দরিদ্রী তো ভাগ্য বস্ত কেলা

চোর ঠ্যাচা বহু মান বাঢ়বীলা

কীর্তি বানাচা অপমান কেলা।। (জনাবাঈ)

আখ্যানকাব্যে প্রযুক্ত দিন্ডীকে না. গ. জোগী তাঁর তুলনাত্মক ছন্দোরচনা গ্রন্থে প্রাকদিন্ডী বলে উল্লেখ করেছেন।

নক্র বোলে ঐ কে হৃষী-কেশী।
নাম-মাত্রে তা-রিলে গজে-ন্দ্রাসী
কায় কৃপে জা হলে মজ বীশী

অতা কৈসা বা মোকল্নি জাসী।। (বিষ্ণুদাস নামা, নক্রউদ্ধার)

ধবল

প্রাচীনকালে বিবাহসম্পর্কিত গীত ধবল গীত নামে পরিচিত ছিল। লোকগীতের এই ছন্দ ত্রয়োদশ শতকের মহানুভব সম্প্রদায়ভুক্ত কবি মহদম্বা তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেন। লিখিত সাহিত্যে এটিই ছন্দটির প্রথম প্রয়োগ। তার পরে অবশ্য অনেকেই প্রয়োগ করেছেন। ছন্দটির সম্পর্কে হেমচন্দ্র সোমেশ্বর শার্ঙ্গধরের পরিচয় ছিল। সে অর্থে এটিকে নতুন বলা যায় না। বিলম্বিত লয়ের চতুষ্পদী এই গীতের প্রথম দুই পর্ব লঘু এবং শেষ দুই পর্ব দীর্ঘ।

শ্রী সর্বেশ্ব-রাচে সীরী ধরুনিয়া চরণ
মগ ধব লী গাঈন গোবিন্দু রা ণা
জেণে রুক্মিণী হরীয়েলী ।। তেণে পবাডে ।। কেলে অতি বহুত
পাবিজে পর মাগতি ভক্তী ।। আইকতা ।। কৃষ্ণচরিত্র
জয় জয় শ্রী প্রভু গোবিন্দা (মহদয়া)

প্রসিদ্ধ কন্নড় সাহিত্যিক দ. রা. বেন্দ্রে মনে করেন মহদম্বার ধবলে ছন্দের মূলে আছে দ্রাবিড়ের অক্কব জাতীয় ছন্দ। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কারণ এই ছন্দটি গুজরাতিতে 'ধোল' নামে বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে।

সাকী

সাকী ছন্দ মারাঠীর নিজস্ব নয়। গ্রন্থসাহেবে এবং কবীরের রচনায় 'সাখ্যা' নামে পদ্যপ্রকার দেখা যায়। বিলম্বিত লয়ের দোহাকে গুজরাতিতে বলে সাকী। মারাঠীতে অবশ্য এ ছন্দকে অর্বাচীনকালের বলা যাবে না। রামদাসের 'দাসবোধ' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

প্রাকৃত-অপভ্রংশে দুবঈ নামে দ্বিপদী রচনা প্রচলিত ছিল। ২৮ মাত্রার সেই দুবঈ ছন্দ আর মারাঠীর সাকী অভিন্ন। জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন' ইত্যাদি পদটির ছন্দোরীতির সঙ্গে সাকীর গঠনরীতির মিল আছে। এই কারণে ছান্দসিক পটবর্ধন তাঁর ছন্দোরচনা গ্রন্থে এই ছন্দটিকে লবঙ্গলতা নামে অভিহিত করেছেন। নাটকে এই ছন্দের ব্যবহার বেশি।

ভাবে ' সদ্যশ রামা' চে' । গাবে ' জগদভিরামা' চে' ।।
শ্রী রঘুবংশী 'ব্রহ্মপ্রার্থিত ' লক্ষ্মীপতি অব ' তরলা' ।
বিশ্বসহিত জ্যা ' চ্যা জনকতে ' কৌসল্যাধব 'তরলা '। (মোরোপন্ত, মন্ত্রগর্ভরামায়ণ)

পোবাড়া-লাবণি

পোবাড়া এবং লাবণি-কে কেউ কেউ বিশিষ্ট ছন্দের দৃষ্টান্ত রূপে আলোচনা করেছেন। না. গ. জোশী তাঁর তিনখানি বইতেই এই দুই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পোবাড়া বা লাবণি কোন ছন্দের নাম নয়—বিশেষ আখ্যানগীতরূপের নাম।

পোবাড়া হল বীরগাথা। এর বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। শিবাজীর আমলে এই কাব্যটির উদ্ভব। কাব্যরূপ বললেও পোবাড়া আসলে গেয় কাব্য। বাংলার মঙ্গলকাব্যের মতো তারও নিজস্ব গায়নরীতি আছে। কিছু নির্দিষ্ট বিশেষত্ব আছে। তাসত্ত্বেও এই রচনা তাল-লয়ের বিশিষ্টতা ও গায়নভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যকে স্বতন্ত্র ছন্দ বলে নির্দেশ করা যায় না।

লাবণি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। লাবণির উদ্ভব সেনাশিবিরে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য। এর বিষয়বস্তু লঘু উপস্থাপনারীতি তরল, সুর-লয় চটুল। লাবণি ছন্দ নামকরণ সেই কারণে

সমর্থনযোগ্য নয়।

চূর্ণক-লয়বদ্ধ মুক্তগদ্য

ভরত গদ্যকে বলেছেন চূর্ণ (নাট্যশাস্ত্র ১৫। ৩৫)। পরে টীকাকে বলা হতে লাগল চূর্ণী। আরো পরে বিশিষ্ট প্রকারের গদ্যরচনার নাম দাঁড়াল চূর্ণক। অকঠোরাক্ষরং স্বল্পসমাসং চূর্ণকং বিদুঃ তত্ত্ববৈদর্ভরীতিস্থং গদ্যং হৃদ্যতরং ভবেৎ (গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞ্জরী ৭।৩)।

মারাঠী গদ্যের জন্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। গদ্যের সেই আদিপর্বেই ছন্দোময়তা ফুটে উঠেছে। মহানুভব সম্প্রদায়ভুক্ত মহাইমভট সংগৃহীত সিদ্ধান্তসূত্রপাঠের গদ্যে পদ্যের বৈশিষ্ট্যই যেন প্রকাশ পেয়েছে।

সম্বন্ধী বিকারু : বিকারী রসু রসী অভিমুক্ষু : সেবানিবৃত্তী।। ৩ ।।
পুরুষু জবজবু পলে : তবতবু বিষো পাঠী লাগে :
পুরুষু জবজবু পাঠী লাগে : তবতবু বিষো পলে।। ১৯ ।।
তুষ্টলা জনু তরি বিষো সম্পাদৈলু : রুসৈলা তরী আণা ঘাতৈলু:
মহণওনি উভয়তা জনু : সম্বন্ধু ত্যাজ্য ।। ২০ ।। (আচারপ্রকরণ, প্রারম্ভসূত্র)

উদ্ধৃতিটিতে প্রথম ছত্রটিতে গেয় ওবীর লক্ষণ আছে। পরের দুই ছত্রে গ্রান্থিক ওবীর আন্দোলিত গতি আছে। সূত্রসাহিত্যের এটি একটি বিশিষ্ট শৈলী।

ষোড়শ শতাব্দীর একনাথের রচনাতেও মুক্তশৈলীর গদ্য পাওয়া যায়:

অর্জদাস্ত : অর্জদার ' বন্দগী বন্ : দেনবাজ ।।
অলেকম সালাম সাহেবাচে সেবেসী : বন্দে শ : রীরকার।।
জিবাজী : শেখদার ' বুধাজী কারকুন '' পরগণে শ : রীরাবাদ ।।
(একনাথ-গাথা ২৪৭৬)

ওই শতাব্দীর দাসোপন্তের লেখাতেও এই জাতীয় গুণ লক্ষ্য করা যায়:

ত্রিভুবন পরিপূ- . জিতু পরমেশু : শ্রীষ্টীবিস্তারি-: তা রবিশ শি ত্রি-: নেত্রু।।
অনসূয়াত্মজ : দত্তু কৃষ্ণ তনু : দেও।
স্বজনগতভয় : কারণামমরি জো :
সুররাজু : অবধৃতগুণী গোবিতু ।

এই গদ্যে মৃদঙ্গের বোলের উপযোগী করে শব্দযোজনা করা হয়েছে। এজন্য এই রীতির মধ্যে সঙ্গীতের তাল লয় প্রচ্ছন্ন আছে।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে লয়বদ্ধ গদ্যরীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। আনন্দতনয়, রঘুনাথ পন্ডিত, অমৃতরায়, নিরঞ্জনমাধব, বিনায়ক, ব্রহ্মগিরিকর প্রভৃতির রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত :

সকলভুবনললামায়মানা।
মানাধিক : -বিভব-ধনিক- : সদন-শত-বিরজি : মানা।।
কলশজনিতমুনি . চকিতজলধিশর : ণাগতি
বিস্তৃত পরিখা : তরীপায়মা : না চন্দ্রশালা : বিজিতসু রবিমা : না।
জিচে সৌধ : গগনমন্ডপা : কার স্তম্ভচি : মানা
লাবিতি জে জল : দা নিজ মানা।

বাসবচাপ জ : য়াস কমানা।।
ঐসী কুন্ডিননামধেয় নগরী : রাজহংসে পাহিলী।।
(রঘুনাথ পন্ডিত, নলদময়ন্তীস্বয়ম্বর)

অমৃতরায়ের ধ্রুবচরিত্র থেকে এই জাতীয় গদ্যের নমুনা :

অসে বাপুনী বরদান : দেশিকে কেলে প্রস্থান : মাগী আঠবী হরিবাপ :
চিণ্ডী সান্ডবী সন্তাপ : অহা ঝালা কৃষ্ণবিয়োগ : ত্যাবিণজাবো জলো ভোগ :
নশ্বর কায় করু : হে ভাগ্য কসে হরপলে?

পান্ডুরঙ্গের পার্থাভিমানকাব্য থেকে উদ্ধৃত নিচের ছত্র দুটিকে গদ্যকবিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে:

চাপাকৃতি শরীর বিলসী ঝগঝগিত বগীত অগ্নী দেখুনি আলা
অতসিকুসুমসমকান্তি ঝাঁকি বিস্মীত আউত্র জেবি নভালা।

৫. আধুনিক কাল

পেশোয়া রাজত্বের সমাপ্তির পর থেকে মারাঠীসাহিত্যে আধুনিক কালের আরম্ভ। এই যুগের সূচনায় অনেক নাটক কাব্য-কবিতা লেখা হয়েছে। তবে নাটকের পদ্যে প্রাচীন ছন্দোরীতি অনুসৃত হয়েছে। এই যুগসন্ধিকালে যাঁবা আখ্যানকাব্য লিখেছেন তাঁরা সংস্কৃত ছন্দই প্রয়োগ করেছেন। ইতিহাস-কথাশ্রিত কাব্যে কিংবা মহাকাব্যেও সংস্কৃতের নানা ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। অনেক কবি পুরনো জাতি ছন্দোরীতির চর্চা করেছেন।

আত্মনিষ্ঠ কবিতা বা গীতিকবিতার জনক কেশবসুত। তাঁর কবিতায় ভাবের ক্ষেত্রে নতুনত্ব থাকলেও ছন্দেব ক্ষেত্রে তিনি পুরনো ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের প্রয়োগ। কখনও কখনও প্রাচীন লৌকিক ছন্দের ব্যবহারও নজরে পড়ে। তাঁর 'ফুলাণ্ঞী পখরং', 'ফুলপাথরু', 'গুলাবাচী কলী' এই তিনটি কবিতা সেই দিক থেকে বিশেয উল্লেখযোগ্য। 'ফুলাণ্ঞী পখরণ' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

টিপ্ ফুলে টিপ্। মাঝে গড়ে গ। টিপ্ ফুলে টিপ্।।
পহা। ফুলাণ্ঞী পখরণ ঝিপ।
কিতি সুখাচী। সকাল
কিতি মৌজেচী হী। বেল
দিশা য়া ফাঁকতী। ফুলে হী ফুলতী। পক্ষী হে বোল্‌তী।
সগর্যাহী। সৃষ্টিনে পহা। নিদ্রা টা-। কিলী
প্রীতি তী। আশে সঙ্গে। খেলায়া লাগলী।
তর । আনন্দে য়া। ঝাড়াখালী। টিপ্ ফুলে টিপ্।

'লা বাঈ লা। বেলাচী পানে মাঝা মহাদেবালা'। —প্রাচীন এই স্ত্রীগীতেব ছন্দ কবিতাটির প্রথম ছত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। ছন্দ বিশ্লেষণের সময় সকলেই এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন। বি স্তু এই আদর্শে সমগ্র কবিতাটি কেউ বিশ্লেষণ করেননি। না. গ. জোশী এই স্তবকের প্রথম ছত্রে দেখেছেন স্বৈরগতি, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ চরমে দেখেছেন অচলগতি, পঞ্চমে পাদাকুলক, ষষ্ঠে সমুদিত, সপ্তমে খন্ডিত সমুদিত এবং অষ্টমে বৃদ্ধ শুভগঙ্গা ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

এই কালে অন্যান্য কবিরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের নব নব বৃত্ত বা প্রকার আবিষ্কারে মন দিয়েছেন। সেইসব বৃত্তগুলির নতুন নামকরণও হয়েছে। এই প্রচেষ্টা মধ্যযুগেও ছিল তা আমরা আগেই বলেছি।

ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে নতুন কাব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন ছন্দের প্রচলন ঘটেছিল। যেমন সুনীত (সনেট), নির্যমক ছন্দ (অমিত্রাক্ষর), সহজকাব্য-মুক্তছন্দ, মুক্তশৈলী।

সুনীত(সনেট)

মারাঠীতে পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীরীয় উভয় রীতির সনেটের প্রচলন হয়েছিল কেশবসুতের আমলেই। মাধব জুলিয়ন (ছান্দসিক মাধবরাও পটবর্ধনের ছদ্মনাম)-ও বহু সনেট রচনা করেছেন। বৃত্ত নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর শার্দূলবিক্রীড়িতই সনেটের ছন্দ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই কবিতাপ্রকারটি মারাঠীতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি।

উল্লেখনীয় যে মারাঠী কবি ল. বি. পরলকর মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন 'শ্রীমধুসূদন দত্ত' নামক সনেটে:

নাগরিকতা প্রতাপ থোব তুঝা বঙ্গ- ক
কবিগুরো। ধীর করে যমকশৃঙ্খলা খ
তোড়ুনিয়া সোড়বি বঙ্গ কবিতাঙ্গ- ক
নেস। সজবুনি রম্য আদরে তিলা খ

নির্যমক ছন্দ (অমিত্রাক্ষর)

মারাঠীতে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুবাদ হয়েছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে। অনুবাদক পয়ারের মূল কাঠামোটি বজায় রেখে মারাঠী ছন্দে প্রবহমানতা এনেছিলেন:

আরোহুনী পুষ্পকান্ত নিধে রক্ষোরাজ
ঘুমে ঘোব নাদ রথচক্রী উড়তাতী
ঠিণগ্যা তেজস্বী অশ্ব খিকাড়ে উল্লাসে। (সপ্তম সর্গ)

অমিত্রাক্ষরের আদর্শে বিনায়ক সাভারকর নির্মাণ করেন বৈনায়কবৃত্ত। এটিও পয়ারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এতে প্রবহমানতা আছে। সাভারকরের গোমান্তক কাব্য থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হল।

তুর-কাণ সর্প তো
' ঝোড়ুনিয়া তোড়ুনিয়া মচবুনিয়া তে
বিষ দুর্ধর টাকণ্যাতচী স্বশক্তি ' চা
' ব্যয় করণে অদ্যাবধি ' ভাগ জাহ- লে
। বিশ্বনাট- । কাস্তিল য়া । দৃশ্য কোণ ।- তে
। আগামী । অঙকাচে । তে ন কবন-। হী
। কথু শকেল । সিশ্চিততঃ । আজ ..

না. গ. জোশী ছাড়া আর কেউ এই ছন্দ প্রয়োগ করেননি। জোশীর জীবনযোগ এবং বিশ্বমানব নামে দুটি কাব্যে এই ছন্দের প্রয়োগ আছে। উঃশাপ নামে একটি নাটকে এই ছন্দটির প্রয়োগ হয়েছে। না. গ. জোশীর বিশ্বমানব কাব্যের অন্তর্গত 'লুসী' কবিতাটি এই ছন্দে লেখা। কবি স্বয়ং এর

কবিতার ছন্দ গদ্যছন্দ। তিনি প্রথমে এ ছন্দের 'সহজ কাব্য' নামটি মেনে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর 'দোলা' কবিতাসংগ্রহে ছন্দটিকে বৈতালিক পদ্য নামে চিহ্নিত করেন। বামন নারায়ণ দেশপান্ডে এই ছন্দ আগেই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর 'অনামিকা' কাব্যে তিনি এটিকে বলেছেন মুক্তশৈলী। আবার 'কোরকু' কাব্যের প্রস্তাবনায় তিনি একে বলেছেন মুক্ত ওবী।

মারাঠীতে গদ্যছন্দে অনেক গীত রচিত হয়েছে। কুসুমাগ্রজের 'সমিধা', কান্তি বুধে-র 'হিমসাগর', ডা. পুরবারের 'ভাবপুষ্পাঞ্জলি' ইত্যাদি কাব্য গদ্যচ্ছন্দে লেখা।

মনমোহন নাতু আধুনিক কালের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর গদ্যকবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হল।

একা প্রচন্ড গ্রন্থশালেচা পুতলা করূন
মী একলব্যাসারখা জ্ঞান মিলবু লাগলো।
তী ভক্তি হোতী .. পরন্তু অখের
ত্যা পুতল্যাতূন .
তো পুতলা কড়াড়া ফোড়ুন
অনেক নাবসিংহ বাহেব পড়লে ভুকেলেলে।

উপসংহার

প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের মারাঠী কবিদের রচনার ছন্দ আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল কবিদের অস্বাভাবিক ঐতিহ্যপ্রীতি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের প্রতি তাঁদের আনুগত্য অসাধারণ। শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি অত্যধিক আনুগত্যের জন্যই মারাঠী ছন্দের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়েছে এমন কথা বলা যেতে পারে। মাবাঠী ছান্দসিকেরা অবশ্য এই বিষয়ে একমত হবেন না। কাবণ মাবাঠী ছন্দের বিকাশ আলোচনাব ক্ষেত্রে তাঁরা শাস্ত্রনির্ধারিত পথই অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে চিন্তা কবেননি। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় নিজ নিজ মৌলিক ছন্দ বিকশিত হয়েছে। কিন্তু মারাঠীতে কেন তা হয়নি তা চিন্তাব বিষয়। মারাঠীতে কবিতার ওপর গান ও তালের প্রভাব বেশি ছিল, অর্থাৎ মারাঠী পদ্যবচনা প্রধানত গেয় ছিল বলে প্রাদেশিক ছন্দোরূপ বিকশিত হয়নি, এমন অনুমান সম্ভবত যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাব কাবণ মধ্যযুগে সব ভাষার রচনাই মুখ্যত গেয ছিল। বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তুলনা এক্ষেত্রে সহজেই মনে আসে। মধ্য বাংলায় প্রায় সবই ছিল গেয় রচনা। তা সত্ত্বেও বাংলার নিজস্ব ছন্দোরূপের জন্ম হয়েছিল সেই সময়েই। অথচ মারাঠীতে ঠিকধারায় বিবর্তন ঘটেনি। মারাঠী কবিদের রক্ষণশীলতা তার অন্যতম কারণ।

সহায়ক গ্রন্থ

গো. বী. খাসগীবালে : মরাঠী ছন্দ: শাস্ত্র
না গ. জোশী . মরাঠী ছন্দোরচনা
মরাঠী ছন্দোরচনেচা বিকাস
: তুলনাত্মক ছন্দোরচনা
বি. কা. বাজবাড়ে : মরাঠী ছন্দ
বি. জ. সরস্রবুদ্ধে : পদ্যমীমাংসা
মাধবরাও পটবর্ধন : ছন্দোরচনা
: পদ্যপ্রকাশ

বাংলা ছন্দ-আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রের ভূমিকা

নীলরতন সেন

ভারতে ছন্দচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রী. পূ. ৬০০-২০০ অব্দের মধ্যে রচিত বেদাঙ্গের ছয়টি মুখ্য ভাগের মধ্যে ছন্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। হলায়ুধ (আ. ৯৫০ খ্রী) বেদাঙ্গ ছন্দসূত্রের টীকা লিখেছিলেন। হেমচন্দ্র খ্রী. দ্বাদশ শতকে 'ছন্দানুশাসন' এবং কেদারভট্ট খ্রী. চতুর্দশ শতকে 'বৃত্তরত্নাকব' লিখেছিলেন। কালিদাস (মতান্তরে বররুচি)-বচিত 'শ্রুতবোধে' সংস্কৃত ছন্দের প্রাথমিক সূত্রগুলি পাওয়া যায়। পিঙ্গলের 'ছন্দসূত্রে'ও সংস্কৃত ছন্দেব বিশদ আলোচনা রয়েছে। পিঙ্গলের নামে সুপ্রচলিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্'-এ প্রাকৃত ছন্দের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এ-গ্রন্থটি সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের (খ্রী. চতুর্দশ শতক ?) রচনা। এই ধারার সর্বাধুনিক গ্রন্থ 'ছন্দোমঞ্জরী' সম্ভবতঃ খ্রী চতুর্দশ শতকে কবি-ছান্দসিক গঙ্গাদাস বচনা করেছিলেন। এগুলি ছাড়াও সংস্কৃতে আরও বেশ কিছু ছন্দগ্রন্থের নাম পরবর্তী ছান্দসিকেরা উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক শ্রীরাধাদামোদর প্রভু-রচিত ' ছন্দঃকৌস্তুভ' গ্রন্থটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আদর্শ ছন্দগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

বাংলায় ছন্দ আলোচনায় সূত্রপাত করেন বৈষ্ণব কবি-ছান্দসিক নরহরি চক্রবর্তী, ওরফে ঘনশ্যাম দাস। তিনি সম্ভবতঃ খ্রী. সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে 'ছন্দঃসমুদ্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে গ্রন্থে তিনি বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তচন্দ্রিকা, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ প্রভৃতি পূর্বসূরীগণ-রচিত ছন্দগ্রন্থ থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন। সেখানে এই আলোচনায় তিনি বাংলা ভাষাই ব্যবহার করেছেন এবং মুখ্যতঃ ছন্দবদ্ধ পয়ারে সূত্রগুলি রচনা করেছেন।[১]

বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন একজন অক্সফোর্ডে সুশিক্ষিত ইংরেজ অনুবাদক, নাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)। ইংরেজিতে লেখা তার *A Grammar of The Bengal Language* গ্রন্থটি খ্রী. ১৭৭৭-৭৮ -এ চার্লস্ উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬)-কর্তৃক হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে (Of Orthoepy and Versification) লেখক কিছুটা স্বাধীনভাবে বাংলা পদ্যছন্দের বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন। বাংলা ছন্দ যে অনেকাংশে প্রস্বর বা accent দ্বারা নির্ণীত হয় এবং সেখানে ছন্দের তাগিদে যে অনেক শব্দের সংক্ষেপীকরণ ঘটে (যেমন করিলাম > কৈলাম, না পারি > নারি, নহে > নয় ইত্যাদি), আবার ছন্দের তাগিদে যে অনেক সময় ক(নাহিক), ত(তোমারেত), হ(করহ), এ(কহিয়ে) ইত্যাদি বর্ণ শব্দের শেষে যুক্ত হয়, এই ধরনের নানা উচ্চারণবৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। তবে বৈদিক ও সংস্কৃত

ছন্দের রূপগুলি (অনুষ্টুভ, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী, শর্করী ইত্যাদি) আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে বাংলা কবিতার ছন্দ বিচার করতে গিয়ে তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। বাংলা চোদ্দ মাত্রার পয়ারকে তিনি সঙ্গতভাবেই heroic measure বলে গণ্য করেছেন। তিনি তৎকাল প্রচলিত তোটক, একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী(৬।৬।৮). চৌপদী (৬।৬।৬।৫)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পাশাপাশি গানের রাগ-রাগিণী, লয়, ধুয়া, তাল ইত্যাদিরও উল্লেখ করেছেন। তখন পদ্য সুর-সহযোগে পড়া হত বলেই সম্ভবতঃ গানের প্রসঙ্গ তুলেছেন।

এর অর্ধশতাব্দীকাল পরে বাংলা পদ্যের ছন্দ আলোচনায় সঠিক উচ্চারণ-পথের সন্ধান করেন রামমোহন রায় (খ্রী. ১৭৭৪-১৮৩৩), তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) গ্রন্থে। "ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু-গুরুভেদে আনুপূর্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়।" 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র 'ছন্দঃ' অধ্যায়ের এই সূচনাবাক্যটি দ্বারাই বাংলা ছন্দ আলোচনার যথার্থ সূত্রপাত হয়েছিল। রামমোহন লিখিত বর্ণ বা letter এবং উচ্চারিত 'দল' বা syllable-এর পার্থক্য ধরতে পেরে সিলেব্‌ল্‌কে 'ধ্বন্যাঘাত' নাম দিয়েছিলেন। তিনি 'মাত্রা' বা 'ধ্বনি'-পরিমাপের একক অর্থে 'অক্ষর' এবং পদ্য-পংক্তিকে 'চরণ' নামে অভিহিত করেন। 'পদ' বা Ceasuric unit-কে 'চরণের বিভাগ' নাম দেন। রামমোহন দল বা syllable এবং কলা বা time-unit-এর পার্থক্য ধরতে পেরেছিলেন। 'পয়ারের' সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে।"

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
রাজা বলে গোসাই বাসায় আজি চল
১ ২ ৩ ৪ ৫৬৭৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ডাক্ হাক ঢাক্ ঢোল্ মাল্ সাট্ সার্।
১২৩ ৪৫ ৬৭ ৮৯ ১০ ১১ ১২
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার।[৫]

বাংলা ছন্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণলিপি যে মাত্রা-একক নয় সেটা রামমোহন ধরতে পেরেছিলেন। তবে বাংলায় যে সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণ চলে না একথা সঠিকভাবে ধরতে পারেননি বলেই বাংলা কবিতার ছন্দ মেলাতে না পেরে একটু বিরক্তির সঙ্গে লিখেছিলেন,

> "গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য আছে, সুতরাং ইহার ছন্দপ্রকরণ জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, এই নিমিত্ত কেবল যে দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূরি ব্যবহার্য হয় তাহাই এ স্থানে লিখিলাম।"[৬]

তিনিও হ্যালহেড-এর মতো পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ও তোটকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লক্ষ করা যাবে, মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের কাব্যে অনেক সময় এই ছন্দোবন্ধগুলির নামোল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং সাহিত্য-ইতিহাসের লেখকগণ প্রায় সকলেই প্রাসঙ্গিকভাবে ছন্দের আলোচনা করেছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও (১৮১২-৫৯) ছন্দের বিভিন্ন রূপ বা প্যাটার্ন নিয়ে সচেতনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।—প্রয়োজনমতো বিভিন্ন প্যাটার্নের নতুন নতুন নামকরণও করেছেন। মনে হয়, সচেতনভাবে না হলেও, তিনি বাংলা মুখ্য তিন ছন্দোরীতির

পার্থক্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এরপর দেখা যাচ্ছে, বাংলা কাব্যছন্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। তিনি সচেতনভাবেই ইংরেজি ব্ল্যাঙ্কভার্সের আদর্শে বাংলা 'অমিত্রাক্ষর' রচনায় প্রয়াসী হলেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে 'চতুর্দশপদী' সনেট ওড্ এবং অটাভারিমা প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনের পরীক্ষা করলেন। তিনিও চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত পয়ারকে Heroic Verse রচনার উপযোগী ছন্দ বলে গণ্য করেছেন। কবির প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, এই বাংলা কাব্যছন্দ নিয়ে নতুন পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি রঙ্গলাল, রাজনারায়ণ, গৌরদাস, কেশবচন্দ্র (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনাও করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর অমিত্রাক্ষরে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথমাংশ যখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৮৬০, নভেম্বর) প্রকাশ করেন, সেখানে ভূমিকা স্বরূপ লিখেছিলেন,—

> "যাহারা ইংরাজি ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিলটন কবিকৃত 'পারাডাইস লস্ট' নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহা পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া কাব্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ যে প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার বিরামচিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।"[৪]

এখানে দেখা যাবে, রাজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর পয়ারের ভাবযতি ও ছন্দযতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিত্রাক্ষর পয়ারের সঙ্গে তার পঠনগত পার্থক্য সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন।

১৮৬৭-তে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একটি ভূমিকা (সম্ভবত মধুসূদনের আগ্রহেই) লেখেন। তিনি মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরের কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেন। মধুসূদন অনেক সময় বিজোড় মাত্রায় ভাবযতি দিয়েছেন : তাতে 'পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ' ঘটে বলে তাঁর মনে হয়েছে।—এ আলোচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে কিছু মৌলিক চিন্তা প্রকাশ পেলেও বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে কবির ভাবনা কিছু প্রকাশ পায়নি। এই যুগেই লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫-১৯১৬) তাঁর 'কাব্যনির্ণয়ে' (১৮৬২), রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২)-এ, ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (১৮২৪-৯৫) তাঁর 'ছন্দঃকুসুম'-এর বিজ্ঞাপনে (১৮৬৪), বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০) তাঁর 'কর্ণার্জুন' কাব্যের ভূমিকায় (১৮৭৫) বাংলা ছন্দ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছেন। হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার'-এর ভূমিকাতেও ছন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) তাঁর 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তকে'র (১৮৭৮) ভূমিকায় গদ্যকবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, 'বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন কবির কবিতাপুস্তকের সমালোচনায় অনেকসময় প্রাসঙ্গিকভাবে ছন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) তাঁর মুক্তক-সংলাপে লেখা 'হরধনুভঙ্গ' নাটকের (১৮৮২) ভূমিকায় অমিত্রাক্ষর-সংলাপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি 'পদ্যপৌঙক্তিক পদ্য-গদ্য' নাম দিয়ে ১৮৮৪-তে 'বর্ষার মেঘ' নামে একটি ছোট গদ্যকবিতা প্রকাশ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন,—

যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে সেই সকল গদ্যের কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন?

[আর্যদর্শন, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ ১৭৫-পাদটীকা]

গিরিশচন্দ্র ঘোষও (১৮৪৪-১৯১৩) মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ প্রকাশের সময় (১৮৮৫) 'প্রস্তাবনা' অংশ মিশ্রবৃত্ত ত্রৈপদী ছন্দে যে মন্তব্য করেন সেটিও ছন্দ আলোচনার পর্যায়ে পড়ে। যেমন

তুলিয়া গভীব তান, মধুর মধুর গান
গদ্য-পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু,
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি-বিভাগের হেতু।

[মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ)-এর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা]

এই পটভূমিতে, প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে হলেও বাংলা কবিতার ছন্দ বিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী (১৮৭৭) এবং সাধনা (১৮৯১)-এর পৃষ্ঠায় তার কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার বিশদ পরিচয় প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পাদনা-সূত্রে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, এই আলোচনার সূত্রপাত ১৮৮৪-তে, আর পরিসমাপ্তি ১৯৩৯-এ। অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তিনি বাংলা ছন্দের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন। কখনো পুস্তক সমালোচনা সূত্রে, কখনো ছন্দজিজ্ঞাসুদের সঙ্গে পত্রালাপে, কখনো বা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হিসাব রচিত আলোচনায তাঁব মতামতগুলি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দীর্ঘ ৫৫ বছরের ছন্দ-আলোচনাকে মোটামুটি তিন পর্বে ভাগ কলা যেতে পারে। প্রথম পর্বে(১৮৮৪-১৯১২) অন্য লেখকের কাব্য-সমালোচনার সূত্রে বা নিজের রচিত কবিতার ভূমিকা হিসাবে রামপ্রসাদী ছন্দের স্বাভাবিক চাল, ছন্দে যুক্তাক্ষরের গুরুত্ব, সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের উচ্চারণগত পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে (১৯১৪-২৫) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনের (১৮৫২-১৯২০) সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ছন্দের উচ্চারণ প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। কলাবৃত্তকে সংস্কৃতভাঙা ছন্দ, মিশ্রবৃত্তকে সাধুভাষার (পয়ারাঙ্গের) ছন্দ এবং দলবৃত্তকে প্রাকৃত বাংলার (বা চলিত বাংলার বা ছড়ার) ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন। যতি-বিভাগে 'সম-অসম-বিষম' শব্দবিন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ছন্দযতির চালকে তিনি দুমাত্রা (সম), তিনমাত্রা (অসম) এবং দুই-তিন মাত্রার মিশ্রণে (বিষম) বোঝাতে চেয়েছেন। ছন্দের লঘু যতিকে 'চাল' এবং দীর্ঘযতিকে 'চলন' বলেছেন। মিশ্রবৃত্ত (তাঁর ভাষায় পয়ারাঙ্গের ছন্দে) যে ধ্বনির বিশেষ শোষণশক্তি রয়েছে সে বিষয়ে পাঠককে অবহিত করেছেন। তৃতীয় পর্বে (১৯৩২-৩৯) কবি কয়েকজন তরুণ ছান্দসিকের সঙ্গে ছন্দবিতর্কে উৎসাহ বোধ করেন। তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) এবং অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-৮৩) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় তিনি ছন্দে রুদ্ধদলের ভূমিকা, বাংলা মুখ্য তিন ছন্দ-রীতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, এবং বাংলা ছন্দের যতিবৈচিত্র্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য বা ইংরেজি ছন্দের প্রস্বর-অপ্রস্বরের তরঙ্গভঙ্গ বাংলা উচ্চারণে নেই। যুক্তবর্ণের

ব্যবহার দ্বারা এই বৈচিত্র্যের অভাব আংশিক পূরণ করা যেতে পারে, এবং মধুসূদন সচেতনভাবে সে প্রয়াস করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ সে কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃত বাংলা বা ছড়াগানের (রামপ্রসাদী) ছন্দ যে বাংলা কাব্যের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক ছন্দ এ-কথাও এই সময়ে তিনি পুনর্বাব বেশ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন।[৫] দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের কৃত্রিম লঘু-গুরু উচ্চারণ বাংলায় কতটা কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়েও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। এই তৃতীয় পর্বে কবি পূর্ববর্তী দুই পর্যায়ে ছন্দ নিয়ে যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন তার রচনার সঙ্গে গদ্যকবিতার ছন্দ নিয়েও কিছু মৌলিক বক্তব্য পেশ করলেন।[৬] —কখনো প্রবন্ধের আকারে, কখনো বা জিজ্ঞাসুদের কাছে লেখা পত্রের আকারে, বা মৌখিক আলোচনা-সূত্রে। এমনকি দু'একটি গদ্যকবিতায়ও কৈফিয়ৎ হিসেবে। গদ্যকবিতার ছন্দ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ রায় উনিশ শতকেই প্রাথমিক পরীক্ষা করলেও এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রথম যুগের কোনো কোনো রচনায় এ-ছন্দের অস্ফুট সূচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় পর্বেই বেশ কিছু কবিতায় এর সুষ্ঠু প্রয়োগ করলেন এবং সুনিরূপিত আঙ্কিক মাত্রা-বিন্যাসের বাইরেও ছোট-বড়ো বাক্‌পর্বে যে ভাবাশ্রয়ী ছন্দের দোলা সৃষ্টি সম্ভব সেটা দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করে বোঝাতে প্রয়াসী হলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় গদ্য-কবিতার ছন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এ-ছন্দের নিয়ম-রীতি নিয়ে পরবর্তী ছান্দসিক ও ছন্দ-জিজ্ঞাসুরাও কিছু কিছু আলোচনা (অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়তই) করেছেন। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠিক অন্য ছান্দসিকদের মতো বাংলা ছন্দের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মসূত্র তৈরি না করলেও, ছন্দ-আলোচনার অনেকগুলি চাবিকাঠি পরবর্তী-ছান্দসিকদের হাতে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া, তিনি যখন ছন্দ নিয়ে আলোচনা সুরু করেন তখনো এমন একটি আঙ্গিক-প্রধান বিষয় সম্পর্কে লেখার উপযোগী ভাষারও বিশেষ অভাব ছিল। তাঁকে সেই ভাষা তৈরি করতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচনা-সূত্রে কিছু ছন্দ-পরিভাষাও তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, অক্ষর, স্বর (লঘু ও গুরু), মাত্রা, ধ্বনি, ঝোঁক, সম-অসম-বিষম মাত্রক শব্দাবলী, তিনমাত্রার ছন্দ, চাল-চলন, ছত্র, হসন্তধ্বনি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে রচিত ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে ১৯৩৬-এ 'ছন্দ' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করেন তরুণ ছন্দজিজ্ঞাসু কবিগায়ক দিলীপকুমার রায়কে। 'বিজ্ঞপ্তি'তে প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে বাংলা ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে, প্রবোধচন্দ্র সেনের সম্পাদনায়। এখন পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্রের সম্পাদনায় এ-গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনার প্রথম পর্যায়েই ১৯১৮-তে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) 'বাংলা ছন্দ' নামক একটি রূপকাশ্রয়ী রচনা 'বিচিত্রা ক্লাবে' পঠিত হয়। সেটি দু'মাস বাদে 'ভারতী'-পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩২৫) 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে প্রকাশিত হয়। ছন্দ-সরস্বতীকে কবি তাঁর কৈশোর থেকে পরিণত যৌবন পর্যন্ত পরপর পাঁচবার পঞ্চমূর্তিতে, পাঁচটি কাব্য-বাহনে, পাঁচ প্রকার চলন ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম আবির্ভাব কবির কৈশোরে "আদ্যাশ্রী মূর্তি -মকরাঙ্গী-ডিঙ্গাবাহন-গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি"তে। এ অংশে তিনি চর্যাপদ থেকে বিহারীলালের কবিতা পর্যন্ত বাংলা কবিতার, মিশ্রবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদী আশ্রয়ী, বিবর্তনধারাটি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ছন্দসরস্বতীর দ্বিতীয় আবির্ভাব "আদ্যাশ্রী মূর্তি-মঞ্জুমবাল বাহন-গঙ্গাযমুনা পদ্ধতিতে"। এখানে কবি কলাবৃত্তের উচ্চারণ-রহস্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। ছন্দ সরস্বতীর তৃতীয় আবির্ভাব "চিত্তশ্রী মূর্তি

- মত্তময়ূর বাহন - ঝর্ণাঝামর পদ্ধতিতে।'' এখানে কবি লৌকিক দলবৃত্তের মেজাজটা ধরতে চেষ্টা করেছেন। কবির ভাষায় এটি হল 'শব্দ-পাপড়ি গোনা ছন্দ'। ছন্দসরস্বতীর চতুর্থ আবির্ভাব ঘটেছে 'দৃপ্তশ্রী মূর্তি-গগনগরুড় বাহন-বিমানবিহার পদ্ধতিতে''। এখানে কবি সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপায়ণের পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চম আবির্ভাবে ছন্দসরস্বতী ''মঞ্জুশ্রীমূর্তি-বিদ্যুৎ তাঞ্জাম্ বাহন-বুল্‌বুল গুল্‌জার পদ্ধতিতে' দেখা দিয়েছেন। এখানে কবি রুদ্ধ-মুক্ত দল-বিন্যাসের নানা বৈচিত্র্যময় রূপাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। কবি-বর্ণিত 'ছন্দ-সরস্বতী'র প্রথম তিনটি মূর্তির মাধ্যমেই বাংলা ছন্দের মৌলিক তিনটি ছন্দরীতির উচ্চারণ-রহস্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হয়েছে। চতুর্থ বা পঞ্চম মূর্তি দুটি মূলতঃ কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তেরই কিছু বৈচিত্র্যময় প্যাটার্ন বা রূপাদর্শের পরিচয় বহন করে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি প্রকাশের কিছু পূর্বেই, দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাখালরাজ রায় নামক এক অজ্ঞাতনামা ছন্দজিজ্ঞাসু 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' নামে একটি সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি রাণী নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' (নবপর্যায়)-১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪) প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেন,—

> বাংলায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া অর্থাৎ স্বরের উচ্চারণ হউক নাই হউক মোট অক্ষর প্রতি চরণে সমান থাকা চাই, যথা—পয়ার, পূর্বের ত্রিপদী চতুষ্পদী প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকার—মাত্রা গণনা করিয়া। বাঙ্গলার মাত্রা গণনায় সংস্কৃতের সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, বাঙ্গলায় আ, দীর্ঘ-ঈ, দীর্ঘ-ঊ, এ ও,—এই পাঁচ স্বরকে একমাত্রা গণনা করা হয়, সংস্কৃতে এগুলি দুই মাত্রা। বাঙ্গলায় ঐ ঔ যুক্তস্বর বলিয়া দুই মাত্রা এবং সংস্কৃতের ন্যায় বিসর্গ অনুস্বর ও যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণ দুই মাত্রা গণনা করা হয়। আর একপ্রকার ছন্দ খনার বচন, ছেলেভুলান ছড়া, মেয়েলী ছড়ায় আবদ্ধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতায় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় এবং স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন। প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষরমাত্রিক' ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ৩য় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।[৭]

মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী রচনাটি তৈরি করবার সময় রাখালরাজের এই প্রবন্ধটির কথা জানতেন না। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ছন্দচর্চার দ্বিতীয় পর্বে যে তরুণ ছান্দসিকদের সঙ্গে ছন্দ-বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন এবং অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩২৯-পৌষ থেকে ১৩৩০, বৈশাখ) প্রকাশিত হয়। কয়েকমাস বাদেই প্রবাসীতে (১৩৩০ মাঘ-চৈত্র) তাঁর 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে (১৯৩১) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ইংরেজিতে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তবে প্রবোধচন্দ্র বা অমূল্যধনের পূর্ণাঙ্গ ছন্দগ্রন্থ প্রকাশিত হয় আরও কিছুকাল পরে। তার আগেই, ১৯৪০ এপ্রিলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দিলীপকুমারের 'ছান্দসিকী' প্রকাশিত হল।[৮] সেখানে তিনি মুখ্যতঃ

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-বিশ্লেষণরীতি এবং তৎকালীন প্রদত্ত মুখ্য ছন্দ ত্রয়ীর নামগুলিই (মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত) ব্যবহার করেন। দিলীপকুমারের 'ছান্দসিকী'ই সম্ভবত প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছন্দ ব্যাকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-এ। এখানেও তিনি মুখ্যত প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-বিশ্লেষণ রীতি ও পূর্বতন পরিভাষাগুলি অনুসরণ করে, —মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত), স্বরবৃত্ত (দলবৃত্ত) এবং অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত)—মুখ্য এই তিন ছন্দরীতির পরিচয় দেন। সেইসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের (পদযতি-প্রধান) দলবৃত্তকে 'স্বরাক্ষরিক', মুক্তদলের আংশিক গুরু উচ্চারণ সমন্বিত কলাবৃত্তকে 'লঘুগুরু' এবং কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত উভয় রীতিতেই পাঠ্য ছন্দকে 'স্বরমাত্রিক' ছন্দ হিসাবে পরিচিত করেন। বলাবাহুল্য, এই তিনটি ছন্দরীতি আসলে পূর্ব-প্রদত্ত মুখ্য তিন ছন্দরীতিরই অংশীভূত। এছাড়া, তিনি ছন্দজিজ্ঞাসু পাঠকদের কথা মনে রেখে সংস্কৃত এবং ইংরেজি ছন্দের প্রাথমিক নিয়মগুলিও দৃষ্টান্ত-সহ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে দিলীপকুমার প্রবোধচন্দ্রের নবপ্রবর্তিত ছন্দ-পরিভাষার কিছু কিছু গ্রহণ করেন। যেমন সিলেব্‌ল্‌কে 'দল', closed এবং open সিলেব্‌ল্‌কে রুদ্ধ ও মুক্ত দল ইত্যাদি। ১৯৪০-এ প্রকাশিত তাঁর 'ছান্দসিকী'কেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছন্দ ব্যাকরণের মর্যাদা দিতে হয়।

পূর্বেই বলেছি, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাংলা ছন্দের আলোচনা সুরু করেন ১৯৩০-এ, —ইংরেজিতে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির গবেষণাপত্র রচনা-মাধ্যমে। ১৯৩২-এ তিনি 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামে একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি অধিবেশনে।—সেটি তখন 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এক বছর পরে, ১৯৩৩-এ উক্ত প্রবন্ধটি একই নামে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।—আরও সাত বছর পরে, ১৯৪০-এ, এই রচনাটিকে পরিবর্ধিত করে এই এক নামেই একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়; এবং গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যক্রমে টেক্সট্ বা পাঠ্য হিসাবে গণ্য রয়েছে। অমূল্যধনও বাংলা ছন্দের মুখ্য তিন রীতির কথা বলেছেন। তবে উচ্চারণ ভঙ্গির প্রাধান্য দিয়ে মিশ্রবৃত্তকে ধীর লয়ের ছন্দ বা তানপ্রধান ছন্দ (পয়ার জাতীয় ছন্দ), কলাবৃত্তকে বিলম্বিত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ এবং দলবৃত্তকে দ্রুতলয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ (বলপ্রধান ছন্দ) নামকরণ করেছেন। বাংলা ছন্দকে তিনি পর্ব-পর্বাঙ্গের বিন্যাসক্রমে পরিচিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি 'প্রবেশিকা (বস্তুসংক্ষেপে)' নামে ছন্দের মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ৪৫টি সূত্রে ছন্দের জাতিভেদ, রীতি, লয় ও শ্রেণী প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ, বাংলায় ইংরেজি ছন্দ, বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ, পর্ব-পর্বাঙ্গ বিচারের গুরুত্ব, গদ্যের ছন্দ, বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর জটিল বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং তান-ধ্বনি-শ্বাসাঘাত-লয় ইত্যাদির নিরিখে ছন্দের প্রকৃতি বিচারের প্রয়াস ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের কাছে অনেকটা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।*

অমূল্যধনের প্রায় দশ বছর পূর্বে প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দচর্চা সুরু করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ 'বাংলা ছন্দ' এবং 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' প্রবন্ধ দুটি ১৯২২ থেকে ১৯২৪ এর মধ্যে কয়েক কিস্তিতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রমুখ কবি, সমালোচক ও ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁর এই ধ্বনিবিজ্ঞান-

সম্মত ছন্দ আলোচনা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯৩২-৩৫-এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে বিচিত্রা, পরিচয়, উদয়ন প্রভৃতি পত্রিকায় যে ছন্দবিতর্ক জমে ওঠে সেখানে প্রবোধচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দ-বিচারে ব্রতী হন এবং ১৯৩১-এ কবির ৭০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ (২৮পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিশ্লেষণমূলক তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এ, বিশ্বভারতী থেকে।[১০] এ-গ্রন্থটি একাধারে বাংলা ছন্দ ব্যাকরণ এবং রবীন্দ্র-কাব্যছন্দ পরিচায়ক, সুবোধ্য ও সরস ভাষাভঙ্গি তে রচিত। আলোচ্য গ্রন্থের নতুন সংস্করণে (১৯৮৭) প্রবোধচন্দ্র তাঁর সর্বাধুনিক ছন্দ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, গ্রন্থশেষে একটি 'পরিভাষা-কোষ' সংযোজিত করেছেন। ১৯৬৫-তে তাঁর প্রথম ছন্দ ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসাবে 'ছন্দ-পরিক্রমা' প্রকাশিত হয়। এতদিন তিনি বাংলা ছন্দ আলোচনার উপযোগী পরিভাষার সন্ধানে ছিলেন। এই গ্রন্থে প্রথম তিনি মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত (বা যৌগিক) এবং স্বরবৃত্ত, —মুখ্য ছন্দরীতিত্রয়ীর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে সরল কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে কলাবৃত্ত), মিশ্র কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত) এবং দলবৃত্ত —এই নামগুলি প্রবর্তন করলেন। 'কলা' বলতে mora, 'দল' বলতে syllable এবং 'মাত্রা' বলতে তিনি একক বা unit of measure বোঝাতে চেয়েছেন। ছন্দ-ব্যাকরণ সম্পর্কে অবশ্য তিনি তার তিন দশক পূর্বে 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে বিশ্লেষিত মূলসূত্রগুলি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে পরিভাষাগত বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'ছন্দ-পরিক্রমা'কে (পৃ. ১৩৩) তিনি পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-ব্যাকরণ বলতে চাননি। সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬-তে, 'নূতন ছন্দপরিক্রমা' নামে। ইতিমধ্যে, ১৯৭৪-এ 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' নামে তাঁর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁর ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র তাঁর যাবতীয় গদ্য-রচনার একটি তালিকা 'আমার রচনার তালিকা' নামে ১৯৭০-এ প্রকাশ করেছিলেন। আরও পনের বছর বাদে 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা'র পরিশেষে তিনি ১৯২২ থেকে ১৯৮৫ এই দীর্ঘ ৬৪ বছরের মধ্যে প্রকাশিত ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন। তার থেকে জানা যাচ্ছে, এই সময়কালের মধ্যে তাঁর ছন্দ-বিষয়ক ১০৩টি প্রবন্ধ এবং ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পাদনা (১৯৬২, ১৯৭৬) তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি।[১১]

সম্ভবতঃ প্রবোধচন্দ্রই প্রথম 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা ছন্দের সহজতম বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠককে অবহিত করেন। রাখালরাজের প্রবন্ধটি যেমন তখন সত্যেন্দ্রনাথ বা প্রবোধচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তেমনি অধিকাংশ পাঠকেরই গোচরে আসেনি। রাখালরাজের মতো প্রবোধচন্দ্রও, সম্ভবত সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের নাম অনুসরণে বাংলায় মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নামগুলি ব্যবহার করেছিলেন। চতুঃস্বর বা vowel -সংখ্যাত লৌকিক ছড়ার ছন্দের 'স্বরবৃত্ত' নামটিও, স্বতন্ত্রভাবে হলেও, উভয় ছান্দসিকই উদ্ভাবন করেছিলেন। মুখ্য তিন ছন্দ-প্রকৃতির মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতিতেও উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়।

প্রবোধচন্দ্র 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা'য় ছন্দ-ভাবনায় যে পরিণত ফসল পাঠকদের উপহার দিয়েছেন এবং 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' আনন্দ সংস্করণে যে 'পরিভাষা-কোষ' সংযোজন করেছেন, বলা যেতে পারে, এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণের এই দুটিই তাঁর সর্বাধুনিক সংযোজন। ছান্দসিকের সেই আলোচনার বিশদ পরিচয় এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে

কেবলমাত্র বাংলা ছন্দরীতি-বিষয়ক তাঁর মূল সূত্রটি উদ্ধৃত করছি।—

> পদ্যরচনায় মাত্রা বিন্যাসের বিভিন্ন প্রণালীকেই বলা হয় 'রীতি' (style)। বাংলা ছন্দের মূল উপাদান 'দল' (syllable)। দলের দুই রূপ—মুক্ত ও রুদ্ধ। সবরকম ছন্দেই মুক্তদল সাধারণতঃ এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত রুদ্ধদলও মুক্তদলের সমান, অর্থাৎ একমাত্রা বলেই গণ্য হয়। বিশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত রুদ্ধদল হয় দুই মুক্তদলের সমান অর্থাৎ দুই মাত্রা। একটি মুক্তদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম 'কলা' (mora)। তাই বিশ্লিষ্ট রুদ্ধদলের ধ্বনিমান হয় দুই কলা।
>
> এক রীতির বাংলা ছন্দে এই কলাই ধ্বনিপরিমাপের মাত্রা (unit) বলে গণ্য হয়। তাই এ-রকম মাত্রাকে বলা হয় কলামাত্রা (moric unit), আর ওই রীতিকে বলা যায় 'কলামাত্রক' বা 'কলাবৃত্ত রীতি' (moric style)। এই রীতিতে সব মুক্ত দলই এককলা পরিমিত এবং সব রুদ্ধদলই বিশ্লিষ্ট ও দুইকলা পরিমিত বলে গণ্য হয়।
>
> দ্বিতীয় রীতির ছন্দে মুক্তদল স্বভাবতই এককলা-পরিমিত বলে গণ্য হয়। অধিকন্তু শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলও সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ও এককলা পরিমিত বলেই স্বীকৃত হয়। আর শব্দান্ত্য রুদ্ধদল প্রায় সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দুইকলা পরিমিত বলে স্বীকৃত হয়। এই রীতিতে রুদ্ধদলের এই দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটে বলেই এর নাম হয়েছে মিশ্র কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত (composite)।
>
> আর তৃতীয় রীতির ছন্দ মুক্তরুদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক দলই এক মাত্রা বলে গণ্য। তাই এ-রকম মাত্রাকে বলা যায় 'দলমাত্রা' (syllabic unit), আর এই ছন্দোরীতিকে বলা যায় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি (syllabic style)।

প্রবোধচন্দ্রকে বাংলা ছন্দ-আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকটা যেন সব্যসাচীর ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণের সঠিক সূত্র উদ্ভাবনে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন, অপরদিকে তেমনি আবার ভ্রান্ত পথগামী ছান্দসিকদের ত্রুটিগুলির প্রতি যথাযথ অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের, দিলীপকুমারের বা অমূল্যধনের বক্তব্যের অস্বচ্ছতা বা ভ্রান্তিগুলি কখনো প্রবন্ধাকারে কখনো বা আলোচনা-পত্রের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। একটু লক্ষ করলেই ধরা যাবে, সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা ছন্দচর্চাকারীরা সকলেই মূলতঃ প্রবোধচন্দ্রের ছন্দ-বিশ্লেষণরীতি গ্রহণ করেছেন। শুধু পরিভাষা ব্যবহারে বা অপ্রধান দু'একটি ছন্দরীতির ব্যবহারে অল্পস্বল্প মতবিভেদ প্রকাশ পেয়েছে। অমূল্যধনও তিন বিশেষ ঢঙের ছন্দের কথা যখন বলেছেন তাদের মাত্রাবিন্যাসে প্রবোধচন্দ্রের নীতিকে অস্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ছন্দ-আলোচনার চতুর্থ পর্যায়ে স্পষ্টভাবে বাংলা ছন্দের ত্রিবৃত্ত-সূত্র মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আধুনিক বাংলা ছন্দ-আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রই যথার্থ দিশারীর ভূমিকা নিয়েছেন বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা।

প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথের' পরে বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৫) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে, ১৯৪২-৪৩-তে 'শনিবারের চিঠিতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অমূল্যধন যেমন কবিতা পাঠের 'ঢঙ্'-এর ভিত্তিতে ছন্দ-প্রকৃতিকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন,

মোহিতলালও যতি-বিন্যাসের ভিত্তিতে ছন্দের শ্রেণী-ভাগ করতে গিয়ে অনেকাংশে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তিনি কলাবৃত্তকে পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্তকে পদভূমক বর্ণবৃত্ত এবং দলবৃত্তকে পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত নামে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, কলাবৃত্তে লঘু পর্বযতির এবং মিশ্রবৃত্তে জোড়মাত্রক দীর্ঘ পদযতির প্রাধান্য থাকলেও এই দুই ছন্দরীতিকে নিছক পর্বভূমক বা পদভূমক বলা ঠিক নয়। তেমনি দলবৃত্তকেও পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত বললে 'অক্ষর' শব্দটির অপপ্রয়োগ ঘটে। বাংলা ছন্দ আলোচনায় মোহিতলালের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ। এখানে তিনি এই ছন্দের ভাবযতি ও ছন্দযতির অপূর্ব বুনুনি-জনিত ধ্বনির তরঙ্গভঙ্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন।

তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯০৮-?)১৯৪৩-এ 'বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা' নামে একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল, 'ছন্দোবিজ্ঞান' (১৯৪৮)। তিন দশক বাদে লেখক পূর্ববর্তী দুটি গ্রন্থের বক্তব্যকে পরিমার্জিত করে সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থ 'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' (১৯৭১) প্রকাশ করেন। এখানে তিনি কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতিত্রয়ীকে যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত, বলবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত নামে পরিচিত করেছেন। তাঁর মতে, মাত্রাবৃত্ত হল, 'দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ', বলবৃত্ত হল, (প্রবল শ্বাসাঘাত-প্রধান) 'সবল প্রকৃতিব ছন্দ' এবং অক্ষরবৃত্ত হল, (গদ্যের সাধারণ ভঙ্গিতে উচ্চার্য) 'সাধারণ প্রকৃতির ছন্দ'। এই তিন রীতির মাত্রা নির্ধারণে তিনি অবশ্য মুখ্যত প্রবোধচন্দ্রের গণনারীতিই অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থের পূর্বার্ধে তিনি ছন্দতত্ত্ব বা ছন্দের ব্যাকরণ আলোচনা করেছেন। উত্তরার্ধে তিনি বৈদিক ছন্দ থেকে সুরু করে রবীন্দ্রযুগ-পযর্ন্ত ছন্দ-বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেছেন। ঐ গ্রন্থটিও ছন্দজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অহেতুক জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। ভাষাবিজ্ঞানী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (১৯১২-৭৫) ১৯৫৬-তে 'বাংলা ছন্দ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নিবেদনে জানিয়েছেন, প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাই তাঁর এই গ্রন্থ রচনার মূল উৎস। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি দলবৃত্তকে 'দেশজ ছন্দ', কলাবৃত্তকে 'প্রাকৃত ছন্দ' এবং মিশ্রবৃত্তকে 'ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ' নামে পরিচিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতেই বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।—এই মুখ্য তিন ছন্দরীতি ছাড়াও, তিনি 'সংস্কৃত-মূল', 'বিদেশী মূল', 'মুক্তক' এবং 'অস্ফুট' নামে আরও চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথম পাঁচটি নামের মাধ্যমে যেমন ছন্দরীতিগুলির জন্মসূত্রের সন্ধান করেছেন; শেষ দুটি নামে আবার ছন্দের গঠনগত বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য এই নামগুলি ছন্দরীতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা-নির্ধারণের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়। সেক্ষেত্রে লেখককে কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের নীতিই অনুসরণ করতে হয়েছে।

প্রবীণ কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৮?) তাঁর পূর্ণাঙ্গ 'ছন্দ-সমীক্ষণ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৯৭৯-এ। তার আগে অবশ্য ১৯৬০-এ এই নামেই তাঁর একটি ছোট পুস্তিকা বেরিয়েছিল। উভয় গ্রন্থেই তিনি প্রবোধচন্দ্র-প্রবর্তিত বাংলা ছন্দের মুখ্য তিন রীতির মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত নাম তিনটি, মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতি সহ, গ্রহণ করেছেন। ছন্দবিচারে তিনি যে প্রবোধচন্দ্রকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কথা গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। তবে কলা, মাত্রা ইত্যাদি কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে কিছু হের-ফের করেছেন। তিনি মূল তিন ছন্দপ্রকৃতি ছাড়াও, স্বর-মাত্রাবৃত্ত, প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ, হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রিক ছন্দ, মিশ্র ছন্দ,

স্বরাক্ষরবৃত্ত ছন্দ, লোকছন্দ ইত্যাদি নামকরণের সাহায্যে বাংলা ছন্দের কিছু বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। মনে হয়, এই নতুন নামগুলির প্রয়োজন ছিল না। উক্ত ছন্দ-বৈচিত্র্যগুলি মুখ্য তিন ছন্দরীতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। আবদুল কাদির ১৯৭৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত' নামে পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্ভবতঃ এতদিন সেগুলি ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকবে! এই প্রবন্ধ-পঞ্চকে তিনি চর্যাপদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের কবিতা পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন। বাংলা ছন্দচর্চায় প্রবোধচন্দ্রের অনুসারী হিসেবে ছান্দসিক আবদুল কাদিরের নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধচন্দ্রের সমকালীন বা পরবর্তী ছন্দচর্চাকারীদের তালিকা দীর্ঘ। এই অল্প পরিসর আলোচনায় তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সে তালিকায় যেমন তাঁর অগ্রজপ্রতিম রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) মতো মনীষীরা রয়েছেন, তেমনি সাম্প্রতিক কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-ছান্দসিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪) বা কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষও (১৯৩২) রয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা তাঁর ছন্দ-বিশ্লেষণরীতির কিছুটা হেরফের ঘটাতে চেয়েছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর প্রবর্তিত রীতি-পদ্ধতি মেনে নিয়ে পরিভাষা ব্যবহারে, অথবা সাম্প্রতিক কালের কবিতায় তার প্রয়োগগত নূতনত্ব সৃষ্টিতে, স্বকীয়তা দেখাতে চেয়েছেন। তবে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তরুণতম ছান্দসিক পর্যন্ত কেউই ছন্দ-চর্চার ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রের অনন্য বিশিষ্ট ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর ধ্বনি-বিজ্ঞান-সম্মত ছন্দবিশ্লেষণ-রীতিকে প্রত্যেকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ ছন্দচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আরও কয়েকটি ভূমিকার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বাংলা ছন্দ ব্যাকরণের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি প্রবোধচন্দ্র আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁরই নির্দেশনায় একদল তরুণ ছান্দসিক প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা ছন্দ-বিবর্তনের ইতিহাস রচনায় এবং সেইসঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দী. ওড়িয়া. অসমীয়া ও মৈথিলী কাব্যছন্দের সঙ্গে বাংলা কাব্যছন্দের তুলনাত্মক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। প্রবোধচন্দ্র নিজেই 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি রচনা করে সেখানে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ছন্দচর্চার ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক ধারাও কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এটিও একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই। পরিশেষে একটি আক্ষেপের কথা বলি। প্রবোধচন্দ্র চেয়েছিলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উচ্চতর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাব্যছন্দের নিয়মিত পঠন-পাঠন চালু হোক। সেটা শিক্ষার্থীদের কাব্যের রসাস্বাদনের পক্ষে সহায়ক হবে। যে কোনো কারণেই হোক, তাঁর সেই দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম যাঁরা তৈরি করেন, এই সুযোগে আর একবার এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

উল্লেখসূত্র

১. নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীহরিদাস দাস যে বৃহদায়তন 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' চারটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন, তাঁর পরিশিষ্ট ৪-ক-তে নরহরির 'ছন্দঃসমুদ্র'-এ প্রাপ্ত খণ্ডিত পুথিটি প্রকাশ করেছেন। এই অংশে কেবলমাত্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত নানা ছন্দরূপের পরিচয় মিলছে। পরবর্তী যে অংশটি পাওয়া যায়নি সেখানে কোনো বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন কিনা তা জানা যাচ্ছে না।

২,৩. রামমোহন গ্রন্থাবলী (সা, প, সং ১৯৪৪), গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ছন্দঃ পৃ ৩৬-৩৭

৪. মধুস্মৃতি ১ম সং, পৃ ১২২

৫. 'ছন্দের প্রকৃতি' (১৯৩৪) প্রবন্ধে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের স্বাভাবিকতার প্রশ্ন তুলে তিনি এমন কথাও বলেন যে 'মেঘনাদবধকাব্য' এই ছন্দে লিখলে কিছুমাত্র বেমানান হত না। উদাহরণস্বরূপ উক্ত কাব্যের কয়েক পংক্তি দলবৃত্তে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর লঘুযতি-প্রধান উদাহরণটি সমালোচকগণ কর্তৃক উপহসিত হয়েছিল। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) পরিহাসের ভঙ্গিতে উক্ত কয়েক পংক্তি চর্যাগীতের ছন্দ থেকে সুরু করে সমর সেনের গদ্যকবিতার ছন্দ পর্যন্ত শতাধিক প্যাটার্নে অনুবাদ করে 'শনিবারের চিঠি'তে (ভাদ্র, ১৩৪৪) প্রকাশ করেন। কিন্তু কেউই ভেবে দেখেননি যে, এর বেশ কিছুকাল পূর্বেই মহাকাব্য রচনার উপযোগী ধ্বনিগম্ভীর পদযতিপ্রধান দলবৃত্ত ছন্দ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যে (১৯০৭) অত্যন্ত সাহসিকভাবে পরীক্ষা করেছিলেন।

৬. লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যচর্চার প্রথম যুগ থেকেই অমিত্রাক্ষর ভেঙে মুক্তক রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রথমে মিশ্রবৃত্তে, তারপর দলবৃত্তে এবং শেষে অল্পস্বল্প কলাবৃত্তেও মুক্তক ব্যবহার করেছেন। কখনো লাইন-শেষে মিল দিয়ে, কখনো মিল না দিয়েও লিখেছেন। তবে এই ছন্দরীতি নিয়ে বিশেষ কোথাও আলোচনা করেননি।

৭. দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দ-জিজ্ঞাসা, বাংলার ছন্দ ও তাল, পৃ ৪৮০।

৮. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ছান্দসিকী' প্রকাশের দু'বছর আগেই তিনি সাঙ্গীতিকী (১৯৩৮) নামে সংগীত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে গানের সুর ও কথার সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। গানের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সম্পর্ক নিয়ে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রও আলোচনা করেন।

বাংলা ছন্দ-চিন্তার অগ্রগতিতে বিদেশীর দান

রামবহাল তেওয়ারী

ভারতীয় ছন্দে বাংলা ছন্দবিদ্যা আজ অনন্য গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী। বিচিত্র-ব্যাপক শিল্পরূপ ও সূক্ষ্ম-গভীর চিন্তন-মনন বাংলা ছন্দকে যে স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব দান করেছে, অন্যান্য ভারতীয় ছন্দে তা দেখা যায় না। আজও অধিকাংশ ভারতীয় ছন্দ বহুলাংশে সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের অনুশাসন মেনে চলে। বাংলা ছন্দ চলছে তার স্বাধীন প্রকৃতি-সুলভ আধুনিক পথে। বাংলাছন্দের এই প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্যের মূলে আছে বাঙালির চিত্ত-সম্পদ ও ছন্দ-প্রতিভার অবিস্মরণীয় দান--সে কথা বলাই বাহুল্য। আর সে দান পুরোপুরি আধুনিক কালের। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিতায় ব্যাপকভাবে ছন্দ-প্রয়োগ করলেও বাঙালি ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়নি, ছন্দ-চর্চার কথা ভাবেনি। এমন কি আধুনিক কালেও সেই নিস্তরঙ্গ ছন্দ-সায়রে সে ঢেউ তোলার প্রয়াস করেনি। সেই উদ্যম দেখিয়েছেন সর্বপ্রথম একজন বিদেশী--ন্যাথানিএল ব্র্যাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০) তাঁর *A Grammar of the Bengal Language* (1778) গ্রন্থে। এদেশের ব্যাকরণে ছন্দের স্থান ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশের ব্যাকরণে তা স্বীকৃত। বাংলা ছন্দের প্রতি হালহেডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে। সেই সুবাদে তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ছন্দ সন্নিবিষ্ট করেন। তা থেকে পরবর্তীকালে বাংলা ব্যাকরণেও ছন্দ-সংযোজন একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে একজন বিদেশীর প্রয়াসে আধুনিক বাংলা ছন্দ-আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। বেশ কিছুদিন পর আর একজন বিদেশী—রেভারেন্ড উইলিয়ম য়েট্‌স্ (১৭৯৭-১৮৪৫) বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্ষীণ ধারাটিকে পুষ্ট করতে প্রয়াসী হন তাঁর *Introduction to the Bengali Language*, Vol. 1 (1847) গ্রন্থে। পরে ১৮৪৯ সালে বইটির ব্যাকরণ অংশটুকু পুনঃ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় *Bengali Grammar* (1849) নামে। সম্পাদনা করেন জে. ওয়েঙ্গার সাহেব। বাংলা ছন্দে তাঁরও অনুরাগ ছিল। সম্পাদনকালে বাংলা ছন্দ বিষয়ে সংযোজিত তাঁর অভিমতও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অবজ্ঞাত দুর্বল বাংলা ছন্দের দৈন্যদশায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলেও যথাকালে বাংলা ছন্দ সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশাও ধ্বনিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করা যায়—গ্রন্থটি প্রকাশের ষাট-সত্তর বৎসরের মধ্যেই বাংলায় যেন ছন্দ-বিপ্লব ঘটে যায়। ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা—উভয়ক্ষেত্রেই ঘটে যায় অভাবনীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধি। কিন্তু এই অভাবনীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধির মূলেও রয়েছে অপর একজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রেমিক বিদেশী ছন্দোবিদ্ অধ্যাপকের অযাচিত দান। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জেমস্ ড্রমন্ড অ্যান্ডারসন (১৮৫২-১৯২০)। আমরা জানি — রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ-চিন্তার জগৎটিকেও অত্যাশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ

করেছেন। ছন্দশিল্পের জগৎটি তাঁর শিল্পিসত্তার বৈশিষ্ট্য সুলভ সহজ-স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ছন্দ-চিন্তা অনুপ্রাণিত হয়েছে অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার উদ্যমে — বললে অন্যায় হবে না। বিষয়টি জানা যায় অ্যান্ডারসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথেরই একটি পত্র থেকে। পত্রটি ৬ ফাল্গুন ১৩২০, শিলাইদহ থেকে লেখা। তার থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু হল —

> "ছন্দ সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করিতেছেন, আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি কোনো কথা কহে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল কিছু লিখিব, কিন্তু আমার কলম অলস হইয়া আসিয়াছে; এখন সে আর নিজের বেগে চলেনা, তাহাকে ঠেলিয়া চালাইতে হয়।"
>
> —ছন্দ (১৯৬২), পাঠপরিচয়, পৃ ৩২০।

তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, একথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার প্রথমপর্ব (১২৮৮-১৩১৯) থেকেই তা বোঝা যায়। সাধারণভাবে বাঙালি তখন ছন্দ-বিমুখ ছিল, সে কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছেন অধ্যাপক অ্যান্ডারসন — তারই সহজ স্বীকৃতি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে। তবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছন্দ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা বলেছেন, তা এসেছে আনুষঙ্গিকভাবে অন্য বিষয়ের আলোচনায়। বাংলা ছন্দের সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিচয় দেবার প্রথম চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসা প্রশমনের উদ্দেশ্যেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর ছন্দ-চিন্তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয়পর্ব (১৩২০-১৩৩৮)। সুসংহত সুশৃঙ্খল অনুপুঙ্খ ছন্দ-আলোচনার এই ধারা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে বহমান দেখা যায়। অন্যান্য ছন্দ-চিন্তকের সহযোগিতায় তা পরিপুষ্ট, বিচিত্র ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। এই পর্বে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে এদেশের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), এবং বিদেশের জে ডি অ্যান্ডারসন, কবি রবার্ট ব্রিজেস (১৮৪৪-১৯৩০) ও কুইলার কাউচ (১৮৬৩-১৯৪৪) ইংলন্ডের, এবং সিলভাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫) ফ্রান্সের, কথা প্রথমে আসে। দেখা যাচ্ছে বাস্তবতার বিচারে বাংলা ছন্দ-চর্চা ও ছন্দ-চেতনার সূচনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তিন জন বিদেশীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এখন সেই তিন জনের অর্থাৎ হালহেড, য়েট্‌স্ ও অ্যান্ডারসনের দানের স্বরূপ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

২

ন্যাথানিএল ব্র্যাসি হালহেডের বাংলা ছন্দ-চিন্তা

আমরা পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করেছি যে, হালহেড তাঁর *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮) গ্রন্থের Of versification অংশে বাংলা ছন্দ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা ও আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর আলোচনায় সে যুগে প্রচলিত কয়েকটি বাংলাছন্দের নাম, পরিচয় ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ-প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ-সবই বাংলাছন্দের ক্ষেত্রে প্রথম, অভিনব তো বটেই। সে যুগে এই মহৎ সূচনার মূল্য ও গুরুত্ব তেমন অনুভূত না হলেও, আজ তা সুস্পষ্ট। হালহেড এইভাবে বাংলাছন্দ চিন্তাসৌধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালের বাংলাছন্দ-চিন্তা সেই ভিতের উপরই দানা বেঁধেছে এবং ক্রমে প্রত্যাশিত রূপলাভে সমর্থ হয়েছে।

বাংলা কবিতার ছন্দকে, কবিতার প্রকার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে, হালহেড তিনভাগে ভাগ

করেছেন। এ-ভাগের বিশেষ সার্থকতা না থাকলেও রীতি বা প্রকৃতির বিচারে বাংলা ছন্দের তিনপ্রকারের পূর্বাভাস যেন ধ্বনিত তাঁর অভিমতে। আবার সাধারণ বিশ্বাসে বাংলা ভাষা যেমন সংস্কৃত থেকে এসেছে, বাংলা ছন্দও তেমনি সংস্কৃত থেকে 'ধার করা' বলে তিনি মনে করতেন।[২] বাংলাছন্দের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে— 'Every line of every species of verse is called a ছন্দ'। (Of versification. p. 200), তাতে ছন্দ বা ছন্দ-পংক্তির কোনো ধারণাই করা যায় না। তবে শ্লোক বা শ্লোকার্ধ অর্থে হিন্দী প্রভৃতি কবিতায় 'ছন্দ' শব্দটির যে প্রয়োগ আছে এখানে তার প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। হালহেডের এ-সব কথা সহজস্বীকার্য না হলেও বাংলা ছন্দ নিয়ে এই জাতীয় চিন্তার প্রথম নির্দশন রূপে তার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে। বাংলাছন্দের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—প্রস্বর ও পংক্তির সিলেবল (অক্ষর)-সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলা ছন্দ। তাতে ধ্বনিপরিমাণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধ্বনিমাত্রা ও প্রস্বর যেন সমবিন্দু।[৩] বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে ইংরেজি ছন্দের ধ্যান-ধারণা কাজ করেছে—সেকথা বলাই বাহুল্য, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতচন্দ্র রায়ের অক্ষর-ছন্দের বিধান, সম্ভবতঃ।

স্থানবিশেষে বাঙালির মুখে তিনদলের শব্দ দুই দলে রূপান্তরিত হয় —এটাও হালহেড লক্ষ করেছেন।[৪] লক্ষ করেছেন বাংলা কবিতায় মিলের খেলাও।[৫] মিলের খেলায় তাঁর মন প্রসন্ন হয়েছে। হালহেডের এই জাতীয় প্রয়াসে বাংলা ছন্দ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙালির ছন্দ-মনস্কতার স্বরূপও বোঝা যায়। উত্তরকালে বাংলা ছন্দচিন্তার যাত্রাপথের একটা আভাসও পাওয়া যায়।

সে যুগের বাংলাছন্দের দিকে তাকালে —তার রূপ, রীতি, সংজ্ঞা ও পরিভাষা কোনো কিছুরই ধ্যান-ধ্যারণার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল কোনো-কোনো কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি ছন্দোবন্ধের নাম যত্র-তত্র চোখে পড়ে। মূলে ছন্দ-চর্চাই যেখানে নেই, সেখানে ছন্দ-আলোচনার এইসব উপকরণের প্রত্যাশা নিরর্থক বৈকি। তা অনুধাবন করে হালহেড সাধ্যমতো তা সংগ্রহ বা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ ছন্দ-চর্চায় এইসব উপকরণ অপরিহার্য। হালহেডের বাংলা-ছন্দ-চিন্তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব এখানেই।

পরিভাষা ছাড়া ছন্দের মতো প্রাকরণিক বিষয় বোঝা বা বোঝানো অসম্ভব ব্যাপার। তাই বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাংলা ব্যাকরণ ও ছন্দের আলোচনায় মাঝে মাঝে হালহেড এমন সব মন্তব্য করেছেন যাতে মনে হয়, তিনি হিন্দী প্রভৃতি আরো কয়েকটি ভারতীয় ভাষা জানতেন। তবে সেইসব ভাষার ছন্দ নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি। বাংলা 'অক্ষর' ও ইংরেজি সিলেব্‌ল এক বস্তু নয়। তা হলেও কাজের সুবিধার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম অক্ষরের বদলে সিলেব্‌ল ব্যবহার করেছেন। তারই ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে বাংলা-ছন্দের আলোচনায় অক্ষরের বদলে সিলেব্‌ল বা সিলেব্‌লের বদলে অক্ষর ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ —অনুষ্টুপ, পংক্তী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, শর্করী, অতিজগতী ও অতিশর্করীর পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দ পংক্তি ও পদ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর কথাও বলেছেন। তবে ছন্দ-পংক্তির ধারণা সর্বত্র ঠিক থাকেনি। বাংলা কবিতা পাঠে পূর্ণবিরাম ও অর্ধবিরাম ছাড়া অন্যবিরাম তাঁর কানে ধরা পড়েনি। 'pause'কে সম্ভবতঃ তিনি 'পদের' পর্যায়বাচী মনে করেছিলেন। তাই এক pause -এর রচনাকে একপদী দুই pause -এর রচনাকে দ্বিপদী ক্রমে

পংক্তির নামকরণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে 'পদ' ও 'পদী'র অর্থ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। সে যাই হোক তাতে তাঁর প্রথম প্রয়াসের গুরুত্ব কমেনি বিন্দুমাত্র। বাংলাছন্দের আলোচনায় মিলটনের ইংরেজি কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করে, তার ছন্দের পরিচয় দিয়ে বাংলা-ছন্দের সঙ্গে মিল-অমিল দেখিয়ে তুলনামূলক ছন্দ-আলোচনার সংকেত দেন সর্বপ্রথম।[8] উদ্ধৃতিটি ইংরেজিতে লেখা বাংলা দলবৃত্ত পয়ারের (Syllabic payar) মর্যাদা পেতে পারে। প্রত্যেক ছন্দপংক্তির প্রথম দুই পর্বে মিল থাকায় তরলপয়ারের মর্যাদাও পেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, হালহেড সংস্কৃত গুরু, লঘু, বাংলা দীর্ঘ-হ্রস্ব ও ইংরেজি 'long-short' বা "strong-weak" -এর তারতম্যের ও সাম্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তোটকের ধ্বনিবিন্যাস (υυ-) ইংরেজি Anapaest-এর মতো। তাতে Dactylic (-υυ) এবং Trochaic (-υ) -এর বিশেষত্ব খুঁজে পেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বাংলা ঝোঁক বা প্রস্বরের প্রকৃতির কথাও বলেছেন। এইভাবে অবলীলাক্রমে ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের তুলনামূলক আলোচনার দিকটি তুলে ধরেছেন। বাংলাকাব্যের ছন্দের ব্যবহার এবং উপযোগিতা অনুধাবন করে হালহেড সিদ্ধান্ত করেছেন—আখ্যান ও বর্ণনামূলক কাজে পয়ার এবং দুঃখ-শোক-আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রভৃতির জন্য ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের ব্যবহার হয়ে থাকে বাংলায়।[9] বাংলাছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে হালহেডের এজাতীয় নিরীক্ষাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। গীত বা বাংলাগানের ছন্দের কথাও চিন্তা করেছেন কিন্তু সে কাজে অগ্রসর হতে পারেননি। বলেছেন—

"The গীত বা elegiac style of writing is so very loose and arbitrary that I cannot lay down any rules for its construction." (Of versification, p. 205).

দেখা যাচ্ছে বাংলা আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যের ছন্দের বিধান নির্দেশ করতে প্রয়াসী হলেও হালহেডের পক্ষে বাংলা গানের ছন্দ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাগানের 'মিল' অনেকটা কবিতার মিলের মতোই—এ-টা তিনি লক্ষ করেছেন। সে যাই হোক কবিতার ছন্দ ও গানের ছন্দ যে এক নয় তা ধরতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

হালহেডের বাংলা ছন্দ-আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—তার বিধি-বিধান নিরূপণ। তাতে তাঁর সাফল্য পরিমাণে কম হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। বাংলা ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চার অবকাশ ও উপযোগিতা রয়েছে—তা বুঝে আমাদের বোঝাবার প্রথম চেষ্টা করেছেন ন্যাথানিএল ব্র্যাসি হালহেডই। তাই আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—

"বস্তুতঃ বাংলা ছন্দ-চিন্তার ইতিহাসে হালহেডকেই ভোরের পাখি বলে স্বীকার করতে হয়।"

—প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃ ১৩২।

৩

রে. উ. য়েট্সের বাংলা ছন্দ-চিন্তা:

রেভারেন্ড উইলিয়ম য়েট্সের বাংলাছন্দ-চর্চার মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হালহেডের প্রণোদনা থাকা বিচিত্র নয়। তাঁর *Bengali Grammar* (১৮৪৯) গ্রন্থটি বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ। তার দশম অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের ব্যাপক পরিচয় দানের সযত্ন প্রয়াস লক্ষিত হয় (Of prosody অংশে)। হালহেড ও য়েট্সের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা ছন্দ নিয়ে পরিমাণে স্বল্প হলেও মৌলিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) তাঁর *Bengali Grammar in the English Language* (1826) গ্রন্থে।

সুতরাং হালহেড-রামমোহন ও য়েট্‌সের বাংলা ছন্দ-আলোচনার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে কিছু-কিছু মিল বা সাম্য থাকা বিচিত্র নয়। ভাষার উচ্চারণ-প্রকৃতিই ছন্দের নিয়ামক। বাঙালির মুখের উচ্চারণ এবং কবিতাপাঠ পুরোপুরি এক নয়। অর্থাৎ কবিতার উচ্চারণ কৃত্রিম। তাই বাংলা ছন্দ প্রত্যাশিত বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি—এই ছিল য়েট্‌সের বিশ্বাস। তাই তাঁর মতে বাংলা ভাষার দুর্বল ও নিকৃষ্টতম অংশ হল তার ছন্দ। রামমোহনও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। বাঙালিব ছন্দ-সচেতনতার অভাবই তার প্রধান কারণ হলেও গদ্যের অ-স্বরান্ত স্বাভাবিক উচ্চারণ কবিতাপাঠে স্বরান্ত হয়ে ওঠাকেই য়েট্‌স কৃত্রিম, অস্বাভাবিক এবং ছন্দের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছেন। এই কৃত্রিম উচ্চরণই বাংলা ছন্দের প্রধান ত্রুটি। তাছাড়া সংস্কৃত গ্রীক ছন্দের মূলকথা হল—ধ্বনির দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা বিচার, যা বাংলায় একেবারেই মানা হয়না। ওই দুই ছন্দে মিলের তেমন স্থান নেই, কিন্তু বাংলায় মিলের স্বীকৃতি রয়েছে। এইসব কারণে বাংলা ছন্দের প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটতে পারেনি। বাংলায় দলের ধ্বনিপরিমাণ নিরপেক্ষতাও অনাবশ্যক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। হালহেডের মতো য়েট্‌সও মনে করেন বাংলা ছন্দ সংস্কৃত ছন্দ থেকেই এসেছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দেরই প্রাধান্য, অথচ তাতে সংস্কৃত ছন্দ রচনার প্রয়াস দেখা যায় না—তাই তো বাংলা ছন্দের এমন দৈন্যদশা। তাঁর মতে সংস্কৃত ছন্দের অনুশীলন এবং বাংলায় প্রয়োগ-প্রয়াসই বাংলা ছন্দের উন্নতির প্রশস্ত পথ। অনুষ্টুপ থেকেই বাংলা পয়ার ছন্দের উদ্ভব, কিন্তু তা অনুষ্টুপের মতো উৎকৃষ্ট নয়। সুতরাং বাংলায় পয়ার নয়, অন্যান্য সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে অনুষ্টুপই রচনা করতে হবে। যথা সময়ে উপযুক্ত কবি-শিল্পীর আবির্ভাবে তা অবশ্যই সম্ভব হবে। এ-সব থেকে সংস্কৃত ছন্দের প্রতি য়েট্‌সের প্রবল অনুরাগ ও আস্থা এবং বাংলাছন্দের প্রতি সহানুভূতির দিকটি সুস্পষ্ট বোঝা যায়।[৮] উত্তরকালে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন বেশ কয়েকজন কবি, কিন্তু প্রত্যাশিত ফলোদয় না-হওয়ায় সে পথ পরিত্যক্ত হয়েছে বলা যায়।[৯] তাহলেও বাংলা ছন্দ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার উৎকর্ষ বিধানের জন্য পথনির্দেশ করা একজন বিদেশীর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর ছন্দচিন্তায় যে বহুজন আকৃষ্ট এবং ছন্দ-রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন, তার গুরুত্বও কম নয়। সংস্কৃতের মতো চার-চার চরণে বা ছন্দ পংক্তিতে এক-একটি শ্লোক বা স্তবক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন উইলিয়ম য়েট্‌স্। সংস্কৃতের আদর্শে হলেও এবং বাংলায় তা সবসময় সম্ভব নয় জেনেও য়েট্‌সের ছন্দচিন্তার অভিনবতা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে য়েট্‌সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান হল—কবিতা আবৃত্তির সময় স্থায়িত্বকাল ভেদে বিভিন্নরকম 'যতি'র অস্তিত্ব অনুভব। অন্ত্য-মিল বা মধ্য-মিলের পর যতি পড়ে। তবে তার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্ন-আদির প্রয়োগ না হওয়ায় য়েট্‌স্ কমা (,) বসিয়ে তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পয়ার যে আট ও ছয় অক্ষরের দুই ভাগে (পদে) বিভক্ত চোদ্দ অক্ষরের ছন্দ-পংক্তি—একথা য়েট্‌সই বলেন সর্বপ্রথম।[১০] আট ও ছয় অক্ষরের মাঝখানে মধ্যযতি বা অর্ধযতির কথা না-বললেও প্রকারান্তরে তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রথম ও নবম অক্ষরের উপর যে ঝোঁক বা প্রস্বর পড়ে তাও তাঁর কান এড়াতে পারেনি। সুস্পষ্টভাবে এমন কথাও বলেছেন—বাংলাছন্দের প্রত্যেক ধ্বনি-বিভাগ বা পর্ব-উপপর্বের প্রথম দলেই থাকে একটি করে প্রস্বর। এই প্রস্বরই ধ্বনিবিভাগটিকে পরিচালিত করে। বাংলা ছন্দ-প্রকৃতির এমন গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করেন সর্বপ্রথম উইলিয়ম য়েট্‌স্ই। অবশ্য প্রস্বরিত দলকে তিনি 'long' বলেছেন, যা ইংরেজি ছন্দের সংস্কারের ফল বলে

মনে হয়। পয়ারের মধ্যযতি বা caesura -র অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জে. ওয়েঙ্গারের সম্পাদকীয় সংযোজন থেকে। তিনি এমনও বলেছেন যে-ক্বচিৎ-কখনো এই caesura বা মধ্যযতি লুপ্ত হলে কবিতায় কর্কশতা আসে, গদ্যের আদল ফুটে ওঠে।[১১] য়েট্‌সের পয়ার-চিন্তা ও জে. ওয়েঙ্গারের সংযোজন মিলে ৮ ও ৬ অক্ষরের ভাগ, মধ্যযতির অস্তিত্ব এবং দুই বিভাগের শুরুতেই ঝোঁক বা প্রস্বরের অস্তিত্ব ইত্যাদির কল্যাণে পয়ারবন্ধের প্রকৃতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলা যায়। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে এটাও য়েট্‌সের অবিস্মরণীয় দান। বাংলা ছন্দের সাধারণ বিশেষত্ব ও পরোক্ষ সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে য়েট্‌স বলেছেন—ধ্বনিগুচ্ছের সুনিয়মিত পুনরাবর্তন সুসমঞ্জসবিন্যাস ও সুললিত সুকুমারতায় আমাদের শ্রুতি-রুচি তৃপ্ত ও আশ্বস্ত হয়।[১২] য়েট্‌স্ বাংলা ছন্দের পরিভাষা আদি নিয়ে মাথা ঘামাননি। প্রয়োজনে প্রচলিত ছন্দোবন্ধের বাংলা ও সংস্কৃত নাম ও কিছু কিছু ইংরেজি পরিভাষা দিয়ে আলোচনাকে প্রাঞ্জল করেছেন। তিনি পয়ার সহ, একাবলী, তোটক, মালঝাঁপ, মালতী, চামর, ললিতঝাঁপ, লঘুভঙ্গ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চতুষ্পদী, দীর্ঘ চতুষ্পদী, লঘু ললিত, দীর্ঘ ললিত প্রমুখ ১৫টি ছন্দোবন্ধের নামোল্লেখ করেছেন। উদাহরণ সহ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করেছেন। তবে ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের তুলনাত্মক প্রসঙ্গ তোলেননি।[১৩] নামগুলির বৈজ্ঞানিকতাও বিচার করেননি। য়েট্‌সের ছন্দগুলির মধ্যে হালহেড-উল্লিখিত ছন্দ কয়টিও আছে। এইভাবে এই দুই জন বিদেশী ছান্দসিক মিলে মোট ১৫টি ছন্দের প্রকৃতি ও পরিচয় তুলে ধরেছেন—বাংলা ছন্দ-চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা দুটির উচ্চারণ-প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং বাংলা ভাষার উচ্চারণ-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। তাই বাংলায় সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দ সহজভাবে 'বসে না'। কিন্তু য়েট্‌স্ বাংলায় সংস্কৃত ছন্দরচনার উপর জোর দিয়েছেন বিশেষভাবে। তাতে বাংলা ছন্দ ও কবিতার উৎকর্ষ ঘটবে—এমন উচ্চাশাও ব্যক্ত করেছেন। আর ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। ইংরেজি ছন্দ বাংলা ভাষার প্রকৃতিসম্মত নয় বলেই তিনি নীরব, বলে মনে হয়। তা যদি হয় তবে অনুমান করতে হয় তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আর বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে, একথা যে-কোনো কারণেই হোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের উপর এত জোর দিয়েছেন। আলোচনার শেষে গ্রন্থটিতে বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাতে একদিকে যেমন সে-যুগের বাংলা ছন্দের দুর্বলতার পরিচয় আছে তেমনি য়েট্‌স্ ও ওয়েঙ্গারের আন্তরিকতা ও সহানুভূতির ছাপও আছে। বক্তব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করার মতো। সেখানে বলা হয়েছে—

"It would be unfair to criticise tnem, as they have not yet had sufficient time to come to perfection. From the attention now paid to the cultivation of the Bengali languagc, which possesses very great capabilities, we are persuaded that the time is not very distant when its composition both in prose and verse will equal, if not outvie, those of any other vernacular language of India."

প্রবোধচন্দ্র সেন: বাংলা ছন্দ-চিন্তা ও ছন্দ-শিল্পের অগ্রগতি (১৯৮৯) পৃ১১১।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় দুই বিদেশী ছান্দসিকের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পরবর্তী চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সার্থক হয়ে উঠেছে। বাংলা ছন্দের অগ্রগতি সমৃদ্ধি ও সার্থকতা ভারতীয় ভাষার অপরাপর সব ছন্দকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে. অবশ্য তা সম্ভব হয়েছে য়েট্‌স্‌ নির্দেশিত পথে নয়, বাংলার স্বতন্ত্র প্রকৃতি-সুলভ সহজ স্বাভাবিক পথেই।

৪

অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের ছন্দচিন্তা:

অধ্যাপক জে. ডি. অ্যান্ডারসনের যৌবনকাল কাটে বাংলায়। ভ্রমণ করেছেন বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চল গুলিতেও। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যেরও পরিচয় লাভ করেন। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর একটি অত্যন্ত নিবিড় ও অন্তরঙ্গ যোগ গড়ে উঠেছিল। হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের প্রতি গভীরভাবে সজাগ করে তোলে। সেই সুবাদে তিনি বাংলা ছন্দের প্রতিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। বাংলা ছন্দের বিশেষত্বের সঙ্গে তিনি ফরাসী ছন্দের বিশেষত্বের মিল খুঁজে পান। তাঁর মতে ভারতীয় ভাষা ও ছন্দে বাংলা ভাষা ও ছন্দের যে স্থান, য়ুরোপীয় ভাষা ও ছন্দে ফরাসী ভাষা ও ছন্দের সেই স্থান। অবশ্য বাংলা ও ফবাসীর মধ্যে মিল যেমন আছে, আছে অমিলও। যা খুবই স্বাভাবিক। বাংলা ছন্দ সন্ধিৎসু এই বিদেশী অধ্যাপক বাংলা ছন্দকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তা নিয়ে বিচিত্ররকমের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, তাই বাংলাছন্দের নানা তথ্য ও সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর ছন্দ-অনুরাগী চিত্তে। জেগে ছিল নানারকম কৌতূহল ও ছন্দ-জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর উচ্চস্তরের কাব্য ও ছন্দশিল্পের পরিচয় পেয়ে তিনি আশ্বস্ত হন। তাঁর ছন্দ-জিজ্ঞাসা প্রশমনের উদ্দেশ্যে তিনি ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। সে বিষয়ের অবতারণা আমরা যথাস্থানে করব।

অধ্যাপক অ্যান্ডারসন দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং কোনো কোনো বিষয়ে স্বমত গড়ে তুলেছিলেন—তা জানা যায় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম খন্ড, (১৯১৪) গ্রন্থের 'Introduction' অংশের জে. ডি. অ্যান্ডারসনের ছন্দ বিষয়ক মতামতের উল্লেখ থেকে (পৃ. ৮১-৮৪)। সেখানে তিনি প্রতিবেশী ভাষা থেকে বাংলা-ভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা কবেছেন। বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বাংলা উচ্চারণে প্রস্বর বা ঝোঁকের বৈশিষ্ট্যের উপর। হিন্দীর প্রস্বরের সঙ্গে বাংলা প্রস্বরের প্রকৃতি ও অবস্থানগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এমন কি ফরাসী ও ইংরেজি accent-এর stress, pitch এবং duration প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে তার সঙ্গে বাংলা প্রস্বরের প্রভেদও ব্যাখ্যা করেছেন।[১৪] বাংলা পয়ারকে ফরাসী The Alexandrine-এর মতো 'হিরোইক মিটার' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য পয়ারকে এই নামে উলিয়ম য়েট্‌স্‌ও উল্লেখ করেছেন, তা আমরা জানি। ভারতেব হিন্দী-মরাঠী প্রভৃতি ভাষার মতোই য়ুরোপের ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রস্বরিত শব্দ (stressed word) বেশি থাকায় পয়ার রচনা কঠিন। তবু ইংরেজি ছড়া বেঁধেছেন বাংলা পয়ার ছন্দে। বাংলার 'tonic accents'-এর সৌন্দর্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য। তবে ইংরেজি ভাষার প্রকৃতিসম্মত না হওয়ায় তার পাঠ বা আবৃত্তি সহজসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে বাংলায় যে প্রস্বরিত শব্দ নেই তা নয়, তবে কবিতায় তার অস্তিত্ব তেমন অনুভূত হয় না। কখনো কখনো কবিরা

আয়াস করে তার প্রয়োগ করেন। বাংলা বাক্‌পর্বের প্রস্বর বা বাক্‌প্রস্বর (Phrase-accent) ফরাসী Tonic accent যা বাক্‌প্রস্বরেরই নামান্তর বলা যায় এবং ইংরেজি শব্দপ্রস্বর (Word-accent বা Stressed-word) প্রভৃতির ভিন্নতা বুঝিয়েছেন সহজ সুন্দরভাবে। বলেছেন—

"Take a word common to both the languages. Take "Signification". In English this is pronounced সিগ্নিফিকে–ষণ, and the stress is on কে wherever the word comes in a sentence. In French the same word is "সিনিফিকাসিয়োঁ" with a rise of the voice on the final syllable, which is even more audible if the word comes at end of a phrase ... I suggest that initial accent in Bengali is stronger when the word comes at the beginning of a vocal unit, e.g. take the sentence "আঁর একটি বিষয়, লক্ষ করিবার আছে।" ... But alter the order and say "বিষয়টা এই" and will not the accentuation be altered? In Hindi the words would keep their own word-stress."

—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খন্ড, (১৯১৪) Introduction পৃ. ৮৪পাদটীকা

পরবর্তীকালেও অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের বাংলা ছন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিচয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে পত্রালাপে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সেইসব বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দ বিষয়ক আলোচনার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনি তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত বক্তব্যও উত্থাপিত হয়েছে। তিনি এমন সব প্রসঙ্গ তুলেছেন, অথবা বাংলা ছন্দ বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছেন, যা রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে। কারণ পূর্বে সেই জাতীয় প্রশ্ন কেউ করেনি, এবং রবীন্দ্রনাথও হয়তো তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেননি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal* (1917) গ্রন্থের Preface -এ জে ডি. অ্যান্ডারসন বাংলা ছন্দের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। ছন্দ-প্রসঙ্গ অবতারণার প্রাক্‌কালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পন্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-- ছন্দ একটি প্রাকরণিক বিদ্যা যা স্বভাবতঃই বিতর্কমূলক। আর কোনো বিদেশীর পক্ষে চট করে নিজেকে বাংলা ছন্দের অধিকারী বলে মনে করাটা সুচিন্তাপ্রসূত ও সমীচীন নয় জানি, তা সত্ত্বেও বাংলা ছন্দ বিষয়ে আমার কয়েকটি প্রস্তাব আছে।[১৭] তাঁর মতে সব দেশেই কবিরা নিজ-নিজ ভাষায় সর্বজনবোধ্য এমন কিছু কিছু শ্রুতিমধুর ধ্বনির সৃজন করেন যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রুতিগম্য স্পন্দন জাগে। ছন্দ-মাধুরী কবিতার আপাত শব্দাবলীতে থাকে না, সেইসব শব্দ সহজে কাজে লাগে গদ্য রচনাতেও, তা আরোপিত হয় সুরলালিত্য, প্রস্বর (ঝোঁক, পিচ, প্রলম্বন) ও ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে। সুতরাং ছন্দ পুরোপুরি শ্রুতি-আশ্রিত। অধ্যাপক অ্যান্ডারসন তিন প্রজাতির ছন্দের কথা বলেছেন,—ধ্বনিভিত্তিক— গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ছন্দ এই প্রকারের। সংস্কৃত ছন্দও এই কোটিতে পড়ে; নিশ্চিতপ্রস্বর আশ্রিত ছন্দ—যা ইংরেজি কাব্যের বাহন, তাতে নিশ্চিত ব্যবধানে প্রস্বরিত শব্দ ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি করে ; বাক্‌পর্ব আশ্রিত ছন্দ—তাতে বাক্‌পর্বের প্রস্বর ছন্দ-স্পন্দ সৃজন করে — ফরাসী ও বাংলা এই জাতীয় ছন্দ। এ ছন্দকে সিলেবিক্ বা অক্ষরসংখ্যাতও বলা যায়। তাঁর মতে বাংলা ছন্দ ধ্বনিভিত্তিক বা প্রস্বরভিত্তিক নয়, বাক্‌প্রস্বরভিত্তিক।[১৮] এই বাক্‌প্রস্বর পড়ে পদ বা পংক্তির প্রথম দলে। মিলপ্রস্বরও গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ছন্দে। তাতে কবিতা পংক্তির সমাপ্তি সূচিত হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বনি-আশ্রিত

(কলাবৃত্ত) ছন্দের সৌন্দর্যও প্রত্যক্ষ করেছেন অধ্যাপক অ্যান্ডারসন। পয়ারের উদাহরণ দিয়ে পূর্ণযতি, অর্ধযতি ও মধ্যমিলের স্বরূপ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। প্রস্বরের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে মিলটনের পংক্তি তুলে Iambic Pentametre-এর চরিত্র ও উপযোগিতা নির্দেশ করেছেন। বাংলা দীর্ঘ একাবলীকে (৬ + ৬ = ১২) ফরাসী Alexandrine ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ রূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে পয়ারের তিনটি পূর্ণপর্বের (phrase) প্রত্যেকটির প্রথমেই একটি করে প্রস্বর থাকে। তাতে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃজন হয়— তাই হল পয়ার ছন্দের মূল ভিত্তি। অ্যান্ডারসনের সব অভিমতই যে সহজগ্রাহ্য নয়—সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ছন্দতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ মূলক কোনো লিখিত বিধান-আদি না-থাকায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অক্ষরভিত্তিক ছন্দোরীতিতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বন্ধেরও অবতারণা করেছেন। বাংলা ছন্দের Theoretical account-এর অভাবপূর্তি এবং ছন্দোলিপিসহ ছন্দ-বিশ্লেষণের অনুকরণীয় আলোচনার জন্য আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।[১১] তৎসহ সুনিশ্চিতভাবে বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দ-পংক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের আশু প্রয়োজনের কথাও বলেছেন। তা না হলে বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য জল্পনা-কল্পনার স্তরেই আবদ্ধ থাকবে। একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় বাংলা ছন্দ বিষয়ে অধ্যাপক অ্যান্ডারসন যা-যা ভেবেছেন এবং যে-সব প্রস্তাব করেছেন, তা গুরুত্ব দিয়ে বোঝা এবং তদনুযায়ী বাংলা ছন্দ চর্চায় অগ্রসর হওয়ার শক্তি সামর্থ্য ও মানসিকতা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই ছিল। এই বিদেশী ও স্বদেশী দুইজন ছান্দসিকের সমন্বিত প্রয়াসে বাংলা ছন্দ চিন্তার অগ্রগতির ক্রম ত্বরান্বিত হয়।

৫

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জে ডি অ্যান্ডারসন মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে ১২ জুলাই ১৯১২। তারপর থেকে মৃত্যুর (২০ অক্টোবর ১৯২০) পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রভবনে (শান্তিনিকেতন) তাঁর ৪৫টি পত্র সংরক্ষিত। প্রথমটির তারিখ ১৫ জুলাই ১৯১২ এবং শেষ পত্রটি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০ সালে লেখা। কুড়িখানি পত্রে প্রধানভাবে বা প্রাসঙ্গিক ভাবে ছন্দের আলোচনা আছে। বাংলা ছন্দ বিষয়ে তাঁর আরও অভিমত রয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন রচিত *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal* (১৯১৭) গ্রন্থের preface (১৯১৫ পৃ V-VI) অংশে এবং J. D. Anderson -কৃত *A Manual of the Bengali Language* (১৯২০) গ্রন্থের ১১-১২ এবং ১০৬-০৮ পৃষ্ঠায়। বাংলা ছন্দ সম্পর্কে অ্যান্ডারসনের অভিমত এবং সে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা ছন্দ নিয়ে ভাবতে ও কৌতূহলী প্রশ্ন করতে অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের আনন্দের শেষ ছিল না। তিনি মনে করতেন একজন ভাষানিপুণ বিদেশীর পক্ষেই কোনো ভাষার গলি-ঘুঁচি জানা এবং প্রকৃতিগত বিশেষত্বের খুঁটিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব। তাই তুলনাত্মক আলোচনার পন্থানির্দেশও তার পক্ষেই সম্ভব। স্বভাষাভাষীর পক্ষে সব সময় তা সম্ভব হয় না। কারণ ভাষাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা থাকায় ভাষার অনেক কিছু তার চোখ এড়িয়ে যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম। কারণ কবিপ্রতিভার সঙ্গে সূক্ষ্মরসবোধপুষ্ট সমালোচনা-শক্তি এবং দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে তাঁর সত্তায়, ইংরেজ কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র মিলটন ও ড্রাইডেনই যার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা গদ্য ও পদ্যের সঙ্গীতময়তার সৌন্দর্য ও বিচারবিশ্লেষণে তিনি বিমুগ্ধ, যা বহুলাংশে কেবলমাত্র ফরাসী ভাষায় লক্ষ করেছেন। প্রস্বরের প্রকৃতি ও স্থান নিয়ে তিনি বেশ সূক্ষ্ম অথচ যথার্থ প্রশ্ন তুলেছেন। আপাতভাবে চললেও বাংলায় কেবল অক্ষরবিন্যাসকে ছন্দ বলা যায় না। ফরাসীতেও তা হয় না। বাংলার প্রস্বর ফরাসীর মতোই স্থান বদল করতে পারে শব্দপ্রয়োগের অনুকূলে। তবে বাংলায় প্রস্বর শব্দ বা পর্ব-পদের শুরুতে পড়ে আর ফরাসীতে শব্দ বা পর্ব-পদের শেষে পড়ে। বাংলায় বিরতির ঠিক পরে, কিন্তু ফরাসীতে বিরতির ঠিক আগে বাক্‌প্রস্বর (phrase accent) পড়ে। বলাই বাহুল্য বাংলা ও ফরাসী ছন্দের মূলভিত্তি হল এই বাক্‌প্রস্বর। বাংলায় মিল প্রস্বরও আছে।[১৮] বাংলায় শব্দপ্রস্বর থাকলেও তা বাক্‌প্রস্বরের অধীন, কখনো প্রবল হতে পারে না। যাই হোক বাক্‌প্রস্বরের গুরুত্ব এবং শব্দ-প্রস্বরের অভাবের বিচারে বাংলা ও ফরাসীতে বেশ মিল আছে। ইংরেজি-হিন্দীর উচ্চারণ ভিন্নতর। তাঁর মতে প্রত্যেক ভাষারই তার প্রকৃতিসুলভ ছন্দ আছে সতর্ক ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসায় যার পরিচয় পাওয়া সম্ভব।[১৯] বাংলা ছন্দতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার পাশে ইংরেজি কবিতার পংক্তি উদ্ধার করে বাংলার মতো তার ছন্দোলিপি তৈরি করে বাংলা ও ইংরেজি ছন্দে সাম্য দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অ্যান্ডারসনের তা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তার সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ করেন। কারণ বাংলা কবিতার স্পন্দন ও ছন্দ ইংরেজি কবিতার স্পন্দন ও ছন্দ থেকে ভিন্ন। বড় জোর বেশ আয়াসে কিছু কিছু ইংরেজি কবিতা এমনভাবে পড়া যেতে পারে যাতে বহুদল-ভিত্তিক বাংলা ও ফরাসী কবিতার মতো তা শোনাতে পারে।[২০] তাতে Trochaic (-υ), Dactylic (-υυ) এবং Iambic (υ-) জাতীয় ছন্দস্পন্দও পাওয়া যেতে পারে। এই জাতীয় সাদৃশ্যমূলক চিন্তা পূর্বে হালহেডও করেছিলেন।[২১] Accentuated ছন্দে রচিত ইংরেজি কবিতা মূলতঃ প্রস্বর-সংখ্যা-আশ্রিত, অক্ষর-সংখ্যা তাতে গৌণ। সুতরাং Syllabic বা দলবৃত্ত বলতে যা বোঝায় ইংরেজি কবিতার ছন্দ তা নয়। সেইজন্য কোনো ইংরেজ কবি বাংলা কবিতা লেখেনি। কারণ বাংলার স্পন্দনলীলা ও লালিত্য কোনো ইংরেজের পক্ষে আয়ত্ত করা শক্ত। তাহলেও কোনো বন্ধুর কাছে বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অ্যান্ডারসন স্বয়ং পয়ার ছন্দে ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি।[২২] তাতে তিনি বাংলা পয়ারের মতোই চার পর্বের আদিতেই প্রস্বর দিয়েছেন, যা ইংরেজিতে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ইংরেজি প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যা এ-জাতীয় রচনায় প্রয়োগ করা যায় না উপরন্তু তিন বা ততোধিক'atonic syllables together' পাওয়াও কঠিন। কিন্তু রচিত পয়ার "Shows four beats followed by three atonic syllables." সেই বিরল অথচ মূল্যবান ইংরেজি পয়ারের পংক্তি কয়টি এখানে দেওয়া গেল:—

Such is the melodious the delicately chiming
Metre of Bengali in its pauses and its rhyming.
Triping to the measure of a dance of little feet
Perilously simple, like the jingle of the sweet
Bells upon the ankles of the dancens as they pose
Bells upon their ankles, yes and rings upon their toes.[২৩]

এখানে বাংলা ছন্দের সুন্দর-সুললিত পরিচয় তুলে ধরেছেন অ্যান্ডারসন অনবদ্য ভঙ্গিতে পয়ারে। বাংলায় না-ই সই, ইংরেজিতেই বা কয়জন ইংরেজ পারে বা চেষ্টা করে?

অ্যান্ডারসন প্রাচীন বা সাধু পয়ারের সঙ্গে আধুনিক বাংলা পয়ারের উচ্চারণ প্রকৃতিতে পার্থক্যের কথা বলেছেন। প্রাচীন পয়ারে স্বরান্ত উচ্চারণ ছিল, আধুনিক পয়ারে তা নেই বললেই হয়। এই দুই স্তরের পয়ারের মধ্যে যে ধ্বনিভারগত পার্থক্য আছে তাও তিনি লক্ষ করেছেন, তবে তার কারণ যে ছন্দোরীতিগত পার্থক্য তা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল না--বলে মনে হয়। তাঁর বিচারে দুই স্তরের পয়ারই 'অক্ষরভিত্তিক' (syllabic) । আসলে প্রাচীন পয়ার। তা হলেও রবীন্দ্র-রচিত আধুনিক পয়ার ('আমার মিলন লাগি তুমি' ও 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি') দলবৃত্তে রচিত। তাই তাঁর কাছে অভিনব এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ সম্মত বলে মনে হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের এই দলবৃত্ত পয়ারের তুলনা করেছেন ভিক্‌টর হ্যগোর (১৮০২-১৮৮৫) তিন বা চার মধ্যযতির ব্যবহারকুশলতার সঙ্গে। আর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মূল্যায়ন করেছেন।[১৪] বাংলায় সাধারণতঃ আমরা দ্বিদল বা দ্বিমাত্রক শব্দই স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্চারণ করি। রবীন্দ্রনাথের দলবৃত্ত কবিতার উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অধিকাংশ শব্দই দ্বিদল। এটাও এন্ডারসন লক্ষ করেছেন। তাতে তিনি 'Tripping Trochaic effect' অনুভব করেছেন যা ধ্বনি-আশ্রিত ছন্দেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'সমচলনের' ছন্দ বলেছেন। এই প্রসঙ্গে অসম (ত্রিদল বা ত্রিমাত্রক) এবং বিষম (৩ + ২ = ৫ দল বা মাত্রা এবং ৩ + ২ + ২ = ৭ দল বা মাত্রার) চলনের ছন্দের কথাও স্মরণীয়। সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশক্রমে অ্যান্ডারসন লাটিন ছন্দের প্রসঙ্গ এনেছেন। লাটিন ছন্দের উদাহরণ রচনা করেছেন। তাতে 'long' বা প্রলম্বিত দলের বদলে 'stressed' বা প্রস্বরিত দল ব্যবহার করেছেন[১৫], যা তাঁর ছন্দ চিন্তার গভীরতা ও বাস্তববোধের পরিচায়ক। বাংলার মতোই ফরাসীতেও দলবৃত্ত ছন্দ আছে। এমনকি চেষ্টা করলে ইংরেজিতেও তা লেখা যায়। বাংলা ছন্দে সুস্পষ্টভাবে বিরাম বা যতির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন অ্যান্ডারসন। তাঁর মতে 'caesuras, pauses, ফাঁকs' প্রভৃতি ছন্দ অনুধাবনে ও ছন্দোরস উপভোগে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বাংলা ও ফরাসী ছন্দে এই যতিগুলি অপরিহার্য। কারণ এরাই দলের প্রলম্বন নিয়ন্ত্রণ করে। আর তার উপরই ছন্দের নৃত্য বা গতিভঙ্গি ও মাধুরী নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের 'অনুচ্চারিত মাত্রা' বা 'যতির মাত্রা'-র অবস্থান বা অস্তিত্ব ও উপযোগিতা বুঝতে বিলম্ব হয়নি অ্যান্ডারসনের। বলেছেন—ইংরেজির মতো শব্দ-প্রস্বর আশ্রিত ছন্দে এই অনুচ্চারিত মাত্রার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বাংলার এই 'যতিমাত্রা'য় পূর্ববর্তী ধ্বনির দৈর্ঘ্য এবং ওজন বেড়ে যায় আর ছন্দ-পংক্তির প্রত্যাশিত মাত্রামান বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্র-প্রবন্ধে ইংরেজি কবিতার ছন্দকে বাংলার মতো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলা উচ্চারণ সুলভ ধ্বনি-পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন কোনো কোনো পংক্তি বা পদের প্রথম ধ্বনিকে 'অতিপর্ব' রূপে গণ্য করে। যদিও মূল ইংরেজি কবিতায় অতিপর্ব নেই। তাই তার পাঠও ভিন্নতর। সে সম্পর্কে অ্যান্ডারসন বলেছেন- " But to an Englishman, the syllables [shown at the beginning of the lines] .. are not extrametrical at all .. In short in English we need not begin on a strong or long one as in French. And as your own quotations show the metrical units can come in the middle of the words and are independent of pause, caesura, ফাঁক'

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৬৪-৬৫ [১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮, চিঠি]

এই আলোচনাতে বাংলা, ফরাসী ও ইংরেজি কবিতা পাঠের প্রভেদ বেশ সহজ ও সুন্দরভাবে

ফুটে উঠেছে।

ইংলন্ডের তৎকালীন রাজকবি রবার্ট ব্রিজেসের কাছে অধ্যাপক অ্যান্ডারসন রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ে যে সব অভিমত প্রকাশ করেন, তাও বাংলা ছন্দ, বিশেষ করে রবীন্দ্র-ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। তাছাড়াও তিনি বলেছেন বাংলা-ফরাসী সহ কয়েকটি ভাষার ছন্দের একক সেই ভাষার সাধারণ উচ্চারিত এককের সঙ্গে এক। কবিতায় তা নিশ্চিত বিরামের পর দেখা দেয়। আর বাংলার মিলকে তিনি ফরাসী মিলের মতো পুরুষালী (Masculine) ও মেয়েলী (Feminine)—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পয়ারের মিলকে আলেকজান্ডার পোপের (১৬৮৮-১৭৪৪) মিলসম্পদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন রবীন্দ্রকবিতাকুঞ্জ মিলের বিচিত্র পুষ্পে সুশোভিত। ফরাসীর মতোই মিলের অনুবর্তনে শ্রুতিসুখকর হয়েছে বাংলা কবিতা পাঠ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দসম্পদ ও তাঁর প্রয়োগবিধি ষোড়শ শতকের বাঙালি কবি ও বাংলাসাহিত্যের ছন্দসমৃদ্ধির কথা মনে করায়। বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ-বৈচিত্র্যের কথাই সম্ভবতঃ এপ্রসঙ্গে বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গিকে সহজভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর কবিতায় যা, এডমান্ড স্পেন্সর (১৫৫২-১৫৯৯) এবং উইলিয়ম ড্রমন্ডের (১৫৮৫-১৬৪৯) কাব্যকলার মতো আত্মপ্রকাশ করেছে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ও সুন্দরমধুর প্রভাবী শক্তির সমন্বয়রূপে।

অ্যান্ডারসনের বিভিন্ন ও বিচিত্র জিজ্ঞাসা মেটাতে রবীন্দ্রনাথ যে সব পত্র-প্রবন্ধাদি লিখেছেন তাতে তাঁর তৃপ্তি বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন ও জেনেছেন তা তুলনাহীন মনে করেছেন। ৮ জানুয়ারি ১৯১৯ তারিখের পত্রে অ্যান্ডারসন লিখছেন—

" I am straying away from your letter, from the most interesting ingenious and revealing things you say about ছন্দ"

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৭১।

রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যের ছন্দকে অধ্যাপক এন্ডারসন 'Vers libres' বলে অভিহিত করেছেন। ফরাসীতেও অনুরূপ প্রয়োগের কথা বলেছেন। কিন্তু এই দলবৃত্ত মুক্তক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি, ফরাসী বা ইংরেজি অনুসরণ-অনুকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় ছন্দ-প্রজ্ঞার কথা তিনি 'Experimental Phonetics' প্রবন্ধে আলোচনা করেন।[১৬] বাংলা ছন্দের নাড়ি-নক্ষত্র জানতে ও জানাতে এবং সেই সম্পর্কে নিজের চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত করতে অ্যান্ডারসন ফরাসী ও ইংরেজি ছন্দের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই জাতীয় আলোচনায় সুষ্ঠু-সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় ছন্দ আলোচনায় সংস্কৃত-প্রাকৃত পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বহমান ভাষার উচ্চারণ-প্রকৃতি বদলে গেছে, ছন্দের প্রকৃতি ও প্রয়োগকৌশলেও পরিবর্তন এসেছে কিন্তু যুগোচিত পরিভাষার নিতান্তই অভাব এদেশে—সে কথা অনুভব করেছেন অ্যান্ডারসন। ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষর, মাত্রা, পদ ও চরণ এবং কয়েকটি ছন্দোবন্ধের নামই পাওয়া যায় মাত্র। সুতরাং উপযোগী পরিভাষার অভাবে বাংলা ছন্দের আলোচনা প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছুতে পারে না—এটাও তিনি লক্ষ করেছেন। আবার ইংরেজি ও ফরাসী ছন্দের প্রকৃতি বাংলা থেকে ভিন্ন হওয়ায়—ওই দুই ছন্দের পরিভাষা বাংলাছন্দের আলোচনায় সুপ্রযুক্ত হতে পারে না। তাই উপযুক্ত পরিভাষার অভাবের কথা বলেছেন আর কবিতা সুর করে পড়া বা গাইবার ব্যাপারটিও তিনি ভালো চোখে দেখেননি। বলেছেন—

" In India the task is rendered more difficult by two facts : (1) the technical terms of prosody are (as in Europe for the matter) borrowed from classical, i.e quantitative prosody ; (2) as you rightly stipulate Indian verse is affected by the fact that it is chanted, not recited."

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৫০।

লক্ষণীয়, সব ভারতীয় ছন্দ সম্পর্কে না হলেও বাংলা কবিতা ও ছন্দ সম্পর্কে বেশ জোরের সঙ্গে বলা চলে কবিতা আজ আর সুর করে গাওয়া হয় না এবং বাংলাছন্দ আলোচনার উপযুক্ত পরিভাষাও গড়ে উঠেছে।

'অক্ষরবৃত্ত' (syllabic) ছন্দে Blank-Verse সুন্দর ও সার্থকরূপ পেতে পারে কিনা—সে প্রশ্নও তুলেছেন। কারণ অক্ষরবৃত্তে মধ্যযতি (caesura) গুরুত্বপূর্ণ ভাবপ্রবাহ-খন্ডক। ফরাসীতে এই জাতীয় প্রয়াস সার্থক হয়নি। বাংলায় মধুসূদনের প্রয়াস যুগান্তকারী হলেও তাতে অ্যান্ডারসনের কান-মন প্রসন্ন হতে পারেনি। তাতে মনে হয় Blank-Verse কে ইংরেজির মতোই তিনি অন্যভাষাতেও পেতে চান। কিন্তু সব ভাষারই আপন আপন প্রকৃতি আছে। তার অনুযায়ীই তার ছন্দ রচিত হয়। সুতরাং বাংলা ছন্দের প্রকৃতি অনুযায়ী Blank-Verse যে অমিল প্রবহমান পয়ার হয়ে উঠেছে—তাই বা কম কি? অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

বাংলা ছন্দবিদ্যার প্রতি অনুরক্ত অধ্যাপক অ্যান্ডারসন বাংলা ছন্দতত্ত্ব স্বদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি পয়ার রচনা করেন সেকথা আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি পত্র-প্রবন্ধ এবং একটি ছন্দ বিষয়ক ভাষণ ইংবেজিতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'বাংলা ছন্দ'—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় এবং 'ছন্দেব অর্থ' (পূর্বনাম 'ছন্দ') হল সেই তিনটি প্রবন্ধ। অনুবাদ তিনি রবীন্দ্রনাথকেও পাঠিয়ে ছিলেন।[২৭] পাঠিয়েছিলেন রবার্ট ব্রিজেসকেও।[২৮] ব্রিজেস কোনো বাঙালিকে দিয়ে সে প্রবন্ধ এবং তাতে উদ্ধৃত কবিতা পংক্তি পড়িয়ে শোনেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে প্রশংসাও করেছিলেন। আরো অনেকের কাছে ববীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তা বা বাংলা ছন্দতত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন অ্যান্ডারসন। তাঁদের মতামত জানা বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে জে. ডি. অ্যান্ডারসনের কি অভিমত তা আর একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

"The thing has been done, once for all, in the case of European languages, and French Verse has been measured. It is as varied as intangible as sensitive, as Bengali verse. Yet this general rule emerges that in every language, the poet makes use of some dominant audible quality belonging to that language and so creates a music which can be reproduced by any one who can speak that language like a native, and by no one else. The rhythm may be one that is found in all, or in many languages. But each language will produce it by its own proper means. And I impenitently continue to believe that in Bengali this means is a phrasal accent falling on the first or second syllable after a pause, a caesura, a ফাঁক whereas in English, for example, metre and rhythm are independent of pauses, and are simply a matter of putting stresses at regular inter-

vals, separating them from one another by unstressed syllables or equivalent pauses ... The thing can now be put to the test of absolute physical experiment. ... Note that I do not contradict a single one of your assertions. I merely suggest that they are not necessarily inconsistent with my theory, which is merely an attempt to account for the fact that any one who can talk Bengali can catch the rhythm of your verses"-

—ছন্দ (১৯৬২), পাঠপরিচয়, পৃ ৩৭২-৭৩।

দেখা যাচ্ছে বাংলা ছন্দতত্ত্ব ও রবীন্দ্রছন্দ-চিন্তাকে আরো পরিপূর্ণ ও ব্যাপ্ত করার ব্যাপারে অধ্যাপক অ্যান্ডারসনের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। অ্যান্ডারসন ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথ ছান্দসিক অ্যান্ডারসনকে চিনতে ও বুঝতে বিলম্ব করেন নি। প্রশ্ন-উত্তর ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে উভয়েই উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের ছন্দ-জিজ্ঞাসা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি প্রশমিতও হয়েছে বহুলাংশে। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মতান্তর থেকেই গেছে, কিন্তু তাতে ছন্দ-চিন্তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি। তার ফলে বাংলা ছন্দ-অনুরাগীর দল যারপরনেই উপকৃত হয়েছে। বাংলা ছন্দ-সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে রবীন্দ্র-রচিত ছন্দ-বিষয়ক অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছন্দ'। সুস্পষ্ট এবং উন্নত হয়েছে আমাদের ছন্দ-ধারণা। ভারতীয় ও বিদেশী দুই ছান্দসিকের মিলিত প্রয়াসে বাংলা তথা ভারতীয় ছন্দ-চিন্তায় সম্ভব হয়েছে বিস্ময়কর পরিবর্তন, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি। বাংলা ছন্দের এই নবীন সমৃদ্ধি সঞ্চারিত হয়েছে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছন্দে রবীন্দ্রকাব্য- শিল্প ও ছন্দ-চিন্তার মাধ্যমে।

উল্লেখসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার তৃতীয়পর্ব ১৩৩৮-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। এই পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল 'ছন্দ-বিতর্ক'। তাতে যোগ দেন প্রবোধচন্দ্র সেন, দিলীপকুমার রায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে।

২। "The Bengal measures are altogether borrowed from the Sanskrit, and may be divided into three species : Heroic, Lyric and the গীত or Elegiac."

-*A Grammar of the Bengal Language*, p. 197.

৩। "The verses of the Bengales are regulated by accent and by the number of syllables in a line : no regard whatever being paid to quantity, but as it co-incides with accent."

-Do. p. 196

৪। "as কর‍্যা for করিয়া, বল্যা for বলিয়া ...."

-Do. p. 196

৫। "Their poems, like those of the Arabians and Persians, are in rhyme, which appears to suit the genius of most of the Asiatic languages

and to have been in use from the earliest antiquity."

-Do. p. 196.

৬। "We have lyric measures in English which answer to all these verses of the Bengalese : Thus in Milton

"As when the dove, laments her love,
all on the naked spray;
When he returns, no more she mourns,
but loves the live-long day !"

-Do. p. 204

৭। Do. p. 204.

৮। "Should ever a poetical man arise among the people, who should dare to deviate from the beaten path, and taking as his exemplar the 'Anustup', the Sanscrit heroic metre, communicate his sentiments, in that manly form there might yet be seen some noble poetry in Bengali."

—প্রবোধচন্দ্র সেন: বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দ চিন্তার অগ্রগতি (১৯৮৯), পৃ৯৯।

৯। দ্রষ্টব্য: বর্তমান লেখকের 'বাংলা ছন্দ পরিচয়' (১৯৮৯), 'বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ' পৃ ১০৩-১০৯।

১০। "The fourteen syllables are divided into two parts, the first containing eight, the second six syllables. The first and the nineth syllables are long ones and by these the reader must be guided."

—প্রবোধচন্দ্র সেন: বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি (১৯৮৯), পৃ ১০০।

১১। "It will easily be seen that after the eighth syllable there is usually a caesura, though not always, omission of it is very harsh.

—পূর্ববৎ, পৃ ১০১।

১২। "... possess a regularity of arrangement, harmony of sound and softness of cadence, which delight the ear."

—পূর্ববৎ, পৃ ১০২।

১৩। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থ সম্পাদক ওয়েঙ্গারের একটি অভিমত লক্ষণীয়:- "It is however, extremely doubtful whether any iambic metre can never be successfully introduced into a language which seems to abhor it."

—পূর্ববৎ, পৃ ১১০।

সম্ভবতঃ সেই কারণে রেভারেন্ড য়েট্স্ নীরবতা আশ্রয় করেছেন।

১৪। "In all languages, the three qualities of accent of force (stress), accent of height of sound (pitch) and quantity exist. The question in any given language is, which of these qualities is so dominantly audible as to be the basis of metre? It is theoretically possible that more than one of them may be so used, though I confess I do not think it is likely. English metre consists of the regular recurrences of stress ... In French

the dominant audible quantity is that they call the accent-tonique, which dominantly arises of pitch."

--বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১৯১৪), পৃ ৮৩-৮৪ পাদটীকা

১৫। "May I say a few words on a more technical subject for the consideration of experts in Bengali language and literature? ... Metre in all languages, as most of us know, is a subject of much disputation, and he would be a rash man, indeed, who should pretend to be dogmatic on the subject of the metre of a foreign language."

--D. Sen, *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal* (1917), preface, p.V.

১৬। "There is no theoretical account of Bengali metre in print ... I may be allowed to suggest that a complete analysis of Bengali metre with copious examples is much to be desired."

Do. p. X.

১৭। "But there is no reason whatever, why the existing facts of Bengali pronunciation and verse should not be analysed and described."

Do. p.X.

১৮। "... the rhythm, in Bengali must necesssarily be a falling rhythm considering of such feet as, -υ. -υυ. -υυυ-υυυυ. whereas in French it consists necessarily of feet of the types υ-, υυ-, υυυ-, υυυυ-"

-J. D Anderson, *A Manual of the Bengali Language* (1962 ed) Phrasal Accents, p. 11.

১৯। "What I want you to admit is that each type of language must necessarilly have its own type of prosody."

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৪৯।

অ্যান্ডারসনের এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ উক্তি:- "প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ ছন্দ রচনা করিতে হয়।" এটি জে ডি. অ্যান্ডারসনকেই লেখা পত্রের (৬ ফাল্গুন ১৩২০) অংশ। এরই প্রতিধ্বনি ও সমর্থন রয়েছে অ্যান্ডারসনের বক্তব্যে।

২০। "O the dreary/ dreary moorland/
O the barren/ barren shore/"
which make it equivalent of

রাতটা কেমন আঁধার আঁধার
বাতির ছায়া কেমন ঘোর।

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৩৯।

২১। দ্রষ্টব্য: ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৪১।

২২। দ্রষ্টব্য. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খন্ড,(১৯১৪), Introduction, পৃ৮২।

২৩। দ্রষ্টব্য: ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩২৯।

২৪। "In the old fashioned payar the second and fourth accents seem to be artificial metre accents not necessarily heard in prose. In your beautiful innovation on the payar (singularily like Victor Hugo's use of ternary and quaternery caesuras) it seems to me that by introducing intermediate caesuras, you are giving a more natural and easy effect to the second and fourth beats, so that they fall on initial syllables which could be acceented in ordinary speech."

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩২৯। চিঠি, ২ জুন ১৯১৩।

২৫। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বাংলায় সংস্কৃত আরবি-ফারসি প্রভৃতি ছন্দ আনতে চেষ্টা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি গুরু বা long ধ্বনির বদলে রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। আর এই জাতীয় বহিরাগত ছন্দের নাম দিয়েছেন—'বাংলাছন্দের দৃপ্তশ্রী মূর্তি।' (দ্রষ্টব্য ছন্দ-সরস্বতী, ১৯৭৪, পৃ ২৬)।

২৬। Times Literary Supplement পত্রিকা, এপ্রিল ৩, ১৯১৯, পৃ. ১৮২-৮৩। সেই প্রবন্ধের একটি প্রাসঙ্গিক অংশ হল:—

"Sir Rabindranath has recently published a little volume of versés, called '*Palataka*", composed wholly in *vers libres* of a sort never before, I think, attempted in Bengali and singularly resembling similar experiments in French verse. The poet has arrived at these not by imitation of French or English verses, but by supplying words to the haunting melodies which come to his mind in surprising profusion and variety."

—ছন্দ (১৯৬২), পাঠপরিচয়, পৃ ৩৭৭।

২৭। "Herewith I submit an attempt to put your letter on metre into English. I hope I have got the gist of your argument correctly represented."

ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৩৪।

২৮। " I am thinking of making a careful translation of your lecture and sending it to Dr. Robert Bridges, the poet Laureate, who, as you know, is an enthusiastic student and theorist of metre and rhythm, ... I shall take an early opportunity of telling Sir A Quillar Couch about your theories. He is professor of English Literature here and has written pretty and ingenious verses in his days."

—ছন্দ (১৯৬২), পৃ ৩৫৯-৬০।

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল

উত্তম দাশ

১.

শিরোনাম পঙ্‌ক্তির স্পর্ধা ও দুঃসাহস চিনিয়ে দেয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব উচ্চারণ। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে এই নামে তাঁর যে কবিতার বই বেরিয়েছিল তার নাম-কবিতায় কিন্তু ছন্দ-ভাঙার বা ছন্দ-বর্জনের কোন চিহ্ন নেই। বরং আছে ছন্দ-অনুগত এক কবির আত্ম-আবিষ্কারে ছন্দের অন্তর্লীন শক্তিকে যথাযথ ব্যবহারের আশ্চর্য দক্ষতা। এই কবিতার অন্তিমে শক্তি লিখেছেন, 'শব্দের ভিতরে প্রাণপণ রঙ ঢালি, প্রাণপণ—আতিশয্য নয়।' আজীবন ছন্দ-লালিত এই কবির কবিতায় ছন্দ সম্পর্কেও একথা সত্য। শব্দের মধ্যে আতিশয্যহীন যে রঙ তিনি ঢেলেছেন সারাজীবন, সেখানে ছন্দই ছিল তাঁর মূল সহায়। কবিতায় ছন্দের ব্যায়াম নয়, ছন্দ-পরীক্ষার গবেষণাগার করে তোলাও নয় কবিতাকে। আতিশয্যহীন যথাযথ ছন্দের ব্যবহারে ক্রমাগত মেলে ধরা কবিতার রহস্যভূমি। ছন্দের তন্তুজাল ছিঁড়ে ছন্দকে ব্যবহার জীবনের বহুমুখী উচ্চারণে, এই ছিল শক্তির সারা জীবনের সাধনা।

কিন্তু 'আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল' জাতীয় উচ্চারণে এমন ভ্রম হতেই পারে যে শক্তি বুঝি ছন্দের তন্তুজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন কবিতায়। শব্দের অভিধা খুবই ভুল ধারণা তৈরি করে অনেক সময়। বিশেষ যেখানে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার মতো ছন্দোহীনতার অভিযোগও প্রবল। কোন্ ছন্দ-বিদ বা কবিতার অসহিষ্ণু পাঠক রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে ছন্দোহীনতার অভিযোগ তুলেছিলেন, তা এখন গবেষণার বিষয়। তবে গুজবটা বেশ ছড়িয়েছিল। এর একটা কারণ বোধ হয় এই, সরল বুদ্ধির পাঠক মিলহীন কবিতাকেই ছন্দ-হীন কবিতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। অথচ তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতা ছিল মূলত ছন্দ-নির্ভর। এমনকি মিলের এমন সব আশ্চর্য সূক্ষ্মতা দেখা দিয়েছিল এ সময়ের কবিতায় যা এক-কথায় অভাবিত। কিন্তু এমন নয় যে গদ্যবন্ধে এ পর্বে কবিতা লেখা হয়নি, হয়েছে, যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যা এমন নয় যে একটা ভ্রান্ত ধারণা লালিত হতে পারে যে আধুনিক কবিতা ছন্দোহীন। গদ্যকবিতারও যে ছন্দ আছে, ছন্দ যে শুধু মাত্রা-নির্ভরতা নয়। নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিস্পন্দই যে ছন্দের প্রাণ—এসব জটিল তর্কে না গিয়েই ইতিহাসের সাক্ষ্যে এ কথা বলা যায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশের কালসীমায় কোন একজন কবিও শুধু গদ্যছন্দে কবিতা লেখেননি। বিশিষ্ট নাগরিক কবি সমর সেনও নয়। বরং তিরিশের কবিরা, যাঁরা বাংলা কবিতায় নতুন জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠা দিলেন নতুন কবিভাষায় তাঁরা ছন্দের অন্তর্লীন শক্তিকেই ব্যবহার করলেন কবিতার

রূপবন্ধে। প্রথাবদ্ধ ছন্দকে নতুন অভিজ্ঞতার চাপে ব্যক্তিগত উচ্চারণে এমনভাবে স্থাপন করলেন যে ছন্দ আর কবিতার বহিরঙ্গ রইল না, প্রচল রীতি ভেঙে ক্রমাগত তা হয়ে উঠল অনন্ত সম্ভাবনা-মুখী।

আসলে আধুনিক কবিতার গদ্যভাষাই পাঠককে ছলনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে নিজস্ব স্বকীয়তায় যেসব কবি আলাদা হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এমনকি যতীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের ভাষাও ছিল পদ্যের। এঁদের ব্যক্তিত্বে প্রত্যেকেরই কবিভাষা পরস্পর থেকে আলাদা সন্দেহ নেই। নতুন আকাঁড়া শব্দের ব্যবহারে বা আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগেও পদ্যের ভঙ্গি এঁদের কারো কবিতা থেকে বর্জিত হয়নি এবং ছন্দের ব্যবহারও ছিল রীতিনিষ্ঠ বা পরীক্ষামূলক। যার কোনটিই ক-বিভাষাকে ভিন্নরূপ দিতে সাহায্য করেনি। তিরিশের দশক থেকে যে অকস্মাৎ কবিভাষা পাল্টে গেছে এমন নয়, এমনকি সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারও প্রচুর কিন্তু বিভিন্ন কবির কবিভাষায় যে প্রবণতা প্রবল হয়েছে তা হলো কবিতায় পদ্যভঙ্গির পবিবর্তে গদ্যভঙ্গির সচেতন প্রয়োগ। বাঙালি পাঠকের সংস্কারে এটাই ছিল মূল আঘাত। দ্বিতীয় আঘাত ছন্দের রীতিনিষ্ঠ রূপ থেকে সরে আসা।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই ছন্দের রীতিনিষ্ঠ রূপ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষাতেও তার ব্যত্যয় হয়নি। চর্যাপদ থেকে বাংলা ছন্দের বিবর্তন যাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের কাছে এটা পরিচ্ছন্ন যে ভাষার বিবর্তন-পথ ধরেই ছন্দের রীতিনিষ্ঠ রূপ গড়ে ওঠে। ভাষার নিজস্ব উচ্চারণই ছন্দ-প্রকৃতির স্বভাব তৈরী করে। কিন্তু তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রতিভাবান কবির। পয়ারবন্ধ রূপে মিশ্রবৃত্তের রূপবন্ধ মধ্যযুগের শুরুতেই বেশ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাঙালির নিজস্ব উচ্চারণের সহযোগে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা লোকমুখে সংস্কারের সুযোগ পায়নি। এই বইতেই মিশ্রবৃত্তের স্বকীয় রূপটি ধরা পড়েছে। তার পরের দু'তিনশ বছর ছিল এই ছন্দের রীতিতে প্রতিষ্ঠার অনুশীলন। শব্দমধ্যে রুদ্ধদলের উচ্চারণে কিছু গরমিল ঘটছিল, ভারতচন্দ্রে এসে যা স্থিত হয়েছে বলা যায়। এই ছন্দকে আরো রীতিনিষ্ঠ ও সম্ভাবনাময় করেছেন ভারতচন্দ্রের ঠিক একশ বছর পরের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মিশ্রবৃত্তের পঙ্‌ক্তি-যতি তুলে দিয়ে মধুসূদন রীতিনিষ্ঠ এই ছন্দের বহুমুখী সম্ভাবনার দরজাটি খুলে দিলেন। পরের ইতিহাস একালে সকলের জানা। আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার কাজই হলো ভাষার সম্ভাবনাকে বহুগুণিত করা, স্বাভাবিকভাবে ছন্দেরও। মুক্তকের আবিষ্কার তো শুধু ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দেই যে কবিতার মুক্তি, এই কথাটিকেই বাস্তবে স্থাপিত করলেন তিনি।

দলবৃত্তের রূপবন্ধটি লোকছন্দের, এ জাতীয় উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন থাকলেও, এর মধ্যে অন্য একটি সত্য অস্বীকারের সম্ভাবনা থাকে। প্রাচীন মধ্যযুগের সব কবিতাই তো লোকজীবন নির্ভর ও লোকজীবন উদ্‌গত। যতদিন কবিতা ছাপা হয়নি, ততদিন কবিতার শিষ্ট রূপও তৈরি হয়নি। ব্যক্তিগত কবিতাই হোক বা গোষ্ঠীগত কবিতা, ছাপাখানার আগে পর্যন্ত তাকে সুরনির্ভর হতেই হয়েছে, লোকজীবনের উচ্চারণে তার ভাষারূপ পাল্টেছে। ছন্দরূপ তো অনড় কোন বস্তু নয়, লোকজীবনের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিবর্তন ঘটেছে। দলবৃত্তের রূপটি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব বা লোচনদাসের রচনায় ধরা দিলেও এ রূপটি স্বকীয় হয়েছে রামপ্রসাদের কবিব্যক্তিত্বে। আসলে ছন্দের রূপ নির্মাণে কবিব্যক্তিত্বের ভূমিকাই মুখ্য। দলবৃত্ত ছন্দের লঘু প্রকৃতির ধারণাটি রবীন্দ্রনাথ একেবারে চুরমার করেছেন বলাকায়। এই ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনা ধরা রয়েছে তাঁর

ক্ষণিকায়, পলাতকায় আর অনিবার্যভাবেই তাঁর গানে।

কলাবৃত্ত ছন্দের রহস্য রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন মানসীতে। যে কোন ছন্দের রীতিনিষ্ঠরূপ গড়ে ওঠে পর্যায়ক্রমে, বিবর্তনধারায়। মধুসূদন অস্পষ্টভাবে ধরেছিলেন কলাবৃত্তের প্রকৃতি, তার গতিপ্রকৃতি বা রহস্যের ভূমি তাঁর অনাবিষ্কৃত ছিল। কিন্তু বাংলাছন্দের নতুন রূপবন্ধের জন্য তাঁর স্পৃহা বেশ অনুভব করা যায় 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটকের কিছু গানে। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর রোমান্টিক কবিভাবনার অনুকূলে নতুন ছন্দরূপের অনুসন্ধান করেছিলেন। শব্দমধ্য রুদ্ধদল বর্জন করে কলাবৃত্তের একটা কাঠামো তিনি বেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনের প্রথম পর্বে বিহারীলাল থেকে কলাবৃত্তের এই রীতিই গ্রহণ করেছেন। তরুণ বয়সে তিনিও বিহারীলালের মতো ধরতে পারেননি শব্দমধ্য রুদ্ধদলের উচ্চারণ-রহস্য। সংস্কৃত মাত্রাছন্দের অনুসরণে ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী স্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হতো। কিন্তু বাংলা ভাষায় উচ্চারণে স্বরনির্ভরতা কমে যেতেই সংস্কৃত মাত্রাছন্দের রীতিতে কলাবৃত্তের মাত্রাবিন্যাস আর তত সহজসাধ্য রইল না। ফলত শব্দমধ্য রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই ছন্দের রীতিনিষ্ঠরূপ পরিচ্ছন্ন আকার নেয়নি। 'মানসী'-তে এই রহস্য আবিষ্কারের পরে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে এই ছন্দের বহুমুখী প্রবণতাকে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার দুই মৌলিক প্রতিভা যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রিয় শিষ্যের মতো কলাবৃত্তের নতুন রূপবন্ধটির প্রয়োগ করেছেন তাঁদের কবিতায়।

বহুকবির সাধনায় ছন্দের রীতিনিষ্ঠরূপ স্ফুট হতে থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্বই নির্দিষ্ট করে দেয় ছন্দের আভ্যন্তর সঙ্গতি। পরবর্তী কালের কবিপ্রতিভা পূর্বসূরীর নির্দিষ্ট ছন্দ-রীতি ভেঙে আবিষ্কার করতে থাকেন ছন্দের অনন্ত রহস্য। আসলে ছন্দ-রীতির সঙ্গে কবির জীবনসাধনা যুক্ত। সে কারণেই প্রত্যেক বড় কবিকে নিজস্ব কবিভাষার সঙ্গে ছন্দপ্রকৃতিকেও গড়ে নিতে হয় নিজ কবিমানসের অনুকূলে। ছন্দ যে কবিতায় বহিরঙ্গ উপাদান নয় সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় প্রতিভাবানের কবিতা পড়লে। সেখানে ছন্দেব অন্তর্মূল জড়িয়ে থাকে কবিতার অনন্ত রহস্যের সঙ্গে। উপায় ও উপেয় আভ্যন্তর সঙ্গতিতে পরস্পরের সাপেক্ষ তখন।

একজন কবির জীবনে ছন্দ-রীতি কাজ করে দুইভাবে। প্রথম স্তরে ছন্দের রীতিনিষ্ঠ পরিকাঠামোর ওপব নির্ভর কবে গড়ে ওঠে কবিভাবনা। চিন্তাকে সংহত ও পরিমিত রূপ দেবার জন্যই এই স্তরের ছন্দনির্ভরতা। কিন্তু ছন্দের রীতিনিষ্ঠ রূপটি যে কবির নিজস্ব অর্জন নয় তাঁকে ছন্দের দ্বিতীয় স্তবেব দিকে এগুতে হয়। এই স্তরে ছন্দের পরিকাঠামো বজায় রেখে কবি তাকে ভাঙেন ভেতব থেকে। ছন্দেব ধ্বনি-স্পন্দের সহায়তায় কবিতার অনন্ত রহস্যকে কবি মেলে ধরেন ছন্দের অভিনব ও অপ্রত্যাশিত রূপবন্ধে। এই স্তরটি ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনার স্তর।

মিশ্রবৃত্তেব পরিকাঠামো বজায় রেখে মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষব এই ছন্দের সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যবহার করলেন মিলে অমিলে, পরে ছোটবড় ছত্রবিন্যাসে মুক্তবন্ধে। শেষ পর্বে এই মুক্তক মগ্ন উচ্চাবণে ধ্যানের ভাষায় উন্নীত করল কবিচেতনাকে।

বাংলা তিনটি পদ্যছন্দেই রীতিনিষ্ঠ পরিকাঠামো তৈরি করে পরবর্তীকালে তাকেই ভেঙেছেন নিজের মতো। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকে পুরনো রূপবন্ধ আর ধারণ করতে পারেনি। অনিবার্য ছিল ছন্দের সম্ভাবনাকে তাঁর বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করা। এর ফলেই ছন্দ-চিন্তার দুটি স্তর তাঁর কবিতায় পূর্ণ বিকশিত। তাঁর পরবর্তী মৌলিক ভাবনার কবিদেরও ছন্দের এই মৌল ধারণাকে প্রয়োগ করতে

হয়েছে তাঁদের কবিতায়। বস্তুত তিরিশের বাংলা কবিতার অভিনবত্ব ও মৌলিক উচ্চারণ ছন্দপ্রকৃতির এই মৌল ধারণার প্রয়োগেরই ফল।

বাংলাছন্দের রীতিনিষ্ঠরূপ কিভাবে অনন্ত সম্ভাবনায় বিস্তৃত হয়েছে তার পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক পর্বের তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের কবিতা সূত্রে বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। মিশ্রবৃত্তের কিছু নির্দশন প্রথমে চয়ন করছি।

১। এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

—রবীন্দ্রনাথ, আরোগ্য, ৩৩।

২। হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বালটিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি।

—জীবনানন্দ দাশ, বোধ।

৩। চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।

—জীবনানন্দ দাশ, অবসরের গান।

৪। ধক করে লাগে বুকে —
— তুমি —
খুঁজি চারিদিকে।
আমি
রোদ্দুরে দরজা খোলা ঘরে।
উঠোন আকাশ,
একেবারে
ধুয়ে মোছা শেষ।

—অমিয় চক্রবর্তী, দুপুর।

৫। ডায়মন্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা
ইতিমধ্যে কলকাতায়: একত্রিশে চৈত্রেই চম্পট,
প্রকাশ, তাদের ইচ্ছা। (এবিষয়ে নিরুত্তর তারা।)

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নারদের ডায়রি।

৬। অণুকে জেনেছি ব্রহ্ম, দুইভাগ ব্রহ্ম আমি নিয়েছি জঠরে।
একভাগ জমা ছিল ঘরে।

এখন নিজের সঙ্গে দিবারাত্রি যুঝি;
যা ছিল ঘরের মধ্যে, চৌকাঠ পেরিয়ে তাকে খুঁজি
সমস্ত নিখিলে।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অন্নের তৃতীয় ভাগ।

৭। জলস্থল জুড়ে এক দারুণ কৌশল,
আমিও এক কৌশলেই আছি
সারাটা দিন ঘুরেটুরে বনবাগান
ঘরে ফিরে চাকের মৌমাছি।

—অরুণ মিত্র, কৌশল কথা।

৮। তারপর করিৎকর্মা রিপোর্টার ছোকরাকে ডেকে
চোখ টিপে বলে: ওহে,
কাল পার্কস্ট্রিট থেকে আউন্স তিনেক ফূর্তি
বা মেটেবুরুজ থেকে দু'চামচ দুঃখ কিনে এনো।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত, কাগজের লোক।

এই সাতটি উদাহরণেই রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত মুক্তকের প্রয়োগ আছে। লক্ষণীয় কিভাবে কবিরা মিশ্রবৃত্তের চার মাত্রার পর্ব, ইতস্তত পর্ব যতি লঙঘন, রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট-বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রথাগত পদ্ধতি বজায় রেখেছেন। সেইসঙ্গে মিশ্রবৃত্তের সম্ভাবনার দিকগুলোও কিভাবে ব্যবহার করেছেন সেগুলোও আমরা এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবো।

রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটি অমিল মুক্তকের। মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে সরল শব্দবিন্যাসে জীবনের পরম অর্জনকে নির্বারিত করেছেন কবি। ছন্দের স্বাভাবিক গতিস্পন্দকে কোথাও ভাঙছেন না। স্বতঃস্ফূর্ততায় যতি অনুসরণ করে ছত্রগুলো সাজিয়েছেন অসম করে। জীবনানন্দ দাশের প্রথম উদাহরণটি মুক্তকের সাবলীল নির্দশন। মিত্রাক্ষরে কথ্য ভাষায় স্বাভাবিক প্রয়োগ আছে। 'ঘুরিয়াছি'-র মতো সাধু ক্রিয়াও অনায়াসে প্রয়োগ করেন। এ জাতীয় প্রয়োগ পরের উদাহরণে আরো বেশি। দ্বিতীয় উদাহরণে মিশ্রবৃত্তের পুরো চেহারা ধরা আছে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে। কবির তীব্র ইন্দ্রিয়ময়তা সাধু-চলিত ক্রিয়ার মেলবন্ধনে বাস্তব জগতের অনুষঙ্গকে রহস্যভূমিতে স্থাপন করেছে। প্রথম উদাহরণে 'বালটিতে' শব্দে শব্দমধ্য রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট দুই মাত্রার উচ্চারণ মিশ্রবৃত্তের রীতি ভেঙেছে কিন্তু রুদ্ধদলের উচ্চারণের একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকেও এখানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। রুদ্ধদল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে সর্বত্রই দুই মাত্রার ওজন—কোন বিশেষ ছন্দের এটা লক্ষণ নয়। সব ছন্দেই এই উচ্চারণ রীতি আধুনিক পর্বের কবিরা গ্রহণ করেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাংশ মুক্তকের ক্রম-পরিণতি। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সহজ প্রকাশ এখানে। সংলাপের ভঙ্গি, কথাবার্তার স্বাভাবিক স্পন্দন এবং একক স্বর বা ব্যঞ্জনের মিলের কৌশল সব কিছুই কবি প্রয়োগ করছেন মিশ্রবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক ধ্বনিস্পন্দ বজায় রেখে।

চল্লিশ দশকের তিনজন কবির কবিতা থেকে এখানে উদাহরণ দিয়েছি। তিনজনের বাগ্‌ভঙ্গি আলাদা, জীবনদর্শনও ভিন্ন। কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কেও প্রত্যেকের আলাদা ধ্যান আছে। সুভাষের কবিতাটি তাঁর প্রথমজীবনের রচনা। মিশ্রবৃত্তের পরিমিত পঙ্‌ক্তি সজ্জা, মিল, পর্বের গঠন প্রথাগত। কিন্তু কবিভাষা স্বতন্ত্র। 'ডায়মন্ডহারবার' শব্দে শব্দমধ্য তিনটি রুদ্ধদলই দুই মাত্রায় উচ্চারণ

পেয়েছে। মিশ্রবৃত্তে শব্দমধ্য রুদ্ধদলের ও জাতীয় বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের সম্ভাবনা বেশ পরিণতি পাচ্ছে। ছন্দের ধারণ-ক্ষমতার এই শক্তি মিশ্রবৃত্তকে আরো সজীব ও গতিশীল করে তুলেছে।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতাংশে ধরা আছে সমিল মুক্তকের স্বচ্ছন্দ রূপ। মিশ্রবৃত্তের পর্ববিন্যাস বা দলের উচ্চারণ এখানে যথাযথ। অরুণ মিত্রের কবিভাষার মাধ্যম গদ্য। কিন্তু মিশ্রবৃত্তে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। একক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সহযোগ তিনি কিভাবে নিয়েছেন তা লক্ষ্য করার। 'আমিও এক', 'সারাটা দিন' এই দুটি পর্বে একক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই এদের মাত্রা সমতা রক্ষা করেছে। এবং এটা ঘটেছে খুব স্বাভাবিকভাবে, বাঙালির নিজস্ব উচ্চারণের পথ ধরে। এসব উদাহরণে বোঝা যায় রীতি ভেঙে ছন্দের সম্ভাবনা আবিষ্কার করাই মৌলিক কবিপ্রতিভার ধর্ম।

পঞ্চাশের প্রধান কবিরা প্রায় সকলেই ছন্দ-সচেতন। তবে ছন্দের প্রথাগত রূপকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন নিজস্ব পরিকল্পনা মতো। ছন্দের পরিকাঠামো না ভেঙেও উচ্চারণগত স্বাধীনতার আলাদা রূপ তৈরি হয়ে উঠেছে প্রচলিত ছন্দ-বন্ধে। এখানে অমিতাভ দাশগুপ্তের যে উদাহরণ দেওয়া আছে তা মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের সরল রূপ। তবে কথ্যবাগ্‌ভঙ্গি ও গদ্যভাষার চাপে ছন্দের প্রথাগত রূপটি নতুন চেহারা নিয়েছে। এ জাতীয় কবিতা পড়তে মনেই হয় না যে নির্দিষ্ট পর্বে বিন্যস্ত ছন্দ-বদ্ধ কবিতা পড়ছি। ছন্দকে তার প্রথাবদ্ধ রূপ থেকে এভাবেই মুক্তি দিয়েছেন আধুনিক পর্বের কবিরা।

দলবৃত্ত ছন্দের অভিজাত রূপটি আবিষ্কার করেন রবীন্দ্রনাথ। রুদ্ধমুক্ত দলের একই ধ্বনি, পরিমাণ, চার মাত্রা পর্বের সুষম বিন্যাস এবং বিষয়ানুসারী গতিক্রম, দলবৃত্তের এ জাতীয় রূপবন্ধের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ। তিনি 'ক্ষণিকা' 'পলাতকা'য় দলবৃত্তের সম্ভাবনাকে যাচাই করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্ণ প্রয়োগ ঘটল 'বলাকা', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্যে'। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তাঁর ধ্যানের অনুষঙ্গে কাজ করেছে এই ছন্দ। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।

—গীতাঞ্জলি, ২০

২। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
এরে পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।

—গীতিমাল্য, ৩৪।

দলবৃত্তের সাঙ্গীতিক সঙ্গতির জন্যই নয়, এসব কবিতায় ধরা পড়ে মহাকবির হৃৎস্পন্দন। দলবৃত্তের পরিমিত রূপবন্ধে এসব সম্ভব করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমকালের অনেক কবি এই ছন্দের ধ্বনিস্পন্দকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের মতো। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ 'পাল্কির গানে' বা 'দূরের পাল্লা'-র শেষ অংশে। 'লিচুচোর' কবিতায় নজরুল তিনমাত্রায় একটি অতিপর্ব জুড়ে দিয়ে এই ছন্দের রূপবন্ধে অভিনবত্ব এসেছেন। আধুনিক পর্বে দলবৃত্ত বিভিন্ন কবির রচনায় কিভাবে ব্যবহৃত

হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

১। গেলো
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত খেত খামার।

—অমিয় চক্রবর্তী, সাবেকি।

২। পুকুর, মড়াই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ
নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টানটান।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বপ্নে দেখা ঘর দুয়ার।

৩। কোথায় আছে বসতবাড়ি, তার পেছনে
কালো পাহাড় —বাড়িটা কেউ শ্লেটের ওপর
চকখড়িতে এঁকে রেখেছে, আমার শুধুই
ফিরতে থাকা বেরিয়ে যাওয়া ফিরতে থাকা।

—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মরমী করাত।

৪। আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতে শস্য যেন ফলে।

—শঙ্খ ঘোষ, কবর।

তিরিশ থেকে পঞ্চাশের কবিতায় চারটি উদাহরণ এখানে সংকলিত। প্রতিক্ষেত্রেই দলবৃত্তের পরিচ্ছন্ন রূপ। বাংলা ভাষায় 'ইয়ে'-অন্ত ত্রিদল শব্দের শ্রুতরূপ যে দুই দলের, বিশেষ করে দলবৃত্তে, তা আধুনিক পর্বে গৃহীত সত্য। দুই ও তিন উদাহরণে 'নিকিয়ে', 'বেরিয়ে' এই জাতীয় শব্দ। এগুলির দৃশ্যরূপ তিন দল, কিন্তু শ্রুত রূপ দুই দলের। আধুনিক পর্বে অনেকেই বক্তব্যকে আলাদা চিহ্নিত করতে বিশেষ পর্বে মাত্রার হেরফের ঘটান। অলোকরঞ্জনের 'এঁকে রেখেছে' পর্বের মাত্রা পাঁচ। আঁকার একটা বিস্তার বোঝাতে শব্দের ধ্বনিরূপের প্রসারণ ঘটিয়েছেন তিনি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্রুবপদটি লক্ষ্য করার। তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে অমিয় কবি অনুভবের নানা রূপনির্মাণে ছন্দকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব দক্ষতায়। এক্ষেত্রে দলবৃত্তের চারমাত্রার চালই নির্মাণ করেছে ছোট ছোট ছবি। ভাষা গদ্য, নিরাভরণ। ছন্দের মোচড়ে ছবিগুলো প্রত্যক্ষ রূপ নিচ্ছে। এর মধ্যে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' চারটি রুদ্ধদলের দুটি পর্ব। চার রুদ্ধদল একপর্বে আঁটানো যায় না। সে চেষ্টাও করেননি তিনি। স্পষ্ট লঘু যতিতে বিভক্ত করেছেন দুটি পর্ব। দেহাতি মানুষদের উচ্চারণ এখানে কানে বাজে। দীর্ঘ প্রলম্বিত উচ্চারণ। দলবৃত্তের স্বাভাবিক রীতি ভেঙে চারটি রুদ্ধদলই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ পেয়ে যায়। ছন্দে রীতিনিষ্ঠ থেকেও এ জাতীয় বিন্যাসে ছন্দের নতুন

সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে।

কলাবৃত্তের রহস্য আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর হাতেই এ ছন্দের পূর্ণ পরিণতি। রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ধ্বনির একটা প্রবাহ ছন্দে সহজলভ্য। 'মানসী'-উত্তর পর্বে কবি এ ছন্দকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্নরূপে। পূর্ণ পঙ্‌ক্তিব সুঠাম গঠন থেকে মুক্তকের অসম ছত্রবিন্যাস, ছত্রসজ্জা, মিল, ভাবাবেগের বৈচিত্র্য, কবি অনুভবের সমস্ত স্তর রূপায়িত হয়েছে এই ছন্দে। এই ছন্দেই কবির গানের ভুবন উন্মুক্ত করেছে তার রহস্য। এ প্রসঙ্গে 'গীতাঞ্জলিব' 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' কিংবা 'আজি শ্রাবণ-ঘন গহন ঘোরে' জাতীয় উচ্চারণের কথা স্মরণে আসে। কলাবৃত্তের ছয় বা পাঁচ মাত্রার ধ্বনিপ্রবাহ মানবচৈতন্যের অন্তর্মুখ পরিক্রমায় কত দূর সফল এসব গান তারই নিদর্শন। কলাবৃত্তের গীতল রীতিনিষ্ঠ এই ছন্দরূপকে কবি নিজেই ভাঙলেন কর্কশ ধ্বনির আবহে। জীবনের শেষ পর্বে উদ্‌ভ্রান্ত কবির সেইসব দীপ্ত উচ্চারণেব কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। সমিল মুক্তবন্ধে এক কর্কশ ধ্বনিস্পন্দ তৈরি করলেন তিনি এভাবে—

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
    নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
    জমেছে লুটের ধন।

প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক।

এভাবেই প্রথা তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ সে প্রথাকে ভেঙেছেন বারে বারে। রবীন্দ্রসমকালে এ ছন্দ কবিদের খুবই প্রিয় হয়েছিল এর চক্রগতির পূর্ণাযত ধ্বনিস্পন্দে। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংলাপের নাটকীয় ভঙ্গিতে কলাবৃত্তের একটা জীবন্ত রূপ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থে। নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার বলিষ্ঠ রূপও উচ্চারণ করেছেন এই ছন্দে। আধুনিক পর্বে বিষ্ণু দে গভীর প্রত্যয়ে ব্যবহার করেছেন এই ছন্দ। প্রসঙ্গত এখানে তিন দশকের কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।

১। ক্রেসিডা, তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

—বিষ্ণু দে, ক্রেসিডা।

২। বিদেশী হাওয়া
সিনকোনা খেতে মরুপথে যেতে
চমকাবে চাওয়া
শ্যামল আভার।
দার্জিলিং-এর মেঘলায় মেশা
        সরে
        যাওয়া
        ছবি
    ভোরে পাওয়া রবি-নেশা।

—অমিয় চক্রবর্তী, সৌখীন ভ্রমণ।

৩। অন্ধকারের পর্দা থাকুক
টানা।
সবুজ পাতায় ঢেকে দাও
আস্তানা
মুখে এঁটে দাও মুখোশ
আস্তে কথা।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রংরুট।

৫। কথা বলছিল শাদা তিন বুড়ি
সাবেক কালের প্রথায়
সবদিক এতে চুপচাপ কেন?
সেই ছেলেগুলি কোথায়?

—শঙ্খ ঘোষ, দশক।

বিষ্ণু দের উদাহরণটি প্রথাবদ্ধ। কলাবৃত্ত ছন্দের নির্দিষ্ট গতিক্রম পূর্ণধ্বনি সমেত এখানে সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এখানে ছয় মাত্রার পর্বের গঠনকে নাটকীয় ভঙ্গিতে নিজস্ব উচ্চারণের অনুকূলে এনেছেন। সাধারণভাবে প্রথাবদ্ধতায় ছন্দের যে কৃত্রিমতা থাকে তাকে বিষ্ণু দে কলাবৃত্তের ছয় মাত্রার চলনের মধ্যে সজীব উচ্চারণে একটা নির্দিষ্ট গতিক্রমে স্থাপন করেছেন। ফলত যে আবেগ তৈরি হচ্ছে, তাতে আভাসিত হচ্ছে অর্থের দ্যোতনা। কলাবৃত্তের এই শক্তিকে অমিয় ও সুভাষ সম্ভাবনার বহুমুখী রূপ দিয়েছেন। এদের দুজনের কবিতাই ছয় মাত্রায় রচিত। অমিয় পর্ব ভেঙে ছড়িয়ে দিয়ে টুকরো সব ছবির আভাস ফুটিয়েছেন। অপূর্ণপর্বে সাধারণভাবে কলাবৃত্তের ছত্রবিন্যাস করা যায় না, তাতে ধ্বনির গতিক্রম বিনষ্ট হয়। অমিয় বা সুভাষ সে চেষ্টা না করে পূর্ণ বা অপূর্ণ পর্বকে পঙ্‌ক্তি থেকে সরিয়ে আলাদা বিন্যস্ত করেছেন। এবং ঐ ছত্রসজ্জার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া আছে মিল। এইভাবে দৃশ্যরূপের সঙ্গে ধ্বনির একটা সঙ্গতি তৈরি হয়েছে। অন্য দিকে শঙ্খের কবিতা অনেক রীতিনিষ্ঠ। কথ্যভঙ্গির মেজাজ কত স্বাভাবিকতায় তিনি প্রথানিষ্ঠ কলাবৃত্তের ছয় মাত্রার পর্বে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা লক্ষ্য করার।

সুশৃঙ্খল সুপরিমিত ধ্বনিবিন্যাসই হলো ছন্দের প্রাণ। এই বিন্যাস থেকে আসে গতি। এই গতির আবর্তে ও অভিঘাতে শব্দার্থের বন্ধন ছিন্ন করে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় অর্থের ব্যঞ্জনা। গতিময় ধ্বনির মধ্য দিয়ে অর্থকে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়াই ছন্দের মুখ্য কৃত্য। পর্ব-পাদ বিন্যস্ত পদ্যে ধ্বনির শৃঙ্খলা সহজাত কিন্তু গদ্যের যে সুপরিমিত ধ্বনির বিন্যাস সম্ভব তার নিদর্শন যে কোন প্রতিভাবান লেখকের গদ্য। গদ্যকবিতা প্রবর্তনকালে গদ্যের এ জাতীয় ধ্বনিসাম্যের কথাই মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। মাত্রানির্দিষ্ট পর্বের গঠন সেখানে নেই কিন্তু ধ্বনিস্পন্দে তৈরি হয় যে সাম্য তাতেই গদ্যে লেখা কবিতাও ধ্বনির সংযোগে পাঠককে পৌঁছে দেয় কবিতার রহস্যালোকে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা প্রবর্তনকালে পদ্যের সংস্কারে তাকে ছোট বড় ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের কবিরা টানা গদ্যেও লিখেছেন প্রচুর কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ফরাসি কবিদের Verse liberes বা মুক্তবন্ধছন্দের সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন 'বলাকা'য়। তিনিই পরিণত বয়সে গদ্যের মধ্যে পদ্যের স্পন্দন রোপন করলেন 'পুনশ্চ' পর্বে, প্রবর্তন করলেন Verse libres বা গদ্য-কবিতার। আজ একথা আর বলে দেবার নয় যে তাঁর গদ্য কবিতাও তীব্র আবেগে স্পন্দিত। গদ্যের

কর্কশ ধ্বনি গদ্যকবিতায় তিনি বর্জনও করতে চাননি, খুব বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাতেও এত আবেগ ছলকে উঠেছে যে গদ্যের যুক্তি-নিষ্ঠা ভেসে গেছে আবেগের প্রাবল্যে। কিন্তু তবু কবিতার নতুন ছন্দ-রূপ তৈরি হলো তাঁর হাতে, এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন।

আধুনিক পর্বের কবিরা গদ্যকবিতার চর্চা করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু বাঙালি কবিরা অন্তত পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত গদ্যভাষায় কবিতা লিখেও পদ্যছন্দেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। অবশ্য এর মধ্যেই অনেকে বেশ স্বকীয়। অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন গদ্য কবিতাতেই মিল ব্যবহারের অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। দু এক পঙ্‌ক্তির উদাহরণ দিই।

হঠাৎ ঝাঁপ দিলাম — বাস ধরতে — গাড়িতে আটকালো র‍্যাপার
ঠিক সাড়ে তিন সেকেন্ড ব্যাপার।

—অমিয় চক্রবর্তী, অ্যাক্‌সিডেন্ট।

মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম।

—সমর সেন, স্বর্গ হতে বিদায়।

ভাবযতি নির্ভর করে টুকরো টুকরো বাক্‌স্পন্দে এসব কবিতা লেখা। অমিয় পঙ্‌ক্তি মিল দিয়েছেন বেশ সতর্কতায়। সমর অন্ত্যমিলের সঙ্গে মধ্যমিলও ব্যবহার করে পদ্যের ধ্বনিস্পন্দই সৃষ্টি করেছেন। রোমান্টিক ভাবাবেগ সমর একেবারে বর্জন করতে না পারলেও তিনিই আমাদের সাহিত্যে প্রথম নাগরিক কবি। তাঁর গদ্যকবিতার ভঙ্গি লক্ষ্য করার।

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে।
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি।

—সমর সেন, একটি বেকার প্রেমিক।

পরবর্তী পর্যায়ের বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দ বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। কখনো স্বাভাবিক উচ্চারণে, কখনো কথ্য বাগ্‌ভঙ্গিতে আবেগে বা আবেগহীনতায় জীবনের বিচিত্ররূপের রূপায়ণ করেছেন কবিরা। তিন দশকের কবিতা থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিই—

১। ঘুষখোর কেরানির টেবিলে হাত উলটে রেখেছি আর দেখছি
কতক্ষণেরই বা দেখা কেননা সময় অন্ধ ঘণ্টা মিনিটগুলো
খসে যাচ্ছে দেখছি দেয়ালে পবিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়েছে যেমন
মেঝের উপর শুকনো পাপড়িগুলো যদিও গোল সুতোটা আহা
শ্রদ্ধাভক্তি উঁচুতেই টাঙিয়ে রেখেছে আর ঠাসা আশীর্বাদ করছে

—অরুণ মিত্র, ফাটল।

২। কারো মুখের কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই।
আমি হাতেনাতে প্রমাণ চাইব।
আমাকেও কেউ মুখের কথায় বিশ্বাস করুক
আমি চাই না—

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এই জমি।

৩। কেন রবীন্দ্রনাথকে তুমি বুকে জড়িয়ে বসে আছ জানালার ধারে
আমি কি কেউ না?
আমি গরীব ইসকুল মাষ্টারের ছেলে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায় হাঁ করে
জলকাচা ধুতির ওপর পেঁজা শার্ট পরে, পায়ে রবারের স্যান্ডেল
—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি এবং আমি।

এ তিনটি উদাহরণ থেকে সমকালীন গদ্যকবিতার প্রবণতাগুলো বোঝা যাবে। অরুণ মিত্র টানা গদ্যে লিখেছেন কিন্তু কোন ছেদচিহ্ন নেই, অন্বয়ও খুব জটিল, এক বক্তব্য থেকে অন্য বক্তব্যে চলে যাচ্ছেন কবি, চেতনার একটা অন্তঃপ্রবাহ বয়ে চলেছে, এই ভাষা গদ্য বা পদ্যের নয়, দুই-এর মধ্যবর্তী কোন আলো-আঁধারি জগতের ভাষা। সুভাষ পদ্যপঙ্‌ক্তি সজ্জায় সটান সরাসরি গদ্যে বলতে চেয়েছেন নিজের বক্তব্য। কোন রাখঢাক নেই, জটিলতা নেই, আলগা কোন আবেগও নেই। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সজীবতা সমস্ত বক্তব্যকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দেশিত করছে। সুনীলের কবিতার গদ্যও প্রত্যক্ষ ও সবাসরি, কিন্তু একটা চাপা আবেগ জড়িয়ে আছে সমস্ত রচনায়।

তিরিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা শুধু আঙ্গিক বা প্রথার পরিবর্তন নয়। সমকালীন পৃথিবীর চিন্তাস্রোতের চাপে কবিমানসের উপলব্ধির জগৎ যতই ভিন্ন রূপ নিয়েছে ততই কবিভাষা পালটেছে। প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গি, ভাষা এবং প্রথাগত সব উচ্চারণ আর কোন কাজে লাগেনি তাঁদের। এই সময়ের কবিতার ছন্দোরূপ কোন প্রথাগত ছন্দচর্চা থেকে উদ্‌গত নয়, কবি-অনুভবের প্রবল চাপেই নির্মিত হয়েছে ছন্দের বিচিত্র রূপবন্ধ। কবি-কল্পনার উদ্বোধক রূপে কাজ করায় ছন্দ আর বাইরের রূপবন্ধ রইল না, কবিতায় শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তা মেলে ধরেছে কবির আন্তর অনুভবের জগৎকে। সে কারণে এ সময়ের কবিতা ছন্দ থেকে মুক্তি না চেয়ে ছন্দেই প্রকৃত মুক্তি অর্জনে প্রয়াসী হয়েছে। বাংলা কবিতার এই প্রেক্ষাপটেই আমবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ছন্দের স্বরূপ বুঝে নেবার চেষ্টা করবো।

২.

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে। ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের আগেই শক্তি কবি হিসাবে পরিচিত ও গৃহীত। এমনকি তাঁর পরবর্তী কালের দামাল জীবনের মিথটি এ সময় থেকেই গড়ে উঠেছে। তাঁর পর্যটনপ্রিয়তা, আচমকা এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়া, বন্ধুদের নিয়ে তুমুল আড্ডা, রবীন্দ্রনাথের গান আর অনর্গল পদ্য লেখা এ সময় থেকেই বেশ আলোচিত। জীবনযাপনে একটা অস্থিরতা প্রায় সারাজীবন ধরেই তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। ভালো ছাত্র ছিলেন, প্রেসিডেন্সিতে উচ্চশিক্ষা শুরু করেও তীব্র ছটফটানিতে তা ছেড়ে অরণ্য আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোতেই তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছিল অনেক বেশি। পরে বুদ্ধদেব বসুর টানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়া শুরু করেও তা শেষ করতে পারেননি। প্রথাবদ্ধ শিক্ষার চেয়ে জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণই ছিল তাঁর কবিস্বভাবের পক্ষে অনিবার্য। সারাজীবন অনর্গল লিখেছেন, অনেক সময় প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায়, ঘোরের মধ্যে সারাদিন। তাঁর অস্থিরতা ও অগোছালো স্বভাবের জন্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় কালানুক্রমিক কবিতা সাজাতে পারেননি। ঐতিহাসিকভাবে তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে কোন লেখককেই ধন্দে পড়তে হবে। এখন তাঁর যে 'পদ্যসমগ্র' বেরুচ্ছে তাতেও প্রকাশক ও

সম্পাদকের ইতিহাসবোধ এতই দরিদ্র যে পরবর্তীকালে এ সমস্ত সংকলন অনেক সমস্যার জন্ম দেবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে শক্তির প্রথম কবিতার বইতে তাঁর প্রথম পর্বের কবিতাই সংকলিত। এই বইটি তাঁর প্রথম রচনা বলেই নয়, শক্তির কবিপ্রতিভার একটা পরিণত পরিচয়ের জন্য এ বই গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু বিষয়েই নয় প্রকরণেও শক্তির সারাজীবনের কবিভাবনার মূল প্রবণতাগুলি খুব পরিণতরূপে এ বইতে প্রকাশিত। এই বই-র প্রথম কবিতা 'খেলনা' মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লেখা। দলবৃত্ত কলাবৃত্তে যেমন লিখেছেন এখানে তেমনি আছে গদ্য-ছন্দে লেখা কবিতা। একটা চ্যালেঞ্জ থেকে তাঁর কবিতা লেখা শুরু, শুরুতেই তিনি অনর্গল যাচাই করে নিয়েছেন নিজেকে। বুঝতে চেয়েছেন কোন ভাষায় কেমন মিলে কোন ছন্দে নিজস্ব উচ্চারণ তাঁর অনুভবকে ছুঁতে পারে। প্রকাশ করতে পারে তার জীবনের অর্জনকে। কথ্যভাষা আর যতির স্বাভাবিক বিন্যাস এক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য সহায়। ফলত প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে সমকালের কবিতা পড়ার অভ্যাস আর জীবনের পাঠই হলো তাঁর অভ্রান্ত নির্দেশক। সে নির্দেশ কিভাবে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতার প্রকরণে তাই লক্ষ্য করা যাক এবারে—

> পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু, যেন বাল্যে খুব দূরদেশে
> গর্ভের সমান কাছে বারে বারে আসা তার হয় না কখনো জানি তবু ডাকি ডাকি
> খেলনা খেলনা দাও ভাঙি ছুঁড়ে দিয়ে দেয়ালের অনেক উপরে।

জীবনানন্দের কণ্ঠস্বর খুব অদৃশ্যভাবে এখানে ছুঁয়ে আছে শক্তির উচ্চারণ। স্বচ্ছন্দ প্রবহমান অমিল মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লেখা এ কবিতায় 'পেয়েছিনু' জাতীয় ক্রিয়াপদে পাঠকের খটকা থাকে হয়তো কিন্তু 'গর্ভের সমান কাছে'-র মতো বাক্যবন্ধে ধরা পড়ে এক মৌলিক কবিকণ্ঠ। দুটি 'খেলনা' শব্দেই শব্দমধ্য রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে কবির ভালোবাসার প্রগাঢ় প্রলম্বিত উচ্চারণটিই আভাসিত হয়।

এ বইয়ে গদ্যছন্দে লেখা 'জরাসন্ধ' কবিতাটি কবির কাব্যচর্চার একেবারে শুরুর দিকের রচনা। এখানেও কবিকল্পনার মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মিলবে।

> আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।
> যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের কৃপণ করুণ, তাকে
> তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ মাঠ আর নয়। ধানের নাড়ায়
> বিঁধে কাতর হলো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে
> তুই আনলি কেন। ফিরিয়ে নে।

এ কবিতায় গদ্য পদ্য জোড় বেঁধে আছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে দলবৃত্ত ছন্দে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি থেকে দলবৃত্ত ছন্দের সীমা ভেঙে কবি তাকে নিয়ে গেছেন গদ্যছন্দের স্বাভাবিক গতিতে। মাঝে মাঝে দলবৃত্তের চার মাত্রার পর্ব বেশ তরঙ্গিত করছে কবি-অনুভবকে। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার যে কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সরল বিন্যাসকে এখানে শক্তি এক নিজস্ব কাব্যিক অন্বয়ে গড়ে তুলেছেন। এই অন্বয়ই আমরা তাঁর কবিতায় ক্রমান্বয়ে আরো দৃঢ়মূল হতে দেখবো। আপাত কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির নিরীহ উচ্চারণ, কিন্তু বাক্যবন্ধের গঠন প্রচলিত অন্বয় ভেঙে মেলতে থাকে অনুভবের জগৎ। গদ্যের অন্বয়ে তখন আর তাকে ধরা যায় না।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' বই-র একটি বিখ্যাত কবিতা 'চিত্রশিল্প অনন্তকাল'। দলবৃত্ত ছন্দে লেখা এই কবিতার প্রবহমান বিন্যাস ও সরল বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষ্য করার।

খুকু, আমি সাধ্য মতো ছবিগুলো এঁকেছিলাম ... দুয়ার
জ্যোৎস্না, তাঁবুর পাশে ইতস্তত পোড়া কয়লা, কাঁটার লতা
আমরুলের পুঞ্জ পুঞ্জ নীল অম্লতা সমস্তই এঁকেছিলাম ...

দলবৃত্তের চার মাত্রার পর্বে টুকরো টুকরো ছবি বেশ ফুটে উঠছে। দলবৃত্তে রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট দুই মাত্রার উচ্চারণ কবি-আবেগের চাপে কত স্বাভাবিক রূপ নেয় তার নিদর্শন 'আমরুলের' শব্দটিতে ধরা আছে। শক্তির আর একটি সচেতন দক্ষতা এখানে প্রকাশিত। প্রথম পঙ্ক্তির 'দুয়ার' অপূর্ণ পর্ব নয়, তেমনি পরের পঙ্ক্তির 'জ্যোৎস্না' অতিপর্ব নয়। এ দুটি শব্দ মিলে একটি পর্ব, একই লঘু যতিতে বিন্যস্ত অথচ লিখিত রূপে শব্দদুটি ছড়িয়ে আছে দুটি আলাদা পঙ্ক্তিতে। শক্তির কবিতা পাঠে এ কৌশলটি বেশ ধরা যেতো। খুব স্বাভাবিক ভাবে এ দুটি শব্দকে তিনি একই লঘুযতিতে পড়ে যেতেন। সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে পাঠক এ ভাবেই কবিতাটি পড়েন, অন্তত পড়ে স্বস্তি পান। 'দুয়ার জ্যোৎস্না' এক সঙ্গে উচ্চারণ না করলে এ কবিতার ভাবাবেগটি ধরা যায় না, কবির প্রার্থিত ছবিটিও স্ফুট হয় না।

এ বইয়ের কলাবৃত্ত ছন্দে লেখা কতির মধ্যে 'চতুরঙ্গে' অনেক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত একটা স্তবক উদ্ধার করি—

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

কলাবৃত্ত ছন্দের প্রথাগত সব বৈশিষ্ট্যই এখানে বর্তমান। সমস্ত রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পূর্ণায়ত ধ্বনির প্রকাশ, ছয় মাত্রা-পর্বের চক্রগতি এ কবিতায় স্পষ্ট। তরুণ যৌবনের এই মৃত্যুচিন্তা শক্তির ষাট বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে বহু বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হতে দেখবো আমরা। অপরূপ পৃথিবী কিংবা প্রিয় রমণী কোন কিছুই তাঁকে বেশিদিন বাঁচায় প্রাণিত করতে পারে না। সেকি প্রাচীন বয়সের স্থবিরতার কারণে, দেখেছিলেন কি কোন প্রিয়জনের তেমন স্থবির বার্ধক্য। যে কারণে তাঁকে বলতে হয়েছে— 'প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।' এই পঙ্ক্তির 'দুঃখশ্লোক' পর্বের ধ্বনিবিস্তার কলাবৃত্তের প্রচল রীতিকে অস্বীকার করেই বিন্যস্ত। ধ্বনিবিস্তারে 'শ্লোক' শব্দের, আসলে একক দলের তিন মাত্রার উচ্চারণে একটা দৃপ্ত প্রতিজ্ঞার ভঙ্গি বেশ ফুটে উঠেছে।

শক্তির কবিতার বিশেষ আঙ্গিক, মিলবিন্যাস, ছন্দ-প্রকরণ তাঁর বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি এই বইয়ের 'পরস্ত্রী' কবিতায় ধরা পড়েছে পরিপূর্ণভাবে। ঐতিহাসিক কারণেই কবিতাটি পুরো উদ্ধার করছি।

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সবশেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধরে বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না
বালক আজও বকুল ছড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে।

সবার বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি, সুশ্রী অমন কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা কিছু চেনাও চিরতরে।

কবিতাটি দলবৃত্ত ছন্দে লেখা। উদাস এক বাউল কবির বিচিত্র ভাবাবেগ ছন্দ-বন্ধনে ধরা পড়েছে এখানে। 'জরাসন্ধ' কবিতায় আমরা দেখেছিলাম গদ্যছন্দের মধ্যে দলবৃত্তের পঙ্‌ক্তি বা পর্ব কবি কিভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে দেখা যাবে বিপরীত প্রক্রিয়া, দলবৃত্তে লেখা কবিতায় চমৎকার মিশিয়েছেন গদ্যকবিতার পঙ্‌ক্তি। 'সবার বয়স হয় আমার বালক বয়স বাড়ে না কেন' পঙ্‌ক্তির উচ্চারণ স্বাভাবিক গদ্যের, দলবৃত্ত ছন্দের চার মাত্রায় পর্বে এক বিন্যস্ত করা যায়, অবশ্যই কিছু স্বাধীনতা নিয়ে। কিন্তু তাতে স্বাভাবিক উচ্চারণ তীব্রভাবে ব্যাহত হয়। 'তুমি কপালে' এবং 'চতুর্দিক' পর্বদুটির মাত্রাবিন্যাস দলবৃত্ত রীতিবিরুদ্ধ। রীতিনিষ্ঠভাবে পড়লে প্রথমটি পাঁচ মাত্রায় ও দ্বিতীয়টি তিনমাত্রার পর্ব। কিন্তু বাংলা ছন্দে ধ্বনি উচ্চারণের প্রসার-সংকোচ স্বাধীনতা দক্ষ ছান্দসিকের মতো শক্তি এখানে গ্রহণ করেছেন। 'সব শেষের তারা মিলালো' বাক্যবন্ধটি আসলে দুটি পর্বের বিন্যাস, পর্বযতি লুপ্ত হয়ে একটি স্বাভাবিক উচ্চারণের পদ গঠিত হলো এখানে। কবিতাটির পঙ্‌ক্তি-ভাঙা বিন্যাস বাংলা কবিতায় অভিনব কিছু নয়। কিন্তু এ কবিতায় মিলের ব্যবহার শক্তির স্বকীয়।

শক্তির কবিতা প্রধানত ছন্দ-নির্ভর। কিন্তু কবিতার খুব বেশি মিল ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী নন। যেখানে মিল ব্যবহার করেছেন সেখানে সরল স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ মিলেই তাঁর আগ্রহ, অভাবিত মিল তাঁর কবিতায় খুবই কম। মিল বিন্যাসে তাঁর দুটি বিশেষ প্রবণতা 'পরস্ত্রী' কবিতায় ধরা পড়েছে। পরবর্তী কালে তাঁর কাব্যসাধনায় এই প্রবণতা আরো পূর্ণপ্রভ। মিলের কোন নির্দিষ্ট ছক শক্তি ব্যবহার করতে চান না, মিলকে ছড়িয়ে দেন কবিতার ইতস্ততে। অনেক সময়েই দূরান্বয়ী সেসব মিল হঠাৎ একটা ধ্বনিস্পন্দ জাগায় পাঠকের মনে। যেমন দশ ছত্রের এই কবিতায় 'অরে' মিলটি আছে তিনবার। দ্বিতীয় ষষ্ঠ ও দশম ছত্রের এই মিল সরল ও ছকহীন। এ জাতীয় মিলের জন্য পাঠকের কোন প্রস্তুতি থাকে না বলে আকস্মিক মিলে একটা অভাবিত ধ্বনিসাম্যের তৃপ্তি পাওয়া যায়। এ কবিতায় দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে। মিলহীন কবিতাতেও হঠাৎ মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনা শক্তির খুবই প্রিয় প্রকরণ।

শক্তির প্রথম কবিতার বইয়ের একটি উনিশ স্তবকের দীর্ঘকবিতা 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা'। শেষ স্তবকের দুটি পঙ্‌ক্তি, শক্তির সমগ্র কাব্য সাধনায় খুবই তাৎপর্যের। লিখেছেন শক্তি —

ঈশ্বরের বুক থেকে কে দ্রাক্ষা মোচন করে রোজ
তীর্থংকর। সে কি আমি?

জিজ্ঞাসাই এখানে উত্তরটি জানায়। 'কবিই ঈশ্বরের বুক থেকে দ্রাক্ষা মোচন করেন রোজ'। করেন ছন্দের আশ্চর্য জাদুতে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, অত্যন্ত স্বকীয় ভঙ্গিতে।

শক্তির দ্বিতীয় কবিতার বই 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' বেরিয়েছে ১৯৬৫ সালে। এই বইয়ের মানস-উল্লাস সমকালীন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ছন্দে মিলে প্রেমে প্রকৃতিতে এখানে যেন কবি মেতে আছেন। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি নিজস্ব উচ্চারণে আলাদা এক কণ্ঠস্বরকে দৃপ্ত করেছে এখানে। সেই সঙ্গে মিলের রহস্যে সম্মোহিত করছেন পাঠককে। 'আমি স্বেচ্ছাচারী' তাঁর একটি

উল্লেখযোগ্য কবিতা, সম্পূর্ণ উদ্ধার করি এখানে।

তীরে কি প্রচন্ড কলরব
জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিল বাড়ি?
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী'।

সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে
এভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে
সমাদরণীয়?
কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ।
মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে সমিল প্রবহমান মুক্তবন্ধে কবিতাটি লেখা। খুব সংহত সংযত উচ্চারণ। ঈষৎ দ্রুত লয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মিলের ধ্বনিস্পন্দে কবিতার শরীরে তীব্র গতির স্পন্দন জাগে। পর্বযতি লঙ্ঘন ও অপূর্ণপর্ব গঠন ভাবাবেগের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে যে পাঠককে কোথাও যেন থামার অবকাশ দেয় না। চার ও ছয় ছত্রের দুটি স্তবক যে রহস্যের ভূমি তৈরি করে তাতে মিশ্রবৃত্তের চার মাত্রা পর্বের ধ্বনিস্পন্দ ও পাঁচটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের সরল ধ্বনিবিন্যাসের ভূমিকা অনেকখানি। ছন্দ ও মিল এখানে কবি কল্পনাকে নির্দিষ্ট অবয়বে মূর্ত করে তাকে গতিময় এক অনুভবে স্থাপনা দিয়েছে।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে শব্দমধ্য রুদ্ধদলের উচ্চারণে আধুনিক পর্বের কবিরা যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। ছন্দের পরিকাঠামোর মধ্যেই এই স্বাধীনতা। মূলত রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের সুযোগ কবিরা নিয়েছেন কবিভাবনার পূর্ণায়ত রূপ পরিকল্পনার জন্য। শক্তির 'পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাই —এখন দুপুর' জাতীয় পঙ্ক্তিতে 'পারিপার্শ্বিক' শব্দের শব্দমধ্য রুদ্ধদলের বিস্তার কবি-আবেগে এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে পাঠকের লক্ষ্যই থাকে না এসব ক্ষেত্রে কিভাবে এবং কেন শব্দমধ্য রুদ্ধদল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ পেয়ে যায়।

এই বইতে দলবৃত্তে অনেক কবিতা আছে। দলবৃত্তে শক্তির স্বাভাবিক দক্ষতার কথা আগেই বলেছি। এখানে তাঁর স্বকীয় উচ্চারণে দলবৃত্ত আরো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন পর্বে শক্তি এক একটি ছন্দের সম্ভাবনা বিশেষভাবে যাচাই করেছেন। এখানে যেমন মিশ্রবৃত্তেই তিনি অনেক উজ্জ্বল।

মিলের গুরুত্ব দ্বিতীয় বইতে বেড়েছে। পর্বে পর্বে মিলের কৌশলও বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'দুয়ার খুলে দাও প্রহরী' কবিতায় কলাবৃত্তের সাত মাত্রা পর্বের গঠনটি স্বতঃস্ফূর্ত রূপ পেয়েছে মিলের গরিমায়। কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করি—

হৃদয় নদী তীরে সে ডাকে ফিরে ফিরে
'দুয়ার খুলে দাও, প্রহরী — আছে তাড়া'
বাহিরে ঝড়ে থেকে দু-হাতে আছি ঢেকে
প্লাবন আনে বুঝি শ্রাবণ বারিধারা।

শক্তির তৃতীয় কবিতায় বই 'সোনার মাছি খুন করেছি' বেরিয়েছে দ্বিতীয় বইয়ের দু'বছর পরে, ১৯৬৭ সালে। গদ্যছন্দ এই বইতে মুখ্য। তাঁর উচ্চারণের স্বাভাবিকতায় গদ্যছন্দ বেশ মানিয়ে যায়।

কিন্তু গদ্যপদ্যের একটা মেলবন্ধন এখানে ঘটিয়েছেন খুব দক্ষতায় ও কৌশলে। ছন্দ যে কবিভাবনার অনুপাতী সেই চিন্তা এখানে বেশ স্পষ্ট। গদ্য-পদ্যের মিশ্রণটি লক্ষ্য করা যাক —

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী —সোনার কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।

—নীল ভালোবাসায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দলবৃত্ত আর গদ্যছন্দ এখানে কেমন ভাব ভালোবাসায় পাশাপাশি মিশে আছে। 'ছেড়ে দিয়েছে' দলবৃত্ত পঙ্‌ক্তিতে আলাদা উচ্চারণে ব্যতিক্রমী। ভাবনার বিস্তারের জন্য পাঁচ মাত্রার এ জাতীয় পর্ব দলবৃত্ত ছন্দে অনেকেই সরল ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী'-র মতো গোটা একটা গদ্য পঙ্‌ক্তি চার মাত্রা পর্বের দলবৃত্তের সঙ্গে ব্যবহার বেশ সাহসী। এ সাহস কবিকে যুগিয়েছে গদ্য-পদ্যের সীমানা ভেঙে দিতে, পাঠকের অভ্যস্ততাকে আঘাত করতে। কিন্তু ছন্দের উঁচু-নীচু আবর্তকে গদ্যছন্দের ঈষৎ দীর্ঘ ধ্বনিস্পন্দের সমান্তরাল প্রবাহে টেনে আনার আসল তাগিদটি এসেছে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ থেকে। জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্য যে সোনার মাছি খুন করতে হলো সে তো আসলে ভালোবাসার গ্লানির বন্ধন, কিন্তু ভালোবাসাকে তো দীর্ঘতম জীবনযাপনের গ্লানি স্পর্শ করে না, তার সঙ্গে জীবনযাপনের অর্থ তো রোমাঞ্চকর যামিনী অতিবাহন। এই অভিজ্ঞতাই ভালোবাসার নবীকরণ। 'এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী' কবি-অনুভবে আলাদা তাৎপর্যের বলেই তার উচ্চারণও আলাদা ও বিশিষ্ট।

তৃতীয় বইতে শক্তির মিল ব্যবহারের একটি বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে স্বকীয়ভাবে। সমিল পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পাঠকের শ্রুতির প্রার্থিত ধ্বনিস্পন্দকে বারিত করে মিল প্রত্যাহারের প্রবণতা শক্তির কবিতায় এই পর্বে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই প্রবণতার আরো বিকাশ আমরা লক্ষ্য করবো।

কিছুই জানতে পারি নি আজ, কাল যা-কিছু আনতে
তার মাঝে কি থাকতো মিশে সেই আমাদের ক্লান্তির
দু-জন দু-হাত জড়িয়ে থাকা—সেই আমাদের শান্তি?
তোমার হাত যে ধরেই ছিলাম তাই পারিনি জানতে।

—তোমার হাত

দ্বিতীয় তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মিলের সম্ভাবনা ও প্রত্যাহার বেশ দক্ষ কবির কাজ। পাঠকের ধ্বনিগত সাম্যের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়ে ভেঙে দেবার মধ্যে এক জাতীয় সতর্কীকরণ আছে যেন। এক্ষেত্রে ধ্বনির সাম্য কিন্তু সবটা ভাঙছে না। একটা ধ্বনিসাম্যের স্পন্দন জেগে থাকছে দূরশ্রুত ঘন্টাধ্বনির মতো, যার রেশ দৃশ্যরূপে নয় শ্রুতিতে বাজবে রিনরিন করে।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' বইতে গদ্যছন্দের ব্যবহার বেশি। কিন্তু পরের বই 'উড়ন্ত সিংহাসনে' দলবৃত্তের সাম্রাজ্য। পঙ্‌ক্তিসজ্জা, স্তবক গঠন ও মিলের বৈচিত্র্যের জন্য এ বই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পরে শক্তিই যে দলবৃত্তে শ্রেষ্ঠ কবি তা এই কবিতায় বইতেই সুনিশ্চিত হয়েছে। এই বই থেকে দলবৃত্তের দুটি উদাহরণ চয়ন করছি।

১। একটি আসন যত্নে আমি সাজিয়েছিলাম
চারদিকে তার, সেঁকুল কাঁটায় রুক্ষ ডাঁটা দাবিয়ে রেখে

সাজিয়েছিলাম মস্ত চিতা, বসবো বলে তার বিবেকে ...
একটি আসন যত্নে আমি চিতার মতন সাজিয়েছিলাম।
—একটি আসন যত্নে আমি

২। রোমাঞ্চ হয় পড়লে পাতা মুখ লুকিয়ে
সবুজ ঘাসের
চিরহরিৎ কম্প্রসভায়
অচেনারূপ চিনতে আসে ...
রোমাঞ্চ হয়।

প্রথম উদাহরণে দলবৃত্ত ছন্দের পূর্ণরূপ ধরা আছে। কোন অপূর্ণ পর্ব না রেখে চার মাত্রা পর্বের চারটি পর্ব সজ্জায় পঙ্‌ক্তিগুলি গঠিত। খুব স্বাভাবিক উচ্চারণে নির্বারিত করেছেন কবি-অনুভবকে। মৃত্যু-চিন্তা বিভিন্ন পর্বে শক্তির কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। জীবনেব নশ্বরতাকে, তার প্রতিষ্ঠাকে চিতার উপমানে নিরাসক্ত জীবনস্পন্দে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'বিবেক' শব্দের অভিঘাত সমগ্র ভাবকল্পনাকে আশ্চর্য এক গভীরতা দিয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে -.এসজ্জার দৃশ্যরূপটি লক্ষ্য করার। এক একটি ঝোঁকে পর্বগুলি উচ্চারিত হচ্ছে, পর্বেব মাঝে ঈষৎ ফাঁক রেখে ছবিগুলো টুকরো করে আলাদা করে দিয়েছেন কবি। উদ্ধৃত অংশে নেই কিন্তু কবিতাটিতে হঠাৎ মিলের ধ্বনিস্পন্দে কোথাও অকস্মাৎ ধ্বনিতরঙ্গ তৈরি হয়েছে। তুলনার প্রথম উদাহরণের সংবৃত মিলটি প্রথাগত ও ঐতিহ্যবাহিত।

শক্তিব বিপুল ভ্রমণ খোলা মেলা উদ্দাম জীবনযাপন তাঁব কবিতায় ধরা দিয়েছে ঈষৎ ভিন্ন ভঙ্গিতে। চিরদিনই তিনি কবিতা রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু খুব সচেতনভাবে প্রকৃতির দৃশ্যজগৎ থেকে শব্দচযন করেন, শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে দৃশ্য তুলে আনেন চেনা জগৎ থেকে। সেই সঙ্গে তিনি ধ্বনিব জগতকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন ছন্দ-স্পন্দের নিগূঢ় উচ্চারণে, ধ্বনির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মস্পন্দনও এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়, ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনির গরিমায়।

এবারে আমরা 'উড়ন্ত সিংহাসন' পববর্তী কবিতার বই থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর ছন্দ-চর্চার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন ধারাটি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। প্রথমেই মিশ্রবৃত্ত ছন্দ।

১। আকাশ পিদ্দিম গেঁথে মন্ত্রী যায় সানাই বাজাতে,
পুলিস-মেথর যায় ঝাঁটা হাতে জানাতে বিদায় ..
দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই লাগে ভালো।
—ভাত নেই, পাথর রয়েছে, নাম কবিতা।

২। এটুকু শপথ তার, স্মৃতি বলে রাখবে না কিছুই,
ফটোগ্রাফ, পা দুখানি, কোন মতে আলতায় রাঙানো।
—ঐ, মানুষ কীভাবে মরে।

৩। মাঠের ভিতরে ি য়ে কাঁদে একা, চোখ তুলে আকাশে—
সাধ্য কি, থামায় তাকে? এব. কাঁদে, সংঘে কি কাঁদে না।
—ঐ, জামা কতদিনে ছেঁড়ে।

৪। মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি

পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়
ধ্যানমগ্ন করে ...
—ঈশ্বর থাকেন জলে, কবির মৃত্যু।

৫। ঈশ্বর থাকেন জলে
তাঁর জন্য বাগানে পুকুর
আমাকে একদিন কাটতে হবে।
আমি একা
ঈশ্বর থাকুন কাছে, এই চাই—জলেই থাকুন।
—পরশুরামের কুঠার, আমাদের সম্পর্ক।

৬। ঘুম থেকে উঠে দেখি, রোদ্দুর উঠেছে—
জানলা গলে রোদ এই বিছানায় ভেঙে ভেঙে পড়ে।
অগুরুর গন্ধ কেন? মেঘ কেন কবিডোর জুড়ে?
কেউ গেলো? কেউ চলে গেলো?
পাট-করা তোশক, শুধু তেল-কাপড় কলঘরে ছড়ানো—
ধোয়া হবে।
—মানুষ বড়ো কাঁদছে, চলে যায়।

৭। হাত, ভাঙা হাতখানি, নুলো হাতখানি
ও গুরু
পেরেক থেকে রক্তপাত হয়।
—আমাকে দাও কোল, প্রকৃত পেরেক থেকে।

৮। যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না, অসময়ে।
—আমি চলে যেতে পারি — যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো।

৯। ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই —
যা কিছু নিজের, আমি ফেলেই এসেছি
ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই।
—প্রচ্ছন্ন স্বদেশ, পরিত্রাণ চাই।

১০। রক্ষা করো দুটি চোখ।
হয়তো তাদের
এখনো দেখার কিছু কিছু বাকি আছে।
অশ্রুপাত শেষ হলে নষ্ট করো আঁখি

পুড়িও না ফুলমালা স্তবক সুগন্ধে আলুথালু
প্রিয় করস্পর্শ ওর গায়ে লেগে আছে।

—হে চির প্রণম্য অগ্নি, নামকবিতা।

১১। শুয়ে আছে
একাকী, আগুনে ছাই হবে বলে
আছে, জীবন বিচ্ছিন্ন
মাটি প্রতিমার মতো
মৃন্ময়ী, যথার্থ নাম।

—সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার, একা গেলো।

প্রথম উদাহরণের কবিতাটি ব্যঙ্গজীবিত। প্রচলিত বাংলা প্রবচনকে তৃতীয় পঙ্ক্তিতে খুব স্বাভাবিক উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন। 'দুষ্টু' শব্দে ধ্বনিপ্রসার ঘটেছে শব্দমধ্যে রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে। দুই থেকে চার সংখ্যক উদাহরণের কবিতাগুলির কেন্দ্রে আছে মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুভাবনা। একটা বিষাদের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে সর্বত্র। এর মধ্যেই ছন্দের নানা কলাকৌশল। ভাষায় স্বাভাবিক উচ্চারণকে কিভাবে ছন্দের প্রয়োগ কৌশলে কবিতার অভ্যন্তরে স্থাপন করছেন, এসব ক্ষেত্রে তা বেশ লক্ষ্য করার। তৃতীয় উদাহরণের প্রথম পঙ্ক্তির শেষে 'আকাশে' শব্দে মাত্রার ফাঁক রেখেছেন আকাশের বিস্তার বোঝাতে। এসব কৌশল কৃত্রিমভাবে প্রযুক্ত নয়। ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের সঙ্গে তা যেন মিশে আছে। চারের উদাহরণটি মুক্তক, মিলহীন। 'মৃত মুখ'-কে 'কুয়োর জলের মতো' মৌলিক উপমানে ধরার দক্ষতাই চিনিয়ে দেয় শক্তির কবিপ্রতিভাকে। তৃতীয় ছত্রের 'ঘুম পাড়ায়' পর্বটি আপাতদৃষ্টিতে মিশ্রবৃত্ত বিবোধী পাঁচমাত্রার। কিন্তু পাঁচ মাত্রায় উচ্চারণে এই পর্বে আটানো যায় না, কেমন অস্বস্তি লাগে উচ্চারণে। কবিতা পড়াব সময় কিন্তু চার মাত্রাতেই উচ্চারিত হয় পর্বটি। খুব সহজ ছন্দ-সন্ধি ঘটে যায় এক্ষেত্রে, ফলত কানে বাজে 'ঘুম্পাড়ায়' উচ্চারণ।

পাঁচের উদাহরণটি ভালো মুক্তকের নিদর্শন। তৃতীয় ছত্রের মাত্রা বিন্যাস অভিনব। 'আমাকে এক/ দিন কাটতে/ হবে' পড়া বেশ কৃত্রিম। কিন্তু 'আমাকে একদিন/ কাটতে হবে' এমন ৬ + ৪ বিন্যাস মানিয়ে যায় এখানে। পরেব উদাহরণের ভাবাবেগটি মৃত্যুর অনুষঙ্গে বিষাদ মেদুর। মৃত্যুর এমন বাস্তব ছবি মাত্র কয়েকটি শব্দে. জিজ্ঞাসা চিহ্নে বেদনাগর্ভ রূপ পেয়েছে। পঞ্চম ছত্রে আছে তিনটি ছবি, ভয়ঙ্কর মৃত্যু অভিজ্ঞতায় জারিত এসব ছবি। 'তেল-কাপড়' পর্বের ছন্দসন্ধি পাঠক নিজের মতোই করে যান কবিতার ভাবাবেগের চাপে। সাতের উদাহরণটি ভিন্ন কারণে উল্লেখের। 'ও গুরু' অপূর্ণ পর্বের ছত্রে পাঠক ঈষৎ থমকে আবিষ্কার করেন যে এটি আসলে পরের পঙ্ক্তির বিচ্ছিন্ন অংশ। গুরুর ছবিটি পাঠকের মনে গেঁথে দিতেই যেন একটি সম্বোধন পদ সহ শব্দটিকে আলাদা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আট ও নয়ের উদাহরণ মিশ্রবৃত্ত ছন্দের আধুনিক রূপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ জাতীয় নিদর্শনকেই আমি বলেছি ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনার প্রকাশ। উচ্চারণের প্রগাঢ়তা, শব্দের সরল বিন্যাস, বাক্যের সংক্ষিপ্ততা ও স্বাভাবিক উচ্চারণ কবিতাকে ধ্যানের স্তরে উন্নীত করেছে। ছন্দ এখানে কবিকল্পনার অন্তর্মূলে কাজ করেছে কবি অনুভবকে সরল অবয়বে প্রতিষ্ঠার জন্য।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনার রূপটি পরের দুটি উদাহরণের মগ্ন উচ্চারণে ধরা পড়েছে। শক্তি তাঁর কবি-জীবনের একটা স্তরে কবিতাকে করে তুলেছিলেন জীবনসম্ভূত ধ্যানের উপকরণ। 'হে চির প্রণম্য অগ্নি' শুধু শক্তির নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৃত্যুচেতনার কবিতা, মৃত্যুচেতনা সেইসঙ্গে ইন্দ্রিয়চেতনা, মর্ত্যচেতনা আর ভালোবাসার বেদনায় বজ্রগর্ভ অমিল মুক্তকে রচিত এই কবিতা। পরের উদাহরণেও মৃত্যুর ছবি, ভালোবাসায় জারিত। আট ও এগার উদাহরণে উপপর্বের গঠনে যে নতুনত্ব, তার কথা আগেও বলেছি। 'কিন্তু, এখনি যাবো না', 'আছে জীবন বিচ্ছিন্ন' পদদুটির গঠন একই — ২ + ৩ + ৩, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অভিনব। কিন্তু উচ্চারণে ছন্দের গতিভঙ্গ হয় না, এর কারণ নিশ্চিতই রবীন্দ্রনাথ-কথিত পয়ারের (মিশ্রবৃত্ত) গাঁটে গাঁটে ভাগ করে পড়ার সুবিধা। শক্তি বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণে এখানে তাকেই ব্যবহার করেছেন।

শক্তি তাঁর কবি-জীবনের কোন পর্বেই কলাবৃত্ত ছন্দকে তাঁর কবিভাবনার অনুকূলে তেমন ব্যবহার করেন নি। 'উড়ন্ত সিংহাসন'-এর পরে এই ছন্দে লেখা কবিতা খুবই কম। সবচেয়ে উল্লেখের যে শক্তির বিখ্যাত কোন কবিতাই এই ছন্দে রচিত নয়। 'উড়ন্ত সিংহাসনে'র পরবর্তী পর্যায়ে কালানুক্রমিক কলাবৃত্তের প্রয়োগ এবারে আমরা লক্ষ্য করবো।

১। প্রকৃতির হাত প্রকৃত কিছুতে নেই
ভেঙে যদি যায় একটি বা দুটি গাছও —
আমার পালানো — পরাজয় বলে আঁকো?
কখ্‌খনো নয়, যতোই আহত করো।

—সুন্দর এখানে একা নয়, শীতে একদিন।

২। ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ে তার হাসি
নুড়ি পাথরের সম্পদ তাকে চেনে
নদীতীরে কোন কুহকী বাজালো বাঁশি—
আমি ঝর্ণার পরবাসী চাঁদবেনে।

—মানুষ বড়ো কাঁদছে, মালা নেই।

৩। পিছনে জল অথৈ আর সামনে আছে জ্বালা
দূর দেশের শিশুর কান বোমায় করে কালা
চোখের কাছে আঁধার — প্রাণ বাঁচায় মন বাঁচায়
কাজ কি শেষ এই দেশে?

—আমি একা বড় একা, পিছনে জল অথৈ।

কলাবৃত্ত ছন্দের মাত্র তিনটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হলো। সবকটি প্রথাবদ্ধ ছন্দ-রূপ রচিত। প্রথম দুটি ছয় মাত্রা পর্বে ও শেষেরটি পাঁচ মাত্রার পর্বে লেখা, দুই ও তিন উদাহরণে অন্ত্যমিলের সরল প্রয়োগ আছে। মাত্রাবিন্যাসে কি পর্বের গঠনে কোন বৈচিত্র্য নেই। তিনের উদাহরণটিতে পাঁচমাত্রার ৩ + ২ বিন্যাস অন্তত একটি ক্ষেত্রে ২ + ৩ বিন্যাস পেয়েছে। শক্তির কবিকল্পনার মৌলিক কোন উদ্দীপক এসব উদাহরণে কোথাও ধরা পড়েনি।

শক্তির কবিতায় মুখ্য ছন্দ মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত। দুই রীতিতে লেখা কবিতার সংখ্যা প্রায় সমান। কবিজীবনের এক এক সময়ে এই দুটি ছন্দের এক একটি প্রাধান্য পেয়েছে। সমকালীন কবিদের মধ্যে শক্তি দলবৃত্ত ছন্দে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন, শুধু তাই নয় তাঁর এই ছন্দ-চর্চা ধারাবাহিক ও

পরিণতি-মুখী। তরুণ বয়সে শক্তি রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে। রবীন্দ্রনাথের গানে দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তের আশ্চর্য সব প্রয়োগ আছে। কলাবৃত্তে রুদ্ধদলের উচ্চারণ পূর্ণায়ত কিন্তু দলবৃত্তে দুই দলের উচ্চারণই সমমাত্রিক। রবীন্দ্রনাথের গানের ঐশ্বর্য শক্তির কবিকল্পনাকে প্রাণিত করে থাকবে, এবং সেই সূত্রেই তিনি দলবৃত্তের ছোট ছোট অবিস্তৃত ধ্বনিস্পন্দে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। আঞ্চলিক ও কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির প্রস্বর-প্রবণতা বহু ভ্রমণে তিনি স্বদেশের মাটি থেকেই লাভ করেছেন। দলবৃত্তে এর প্রকাশ ঘটেছে সহজ ও স্বাভাবিক। দলবৃত্তের প্রতি তাঁর আসক্তির রহস্য সবটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। সেটা কবিস্বভাবের দুর্জ্ঞেয়তায় আচ্ছাদিত। শক্তির কবিতা স্বভাবধর্মে স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁর ভাষায় 'ঘোরে লিখা'। এই ঘোরে যে বাক-স্পন্দে তিনি কবিতা লেখেন, সে ভাষা সরল ও গতিময়, স্বাভাবিক উচ্চাবণের অনুগামী অথচ তীব্র আবেগে জারিত। এই আবেগের গতি-স্পন্দ বিশিষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে দলবৃত্ত ছন্দে। 'উড়ন্ত সিংহাসন'-এর পরবর্তী কবিতা থেকে পর্যায়ক্রমে দলবৃত্ত ছন্দের কিছু উদাহরণ আমরা এখানে চয়ন করছি।

১। এই মিলেতেই পদ্য মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো-সাক্‌সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতা ঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিট মদ্যে আঁচাতেন
ভোজ্য দ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো।

—পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, পোকায় কাটা কাগজপত্র।

২। প্রেমের মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে
নীল সমুদ্রে সাবাটি দিন কিংবা ধবল সাত পাহাড়ে—
প্রেমেব মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে?

—ভাত নেই পাথর রয়েছে, প্রেমের মড়া।

৩। আমার মতন রাজ্যশুদ্ধ ঠুকরে ঘোরা ভ্রমণকাবীর
দেখা তোমরা অবশ্য চাও
যাবো, আমি যাবোই — আমি কথা দিচ্ছি
দেখতে না পাও

—ঈশ্বর থাকেন জলে, কিন্তু আমার বল করে নে।

৪। অধরে অস্পষ্ট হাসিব অন্তরালের কুয়োতলায়
তৃষ্ণা আমার ষোলকলাব
স্নান সেরেছে
সর্বনেশে
পাতালপুবী বহস্যে ঠিক
আর আমাকে এ্যালকোহলিক
যায় কি বলা?

—ঈশ্বর থাকেন জলে, আমাকে আর এ্যালকোহলিক।

৫। মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

—মানুষ বড়ো কাঁদছে, দাঁড়াও।

৬। তোমার হাত ছুঁয়েই আমি ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেলাম
বিদায় নেবার অনেক আগে অনেকক্ষণ কি হেসেছিলাম?
তুমি জানো —দূরত্ব আর
মুখবোজা শাঁস পড়ে রয়েছে মধ্যে আমার।

—অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল, নামকবিতা।

৭। রাং-কলিজার উদোর পিন্ডি পড়লো সবার পাতে
বীঅর-টীঅর চললো বৃহৎ, পরের ভ্রমণসূচী
একবাক্যে বললো সবাই ... অরুচি অরুচি ...
জঙ্গলে গে' কি লাভ হলো? এই তো হরিণ খেলুম।

—প্রচ্ছন্ন স্বদেশ, শিকারবাহিনী।

৮। মধ্যে নদী, চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো —
থাকো, একটি চরে কেন? দু চর জুড়েই থাকো।
দু'চর এখন রহস্যময়,
তোমার হাতে অনেক সময়
থাকো,

— ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, সাঁকো।

কথ্য ভাষার একটা অন্তরঙ্গ মেজাজ ও প্রস্বর প্রবণতা শক্তির কবিতায় বেশ ধরা যায়। দলবৃত্তে লেখা কবিতায় এই অন্তরঙ্গতা যেন আরো প্রগাঢ়, সেইসঙ্গে আছে নিজেকে নিয়ে প্রচ্ছন্ন মজা। তাঁর কবিতার আভ্যন্তর কৌশলগুলোও উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে লক্ষ্য করবো আমরা। প্রথম উদাহরণের চার পঙ্ক্তির দু'টিতে একান্তব মিল। দ্বিতীয়-চতুর্থ পঙ্ক্তিতে রয়েছে মিলের সম্ভাবনা ও মিলপ্রত্যাহার। 'ঠাকুর শুনেছি' পাঠের পাঁচ মাত্রার সহজ স্বাভাবিক ও সাহসী বিন্যাসও লক্ষ্য করার। দ্বিতীয় উদাহরণে দুই পঙ্ক্তিতে একই শব্দধ্বনির মিল। 'জলে ভাসে না' পর্বের পাঁচ মাত্রা বিন্যাসে 'প্রেমের মড়া'র ভেসে থাকা ছবিটি যেন ঠিকরে ওঠে। এ জাতীয় পর্ব পাঠকের অভ্যস্ত আঘাত করে বেশ এবং অনিবার্যভাবেই তার শ্রুতিকে সতর্ক করে দেয়। তৃতীয় উদাহরণে আছে দলবৃত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানরূপ। শক্তির কবিমানসের ভ্রামণিক সত্তা মুক্তবন্ধে এখানে গতিময়। পরের উদাহরণে ধরা পড়েছে দলবৃত্ত মুক্তকের পূর্ণ চেহারা। সাতটি ছত্র পাঁচ-ছয় ছত্রের আকস্মিক মিলের ধ্বনি-স্পন্দে দীপ্ত হয়ে যেন তীব্র গতিতে ধাবিত হয়েছে অন্তিম জিজ্ঞাসায়। দলবৃত্ত মুক্তকে প্রতি ছত্রে অন্তত একটি পূর্ণ পর্বের সংস্থান থাকলে উচ্চারণের স্বাভাবিকতা পায়। সাধারণভাবে মিশ্রবৃত্তের মতো অপূর্ণ পর্বে মুক্তকের ছত্রবিন্যাস দলবৃত্তের ধ্বনিস্পন্দে স্বাচ্ছন্দ্য পায় না। বাংলা ভাষার এই প্রবণতা শক্তি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন।

পাঁচের উদাহরণে আছে কবির সামাজিক বিবেকের উচ্ছ্রিত প্রকাশ। 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' এই ভাবাবেগ শক্তিকে তাঁর কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বেই আলোড়িত করেছে। এখানে একই স্থির ধ্বনিস্পন্দ তাঁর সামাজিক আবেগে তীব্রতা দিয়েছে। ছেদ আর যতির প্রয়োগ নৈপুণ্যের সঙ্গে সর্বনাম 'তাহার' সাধু প্রয়োগের ধ্বনি-বিস্তার ছন্দকে অর্থের কত সংলগ্ন করেছে তার পরিচয়ও ধরা পড়েছে এই উদাহরণে।

ষষ্ঠ উদাহরণে আছে দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। শেষের যুগ্মকটি মুক্তবন্ধ। 'পড়ে রয়েছে' পাঁচ মাত্রা

পর্বে পড়ে থকার ব্যঞ্জনাটি লক্ষণীয়। হাতের উপমানে 'ঠান্ডা জলে'র প্রয়োগ এক গোপন বেদনাকে ছুঁয়ে যায়। 'হেসেছিলাম' ক্রিয়াপদটি পূর্ব পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিলের ধ্বনিস্পন্দে যেন দ্যুতিময় হয়ে ওঠে এখানে। বিপ্রীতক্রমে সপ্তম উদাহরণের লঘু মজাটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে কথ্য ভাষার জীবন্ত চাপে। সংলাপের বিশিষ্ট বিন্যাস তৈরি করে এক আভ্যন্তর নাটকীয়তা। শক্তির উচ্চারণের এই ভঙ্গিই তাঁর কবিভাষায় 'তি সঞ্চার করে।

দলবৃত্তে শেষ উদাহরণটি সমিল মুক্তকে রচিত। ছেদ ও যতির সংঘর্ষ ও সমন্বয় দলবৃত্তের চার মাত্রার চাল্টুকরো ছবিগুলোকে কিভাবে স্ফুট করেছে তা লক্ষ্য করা যাবে এখানে। জীবনের গভীর অনুভব স্বগত সংলাপে কিভাবে দলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে এসব কবিতা তারই যোগ্য নিদর্শ। বিষয় অনুসারে প্রস্বরের তীব্রতার হেরফেরে কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি কত জীবন্ত হয়েছে এসব উদাহরণে 'ার পরিচয় মিলবে।

শক্তি দ্যছন্দে খুবই কম লিখেছেন। তাঁর কবিভাষায় আবেগের যে তাড়না থাকে তা গদ্যের সরল বিন্যসের চেয়ে পদ্যের পর্ব-পদের ধ্বনিস্পন্দে স্বাভাবিক প্রকাশ পায়। গদ্যছন্দে তাঁর নিজস্বতা বোঝাতে 'খানে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

১। বুকের ভিতর কিছু পাথর থাকা ভালো — ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমারটুলির
সলমা- চুমকি - জরি মাখা প্রতিমা
--পাড়ের কাঁচা মাটির বাড়ি, একবার তুমি।

২। আমি তাব ভালোবাসার সব গ্রহণ করলাম এক অক্ষম জরদ্গাব পাহাড়েব নিচে। গ্রহণ করলামভয়। ছিন্নপক্ষ গগনভেরীর বিরাট বিপুল ডানার ভয়, তিতিরেব করুণ স্বর, তেচোলা ধনেশ বাজপা'র মর্মন্তুদ মৃত্যুর প্রত্যাক্ষকে।

—জ্বলন্ত রুমাল, সুবর্ণরেখার জন্ম।

৩ খিদিবপুরের কোণে জঞ্জাল জমেছে, একটু কম
কম মানে, আগে সাপের মুখ ছিঁড়ে বৃষ্টি হচ্ছিলো
এখন ভিখিরির উনুন তাক করে পড়ছে। ঝুরুক ঝুরুক
উনুন মানে দুটো কালো কালো ইঁট, যা এখন ঠিক
কষ্টিপাথরের মতন রূপ
—এই আমি যে পাথর, জঞ্জালে পাক হচ্ছে।

পদ্যে মতো ছত্র-সজ্জায় হোক আর টানা গদ্যেই হোক শক্তির গদ্যছন্দের অধিকাংশ কবিতায় গরে অন্বয় জরুরি কিছু নয়। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা ও কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি তাঁর কবিতার সাধারণ লণ। পর্বে পর্বাঙ্গে বিন্যস্ত না হলেও প্রথম দুটি উদাহরণ পদ্যের আবেগেই রচিত। তৃতীয় উহরণটি এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়। এখানে কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উঠে আসা স্তবজীবনের ছবি, যথাসাধ্য আবেগের তীব্রতাবর্জিত। এখানে আবেগ কাজ করেছে কবিতার তের থেকে, সামাজিক মন যে জীবনের ছবি আঁকছে তা আমাদের সমাজজীবনের কলঙ্ক। বাস্তব ভিত্তিতে কবি-আবেগ কাজ করেছে মানবিক মূল্যবোধ ও গভীর বেদনায়। প্রত্যক্ষ জীবন থেকে তুলে

আনা ছবির বাস্তবতা ও দৃশ্যময়তা গদ্যকবিতার মেজাজে ভারি সুন্দর ধরা দিয়েছে এখানে। বাংলা গদ্যকবিতার এই সম্ভাবনা শক্তি তার স্বল্প-চর্চিত গদ্যছন্দে বেশ ধরতে পেরেছিলেন।

শক্তির সারাজীবনের কাব্যচর্চা ছন্দনির্ভর। প্রথাগত ছন্দকে নিজস্ব উচ্চারণ ও আবেগের চাপে তিনি তাঁর কবিস্বভাবের অন্তর্গত করেছেন। ছন্দ সেক্ষেত্রে আর আলাদা প্রক্রিয়া নয়— কবিভাবনার অনুকূলে গড়ে ওঠা কবির নিজস্ব হৃৎস্পন্দন। ছন্দের ধ্বনিস্পন্দে যে আবেগের তাপ তৈরী হয়েছে তাতে অভিজ্ঞতার জগৎ মেলে ধরেছে তার রহস্য-ভূমি। স্বভাবতই প্রথাগত ছন্দ কবির নিজস্ব ছন্দ-প্রকরণে পরিণত হয়েছে। কোন সৎ কবিই অন্যের ভাষা ও ছন্দে নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে ব্যক্ত করতে পারেন না। বাংলা ছন্দ ও কবিভাষা বিবর্তন পথে যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল শক্তি সেখান থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করে প্রথমেই নিজ কবিভাষাকে আলাদা ছন্দপ্রকরণে নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। বাংলা ছন্দের রীতিনিষ্ঠ প্রথাবদ্ধরূপ আবিষ্কারের আর কিছু ছিল না, তাঁকে অনিবার্যভাবে কাজ করতে হয়েছে ছন্দের সম্ভাবনার রূপ নিয়ে। প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন: আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল, এর অর্থ তো এই যে প্রথাবদ্ধ ছন্দের তন্তুজাল ছিঁড়ে তিনি তাঁর কাব্য সাধনায় আবিষ্কার কবতে চেয়েছেন ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনা। তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা এবং অনুভবকে তিনি কবিতার রহস্যভূমিতে স্থাপন করেছেন নিজস্ব কবিভাষা ও ছন্দপ্রকরণে। তাঁর কাব্যসাধনায় বাংলা কবিতা ছন্দের তন্তুজাল ছিঁড়ে যথার্থই ছন্দের অনন্ত সম্ভাবনায় মুক্তি পেয়েছে।

বাংলা রূপতত্ত্বের ভূমিকা

পবিত্র সরকার

১. রূপতত্ত্বের সংজ্ঞা ও পরিসীমা

ভাষার শব্দ (word) নির্মাণের শাস্ত্রকেই সাধারণভাবে রূপতত্ত্ব (morphology) বলে। পদতত্ত্ব, পদপ্রকরণ ইত্যাদি আরও নানা নাম এর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রূপ বা morph হল পাশ্চাত্যের ধারণা, আর পদ মূলত প্রাচ্যের বা ভারতীয় ধারণা। পদ কথাটির ব্যাকরণগত অর্থ (দ্র. চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯ : ১৪৫) যদি ধরে নিই, অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দই পদ বা grammatical word, তাহলে দেখব রূপতত্ত্ব নামটিই বেশি সংগত। কারণ রূপতত্ত্ব শুধু পদের নির্মাণ আলোচনা করে না, তা শব্দেরও নির্মাণ আলোচনা করে। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার আগে পদের যে রূপ তা-ই যদি শব্দ বা lexeme (দ্র Lyons, 1968 : 197 ও অন্যত্র) বলে আমরা গ্রহণ করি, এই শব্দের গঠনপ্রক্রিয়াও রূপতত্ত্বের আলোচ্য। কাজেই শুধু পদতত্ত্ব বা পদ প্রকরণ বললে রূপতত্ত্বের সমগ্র ক্ষেত্রটি স্পষ্ট হয় না।

শব্দ বা lexeme একটি নির্বস্তুক ধারণা বা ভাববস্তু (substance)। তার দুরকমের শরীর (form) বেশির ভাগ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এক তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বা উচ্চার্য রূপ (Phonological) ; দ্বিতীয়ত তার লেখ্য (orthographical) রূপ। ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপটি ভাষার বক্তাদের স্মৃতিতে থাকে। তা থেকেই বাক্যে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন করে পদ হিসেবে তাকে প্রয়োগ করা হয়। আবার অভিধান ও অন্যান্য গ্রন্থে তার একটি লিখিত বা লেখ্য রূপ দেখা যায়। অর্থাৎ শব্দবস্তুর দুটি প্রকাশ—ধ্বনিগত ও লিপিগত। শব্দবস্তুর ধ্বনিগত রূপটি যখন সত্যসত্যই বাক্যে উচ্চারিত রূপে প্রকাশ পায় তখন তা স্বননরূপ (phonetic form) লাভ করে। তা এখানে আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হল এই কথা যে, শব্দবস্তুর (word-substance) নির্মাণের প্রক্রিয়াও রূপতত্ত্বের আলোচ্য বলেই তাকে পদতত্ত্ব বলা উচিত নয়।

তাহলে রূপ (morph) কী? রূপ হল ধ্বনির দ্বারা প্রকাশিত অর্থের ন্যূনতম খণ্ড (minimal meaningful unit of a grammar)। ব্লুমফিল্ড morph বা morpheme -কে ভাষার smallest signals (Bloomfield, 1933 : 162) বলেন। বাজেল (দ্র. Bazell. 1949/ 1966 : 216-26) ব্লুমফিল্ড ও তাঁর অনুবর্তীদের ধারণার সমালোচনা করে যে সংজ্ঞা দেন তা এইরকম—'মরফিম হল (the) "minimal complex of semantic features capable

of receiving distninct expression." (p 226)। এখানে বলে দেওয়া ভালো যে, morph বা রূপাঙ্গ হল রূপমূলের (morpheme) ব্যবহৃত, প্রকট চেহারা। অর্থাৎ রূপমূল একটি ধারণা মাত্র, কিন্তু রূপাঙ্গ তার বিভিন্ন প্রতিবেশে, একই অর্থে কিন্তু অল্পবিস্তর ভিন্ন ধ্বনিগত চরিত্রে, প্রযুক্ত প্রকাশবৈচিত্র্য। বাংলায় সম্বন্ধবিভক্তির রূপমূল যদি -র ধরে নিই, তাহলে তার দুটি রূপাঙ্গ:-র আর-এর। রূপাঙ্গ রূপমূলেরই অর্থ বহন করে, কিন্তু প্রতিবেশের প্রয়োজনে তার ধ্বনিগত শরীর অল্পবিস্তর ভিন্ন হলে তাকে রূপভেদও (allomorph) বলা হয়ে থাকে। রূপমূল আসলে রূপবস্তু, আর রূপাঙ্গ-রূপভেদ তার শারীরিক প্রকাশ।

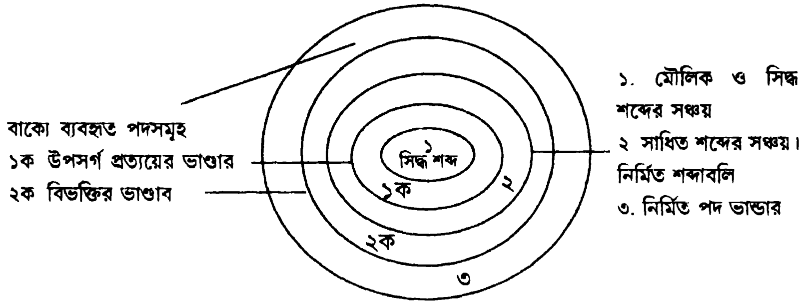
পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা মরফোলজি বলতে বোঝান—কী করে এই রূপাঙ্গগুলি মুক্ত হয়ে শব্দ নির্মাণ করছে তারই শাস্ত্রকে। এক্ষেত্রে ব্লুমফিল্ড একটা প্রাথমিক সূত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে রূপ (form বা morph) আসলে দুরকমের—মুক্ত রূপ (free morph) আর বদ্ধ রূপ (bound morph) (দ্র. Bloomfield, 1933 : 177-8)। মুক্ত রূপ হল সেইসব রূপমূল, যেগুলি একাই শব্দ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন hit, book, table, John ইত্যাদি; আর বদ্ধ রূপ হল ভাষার সেইসব উপাদান যেগুলি এককভাবে শব্দ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না—অন্য কোনো রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই তাদের বাক্যে ব্যবহৃত হতে হয়। ব্যাকরণের বিভক্তি আর প্রত্যয়গুলি সবই বদ্ধ রূপ। প্রত্যয়গুলির মধ্যে উপসর্গগুলিকে ধরতে হবে, ধরতে হবে ইংরেজি the, a-র মতো article-গুলিকে, (যদিও ব্লুমফিল্ড এদের নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছিলেন), ধরতে হবে বাংলা অনুসর্গগুলিকে। এই শেষের দুটি শ্রেণী শব্দ হলেও তা বদ্ধ রূপের উদাহরণ।

যাই হোক, এই মুক্ত রূপগুলি এককভাবে, কিংবা সমাসবদ্ধরূপে, কিংবা অন্য বদ্ধ রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে পদ-জন্ম লাভ করে; আর বদ্ধ রূপগুলি অন্য বদ্ধ রূপের বা মুক্ত রূপেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ ও পদনির্মাণ করে। শব্দের স্থান হয় অভিধানে, আর পদের স্থান হয় বাক্যে।

প্রথাগত ব্যাকরণে এবং ভারতীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণের প্রক্রিয়াগুলিকে পৃথক করে দেখানো হয়। বলা বাহুল্য, যে শব্দগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে ভাষায় এসে পৌঁছেছে, যেমন গাছ, চশমা, হাত, মানুষ ইত্যাদি, ব্লুমফিল্ডের তথাকথিত মুক্তরূপগুলি, সেগুলির নির্মাণ ব্যাকরণে হয় না, কারণ সেসব সিদ্ধ বা সম্পন্ন শব্দ, আগেই তৈরি হয়ে আছে; সেগুলি নতুন করে নির্মাণ করার কিছু নেই। এগুলি হল ভাষার শব্দের মূল ভাণ্ডার। কিন্তু এগুলির সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বা সমাস করে যখন গাছড়া, চশমাধারী বা হাতল, হাতানো ইত্যাদি শব্দ তৈরি হল, সেগুলি হল যৌগিক বা সাধিত শব্দ —এবং তা আমাদের শব্দভাণ্ডারের আর-একটা স্তর তৈরি করল। এ দুধরনের শব্দই অভিধানে ঠাঁই পেল।

যা সাধারণত অভিধানে ঠাঁই পায় না তা হল পদ, যা বিভক্তিযোগে তৈরি হয়। পদ হল বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ। বাক্যে বিশেষ্য সর্বনাম, এবং অন্যান্য নানা ভাষায় বিশেষণ ইত্যাদি কারকে আশ্রিত হয়, তখন তাদের গায়ে কারকের চিহ্ন বা বিভক্তি লাগে। কখনও-বা তাদের গায়ে বচন ও লিঙ্গের প্রত্যয় লাগে। আবার ক্রিয়ার মূল আভিধানিক রূপ ধাতু-র সঙ্গে বিভক্তি লাগিয়ে কাল, পুরুষ, বচন লিঙ্গ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তখন তা ক্রিয়াপদ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা হয়তো একথা বলতে পারি যে শব্দ-নির্মাণ একটি কমবেশি ধীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রতি মুহূর্তে দৈনন্দিন ঘটছে এমন ব্যাপার নয়। কিন্তু পদনির্মাণ একেবারে প্রতি মুহূর্তে প্রতি বক্তার প্রতিটি বাক্য

ব্যবহারেই ঘটছে—বাক্য সৃষ্টির অনন্ত প্রক্রিয়ার তা অঙ্গ। এইভাবে শব্দ ও পদ মিলিয়ে রূপতত্ত্বের যে আকৃতি দাঁড়ায় তা অনেকটা এইরকম:



মূল আভ্যন্তরিক বৃত্তে আছে সিদ্ধ পূর্বনির্মিত শব্দাবলি, যেগুলি ব্লুমফিল্ডের ভাষায় free form, যেগুলি আর নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই। ওই এক নম্বর বৃত্তের বহির্বৃত্তে আছে উপসর্গ প্রত্যয় অনুসর্গ ইত্যাদি, পাশ্চাত্য ব্যাকরণের ভাষায় derivational suffixes। ১ নম্বর বৃত্তের উপাদান ও ১ক বৃত্তের উপাদান, কখনও কখনও ২ ও ১ বা ১ক বৃত্তের উপাদান মিলে তৈরি হল ২ নম্বর বৃত্তের শব্দাবলি—সবই সাধিত শব্দ। আর ১ ও ২ নম্বর বৃত্তের উপাদানের সঙ্গে ২ক বৃত্তেব বিভক্তি ও অনুসর্গের সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি হল ৩ নম্বর বৃত্তের যাবতীয় পদ।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করা যাক। ১ নম্বব বৃত্তের শব্দের সঙ্গে ১ক বৃত্তের উপাদানযোগে নতুন শব্দ কীভাবে তৈরি হচ্ছে দেখি।

প্রত্যয়যোগ : সিদ্ধ শব্দ (১) + প্রত্যয় (১ক) = সাদা + টে = সাদাটে (২)

সমাস : সিদ্ধ শব্দ (১) + সিদ্ধ শব্দ (১) = সাদা + কালো = সাদাকালো

জটিল নির্মিতি : উপসর্গ (১ক) + ধাতু (১) + প্রত্যয় (১ক) + প্রত্যয় (১ক) + প্রত্যয় (১ক) = আ + দেখ্ + ইল্ + ইয়া > এ + পনা = আদেখলে (২) + পনা (১ক) = আদেখলেপনা

২ বৃত্ত পর্যন্ত শব্দনির্মিতির এলাকা। ২ক ও ৩ বৃত্ত পদনির্মিতির। এই দুটি বৃত্তের সক্রিয়তা অনেক বেশি। ২ক বৃত্তে আছে বিভক্তি অনুসর্গ ইত্যাদি inflexion -এর উপাদান—বিশেষ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে কারকের বিভক্তি, আর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাল পুরুষ বচন ইত্যাদির বিভক্তি।

বচন ও লিঙ্গের চিহ্ন বিভক্তি না প্রত্যয়?

অনেক সময়েই বিভক্তি ও প্রত্যয় কথা দুটির বিভ্রান্তির ফলে বচন বিভক্তি, লিঙ্গবিভক্তি এই কথাদুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমরা উপরের ছকটির সাহায্য নিয়ে বলতে পারি যে, বচন ও লিঙ্গ শব্দনির্মিতি প্রকরণের অন্তর্গত, আর কারক, কাল, পুরুষ ইত্যাদি পদনির্মিতি প্রকরণের অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রত্যয় (derivational suffix) যুক্ত হলে আমরা শব্দই পাই, পদ নয়। ফলে বচন-প্রত্যয় ও লিঙ্গপ্রত্যয় যুক্ত যে-সব শব্দ আমরা পাই সেগুলি নতুন সাধিত শব্দ মাত্র, পদ নয়। পদ যে নয় তার প্রমাণ এই যে, এগুলিতে আবার বিভক্তি লাগিয়ে পদ তৈরি করতে হয়, যেমন

'ভেড়াগুলোকে মাঠে চড়াতে নিয়ে যাও।' 'ভেড়া'র সঙ্গে নির্দেশক প্রত্যয় গুলো লাগল, তার ফলে নতুন শব্দ তৈরি হল ভেড়াগুলো। তার সঙ্গে-কে বিভক্তি লাগিয়ে তাকে পদ-এ পরিণত করা হল। অভিধানে অবশ্য বহুবচন রূপ থাকে না, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ রূপ থাকে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বহুবচনরূপ নির্মাণ যতটা প্রত্যাশিত পথে চলে, তা বক্তাদের যতটা অভ্যস্ত এবং তার সম্ভাবনা যত সীমাবদ্ধ, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ সেসব ততটা নয়, আবার ততটা সহজে অনুমানযোগ্য (predictable) নয়।

তেমনই স্ত্রীলিঙ্গ রূপের ক্ষেত্রেও 'আজ ধোপানিকে কাপড় দিয়ে কাজ নেই।' 'ধোপানি' কথাটির নির্মাণ আগে হয়েছে, তা অভিধানের অংশ হয়েছে। তারপরে পদপ্রকরণের ক্ষেত্রে এসে -কে যুক্ত হয়ে তা পদ-এ পরিণত হয়েছে কাজেই রূপতত্ত্বে শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ দুটি অংশ-- এমন কথা সহজেই বলা যায়। আগে শব্দনির্মাণ, পরে পদনির্মাণ—এই ক্রমে ব্যাকরণে ব্যবহারিক রূপতত্ত্বের কাজ চলে। অ্যান্ডারসনের রূপতত্ত্বের সংজ্ঞা (Anderson, 1988 : 146) "... the study of the structure of words–both within some larger construction such as sentence and across the total vocabulary of the language"-কে এই আলোচনার আলোতেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. শব্দনির্মাণ পদনির্মাণ : তার নানা পদ্ধতি

আমাদের উপরের আলোচনায় এমন মনে হতে পারে যে, কেবল প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করেই বুঝি শব্দ বা পদনির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ 'ক' একটি উপাদান, তার সঙ্গে 'খ' প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করা হলে ক + খ হল একটি শব্দ বা পদ। বলা বাহুল্য, শুধু দুটি উপাদানই যুক্ত হয় তা নয়, 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব' তে 'প্রতি + উৎ + পদ্ + ত + মন্ + তি + ত্ব' এই এতগুলি উপাদান আছে, unpretentiousness -এ আছে অন্তত un + pre + tend + ious + ness — এই পাঁচটি উপাদান। উপাদান আগে পরে মাঝখানে সব জায়গাতেই জুড়তে পারে। যেমন বাংলায় 'গিয়ে-ই-ছিতো' কথাটাতে -ই- এসে মাঝখানে বসেছে। আগে বসার উপাদান সংস্কৃত ব্যাকরণে উপসর্গ, (prefix), শেষে জুড়ে যাওয়া উপাদান প্রত্যয় ও বিভক্তি (suffix)—পাশ্চাত্য ব্যাকরণে বর্ণনাপন্থীবা প্রত্যয় ও বিভক্তির সেভাবে তফাত করেন না), আর মাঝখানে জুড়ে যাওয়া উপাদান মধ্যসর্গ (infix) বলতে পারি।

কিন্তু এই A + b + c ধরনের যৌগিক পদ্ধতি শুধু বাংলায় কেন, কোনো ভাষাতেই শব্দ বা পদনির্মাণের সমস্ত বা একমাত্র পদ্ধতি নয়, এবং এ থেকে বাংলা শব্দনির্মাণের বা রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপও সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবে না। আমরা এই যান্ত্রিক যোগফল-প্রক্রিয়ার মধ্যেও কী ধরনের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা পরে লক্ষ করব। শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ—এই দুভাগে ভাগ করে ওই নির্মাণ-প্রক্রিয়াগুলি আমরা বোঝবার চেষ্টা করব।

শব্দনির্মাণসূত্র ১: প্রত্যয়যোগ

এই প্রক্রিয়াটিই সকলের চেনা, এবং এর কথাই নানা ব্যাকরণে বেশি করে থাকে। যেমন— আম + আনি = আমানি, ঘর + আমি = ঘরামি, বাবু + আনা = বাবুয়ানা, হা + ঘর + ইয়া >এ = হাঘরে ইত্যাদি।

এর মধ্যে, এবং পরে পদনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিভক্তিযোগের মধ্যেও, যে জিনিসটি দেখার সেটি সাধারণ ব্যাকরণে লক্ষ করা যায় না, (চাকী, ১৯৯৬ অবশ্য লক্ষ করেছেন)। তা হল এই যে, বাংলায়

প্রত্যয়, বা বিভক্তিযোগের ফলে আগের উপাদানে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তনও ঘটে। এটি নির্ভর করে প্রত্যয়/বিভক্তিতে কী স্বরধ্বনি আছে বা ছিল তার উপর। এ পরিবর্তন মূলত ঐতিহাসিক পরিবর্তন, অর্থাৎ আগে ঘটেছে, এখন তার সর্বশেষ পরিণামটিই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ধরা যাক 'হাঘরে' কথাটা। এটা অনায়াসে হা + ঘর + এ হিসেবে ব্যুৎপাদন করা যায়। কিন্তু এই ঘর + এ উচ্চারণে 'ঘোরে'। বেঘোরে-র 'ঘোরে'-এর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। 'ঘর + এ' -তে সাধারণভাবে 'ঘোরে' হওয়ার কথা নয়, কারণ 'আমি ঘরে ঢুকলাম— কথাটিতে যে 'ঘরে' (ঘর + এ), তার উচ্চারণ 'ঘোরে' নয়। 'হাঘরে'-র 'ঘরে' কেন 'ঘোরে' হল তার রহস্য স্পষ্ট হবে যদি আমরা এটিকে ব্যুৎপন্ন করি হা + ঘর + ইয়া → হা + ঘোরিয়া → হাঘোইরা →হাঘোই্রে → হাঘোরে এই ক্রমে। অর্থাৎ প্রথমে 'ইয়া' যোগ হল 'ঘর'-কে 'ঘোর' করে স্বরসংগতি বা স্বরোচ্চতাসাম্যের নিয়মে। ফলে কথাটি হল 'হাঘোরিয়া'। তারপর অপিনিহিতিতে 'হাঘোই্রা' তারপর পশ্চাৎ স্বরোচ্চাতাসাম্যের নিয়মে 'হাঘোই্রে' এবং পরে অপিনিহিত স্বরলোপের নিয়মে 'হাঘোরে'। অর্থাৎ ধ্বনিপরিবর্তনের নানা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বাংলাভাষার প্রত্যয়গুলিকে আর স্বচ্ছ রাখেনি। প্রত্যয়ের মূল রূপটি কী ছিল এবং সেই রূপের কোন্ বৈশিষ্ট্য ওই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা এখন বোঝা মুশকিল। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলায় শব্দ- ও পদনির্মাণ নিছক A + b + c + d গোছের যৌগিক প্রক্রিয়া নয়। এবং 'হাঘরে'-রে 'এ' যে আসলে 'ইয়া'—ইতিহাসের এই তথ্য খেয়াল না রাখলে আমরা 'হাঘোরে' উচ্চারণের মর্মেই ঢুকতে পারব না। এই কারণে বাংলা ব্যাকরণের একটা অংশে রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphophonology বা morphonology) আলোচিত হওয়া আবশ্যিক।

শব্দনির্মাণসূত্র ১-এর মধ্যেই আমরা উপসর্গযোগকেও ধরেছি, কারণ আমাদের মতে শব্দে অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন হলেও প্রত্যয় ও উপসর্গগুলির ভূমিকা অনেকটা একইরকম। প্রত্যয় মূলত পদান্তর ঘটায়, অর্থাৎ বিশেষ্যকে বিশেষণ, বিশেষণকে বিশেষ্য ইত্যাদি রূপ দেয় আর উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ্য বিশেষণ বা ক্রিয়ার অর্থে পরিবর্তন ঘটায়। আহার, বিহার, প্রহার, উপহার অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন শব্দ, বিভিন্ন উপসর্গযোগের ফলেই এমন হয়েছে। উপসর্গযোগে ধ্বনিপরিবর্তনের দৃষ্টান্তও আছে—বিধান → বিধেন, বিচার → বিচের। কিন্তু তা মূলত উপভাষায় ঘটে, যদিও 'বিকেল' মান্য উপভাষায় পাই।

প্রত্যয়যোগে ধ্বনিপবিবর্তনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই, অথচ ধ্বনিপরিবর্তনের পরিবেশ আছে এমন উপলক্ষ্যও পাই। ধরা যাক স্বীকৃতি সংকল্প নির্দেশ ইত্যাদির প্রাবল্যবাচক -ই প্রত্যয়টি —যাব-ই, ও-ই, নিশ্চয়ই, খারাপ-ই, এক-ই । লক্ষ করি, এক (অ্যাক্) + টি বা এক (অ্যাক) + টু হলে হয় এক (এক) টি, একটু; কিন্তু একই থাকে অ্যাক্ই। 'দেশ + ই' 'দিশি' হয়, কিন্তু হবে +ই 'হবিই' হয় না।

বাংলা প্রত্যয়ের নানা শ্রেণী

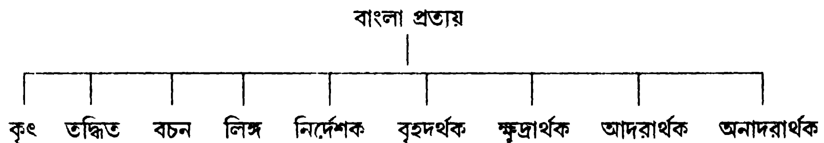
এই উপলক্ষ্যে বাংলা শব্দনির্মাণে কত ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে। কৃৎ ও তদ্ধিতের তালিকা প্রায় সব ব্যাকরণেই থাকে এবং এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , (১৯০৯/ ১৯৮৪: ৮৯-১০৪) ও সুনীতিকুমারের আলোচনা (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯: ১৪৬-২০৩) ও তালিকা বেশ বিস্তারিত। এর আগে বচন ও লিঙ্গ-প্রত্যয়ের কথা আমরা

বলেছি। নির্দেশক প্রত্যয়গুলিকেও (টা টি টু খানা খানি গাছা) একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে গণ্য করতে হবে। আরও এক ধরনের প্রত্যয় বাংলায় আছে যাকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থক (dimunitive) প্রত্যয়। সাধারণত '-ই'-এর যোগে গোলা হয় গুলি, ঝোলা → ঝুলি, পোঁটলা → পুঁটলি। সেক্ষেত্রে প্রথম শব্দটির -আ প্রত্যয়টিকে বৃহদর্থক প্রত্যয় বলতে হবে। ফলে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য -আ আর -ই —এই দুটি প্রত্যয় তুলনায় বৃহৎ ও তার ক্ষুদ্রতর রূপ —এইরকম অর্থযুক্ত শব্দের জোড়া তৈরি করে।

আরও এক ধরনের প্রত্যয় আছে যা নাম ধরে ডাকার ক্ষেত্রে আদর ও অনাদরের ছবি তুলে ধরে। 'রাম' যদি নাম হয়, আদরের ডাক হল রামু (রাম + উ), কিন্তু অনাদরের ডাক রামা (রাম + আ)। পুরুষদের নামে অনাদর-মুদ্রণের আরও রূপ আছে —বিম্‌লে (বিমল + ইয়া > এ), হ'রে (হোরে = হরি + ইয়া > এ), যেদো (যাদব → যাদ্ + উয়া > ও) মোদো (মধু + উয়া > ও + ধ-এর অল্পপ্রাণীভবন) ইত্যাদি। মেয়েদের নামে এক্ষেত্রে সাধারণত -ই প্রত্যয় লাগানো হয়— বিম্‌লি, সাবি, ক্ষেন্তি ইত্যাদি। এর বিস্তারিত ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দেখানোর সুযোগ এখানে নেই (সরকার ও বসু, ১৯৮৯: ১৯৯-২০৮ দেখুন), কিন্তু বিষয়টি খুব অস্পষ্ট নয়।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের তালিকার মধ্যে সচরাচর ধরা হয় না এরকম দুটি প্রত্যয়ের আমরা অন্তর্ভুক্তি দাবি করব। একটি হল অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষ্য (verbal noun) নির্মাণের -আ এবং -আনো (দুটি প্রত্যয়কে ভূমিকার ঐক্যের জন্য আমরা একটি বলেই ধরছি), যেমন √বল্ + আ, √শোন্ + আনো। আর-একটি হল ব্যতিহার ক্রিয়ানির্মাণের অসংলগ্ন -আ. .ই প্রত্যয়। 'ডাকাডাকি' কথাটিতে √ ডাক্ + আ + √ ডাক্ + ই যেমন। দু ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ তৈরি হচ্ছে এবং সংস্কৃতের -অন (অনট্) প্রত্যয়ের যা ভূমিকা এগুলিরও তাই। সুতরাং বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের তালিকায় -আ, -আনো এবং -আ ..... -ই (কিংবা অন্য প্রতীক ব্যবহার করে X আ X ই, যেখানে X একই ধাতু) চলে আসবে।

এইসব বিবেচনার পর বাংলা প্রত্যয়ের শ্রেণীগুলি এইরকম দাঁড়ায় —



'মনস্তাত্ত্বিক' প্রত্যয়

উপরের প্রত্যয় শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটির ক্ষেত্রে আমরা মনস্তত্ত্ব বা মনোভাবের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ করব। ওই প্রত্যয়গুলির প্রয়োগে শুধু যে শব্দের পৃথক শ্রেণী নির্মাণ করতে চাই আমরা তা নয়, আমরা ওই শব্দগুলি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবকেও (প্রশ্রয়, আদর, অবজ্ঞা, অনাদর) ইত্যাদি প্রকাশ করতে চাই। অনেক ব্যাকরণেই পৃথক শব্দ—গালাগাল বা cusswords ব্যবহার করে অনাদর প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বাংলায় রূপতত্ত্বেই প্রত্যয়যোগের দ্বারা কাজটি সমাধা করার ব্যবস্থা আছে।

বিশেষভাবে নির্দেশক প্রত্যয়ের -টা ও -টি এবং আদর অনাদরের প্রত্যয়গুলি এই মনোভাব-

প্রকাশের বাহন বলে এগুলিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয় আখ্যা দিতে পারি। 'মেয়েটা' বনাম 'মেয়েটি', 'রাম' বনাম 'রামু' ও 'রামা', 'সতীশ' বনাম 'সতু' ও 'সতে'— এই মনোভাব-বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয়। এতে বাংলা ব্যাকরণে বাংলার সমাজ-মনস্তত্ত্বের প্রভাব সূচিত হয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষা কীভাবে ভাষার শরীরে সঞ্চারিত হয় এটি তার একটি প্রমাণ। বাংলা ব্যাকরণের এ বৈশিষ্ট্যটির সাক্ষাৎ অনেক ভাষার ব্যাকরণেই পাওয়া যাবে না।

শব্দনির্মাণসূত্র ২ : ভিন্ন স্বরধ্বনি

এই নিয়ম খাটে মাত্র কয়েকটি অর্থসম্পর্কিত শব্দযুগলের উপর, এবং একটি সংকীর্ণ (non-productive) নিয়ম। এগুলি ভাষার ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ, জীবন্ত নিয়ম নয়। অ স্বরধ্বনির বদলে আ স্বরধ্বনি বসিয়ে এগুলিতে প্রযোজক বা প্রেরণার্থক অর্থ পাওয়া যায়— চল্-চাল্, নড়্-নাড়্, পড়্-পাড়্, মর্-মার্ ইত্যাদি। এগুলি অনেকটা ইংরেজি strong verb -এর মতো। তবে সেগুলি পদ, শব্দ নয়।

শব্দনির্মাণ সূত্র ৩ : ব্যঞ্জনের দীর্ঘত্ব (lengthening of consonant, Genuination)

অনেক সময় স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব ঘটিয়ে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির মাত্রা বাড়ানো যায়, যেমন 'হ্যাঁ—', 'না—', 'এ--- আর এমন কী কথা!' কিন্তু এগুলি বাচন (speech)-এর বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণের নয়। বাংলায় কিন্তু একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটিয়ে কিছু বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদির প্রাবল্য, আতিশয্য, তীব্রতা ইত্যাদি মাত্রা নির্মাণ করা হয়, এবং তা প্রায় ভিন্ন শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বড় → বড্ড, ছোট → ছোট্ট, একেবারে → এক্কেবারে ইত্যাদি।

শব্দনির্মাণসূত্র ৪ : শব্দদ্বিত্ব

বাংলা বাচনক্রিয়ায় শব্দ-বহুত্বের একটা সুযোগ আছে, যেমন, 'না-না-না-না! এ কিছুতেই হতে পারে না।' উত্তেজনা বা আবেগপ্রাবল্যে এর কম বহুলতা ঘটে। তবু আমাদের ধারণা, এর একটি প্রত্যাশিত গড় আছে, সেটি তিন সংখ্যাটি। বেশ কিছু সময় 'না-না-না'-ই শুনি আমরা, বুঝতে পারি, শ্রোতার নিষেধ রীতিমতো আন্তরিক। এভাবে 'হায় হায় হায় — কী পাপ করেছিলাম যাতে ঘরে এমন কুলাঙ্গার জন্মাল!' 'যাও-যাও-যাও—তোমার মতো অনেক দেখেছি', 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—কতবার বলব কথাটা?' ইত্যাদিতে উপেক্ষা, অধৈর্য ইত্যাদির প্রাবল্য বোঝা যায়। এর বেশি হলে তার তীব্রতা প্রায় অস্বাভাবিকের দিকে যায়।

যখন এ ধরনের নিষেধ বা স্বীকৃতিসূচক শব্দটি মাত্র দুবার উচ্চারিত হয় — 'না-না, এ কিছুতেই হতে পারে না' তখন তা স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়ায় না, কেবল তাতে সামান্য একটু জোর পড়ে।

কিন্তু এসব প্রয়োগ ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ শব্দদ্বিত্ব নয়। বাংলা শব্দদ্বিত্বের পৃথক আলোচনা অন্যত্র করা হবে। তবে এ প্রসঙ্গে মূল কথা হল যে এই শব্দদ্বিত্ব বাংলা ব্যাকরণে একটি বিধিসম্মত প্রক্রিয়া এবং উপরের প্রয়োগগুলির মতো তা মানসিক আবেগের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে না। কোন্ শব্দটির দ্বিত্ব ঘটেছে তারই উপর কী বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অনুসর্গ ইত্যাদির দ্বিত্ব পৃথক পৃথক অর্থের মাত্রা আনে। আমরা তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে করব না, কেবল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাব। **বিশেষ্য** উদ্ধৃতিসূচক: 'মা মা' করছিস কেন? ব্যাপ্তি: 'ঘরে ঘরে কথাটা পৌঁছে দাও', বিস্তার: ' দিন দিন কেমন যেন হয়ে

যাচ্ছ তুমি।' বহুলতা: 'হাতে হাতে কাজটা করে দাও'। সীমা: 'সকাল সকাল এসে পোড়ো।'. সর্বনাম 'যাকে যাকে পাঠিয়েছিলে সে সে ফিরে এসেছে?' বিশেষণ প্রাচুর্য: 'ভালো ভালো কথা অনেক শুনেছি', সামীপ্য: 'কেমন যেন সবুজ সবুজ রঙের বাড়িটা', ব্যাপ্তি: 'চারদিকে সব লম্বা লম্বা হাইরাইজ'। ক্রিয়া: সামীপ্য: 'তখন সন্ধ্যা হয় হয়, 'লোকটা তো যায় যায়।' উদ্ধৃতিসূচক: 'গেল গেল' চিৎকার উঠল।' দ্বিধা: 'বলি বলি করে বলা হল না।' সীমা: 'দেখতে দেখতে লোকটা উধাও হয়ে গেল।' বিস্তার: 'দেখতে দেখতে (= দেখে দেখে) পুরো সময়টা কেটে গেল।' 'শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গেছি।' অনুসর্গ 'থেকে থেকে অমন চমকে ওঠে কেন?' এখানে অনুসর্গ ক্রিয়াবিশেষণের কাজ করছে। 'মাঝে মাঝে দেখা দিয়ো। ড্রআরগুলোর ভেতরে ভেতরে খুঁজে দ্যাখো!' ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, উদ্ধৃতিসূচক রূপগুলি আমাদের এ অংশের প্রথম রূপগুলির মতো দুয়ের বেশিবার পুনরাবৃত্ত হতে পারে। 'মা মা করছিস কেন' কথাটায় আরও ব্যঙ্গ এনে 'মা মা মা মা করছিস কেন' বলা যেতেই পারে। কিন্তু '* তখন সন্ধ্যা হয় হয় হয় হয়' হবে না। * 'ভালো ভালো ভালো ... কথা'-ও হবে না। আবার দেখছি—অভিজ্ঞতা, সময় ইত্যাদির ক্লান্তিকর দীর্ঘত্ব বোঝাতে 'শুনে শুনে শুনে শুনে' হতে পারে। ফলে কোন্ পুনরাবৃত্তি দুইটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, কোন্‌টি বিশেষ ক্ষেত্রে দুয়ের বেশিবার ব্যবহৃত হতে পারে, তারও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তবে আমরা বলতে পারি, দুই সংখ্যার আবৃত্ত প্রয়োগগুলিই বাংলা রূপতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক (productive) নিয়মের অধীন।

শব্দনির্মাণ সূত্র ৫ : সমাস (Compounding)

সমাস ব্যাকরণে একটি বহু-আলোচিত অধ্যায়, সুতরাং এখানে তার সম্যক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বাংলায় দুই শব্দের সমাস (কাঁচাপাকা) যেমন হয় তেমনই দুয়ের বেশি শব্দেরও সমাস হয়ে থাকে — যেমন 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'চাল-ডাল-আটা-ময়দা' ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রেই এরকম হয়। নিহিতার্থ বা নিহিতসম্বন্ধ সমাসে প্রধানত দুটি শব্দের সমাস হয়। আমরা অনুকার শব্দগুলিকেও —কাপড়-চোপড়, ধানাই-পানাই, চাকর-বাকর — এক ধরনের সমাস বলতে পারি, আবার প্রতিধ্বন্যাত্মক বইটই, ঘোড়া-টোড়াকেও সমাস হিসেবে গণ্য করতে পারি। অর্থাৎ আর-এক দিক থেকে বাংলা সমাসের দুটি শ্রেণী—অর্থপূর্ণ ও (আপাত) নিরর্থক শব্দের সমাস এবং দুটি বা ততোধিক অর্থপূর্ণ শব্দের সমাস।

অ্যান্ডারসন (1988. 188) দেখিয়েছেন যে, সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে শব্দ বা word হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে কারও কারও তাত্ত্বিক আপত্তি আছে। এই তাত্ত্বিক আপত্তি কী ধরনের তার আলোচনার প্রয়োজন এখানে তত নেই। আমরা এই আপত্তি গ্রাহ্যও করব না; তার কারণ, বাংলা ও অন্যান্য অনেক ভাষার রূপতত্ত্বে সমাসবদ্ধ পদগুলিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি শব্দ বলেই মনে করা হয়। তার সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দান্তর করা যেতে পারে, যেমন পরানির্ভর → পরানির্ভরতা, এমনকী সংস্কৃতে প্রত্যয়যোগে ধ্বনিগত পরিবর্তনও ঘটে, কেমন 'পরম + অর্থ' থেকে 'পরমার্থ'-এর সঙ্গে 'ষ্ণিক' যুক্ত হওয়াতে বৃদ্ধি ঘটে হল 'পারমার্থিক'। অর্থাৎ প্রত্যয়ের প্রভাব পুরো সমাসের উপরেই পড়ছে। আর সমাসবদ্ধ শব্দের সঙ্গে আরও অন্য শব্দের সমাস তো হতেই পারে, যেমন আত্মনির্ভর + শীল → আত্মনির্ভরশীল। তার সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হতে পারে 'আত্মনির্ভরশীলতা'। এবং এই পুরো শব্দটির সঙ্গে কারকের বিভক্তি যোগ করে তাকে পদে পরিণত

করা যেতে পারে— 'এই আত্মনির্ভরশীলতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।' সুতরাং সমাসকেও শব্দনির্মাণের এক সংগত উপায় বলেই আমরা গ্রহণ করব।

নিছক বাংলা সমাস রূপতাত্ত্বিক প্রকরণ হিসেবে সংস্কৃত বা জার্মানের মতো অত ব্যাপক নয়। সংস্কৃতের মতো বহু শব্দের সমাসও বাংলায় বিরল। তাহলেও তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সমাসের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু ইতস্তত কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়াই যেতে পারে—রাঙামুখো, ঝামরচুলি, গা-ছাড়া, ঘরপালানো, নেমকহারামি, আক্কেল-সেলামি, গুন্ডারাজ, হাড়হাভাতে, মারণভোমরা, বাপসোহাগি, ভাতারখাকি, হাতসাফাই, গাছপাকা, নজরলাগা, বেআক্কেল, উঁচকপালি, তেএঁটে, পেটভাতা, গোঁসাঘর, ছেলেমানুষ ইত্যাদি অজস্র 'বাংলা' সমাসের দৃষ্টান্ত থেকে তার নির্মাণ-বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য ভাষায় শব্দনির্মাণের আরও কিছু কিছু সূত্রের সাক্ষাৎ অবশ্যই পাওয়া যায়। ইংরেজিতে প্রস্বরের (stress) অবস্থান বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে তফাত করে দেয়। প্রথম অক্ষরে (সিলেব্‌লে) প্রস্বরযুক্ত conduct বিশেষ্য, কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষরে প্রস্বরযুক্ত conduct ক্রিয়া-শব্দ। ইংরেজিতে ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা—অঘোষত্বের দ্বারাও শব্দের রূপান্তর বা পদান্তর হয়। যেমন teeth দন্ত পঙ্‌ক্তি, কিন্তু teethe দাঁত-ওঠা (ক্রিয়াশব্দ)। এইরকম mouth/mouthe; safe/save ইত্যাদি। বাংলা শব্দনির্মাণে এসব পদ্ধতি কার্যকর নেই।

৩ পদনির্মাণ পদ্ধতি

শব্দনির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন পদ্ধতির নানা বৈচিত্র্য আছে এবং নানা সম্ভাবনাও আছে— পদনির্মাণের ক্ষেত্রে তুলনীয় বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনা অনেক সীমাবদ্ধ। তবু প্রক্রিয়া হিসেবে পদনির্মাণ অনেক ব্যাপক (productive)। কারণ পদনির্মাণের উপরেই বাক্যনির্মাণ নির্ভর করে, অর্থাৎ বাক্যনির্মাণের আবশ্যিক শর্তই হল পদনির্মাণ। শব্দনির্মাণের একাধিক সূত্র ভাষায় অনুপস্থিত থাকতে পারে এবং তার ব্যাপকতার হেরফের হতে পারে। কিন্তু পদনির্মাণ শব্দনির্মাণের মতো ঐচ্ছিক (optional) প্রক্রিয়া নয়, তা আবশ্যিক (obligatory) প্রক্রিয়া।

বাংলায় পদনির্মাণ কেবল A + b + c পদ্ধতিতেই ঘটে। অর্থাৎ শব্দমূল, শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ হয়। এই বিভক্তিযোগেও বিভক্তির প্রাক্তন রূপ অনুযায়ী পদের দেহে নানা ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, তার আলোচনা আমরা শেষে করব। কিন্তু পদনির্মাণের জন্য যুক্ত বিভক্তি মূলত দু শ্রেণীর—কারকবিভক্তি (case-suffixes) এবং ক্রিয়াবিভক্তি (conjugational suffixes)

পদনির্মাণসূত্র ১ কারকবিভক্তিযোগ

মান্য চলিত বাংলায় পাশ্চাত্য ব্যাকরণের হিসেবে চারটিমাত্র কারক আছে—কর্ম-নিমিত্ত, করণ, সম্বন্ধ আর অধিকরণ। প্রথমটির বিভক্তি -কে, -দের (কে), করণের বিভক্তি -কে + অনুসর্গ দিয়ে বা -র + অনুসর্গ দ্বারা, সম্বন্ধের বিভক্তি র/-এর আর অধিকরণের বিভক্তি -এ/-তে। কর্তৃকারকের কোনো ব্যাপক (productive) বিভক্তি সাধারণভাবে মান্য চলিত বাংলায় নেই, এজন্য কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি কথাটা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এক ধরনের বিশিষ্ট প্রয়োগে (অনির্দিষ্ট কর্তায়) -এ বিভক্তিটিও পাওয়া যায়, যেমন 'বাঘে মানুষ খায়,' 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে', 'সাপে কেটেছে'।

কিন্তু বাংলা কারকে বিশেষ্য, সর্বনাম, কখনও কখনও বিশেষণের ভাবাত্মক রূপে শুধু যে বিভক্তি যুক্ত হয় তা নয়। মূলত তিনভাবে বাংলার কারক গঠিত হয়:

ক. বিভক্তিযোগ 'রামকে', 'ঘরের', 'জীবনে'

খ. অনুসর্গ যোগ 'গাছ থেকে', 'ঘর হতে'

গ. বিভক্তি + অনুসর্গ যোগ 'তাকে দিয়ে', 'তার দ্বারা', 'রামের জন্যে', 'নদীর মধ্যে'

এর আরও দৃষ্টান্তের জন্য সরকার ও বসু (১৯৮৯: ১৭২-৮৫) দ্রষ্টব্য।

বিভক্তি ও অনুসর্গের অন্যান্য ভূমিকা

কারক নির্দেশের বাইরে কোনো কোনো বাংলা বিভক্তি বাক্যগঠনে নানা ধরনের ভূমিকা নেয়। যখন ক্রিয়াবিশেষ্যের (verbal noun) সঙ্গে কারক বিভক্তি যুক্ত হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ক্রিয়াবিশেষ্য কারকে আশ্রিত হয়। নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে সেই ঘটনাই আমরা লক্ষ করি—

তোমার ওখানে **যাওয়াটাকে** আমি মেনে নিতে পারিনি।

আমার গান **গাওয়াতে** একটু বাধা পড়েছিল সেদিন।

লোকটার **খাওয়ার** বিষয়ে কোনো কথা বোলো না।

অমন অন্ধের মতো **দৌড়োনো থেকে** হোঁচট খাওয়া, গাড়ি চাপা পড়া—
কী না ঘটতে পারত সেদিন?

খাওয়ার জন্যেই না এই জীবন!

এখানে ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ কারকের আশ্রয় নিয়েছে, এবং তার ফলে সেগুলিতে কারকের বিভক্তি অনুসর্গ ইত্যাদি লেগেছে!

কিন্তু এই প্রয়োগগুলিও লক্ষ করুন—

প্রধান বক্তা **না আসায়** সভাটা তেমন জমল না।

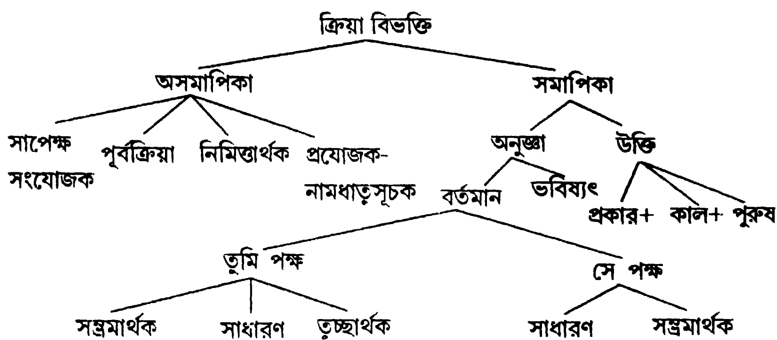
লোকটা হঠাৎ মারা **যাওয়াতে** সংসারটা তছনছ হয়ে গেল।

এখানে অধিকরণ-বিভক্তি লাগছে ক্রিয়াবিশেষ্যের সঙ্গে। কিন্তু অধিকরণের অর্থ প্রকাশ করছে না, গ্রহণ করছে এক হেতুবাচক অর্থ, ফলে এ বিভক্তি ক্রিয়াবিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হচ্ছে হেত্বর্থক বিভক্তি। হেত্বর্থক হচ্ছে এক বিশেষ প্রতিবেশে। এ প্রতিবেশ হল যৌগিক বাক্যের (Compound sentence), যেখানে মূলত দুটি ঘটনা বা ক্রিয়া যুক্ত, একটি ক্রিয়াবিশেষ্য অন্য সমাপিকা (বা অসমাপিকা) ক্রিয়ার হেতু হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

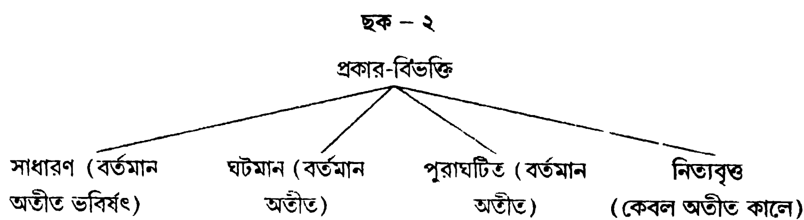
বাংলা ব্যাকরণে একই বিভক্তি বা প্রত্যয়কে নানা বিচিত্র কাজে লাগানো হয় তা আমাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হবে। এটিকে বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা ব্যাকরণের economy বা সাশ্রয়চেষ্টা হিসেবে গণ্য করেছেন (দ্র. Dimcok, 1966)।

পদনির্মাণসূত্র ২ ক্রিয়াবিভক্তিযোগ

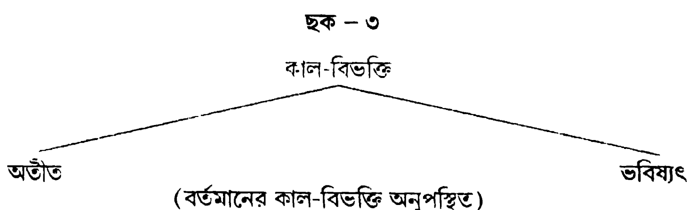
ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ না করে ক্রিয়াপদ নির্মাণ সম্ভব নয়, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ক্রিয়াপদের নির্মাণে শূন্য থেকে শুরু করে একটি, দুটি বা তিনটি বিভক্তি-ও যোগ করা হয়। ক্রিয়ার এই বিভক্তিগুলিকে ছকের সাহায্যে এভাবে দেখানো যেতে পারে—



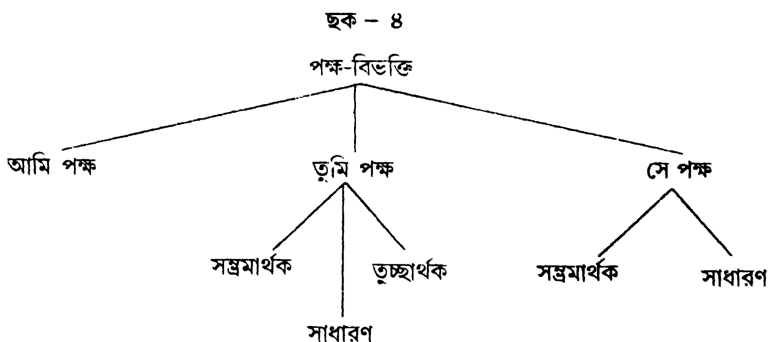
ছক – ২



ছক – ৩



ছক – ৪



সম্ভ্রমার্থকের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার তুমি পক্ষের রূপ = সে পক্ষের রূপ।

যথাস্থানে এসবের বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, এখানে কেবল দৃষ্টান্তই দেওয়া হচ্ছে। সাপেক্ষ সংযোজক = -ইলে > লে যেমন 'তুমি **বললে** আমি শুনব', 'ও গান **শোনালে** তুমি কেন শোনাবে না?' এর সঙ্গে সাধারণ অতীতের সমাপিকার সকর্মক -লে-র তফাত খেয়াল রাখতে হবে—'সে বইটা **দিলে**', 'লোকটা প্রচুর কথা **শোনালে** আমাকে।' পূর্বক্রিয়ার বিভক্তি = হয়া > এ—যেমন 'আমি বোনকে **খাইয়ে**, নিজে **খেয়ে** কলেজে যাব।' নিমিত্তার্থক অসমাপিকা বিভক্তি -ইতে > তে 'তুমি কী **করতে** এলে এখানে?' অসমাপিকার একটি বিভক্তি '-আ/-আনো'-কে আমরা কৃৎপ্রত্যয়ের মধ্যে স্থান দিয়েছি তা স্মরণ করিয়ে দিই। অসমাপিকার মধ্যে আর একটি প্রত্যয় আমরা যোগ করতে চাই। সেটি হল সাধারণ ধাতুকে প্রযোজক (=ণিজন্ত) ধাতুতে পরিণত করার -আ প্রত্যয় (যেমন √বল —√বলা-)। এই -আ প্রত্যয়ই আবার কিছু বিশেষ্যমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামধাতু নির্মাণ করে, যেমন ঘাম + আ = √ঘামা-(ঘামানো)। আমরা উপরে যাকে -'আনো' প্রত্যয় বলে নির্দেশ করেছি, তার মধ্যে এই -আ প্রত্যয়টি লুকিয়ে আছে।

সমাপিকা বিভক্তির মধ্যে বর্তমান অনুজ্ঞার -ন/-উন (যান, করুন) সম্ভ্রমার্থক তুমি পক্ষে = পুরুষে,' -ও (যাও, শোনাও) সাধারণ তুমি পক্ষের আর শূন্য বিভক্তি (যা, শোন্ বল্) তুচ্ছার্থক তুমি পক্ষেই ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় বিশেষ বিভক্তি কেবল সাধারণ তুমি পক্ষের পাই—ইয়ো> ও/ইয়ো (তুমি বোলো, বলিয়ো)। 'সে'- পক্ষের ক্ষেত্রে অনুজ্ঞা-বিভক্তি হল -(উ) ক (যাক, বলুক) আর সম্ভ্রমার্থক -(উ)ন (যান, বলুন)।

উক্তি-ভাবের (indicative mood) ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গরূপে বিস্তারিত বাংলা ক্রিয়াপদে চারটি অংশ থাকে — ধাতু (A), প্রকার বিভক্তি (B), কাল-বিভক্তি (C) এবং পক্ষ (=পুরুষ) বিভক্তি (D)। অর্থাৎ ক্রিয়াটির গঠন হয় A + B + C + D, যেমন √বল্ + ইয়াছ >এছ্ + ইল্ + আম = বলেছিলাম। আবার ক্রিয়াটি প্রযোজক বা নামধাতু-জনিত হলে উপাদান (morph) দাঁড়ায় মোট পাঁচটি —ধাতু + প্রযোজক/ নামধাতু প্রত্যয় + প্রকার বিভক্তি + কালবিভক্তি + পক্ষ বিভক্তি। আমাদের ছকে A + X + B + C + D √বল্ + আ + ইয়াছ > ইয়েছ্ + ইল্ + আম = বলিয়েছিলাম। এখানে প্রযোজক-আ লোপ পেলেও ইয়াছ্ -এর -ই লোপ পায়নি, ফলে অ-প্রযোজক আর প্রযোজক ক্রিয়ারূপের মধ্যে পার্থক্য বজায় আছে।

লক্ষ করতে হবে যে, বাংলা ক্রিয়াপদ প্রকরণে শূন্য থেকে শুরু করে চারটি রূপ (morph) যোগ করার দৃষ্টান্ত আছে। সেগুলি যথাক্রমে দেখাই—

শূন্য রূপ(বিভক্তি) যোগ	: তুই শোন্।
একটি বিভক্তি যোগ	: আমি যা-ই।
দুটি বিভক্তি যোগ	: সে যা-ব্-এ (যাবে)। তুমি বল্-ল্-এ (বললে)।
তিনটি বিভক্তি যোগ	: তুমি বল্ এছ-ইল্-এ (বলেছিলে)।
চারটি উপাদান যোগ	: তুমি বল্-ই-এছ-ইল্-এ (বলিয়েছিলে)।

এখানে উক্তিভাবের ক্রিয়ারূপগুলিতে আর কোনো বিভক্তি না জুড়ুক, যে-বিভক্তিটিকে যোগ করতেই হয় সেটি হল পক্ষ-বিভক্তি (personal suffix)। প্রতি কালে এর রূপ পাঁচটি

করে—বর্তমানে -ই, -ও, -(ই)স্‌, -এ (=য়), -(এ) ন; অতীতে -আম/-উম, -এ, -ই, -ও, -এন; এবং ভবিষ্যতে -ও, -এ, -ই, -এ, -এন। এই পক্ষ বিভক্তিগুলি সমস্তই উপাদানের শেষে যোগ হয়, ফলে এগুলিকে 'অন্তীয়' বা ending বলা যায়। বাকিগুলি ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ করতে পারে না। যেমন 'বলেছ্‌' পূর্ণাঙ্গ শব্দ নয়। তাই 'এছ্‌' 'ইল্‌' ইত্যাদি ঝুলন্ত ক্রিয়াবিভক্তি। এই বাকিগুলি যে প্রকার-বিভক্তি, আর কাল-বিভক্তি তা আশা করি বলার প্রয়োজন নেই। প্রযোজক প্রত্যয়ও এই 'ঝুলন্ত' উপাদানের মধ্যে পড়বে।

প্রকার বিভক্তি বর্তমান কালে দুটি: ঘটমানের ইতেছ >ছ্‌ (চ্ছ্‌)—বলছি, যাচ্ছি -তে যেমন, আর পুরাঘটিতের ইয়াছ্‌ জাত-এছ্‌ (বলেছি); অতীত কালে তিনটি —ঘটমানের ইতেছ্‌ >ছ্‌ (চ্ছ্‌), পুরাঘটিতের ইয়াছ্‌ > এছ্‌ আর নিত্যবৃত্তের -ত্‌ (বলতাম)। কাল বিভক্তি বর্তমানে শূন্য। বর্তমানকালে ধাতুর সঙ্গে যে বিভক্তিটি যুক্ত হয় সেটি আসলে পক্ষবিভক্তি। অতীতে কাল বিভক্তি হল -(ই)ল্‌- আর ভবিষ্যতে -ব্‌-।

শূন্য বিভক্তির ভূমিকা

আমরা লক্ষ করেছি, বিভক্তি-শূন্যতা বাংলা ক্রিয়ারূপ নির্মাণে দুক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক তুমি পক্ষে তা তুচ্ছ বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে ('তুই' সম্ভাষণের যোগ্য ব্যক্তিকে) আদেশের অর্থ বোঝায়; আবার উক্তিভাবে পক্ষ ছাড়া অন্য বিভক্তির অনুপস্থিতি বর্তমান কাল বোঝায়—যা-ই, বল্‌-ই। বর্তমানকালে যেহেতু কেবল পক্ষ বিভক্তিই যোগ হয়, সেহেতু পক্ষ বিভক্তি এখানে একই সঙ্গে কাল ও প্রকারের অর্থও বহন করে। এখানে প্রকার হল সাধারণ (simple) ; নিত্যবৃত্ত পুরাঘটিত বা ঘটমান নয়। কাজেই মনে রাখতে হবে, বিভক্তির কেবল যোগই নয়, বিভক্তির বিয়োগ বা অনুপস্থিতিও নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কারকের ক্ষেত্রে কর্তার শূন্য বিভক্তির কথা আমরা বলেছি। সেখানে শূন্য বিভক্তি শুধু কর্তায় হয় না, মুখ্যকর্মেও হয় —আমি তোমাকে **বইটা** সেদিনই দিয়েছি। এমনকী অধিকরণেও বিভক্তি-শূন্যতা ঘটে —'বাবা **বাড়ি** আছে কি?' এক্ষেত্রে বিভক্তিহীনতা যদি বিভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন শব্দটির বাক্যে অবস্থান ও অর্থ মিলিয়ে তার কারক-ভূমিকা স্থির করে দেয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, বাংলায় কারকের ক্ষেত্রে বিভক্তিহীনতায় যদি বা নেতিবাচক হয়, ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক —তা নির্দিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত করে। অনেক সময়েই ব্যাকরণে উপাদানের উপস্থিতি যেমন, তেমনই উপস্থিতির পাশাপাশি অনুপস্থিতিও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলা ক্রিয়ারূপে এই অনুপস্থিত বিভক্তি মূলত দুটি অর্থ প্রকাশ করে — তুমি পক্ষের তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞা আর উক্তিভাবের ক্ষেত্রে কেবল পক্ষ বিভক্তির উপস্থিতিতে সাধারণ প্রকার (সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ) নির্দেশ করে।

আমরা শব্দনির্মাণ থেকে পদনির্মাণের যে সব প্রক্রিয়া বাংলা রূপতত্ত্বে চালু আছে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আগেই বলেছি, শব্দনির্মাণই হোক,পদনির্মাণই হোক —বিশেষ বিশেষ উপাদান যুক্ত হলে মূল উপাদানের শরীরে কিছুটা ধ্বনিগত রূপান্তরও ঘটে। এই রূপান্তর কখনও আগে ঘটেছে, কখনও এখনও ঘটে চলেছে। অনেক সময় পরের আর-একটা পরিবর্তন এসে আগেকার পরিবর্তনের কারণটাকে মুছে দিয়েছে, ফলে শব্দটির এখনকার চেহারা দেখে সে পরিবর্তনের কারণ বোঝা যায় না। আমরা এবার বাংলা শব্দ ও পদগঠনের রূপধ্বনিতত্ত্ব (morphonology) আলোচনা করে এই 'ভূমিকা'-র ইতি ঘটাতে চাই।

৪. রূপধ্বনিতত্ত্ব

শব্দ ও পদগঠনের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় যে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে, রূপধ্বনিতত্ত্ব মূলত তারই আলোচনা। মনে রাখতে হবে— শব্দ ও পদগঠন এবং ধ্বনিপরিবর্তন—এ দুয়ের মধ্যে কোনো অন্তর্লীন যোগ নেই, সাধারণভাবে দুটি দুই সমান্তরাল প্রক্রিয়া। বিশেষ ধ্বনির পাশে বিশেষ ধ্বনি এলে ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী যান্ত্রিকভাবে একটি ধ্বনিতে বা দুটিতেই পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-রূপটির শরীরে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটছে তার অর্থ বা শ্রেণীর কোনো প্রভাব এই পরিবর্তনে থাকে না। এর ব্যতিক্রম ঘটে, তাও বলা দরকার, কিন্তু বাংলায় এই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রটি বিস্তারিত নয়।

যে নিয়মটি বাংলা রূপধ্বনিতত্ত্বের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় নিয়ম, তার নাম স্বরোচ্চতাসাম্য (vowel height assimilation)। যদি দ্বিতীয় সিলেব্‌লে ই বা উ থাকে, তবে প্রথম সিলেব্‌লের অন্-উচ্চ স্বরধ্বনি, অর্থাৎ ই উ ছাড়া অন্য স্বর, অর্থাৎ অ্যা, এ, অ, ও এইভাবে পরিবর্তিত হয়—

অ্যা হয় এ
এ হয় ই
অ হয় ও
ও হয় উ

অ্যা → এ

শব্দনির্মাণ

এক [a + c = x] + টি = একটি [cktı]
প্যাঁচা + ই = পেঁচি
ক্যাবলা + আদরার্থক উ = কেবলু
ঠ্যাল্ + আ + ঠ্যাল্ + ই = ঠ্যালাঠেলি

পদনির্মাণ

ফ্যাল্ + বি = ফেলবি
ফ্যাল্ + তিস = ফেলতিস
দ্যাখ্ + ই = দেখি , তু দ্যাখে
দ্যাখ + উক্ = দেখুক ; তু. দ্যাখেন

এ → ই

শব্দনির্মাণ

দেশ + ই = দিশি
বিলেত + ই = বিলিতি
ফেরত + ই = ফিরতি
শেখ্ + আ + শেখ্ + ই = শেখাশিখি

পদনির্মাণ

√শেখ্ + উক = শিখুক
√লেখ্ + উন = লিখুন
√মেশ্ + ই = মিশি

অ ⟶ ও

শব্দনির্মাণ

ঘট + ই = ঘটি [ঘোটি]

বদল + ই = বদলি [বোদ্‌লি]

পঙ্কজ -এর অংশ পঙ্ক্ + উ = পঙ্কু [পোংকু] = ডাকনাম

পদনির্মাণ

√ বল্ + ই = বলি [বোলি]

√ বল্ + উক = বলুক [বোলুক]

√ পড়্ + তিস = পড়তিস [পোড়্‌তিশ্]

√ বস্ + লি = বসলি [বোশ্‌লি]

ও ⟶ উ

শব্দনির্মাণ

ঝোলা + ই = ঝুলি

গোলা + ই = গুলি

পোঁটলা + ই = পুঁটলি

খোকা + ই = খুকি

খোকা + উ = খুকু

পদনির্মাণে

√ শোন্ + ইস্ = শুনিস্

√ ছোঁ + বি = ছুঁবি

√ ঘোর্ + ছি = ঘুরছি

√ ভোগ্ + লি = ভুগলি

উপরে যে পরিবর্তনগুলি দেখলাম আমবা, সেগুলি সবই 'স্বচ্ছ' প্রক্রিয়া। অর্থাৎ পরের সিলেব্‌লে ই বা উ থাকার ফলে যে অ অ্যা এ ও যথাক্রমে ও এ ই আব উ হচ্ছে তা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এ স্বরধ্বনিব একধরনেব সমীভবন—উচ্চ স্বরধ্বনির প্রভাবে ওই স্ববধ্বনিগুলি এক ধাপ উঁচুতে উঠছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি কেন হচ্ছে উচ্চারণে?---

বলে	কিন্তু	বোল্‌লো
দ্যাখেন	কিন্তু	দেখছে
শেখো	কিন্তু	শিখবো
খোঁজেন	কিন্তু	খুঁজতো

এখানে তো পরে ই উ দেখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও কেন বল্ হচ্ছে বোল্ (লো), দ্যাখ্ হচ্ছে দেখ্(ছে), শেখ হচ্ছে শিখ্ (বো), খোঁজ্ হচ্ছে খুঁজ্(তো)? এর উত্তর হল, এখন দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এক সময়ে একটা ই ছিল দ্বিতীয় অক্ষরে, অর্থাৎ কথাগুলি ছিল বলিল, দেখিছে, শিখিব, খুঁজিত। এগুলি তৈরি হয়েছিল এইভাবে √বল্ + ইল্ + ও, √দ্যাখ্ + ইছ্ + এ, √শেখ্ + ইব্ + ও, √ খোঁজ্ + ইত্ + ও। ওই ই-র প্রভাবেই বল্ হয়েছিল, বোল্, দ্যাখ্ ⟶দেখ্, ইত্যাদি। তারপরে

ই কোথায় গেল? তা প্রথমে অপিনিহিতির ফলে আগের ব্যাঞ্জনটার সামনে এসে বসল, যথাক্রমে বইল্‌লো, দেইয়ছে, শিইখ্‌বো, খুঁইজ্‌তো হল। তারপর ওই ই দুর্বল হয়ে পড়ে গেল, কালি → কাইল→ কাল যেভাবে হল। ই পাড় যাবার আগেই সে স্বরধ্বনিগুলিকে একধাপ করে তুলে দিয়ে গেছে।

কাজেই প্রত্যয় ও বিভক্তি জোড়বার ফলে ধাতু বা শব্দের ধ্বনিদেহে যে পরিবর্তন ঘটে, তা বাংলা রূপতত্ত্বের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

বাংলা বর্ণমালা
আর
প্রমিত বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালা

সন্‌জীদা খাতুন

বাংলা বর্ণমালা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিন্যস্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। ব্যঞ্জন বর্ণমালার ক্ষেত্রে অন্তত উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ এবং নাসিক্যব্যঞ্জন সজ্জায় বাংলায় প্রথম পাঁচটি বর্গের বর্ণসারণির শৃঙ্খলা বাস্তবিক চমৎকার। অন্তঃস্থ বর্ণগুলিকে ঐ পাঁচটি বর্গের শেষে বিন্যাস করবার পক্ষেও ভালো যুক্তি রয়েছে। তবে বাংলা উচ্চারণে ব্যবহৃত ধ্বনির সার্বিক হিসাব নিতে গিয়ে বাংলা বর্ণমালার কিছু অপূর্ণতা চোখে পড়ে। আবার, যাঁরা উচ্চারণের ভিত্তিতে বর্ণমালার কোনও কোনও বর্ণ বর্জন করবাব কথা বলেন, প্রমিত উচ্চারণ-বিষয়ক সতর্ক বিবেচনার সূত্রে তাঁদের অধিকাংশ কথার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। যা আমাদের আছে তা বর্ণমালার ধনাত্মক পরিচয়। কিন্তু যা বর্ণমালাতে নেই অথচ উচ্চারণে আছে, সেই অভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়াই জরুরি।

উপরের বক্তব্যে স্বরবর্ণমালার কথা তোলা হয় নি। এখন প্রথমেই স্বরবর্ণের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের ঋ আর ঌ, আর এই দুই বর্ণের দীর্ঘরূপ দু'টি বহুদিন হলো বর্ণমালা থেকে খসে পড়েছে। ঋণ, ঋতু, ঋষভ, ঋষি, নৈর্ঋত ইত্যাদি শব্দের ঋ-উচ্চারণ নিতান্তই র-য়ে হ্রস্বই-কার দেওয়া 'রি' উচ্চারণ। স্বরধ্বনি হিসেবে, এই ঋ-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণের কথা শুনতে পাই না। তবে আবৃত্তির ক্ষেত্রে ঋ-কার যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ভিন্নভাবে করবার নির্দেশ আছে। 'আবৃত্তি' 'অমৃত' বলতে ব-বা ম-য়ের যুক্তাক্ষরিক উচ্চারণ সিদ্ধ বলে গৃহীত হয় নি। অন্যদিকে শিক্ষিত সাধারণের উচ্চারণেও ঐ উচ্চারণের শুদ্ধতা টলোমলো, বলা যায়। কিছু কিছু ঋ-কার যুক্ত শব্দে, আবৃত্তিকারদের নির্দেশ মান্য ক'রে আমরা ঋ-কারের উচ্চারণে দ্বিত্ব বর্জন করবার পক্ষপাতী। তাই আমরা 'আব্রিত্তি' 'অম্রিত' বলাকে সমর্থ করি না। কিন্তু কিছু ঋ-কারযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতির মতো উচ্চারণদ্বিত্ব ঘটেই যায়। যেমন—মসৃণ, অপসৃত, অনুসৃত, অনাদৃত ইত্যাদি। এইসব শব্দে আমরা পরিষ্কার 'মোসসৃণ', 'অপোস্‌সৃত', 'ওনুস্‌সৃত', 'অনাদ্‌দৃত' (অথবা লেখা যায় 'মোস্রিণ' 'অপোস্রিতো' 'ওনুস্রিতো' 'অনাদ্রিতো') উচ্চারণ করছি। এই বাংলা হয়ে-যাওয়া শব্দগুলোর সংস্কৃত উচ্চারণের কথা এখন আর ভেবে লাভ আছে কি? 'অনুগ্রহ' 'নিগ্রহ' শব্দের স্মৃতি ধরেই কিনা বলা মুশকিল, আমরা 'ওনুগ্‌গৃহীতো/ওনুগ্রিহীতো' 'নিগ্‌গৃহীতো/ নিগ্রিহীতো' বলছি অবাধে। তবে? উচ্চারণ বিবর্তিত হয়ে চলে বলে, এখন ঋ-কারের উচ্চারণের

transition period চলছে বলব কি? যাই হোক, ঋ-ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনির কোটে চালান করে দেবার যুক্তিগুলো বিবেচনায় আনবার সময় হয়ে এসেছে।

স্বরবর্ণমালার 'অং' আর 'অঃ' সঙ্গতভাবেই ব্যঞ্জনবর্ণমালায় সরে এসেছে, আমরা জানি। এখন, ব্যঞ্জন হিসেবে সাজানো চন্দ্রবিন্দু নিয়ে আবার নতুন ভাবনাচিন্তার দরকার হয়েছে, সে-বিষয়ে পরে লিখছি।

এবার, অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ—বর্ণমালার বাকি এই দশটি স্বরের কথায় আসা যাক। আ-কে অ-এর দীর্ঘরূপ বলেছেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। বাংলা উচ্চারণে আমরা অ-আর আ-কে স্বতন্ত্র স্বর হিসেবে শুনে এবং জেনে আসছি বরাবর। এ নিয়ে একালে আর কোনও বিতর্ক নেই। ই আর উ-এরও কোনও দীর্ঘ চেহারার প্রয়োজন ছিল কি বাংলা উচ্চারণে? সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা বেয়ে এই দীর্ঘ ধ্বনিগুলি বাংলা উচ্চারণে না-হোক, লেখার ভাষাতে প্রবেশ পেয়ে গেছে। উচ্চারণের বিবেচনায় হ্রস্ব-দীর্ঘের হিসেব করতে গেলে নানা সূক্ষ্ম ভেদের বিবিধ এবং জটিল প্রসঙ্গ এসে যাবে। যেমন নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে লিখেছিলেন যে, ''অ' 'আ' 'ই' 'উ' 'এ' এবং 'ও' এই কয়েকটি স্বরের উচ্চারণ সহজ, প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত —এই তিন প্রকার'। অর্থাৎ কেবল হ্রস্ব আর দীর্ঘ নয়। তিনি লিখেছিলেন —'সংযুক্তবর্ণ এবং অনুস্বার ও বিসর্গ পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়', যেমন—ওষ্ঠ সত্য কিংবা বারংবার অধঃ মাতঃ ইত্যাদি। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ আরও বলেছেন-– 'দূরাহ্বান, গান, উপহাস ও রোদনে স্বর দীর্ঘ হইলে তাহাকে প্লুতস্বর বলে'। উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘের অত অনুপুঙ্খ বিচারে আমরা প্রবেশ করতে চাই না। সাদামাঠাভাবে প্রমিত বাংলা উচ্চারণে কি কি মূল স্বরধ্বনি আছে তারই সন্ধান করব কেবল। অন্য স্বরগুলোর হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত নিয়ে যখন ভাবছি না, তখন দীর্ঘ ঈ-এবং দীর্ঘ ঊ-কেও আমরা স্বরধ্বনির তালিকা থেকে বাদ দেব। তবে বর্ণদুটিকে ফেলে দিতেও বলব না আমরা, বানানের ক্ষেত্রে এই দুই বর্ণের প্রয়োজন তো রয়েছে।

বর্ণক্রম অনুযায়ী উচ্চারণভিত্তিক আলোচনায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে এ-পর্যন্ত টিকে রয়েছে অ আ ই উ। এ আর ও কে নিয়েও কিছু বলবার নেই। কিন্তু ঐ আর ঔ? স্বরবর্ণমালায় ঐ আর ঔ যৌগিক ধ্বনি দুটি সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঠাঁই করে নিয়েছে। অথচ, বাংলাভাষার উচ্চারণে শুধু ওই দুটি কেন, ওর সঙ্গে আরও অন্তত ষোলখানি দ্বি স্বর যৌগিক ধ্বনি আছে। প্রশ্ন উঠবে সে-সব যৌগিক ধ্বনির বর্ণরূপ কোথায়? প্রথম স্বরটির উচ্চারণ শেষ হবার আগেই অবিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় স্বরটির দিকে অগ্রসর হয়েই আকস্মিকভাবে থেমে গেলে, পরের স্বরটি খণ্ডিত হয়ে খানিকটা হসন্তধর্ম পায়, অথচ দুটি ধ্বনিই যৌথভাবে একপ্রয়াসে এক সিলেব্‌লে উচ্চারিত হচ্ছে। একেই যদি বলি যৌগিকধ্বনি, তবে ঐ ঔ ছাড়াও ওরকম ধ্বনির দৃষ্টান্ত পাব— দিই পিউ নেই ফেউ সেও দেয় ম্যাও নাই জাউ যায় খাও হয় ধোয় ধোও রুই—এই রকম যৌগিকস্বর উচ্চারণে। বর্ণমালাতে ঐ ঔ-কে রাখতে গেলে ঐ ষোলখানা যৌগিক স্বরকেও তো স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে ঠাঁই দিতে হয়। ওরকম জটিল ভিড় তৈরি করবার চেয়ে বর্ণমালা থেকে ঐ ঔ-কে ছাঁটাই করে দেওয়াই ভালো নয়? যৌগিকধ্বনির মূলস্বর প্রসঙ্গ আলোচনায় বর্ণমালাতে সমস্ত যৌগিকধ্বনির অন্তর্ভুক্তির উপায় পাওয়া যাবে। সে কথা পরে।

যাহোক, আবার বলি, পুরোনো চেনা চেহারার দাম আছে বলে, মূল স্বরধ্বনির দল থেকে বাদ দিলেও, ঐ ঔ-কে লিপিমালা থেকে বর্জন করতে বলি না।

উল্টো ধরনের যৌগিকধ্বনিরও অভাব নেই বাংলাতে। সেগুলো উচ্চারণের শুরুতেই খণ্ডিত হয়ে হসন্ত-স্বভাব পেয়ে অন্য স্বরধ্বনির সহায়তায় পূর্ণ যৌগিক স্বর হিসেবে পরিস্ফুট হয়। যেমন পাওয়া যায় 'ইয়েমেন' 'ইয়ার' 'ইঅর্ক' 'য়োরোপ' 'ওয়েটিংরুম' 'ওয়ার্ধা' 'ওয়ালা' ইত্যাদি অসংখ্য শব্দের আরম্ভের সিলেব্‌লে। 'দাওয়াই' 'হাওয়ায়' এরকম শব্দের দ্বিতীয়ার্ধে তো তিনটি স্বরধ্বনির একত্র সমাবেশ ঘটে যায়।

এবার উল্লেখ করা দরকার, চার্লস্ ফার্গুসন এবং মুনীর চৌধুরী ' Language' (Volume 36, Number 1, 1960)' পত্রিকাতে প্রকাশিত 'The Phonemes of Bengali' নামের প্রবন্ধে বাংলার যৌগিক ধ্বনিরাজির চারটি মূলের পরিচয় নির্দেশ করেছেন। সে চারটি ই্ উ্ এ্ ও্। এই চারটি মূল ধ্বনির আগে অথবা পরে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে যৌগিক ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। যৌগিক ধ্বনির ক্ষেত্রে এই চারটি মূলধ্বনির ধারণা আমাদের ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় যুক্ত হওয়া দরকার। বর্ণমালার ক্ষেত্রেও এই ধ্বনিগুলির সারণি যুক্ত হওয়া সঙ্গত। উল্লিখিত ধ্বনিমূলগুলিকে ফার্গুসন-মুনীর Semi-vowels তথা অর্ধস্বর নাম দিয়েছেন। পূর্ণ স্বরের মতো অবাধে এবং স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে না বলেই অসম্পূর্ণ বা অর্ধস্বর। স্বরের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না বলে এগুলোকে অর্ধব্যঞ্জন বলাও অসঙ্গত নয়। এগুলো বস্তুতঃ স্বর আর ব্যঞ্জনের মর্ধবর্তী অবস্থার ধ্বনি। উচ্চারণে স্বর বা ব্যঞ্জনধর্মের প্রাবল্য অনুসারে এগুলো অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন চরিত্র পায়।

তাহলে, স্বরবর্ণমালার আলোচনায় আমরা এ পর্যন্ত, অ আ ই উ এ ও এই ছয়টি মৌলিক স্বরধ্বনি বুঝে পেলাম। বাংলা ভাষার উচ্চারণে কিন্তু আরও একটি স্বরধ্বনি রয়েছে, অ্যা-স্বরধ্বনি। বর্ণমালাতে এই ধ্বনি স্বতন্ত্র আসন পায় নি। পণ্ডিতেরা বলেছেন অ্যা নাকি এ-র 'ট্যারচা' (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) অর্থাৎ 'বাঁকা বা বিকৃত উচ্চাবণ' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)! 'এক' শব্দকে 'এ' দিয়ে লিখেও যদি উচ্চারণ কবি 'অ্যাক', তবে 'অ্যা' স্বরধ্বনি নিজের অস্তিত্বের জোরেই স্বীকৃতি পেয়ে যাবে না? 'অ্যা' সত্যি সত্যি খাঁটি বাংলা স্বরধ্বনি। ব্যবহার ব্যবসা ন্যায় ধ্যান ত্যাগ জ্ঞান খ্যাতি জ্ঞাতি জ্যা জ্যান্ত ট্যাক ঠ্যাকার ভ্যাবলা শ্যামল ... অ্যা-ধ্বনির অভাব কি? তাই বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলিকে এখন অ আ ই উ এ অ্যা ও এই সাতটি পরিচয়ে চিহ্নিত করতে পারি আমরা।

'The Phonemes of Bengali' প্রবন্ধে চার্লস ফার্গুসন এবং মুনীর চৌধুরী বাংলাতে অ এবং ও-র মাঝামাঝি আর একটি স্বরধ্বনির অস্তিত্ব লক্ষ করে এটিকে 'Compromise vowel 'O''বলেছেন। এই ধ্বনিটি শুনতে পাওয়া যায় 'সুন্দর' 'মঙ্গল' 'প্রসন্ন' এইরকম শব্দের দ্বিতীয় সিলেব্‌লে। আমরা পুরোপুরি 'সুন্‌দোর' 'মোঙগোল্' বা 'প্রোশোন্‌নো' বলি না। আমরা শব্দগুলির দ্বিতীয় সিলেব্‌লে পরিষ্কার 'দর' 'গল্' বা 'সন্'-ও বলি না। একই শব্দের উচ্চারণে সবসময় একইমাত্রার অ/ ও উচ্চারিত হয় না আবার। গুরু গম্ভীর পরিস্থিতিতে বলবার সময়ে অ-কারান্ত উচ্চারণের প্রবণতা দেখা দেয়। প্রাচীনদের আশীর্বাদের উচ্চারণে অথবা পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে অ-কার ঘেঁষা উচ্চারণ দেখা যাবে, যেমন, 'মঙ্গল হোক' বাক্যবন্ধে বা 'রে পামর' বলতে 'মঙ্গল' এবং 'পামর'-এর শেষ সিলেব্‌লটির অ-ঘেঁষা উচ্চারণে। যাত্রার বিবেকের গানে 'ওরে অন্ধ' বাক্যাংশের শেষ অ-কার উচ্চারণের কথাও স্মরণ করা যায়। দ্বিধাগ্রস্ত এই ধ্বনিটিকে বর্ণমালায় স্থান দেওয়া কঠিন হলেও বাংলা উচ্চারণ প্রসঙ্গে এই মধ্যবর্তী ধ্বনিটির বিষয়ে সচেতন হতে হয়। ফার্গুসন-মুনীর এই ধ্বনিটিকে তাঁদের বর্ণনামূলক তালিকাতে (Inven-

tory) রাখলেও রেখেছেন বন্ধনী চিহ্নের ভিতরে। এই চিহ্নেই ধ্বনিটির দ্বিধার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা লিখেছেন— 'In many instances an educated speaker of SCB (standard colloquial Bengali) may hesitate to use a clear, unambiguous [১] in a certain item because it sounds too affected or pedantic, but on the other hand does not like to use a clear, unambiguous [O], which would stamp his diction as colloquial or even uneducated. In such instances, consciously or unconsciously, he may use an intermediate vowel which, is neither clearly one nor clearly the other'. (পৃ. 39)।

এইবারে চন্দ্রবিন্দুর চরিত্রটি আলোচনা করে নেওয়া যায়। চন্দ্রবিন্দু কি স্বরবর্ণের দলে, না ব্যঞ্জনবর্ণের? ব্যঞ্জনবর্ণমালার শেষ দিকেই তো একালে তার অবস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু ব্যঞ্জনের কাঁধে মুদ্রিত হলেও স্বরধ্বনির সঙ্গেই বা সাহায্যেই এই ধ্বনি চলে। ফার্গুসন-মুনীর প্রধান সাতটি স্বরধ্বনি সঙ্গে সাতটি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অর্থাৎ অনুনাসিক স্বরধ্বনির রূপকেও স্বরবর্ণমালায় ঠাঁই দিয়েছেন। এভাবে, তাঁদের গণনায় স্বরধ্বনির সংখ্যা হয়েছে চোদ্দ। তাহ'লে চন্দ্রবিন্দুটি কি স্বরধ্বনির দলেই চলে আসছে? কারণ দেখা যাচ্ছে, মুখ বিবৃত না করে কেবল নাসিকা দিয়ে বাতাস বার হতে দিয়ে ধ্বনি করলে আমরা অনুনাসিক স্বর শুনতে পাই। এরকমের ধ্বনি উচ্চারণ স্বরধ্বনির সহযোগের অপেক্ষা রাখে না।

এখন আমি ব্যঞ্জন বর্ণমালা আলোচনার উপক্রমে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিলকুমার কাঞ্জিলাল এবং গোপাল হালদারের 'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা' নামের (নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই থেকে একটু উদ্ধৃতি দেব। য্ র্ ল্ ব্ বর্ণের উচ্চারণ বর্ণনা করে এই বর্ণগুলি সম্পর্কে এঁরা বলেছেন—এগুলির 'উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণভাবে বিবৃতও থাকে না আবার হাওয়া একেবারে আটকানও থাকে না। কাজেই উহারা না-স্বর না-ব্যঞ্জন' (পৃ. ৮)। এইসূত্র ধরে আমরা বর্গীয় নাসিক্যব্যঞ্জনগুলিকেও কি 'না-স্বর না-ব্যঞ্জন' পর্যায়ে ফেলতে পারি না? এইগুলি মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশের যোগে (উচ্চারক অংশ পরস্পর বিযুক্ত না হলেও) নাসিকা থেকে বায়ু নির্গত হবার ফলে ধ্বনিত হয় বলে এগুলিও 'না-স্বর না-ব্যঞ্জন' হয়ে ওঠে কিন্তু। আর, য ব ল অন্তঃস্থ ব-য়ের মতো শ ষ স হ শিস্‌ধ্বনিগুলিও তো স্বরধ্বনির যোগে মুখগহ্বরের উচ্চারক দুটিকে বিচ্ছিন্ন না করেও উচ্চারণ করা যায়। বর্গের অন্যান্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন যে-অর্থে অবরোধক, নাসিক্যব্যঞ্জন এবং অন্তঃস্থ বর্ণগুলি সে-রকম নয় বলে অনবরোধক নাম পেতে পাবে। অবরোধক ধ্বনিগুলিকে 'stops' এবং অনবরোধক ধ্বনিগুলিকে 'liquids' বলবার চল রয়েছে (ফার্গুসন-মুনীরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

য র ল ব শ ষ হ এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলির এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি, যে-বর্গের ধ্বনির আগে এগুলি যুক্ত হয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সেই বর্গের উচ্চারণস্থান সংশ্লিষ্ট হয়েই এরা উচ্চারিত হয়। নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলি যে-যার উচ্চারণ অনুযায়ী বর্গের শেষে স্থান পেয়েছে সম্ভবত এই কারণেই। আপন আপন বর্গের বর্ণের সঙ্গেই নাসিক্য বর্ণগুলোর সংযুক্তি উচ্চারণগতভাবেও যথাযথ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়— ক-বর্গে ঙ/ কঙ্ক শঙ্খ তুঙ্গ জঙ্ঘা, চ-বর্গে ঞ/ চঞ্চু উঞ্ছ গুঞ্জা ঝঞ্ঝা, ট-বর্গে ণ/ ঘণ্টা কুণ্ঠা ডাণ্ডা ঢেণ্ঢন, ত-বর্গে ন/ অন্ত পান্থ দ্বন্দ্ব অন্ধ, প-বর্গে ম/ কম্প লম্ফ কম্বু দম্ভ —এইরকম।

বাংলা শ বা sh -ধ্বনি শুধু চ-বর্গের সঙ্গেই যুক্ত হয়, যেমন নিশ্চয় দুশ্চর আশ্চর্য বা তপশ্চর্যা

ইত্যাদি শব্দে। উৎ +শ্বাসের শ তো উচ্ছ্বাস শব্দে চ-য়ে ছ-য়ে মিশে বদলেই যায়। আমরা জানি, চ ছ জ ঝ-এর মতো শ (sh) ধ্বনিও দন্তমূল থেকে উচ্চারিত হয়, তবে চ-বর্গকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় আর শ-কে পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বলা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, নিশ্চয়, দুশ্চর, পশ্চাৎ শব্দগুলোর স্বাভাবিক উচ্চারণে দেখা যাবে এই চ-যুক্ত শ-এর উচ্চারণে জিহ্বা চ-বর্গের উচ্চারণস্থল প্রশস্ত দন্তমূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 'স্বাভাবিক উচ্চারণ' উল্লেখ করবার কারণ, শ/ sh ধ্বনিকেসচেতনভাবে শিস দিয়ে বলবার কেতাদুরস্ত এক ধরন আছে, তাতে এই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে চ-বর্গই প্রশস্ত দন্তমূল থেকে পশ্চাৎ দন্তমূলের দিকে সরে আসবে। সেক্ষেত্রে চ-এর উচ্চারণও কিছুটা বিকৃত শোনাবে। আর, স্বাভাবিক উচ্চারণে চ-এর দিকে শ সরে যাবে এবং 'উৎ + শ্বাস' 'উচ্ছ্বাসে' পরিণত হবে।

স্বতন্ত্র অবস্থানে দন্তমূলীয় স/ s -এর উচ্চারণ বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য বাংলা শব্দে পাওয়া যায় না। বিদেশী শব্দে, যেমন, আফসার ইউসুফ ব্যস্ বাস স্যার সেকেণ্ড এইসব। যুক্তরূপেও বিদেশী শব্দের সঙ্গে স-এর s উচ্চারণ পাওয়া যায়, যেমন স্টেশন মাস্টার অস্কার শেক্সপীয়র ইস্কান্দার ইস্পাহান ইত্যাদি। এছাড়া দন্ত্যবর্গের তিনটি বর্ণের সঙ্গে স বা s ধ্বনিকে উচ্চারিত হতে দেখা যায়, যেমন স্তব স্থূল স্নান প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বানানে তালব্য শ থাকলেও দন্ত্য ন যুক্ত শব্দে s ধ্বনি পাওয়া যায়, যেমন 'প্রশ্নোত্তর' জাতীয় শব্দে। 'প্রশ্ন' শব্দে আগে s উচ্চারিত হলেও ইদানীং এ শব্দ sh দিয়েও উচ্চারণ করা হচ্ছে। তাই উচ্চারণের অভিধানেও 'প্রোস্‌নো' এবং 'প্রোশ্‌নো' দুই রূপই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ভাষার মত উচ্চারণও কালে কালে বদলেই থাকে। একটিমাত্র শব্দেই 'শ্ন' ধ্বনি পূর্বাপর sh -যোগে উচ্চারিত হচ্ছে, সেটি 'শিশ্ন'।

র আর ল-এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থাতেও, এমনকি বানানে তালব্য শ থাকলেও, শ-এর s উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন শ্রেয় শ্রাবণ শ্লথ শ্লাঘা অশ্লীল শ্লেষ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে। ইদানীং আবার ল-যুক্ত শব্দে শ/ sh উচ্চারণের প্রচল হয়েছে। তাই কোনও কোনও অভিধানে স্লথো/শ্লথো স্লাঘা/শ্লাঘা অস্লিল/ অশ্লিল স্লেশ/শ্লেশ --- দুইরকম উচ্চারণ নির্দিষ্ট হচ্ছে।

স্পর্শ বর্ষা হর্ষ কর্ষণ ইত্যাদি উচ্চারণ প্রসঙ্গে রেফ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে র-যুক্ত শ-এর কথা বলব। পণ্ডিতেরা বলেন— 'র অন্য বর্ণের পূর্বে বসিলে রেফ বলে'। কিন্তু লক্ষ করে শুনলে বোঝা যায় রেফের উচ্চারণ নিছক হসন্তযুক্ত র-এর মতো নয়। 'আরশোলা' বা 'বারবার' বলতে যে-হসন্ত র তার উচ্চারণে জিহ্বাগ্র কম্পিত হয়ে হালকা ভাবে দন্তমূল স্পর্শ করে। কিন্তু অর্ক মূর্খ বর্গ দীর্ঘ অর্চনা মূর্চ্ছনা গর্জন বর্বর নির্ভার সূর্য ইত্যাদি শব্দের রেফযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে কথিত হসন্ত র-ধ্বনিটির আকস্মিক খণ্ডন ঘটে। জিহ্বা দন্তমূল থেকে পশ্চাৎ দন্তমূলের দিকে আকস্মিকভাবে আকৃষ্ট হয়েই রেফের পরবর্তী বর্ণ উচ্চারণের প্রস্তুতি নেয়। এইজন্যে স্পর্শ বর্ষা কর্ষণ হর্ষ উচ্চারণে রেফ সংশ্লিষ্ট শ-য়ের sh- উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

মূল ধ্বনিটিকে শ/ sh হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স/ s ধ্বনিকে তার সহধ্বনি বলা হলেও শ-এর উচ্চারণ স্থান সরে সরে যায়, এইটিআমাদের বক্তব্য। কিন্তু, বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে স/s শ/sh দুটি ধ্বনিই অন্যধ্বনির পূর্বে যুক্ত হলে উচ্চারণকালে সবক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ধ্বনির উচ্চারণস্থানের কাছাকাছি সরে যায়. এই কথা অন্তত কণ্ঠ্যবর্ণ ক খ এবং ঔষ্ঠ্যবর্ণ প ফ ব ম-এর সঙ্গে যুক্ত স/শ ধ্বনির ক্ষেত্রে বলা যাবে না। 'শুষ্ক' বা 'বয়স্ক' বলবার সময়ে পশ্চাৎদন্তমূলীয় শ নিজের উচ্চারণে স্থির থাকে। আবার 'স্কন্ধ' বা 'স্খলন' উচ্চারণে গ্রহণ করে দন্তমূলীয় স বা s -এর চরিত্র। অর্থাৎ সবক্ষেত্রে উচ্চারণ এক থাকছে না। প ফ ব ম বর্ণ বা ব-ফলা ম-ফলা যুক্ত শব্দে শ-এর উচ্চারণ

কিরকম দাঁড়ায়? স্পন্দন স্পর্ধা স্পষ্ট স্ফটিক স্ফীতি স্ফুলিঙ্গ স্ফূর্তি স্মিত বলতে দন্তমূলীয় স-এর স্বভাব রক্ষা পায়। আবার, আস্পদ পুষ্প বাষ্প আস্ফালন প্রস্ফুটিত বিস্ফোরণ বিস্ময় স্মরণ স্বর স্বাদ স্বভাব শব্দে পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শ-য়ের উচ্চারণ বজায় থাকতে দেখা যাবে। এক্ষেত্রেও একই ধ্বনির সঙ্গে লগ্ন হয়ে শ-ধ্বনির দুরকম উচ্চারণ ঘটছে। শ-এর চরিত্রে এই দোদুল্যমানতা রয়েছে। অভিধানকাররাও এই দ্বিধার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কিংবা উচ্চারণ পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করে একই শব্দের দ্বিবিধ উচ্চারণ নির্দেশ করেন। যেমন দেখছি, ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান' এবং বাংলাদেশ সরকারের গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান'-এ। দুটি অভিধানে এক শব্দের একই উচ্চারণ দেখানো হয় নি, কোথাও-বা একই শব্দের দুইরকম উচ্চারণ সিদ্ধ ব'লে গৃহীত হয়েছে। যেমন— 'আস্ফালন--আস্‌ফালোন্/ আশ্‌ফালোন্' 'পরিস্ফুট— পোরিস্‌ফুটো/পোরিশফুটো' 'বিস্ফার—বিসফার/বিশ্‌ফার' 'বিস্ফারিত —বিস্‌ফারিতো/ বিশ্‌ফারিতো' 'বিস্ফোরক—বিস্‌ফোরক/ বিশ্‌ফোরক্' ইত্যাদি। দ্বিধাব বিষয়টি এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মূর্ধন্য ষ ধ্বনিটিকে অনেকেই বাংলা বর্ণমালা থেকে বিতাড়ন করতে চান। যুক্তি দেন এই বর্ণ বানানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে, ভাষাশিক্ষার্থী বা শিশুর শিক্ষাকে অযথা কঠিন করে এবং এই বর্ণের উচ্চারণ শ/ sh এরই মতো এর নিজস্ব কোনও উচ্চারণ নেই ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মূর্ধন্য ধ্বনিব সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আমবা এই ধ্বনির মূর্ধা সন্নিহিত ধ্বনিরূপ ঠিকই শুনতে পাই। 'কষ্ট' 'ওষ্ঠ' 'উষ্ণ' শব্দগুলিব উচ্চাবণে মূলধ্বনি শ-এর উচ্চাবণ পরিবর্তিত হয়ে যাবাব উদাহরণ সুস্পষ্ট। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাতে শ-এর শ স ষ তিনটি উচ্চারণই আছে। কোনও শ-ই পরিত্যাজ্য নয় সত্যি সত্যি। ফার্গুসন-মুনীব তাঁদের প্রবন্ধে শ-কে তালব্য (palatal) ধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স-কে দন্ত্য (dental) হিসেবে বন্ধনীব ভিতবে বেখে উল্লেখ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীবা তালব্য শ-কেই মূলধ্বনির মূল্য দিয়ে আসছেন। আমাব কথা, ফার্গুসনবা dental স এর উল্লেখ যখন কবলেন তখন retroflex ষ-এর উল্লেখও করতে পারতেন, না-হয় বন্ধনী-চিহ্নের ভিতরে রেখেই!

হ-ধ্বনিটি বাংলা উচ্চাবণে অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবলতাসঞ্চারী শক্তি হিসেবেই নানাভাবে ব্যবহৃত হয। বৈয়াকরণদেব উক্তির প্রসারিত প্রযোগ ঘটিয়ে হ এর মূল উচ্চারণেব দরুন এটিকে 'না-স্বর না-ব্যঞ্জন' বলা যদি যাযও, তবুও বাংলা ধ্বনিমালায় এর প্রতাপ স্বীকার না করে পথ নেই। সেই প্রতাপেব কথায় পরে যাচ্ছি। এখন হ-এর চরিত্র নিয়ে কথা বলব। উচ্চাবণে সর্বাধিক বায়ু নির্গত হয় বলে 'হ' মূল মহাপ্রাণ ধ্বনি ব'লে গৃহীত হয়েছে। তবে মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' বইতে লিখেছেন—'ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা 'হ' নিয়ে যত হতভম্ব হয়েছেন এমন আর অন্য কোন ধ্বনি নিয়ে নয়। এ ধ্বনিটির উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এর যথার্থ স্বরূপ ও নামকরণ সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ বিতর্ক শুধু বাংলা ভাষায় 'হ' ধ্বনি নিয়ে নয়, বহুভাষার 'হ' সম্পর্কে একথা সত্য। কেউ বলেন এটি একটি স্বরধ্বনিই তবে এর সঙ্গে নিঃসৃত বাতাসের গতির চাপ একে মহাপ্রাণ করে তুলেছে। কেউ বলেন এটি উষ্মধ্বনিই তবে ঘোষ। কেউ বলেন এটি অঘোষ উষ্মধ্বনি। কেউ বলেন এটি অন্যান্য মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির অঙ্গ (componant) আব কেউ বলেন এটি নিছক স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি।' (পৃ ১০৩) সকলের মতের বিবেচনান্তে হাই সাহেব ''হ'-এর যথার্থ সংজ্ঞা' আলোচনায় প্রশ্ন তুলেছেন— 'তা হলে

ধ্বনিগত দিক থেকে কোন নামে 'হ'কে অভিহিত করা যাবে? আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বা শিস্‌ধ্বনি (voiced aspirated glottal fricative sound), না নিছক স্পর্শহীন আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি (voiced glottal aspirated sound without stop)?' শেষ কথা, ' 'হ'-এর এ দুটো নামই গ্রহণযোগ্য।' (পৃ. ১০৬)

এবার হ-এর প্রতাপের প্রসঙ্গ। ব্যঞ্জনবর্ণমালাতে হ-ধ্বনি যুক্ত অক্ষর আছে অন্ততঃ এগারোখানি (খ ছ ঠ থ ফ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ঢ়)। এগুলিকে আমরা মহাপ্রাণধ্বনি বলে থাকি। বর্ণমালার তালিকায় নেই এমন হ-যুক্ত আরও কটি অক্ষর যুক্তাক্ষররূপে আমাদের ব্যবহারিক উচ্চারণে আছে। যেমন— হ্ন হ্ন হ্ম হ্র/ হৃ হ্ল হ্ব। ফার্গুসন-মুনীর তাঁদের বর্ণনামূলক তালিকায় ক চ ট ত প গ জ ড দ ব এই দশখানি মূল অবরোধক বর্ণ সাজিয়ে পাশে '+h' লিখে সংশ্লিষ্ট দশখানি মহাপ্রাণধ্বনির অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন। অনবরোধক পাঁচটি ধ্বনি ঙ ন ম ড় র ল-এব পাশে বন্ধনীর মধ্যে '+(h)' লিখে তাঁবা আরো ছয়খানি মহাপ্রাণ ধ্বনি শনাক্ত কবেছেন। দশ + ছয়ে ষোলটি মহাপ্রাণ ধ্বনি হল। আমরা দন্তৌষ্ঠ্য হ্ব ধ্বনিটিকে এই দলে যুক্ত করে সতেরোটি হ-যুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্বের কথা বলতে চাই। তাছাড়া, বিদেশী শব্দের সূত্রে আগত ফ়/f ধ্বনিটিকে প্রমিত বাংলা উচ্চারণে স্থান পেয়ে-যাওয়া আর একটি মহাপ্রাণ ধ্বনি বলতে হয়। ফ়েবদৌসী, ফ়রমান, ওফ়াতে রসুল (সৈয়দ সুলতানেব কাব্যগ্রন্থ), মুলুক ফ়তেহাবাদ (আলাওল) ইত্যাদি শব্দে মহাপ্রাণ ফ় ধ্বনিটি পাওয়া যায়, পাওযা যায় ইংরেজি এপ্রিল ফ্‌ল, ফার্নরোড, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি উচ্চাবণের ফ-তে। এই নিয়ে আঠারোটি হ-যুক্ত ধ্বনির খবর প্রকাশ হল। এগুলোব সঙ্গে স্বতন্ত্র হ ছাড়াও রয়েছে অপর মহাপ্রাণ ধ্বনি বিসর্গ। আঠারোর সঙ্গে এই দুইটি মিলে কুড়িটি। তবে ফার্গুসন-মুনীর যে তাঁদের তালিকায় ঙ-ব সঙ্গে হ-ধ্বনি যুক্ত একটি রূপের কথা বলেছেন, সেটি পাব কোন্ উচ্চারণে? 'সিংহাসন' 'সংহত' 'বেণীসংহার' বলতে যুক্তধ্বনি উচ্চারণের নিয়মে অনুস্বাব তথা ঙ বাঞ্জনটি সংলগ্ন হ-এব সঙ্গে একযোগে উচ্চারিত হয়ে ঐ ধ্বনির জন্ম দেয় কি? কানে ধরা প্রায় অসম্ভব! হ-ধ্বনিব বৈশিষ্ট্য এই যে এ-ধ্বনির যোগে অপর ধ্বনিটি নতুন এক ধ্বনিতে পবিণত হয়। আর হ-ও তখন আপন স্বতন্ত্র উচ্চারণে প্রকাশিত হতে পারে না। প্রাণবায়ু অন্য সত্তায় সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে তার নতুন রূপ সাধন করে।

হ্ম ধ্বনিটির বর্ণনায় এটিকে 'হ-এ ম-এ যুক্ত' বলা হয়। ইংরেজি প্রতিবর্ণীকবণেও 'ব্রাহ্ম' 'ব্রাহ্মণ'-এর Brahma এবং Brahmin বানানই চলে আসছে। 'আহ্লাদ' শব্দে তো 'হ-এ ল-এ' লেখাই হয়। হ্ন বা হ্ণ বর্ণদুটিকেও বলা হয় 'হ-এ ন-এ' বা 'হ-এ ণ-এ' যুক্ত। তেমনি 'হ-এ ব-এ' হ্ব, হ-এ র-ফলা বা ঋকার যোগে হ্র/ হৃ অর্থাৎ উচ্চারণ যাই হোক হ-এর উল্লেখই পুরোবর্তী। আর সব কটি ক্ষেত্রে, সংস্কৃতে যা-ই হোক না কেন, বাংলাতে পরে লেখা ধ্বনিটিই উচ্চারণের সময়ে হ-এর আগে একবার উচ্চারিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হ-যুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি রূপে বিকশিত হচ্ছে। যেমন 'ব্রাহ্মণ' বলতে হ্ম উচ্চারণের জন্য একবার ম্ বলে পরে ম-এ হ-এ একত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে। একই ধরনে 'আহ্লাদ' বলতে ল্ + ল-এ হ-এ, 'কাহ্ন' বা 'সায়াহ্ন' বলতে ন্ + ন এ হ-এ, 'গহ্বর' বলতে অন্তঃস্থ (দন্তৌষ্ঠ্য) ব্ + ব-এ হ-এ, 'হ্রদ' বলতে র্ + র-এ হ-এ, আর 'হৃদয়' বলতেও র্ + র-এ হ-এ ই-কার উচ্চারণ হয়ে থাকে। হ্র এবং হৃ-র উচ্চারণ নিয়ে ধোঁকা লাগতে পারে—হ আগে না র আগে? উচ্চারণকালে লক্ষ করলে বোঝা যাবে আমাদের জিহ্বা র-এর উচ্চারণস্থানে লগ্ন হবাব পরই র্ + হ্র/ হৃ উচ্চারিত হয়। তাতে র-ই পুরোবর্তী হয়ে যায়। কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় হ

উচ্চারণে জিহ্বার কোনও ভূমিকা নেই। যুক্তবর্ণের স্বভাবাপন্ন এই কয়েকটি ধ্বনি উচ্চারণের প্রাক্কালে ম, ল, অন্তঃস্থ-ব, র ধ্বনির উচ্চারণস্থলে জিহ্বা লগ্ন হয়ে তারপরে মহাপ্রাণ হ্ম হ্ন হ্ল হ্ব/ হ্র-র উচ্চারণ সাধন করে। যুক্তবর্ণের স্বভাবের দরুনই হয়তো হ্ম ছাড়া বাংলার এই ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র চেহারা পায়নি। হ্ম বর্ণটি কি এসেছে ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মানের বশে? ওদিকে আবার ড় + হ = ঢ় অক্ষরটি বর্ণমালায় দিব্বি জায়গা পেয়েছে। এই শৃঙ্খলাভঙ্গের দায় কার জানি না।

উপস্থিত আলোচনাসূত্রে বর্ণমালায় নেই অথচ বাস্তব ব্যবহারে আছে এমন অনেকগুলো ধ্বনির সন্ধান পেলাম। তারপরেও আর দু-একটি ধ্বনির কথা বাকি থেকে গেছে। অন্তঃস্থ য-কে আমরা উচ্চারণে জ-এর সমতুল্য জানলেও অন্তঃস্থ য় আর য-ফলা রূপেও পাই। য-ফলা চিহ্ন 'কল্যাণ' উচ্চারণে ল-এর দ্বিত্ব ঘটিয়ে আ-কারকে অ্যা-কারে পরিণত করে। শব্দের শুরুতে থাকলে দ্বিত্ব না-ঘটিয়ে 'অ্যা' উচ্চারণ আনে, ন্যায় ব্যয় ধ্যান ইত্যাদি শব্দে। এভাবে য-ফলা অ্যা-কাব উচ্চাবণের চিহ্ন হয়ে আছে। আর অন্তঃস্থ য় কোথাও শ্রুতিধ্বনি (glide), কোথাও-বা যৌগিক ধ্বনির মূল হসন্তযুক্ত 'এ্' রূপে বাংলায় উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন 'গিয়েছে' 'বিয়ে' 'রয়েসয়ে' 'সময়ে'-তে গ্লাইড ধ্বনিরূপে আর 'হয়' 'দেয়' 'খায়' ইত্যাদিতে যৌগিক ধ্বনিব অন্যতম মূল এ্ তথা অর্ধস্বর রূপে।

এবার আর একটি ধ্বনি অন্তঃস্থ ব-এর কথা। গহ্বর আহ্বান বিহ্বল জিহ্বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে যুক্তবর্ণ উচ্চারণের নিয়ম অনুযায়ী হ্ব ধ্বনির আগে অন্তঃস্থ ব উচ্চারণে আমবা ক্ষণিক থেমে তখনই সংযুক্ত স্বরধ্বনিব সাহায্যে হ্ব ব্যঞ্জনের উচ্চাবণ সম্পন্ন করি। অথচ সচেতন বিবেচনাব অভাবে আমরা বলি যে, বাংলাতে দুটো ব-য়ের কোনও প্রয়োজন নেই। অন্তঃস্থ-ব আমাদেব উচ্চারণে রয়েছে। অনবরোধক এই দন্তৌষ্ঠ্য ব-টিকে প্রয়োজনে পেট-কেটে বর্গীয় ব থেকে আলাদা চেহারা এবং স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

উষ্ম জ নাম দেওয়া যায়, এমন একটি ধ্বনিও, কেবল বিদেশী শব্দের সূত্রে নয়, খাঁটি বাংলা উচ্চারণেই হয়েছে। এই ধ্বনির কথা রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন। 'লুচি ভাজতে' বা 'বাজতে বাজতে চলল ঢুলি' বলতে যে জ উচ্চারিত হয় সে তো বর্গীয় জ নয়। 'মেজদা' 'সেজদি' বলতে আমরা তো বর্গীয় জ বলি না, ইংরেজি z-এর ধরনের একটি উষ্ম জ বলি। নিচে একটি ফুটকি দিয়ে বর্গীয় জ থেকে এর আলাদা চেহারা দেওয়া যায়, যেমন ফ/ f-এর ক্ষেত্রেও আমরা দিতে পাবি। বিদেশী শব্দে 'নজরুল' 'নামাজ' 'রোজা' 'জিম্বাবুয়ে' 'নিউজিল্যাণ্ড' 'জেরুজালেম' বলতে উষ্ম জ-টি আমরা হরদম ব্যবহার করছি। আবার 'বুঝতে' 'বুঝদার' বলতে গেলে ঈষৎ মহাপ্রাণতাযুক্ত আব একটি উষ্মধ্বনি শোনা যায়। হস্ অন্ত শব্দে মহাপ্রাণতা পুরো স্পষ্ট হয় না বলেই 'ঈষৎ মহাপ্রাণতা'-র কথা বলেছি। বাস্তবিক দ বা ধ পরে থাকলে চ-বর্গের কোনও কোনও হসন্তধ্বনি দ্রুত উচ্চারণে খানিক উষ্মতা প্রাপ্ত হয়। যেমন—'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', 'ঠক বাছতে গাঁ উজাড়', 'রাজধানী', 'সমঝদার'। সুনীতিকুমার ত বা দ-এর পূর্ববর্তী জ-এ এই উষ্মতা লক্ষ করেছিলেন। ত-এর পূর্ববর্তী চ ছ, ধ-এর পূর্ববর্তী জ এবং দ-এর পূর্ববর্তী ঝ-এর বিষয়েও ভাবতে হয়। এও ভেবে দেখা ভালো, কেবল পূর্ববঙ্গের লোকেরাই কি চ-বর্গে এই উষ্মতা আমদানী করছে?

ব্যঞ্জন বর্ণমালার নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলির ভিতরে ঙ আর অনুস্বারের উচ্চারণগত ঐক্যের কথা সকলেই জানেন। ঞ বর্ণের উচ্চারণ-রূপ আলোচনার বিষয়। চঞ্চল, লাঞ্ছনা, ব্যঞ্জনা, ঝঞ্ঝনা শব্দের ঞ-র উচ্চারণে আমরা ন-ধ্বনি শুনতে পাই। এই ন চ-বর্গের সন্নিহিত বর্ণের উচ্চারণস্থানের কাছাকাছি সরে যায় বললে ভুল হবে না। ন-এর এই সরে থাকার প্রবণতা অন্যান্য বর্গের সঙ্গে যুক্ত

অবস্থায়ও লক্ষ করা যাবে। সান্ত্বনা মন্থন বন্দনা বন্ধন উচ্চারণে ন-এর দন্ত্য স্বভাব বজায় থাকে, অন্য বর্ণটিও দন্ত্য বলে। কণ্টক গুণ্ঠন মণ্ডন কণ্ঢারা বলতে আবার সংযুক্ত মূর্ধন্যবর্ণের উচ্চারণ স্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ে মূলধ্বনি ন-এর উচ্চারণ।

ঞ-র উচ্চারণের রূপ কেবল 'ন' নয়, নানারকম! জ-এর পরে ঞ যুক্ত হলে ন-এর স্থলে অনুনাসিক উচ্চারণ আসে, সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিরও পরিবর্তন হয় কোথাও কোথাও। 'জ্ঞান বিজ্ঞান' উচ্চারণে আ-কারগুলি অ্যা-কারের উচ্চারণ পায় আর ঞ প্রকাশিত হয় অনুনাসিকরূপে, যেমন— 'গ্যাঁন বিগ্‌গ্যাঁন' ('বিগ্‌গাঁন' উচ্চারণও চলিত)। 'বিজ্ঞ' উচ্চারণে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয় ঞ-র কারণে, যেমন 'বিগ্‌গঁ' (জ + ঞ উচ্চারণে জ-এর উচ্চারণও বদলে 'গ' হয়ে পড়ছে)। স্মরণ করা যায়, পরে যুক্ত হলে ম-ধ্বনিও কখনও কখনও অনুনাসিক উচ্চারণ পায়। যেমন হয়েছে, 'স্মরণ'-এ, 'শ্মশান'-এ। স্বতন্ত্র ঞ উচ্চারিত হয় য়ঁ-রূপে, তার উদাহরণ 'মিঞা' আর 'ভেঙে'-তে। 'যাচঞা' শব্দ কেউ উচ্চারণ করেন 'যাচ্‌য়াঁ' কেউ 'যাচ্‌না'। ঞ-কে অবশ্য আমরা 'য়ঁ'-ই উচ্চারণ করি। সেদিক থেকে শেষ কটি উদাহরণে ঞ-র আসল রূপটি উচ্চারণে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঞ বর্ণটি কি তবে ব্যঞ্জন না চন্দ্রবিন্দুযুক্ত যৌগিক ধ্বনি—এ প্রশ্ন এসে যায়। নাসিক্যব্যঞ্জনের 'না-স্বর না-ব্যঞ্জন' ভাবের কথা আগেই বলেছি।

ধ্বনিতাত্ত্বিকরা ঞ আর ণ-কে ন-এর প্রকারভেদ বলেছেন। আমরা দেখলাম, ঞ-তে ন আবার কখনও কখনও অনুনাসিক ধ্বনি তথা চন্দ্রবিন্দুর যোগে শ্রুতিধ্বনি বা যৌগিকধ্বনির মতো করে উচ্চারিত হচ্ছে। মূর্ধন্য ণ-কে স্বতন্ত্র অবস্থানে আমরা 'ন'-ই বলি। শুধু প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা মূর্ধন্য ধ্বনিগুলোর আগে সংযুক্ত হলে এর মূর্ধন্যস্বভাব প্রকাশ পায়। যেমন 'কণ্টক' 'গুণ্ঠন' ইত্যাদি উদাহরণে আগেই আমরা পেয়েছি। তাহলে মূর্ধন্য ণ-য়ের উচ্চারণ বাংলাতে রয়েছে। এই বর্ণটি বাংলার ভাণ্ডারে আছে যখন, তখন উচ্চারণে নেই কিংবা শিক্ষার্থীর জন্য অযথা জটিলতা দেখা দিচ্ছে ব'লে বর্ণটিকে বর্জন করবার প্রস্তাব বা ইচ্ছাকে আমরা সমর্থন করি না। বানানে স্বতন্ত্র ণ-কে উচ্চারণের অনুসরণে 'ন' করে ফেলা হবে কিনা, সেটা আমাদের আলোচ্য নয়। তবে, কম্পিউটারের দৌলতে আজকাল বাংলাতে দন্ত্য ন-যুক্ত মূর্ধন্য ধ্বনির যে ব্যবহার দেখা দিয়েছে তার নিন্দা করব। সম্ভবতঃ অজ্ঞতার দরুনই ন্ট ন্ঠ ন্ড ইত্যাদির জায়গায় দন্ত্য ন-যুক্ত হরফের আগম ঘটেছে। এই হরফ তৈরি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। এতে বানানের ভুল বেড়ে গিয়ে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশী শব্দের জন্যেও 'সেন্ট যোসেফ' 'ক্যান্টিন' 'এন্ড্রুজ' বানান অযথার্থ নয়। বাংলা বানান উচ্চারণ অনুগামী না হলেও উচ্চারণের ভিত্তিতে বর্ণ ছাঁটাই করবার প্রশ্ন উঠছে যেখানে, সেখানে উচ্চারণ বিরুদ্ধ নতুন হরফ এনে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা অর্থহীন। উচ্চারণের স্বার্থ দেখতে গেলে 'স্টেশন' 'স্টকহোম' 'স্টালিন' এসব শব্দের জন্য 'স্ট' হরফ তৈরি বরং যুক্তিসঙ্গত, এসব উচ্চারণে s/ স ধ্বনিই ব্যবহৃত হয় যখন। 'চলন্তিকা' অভিধানেও 'স্টীমার' 'স্টেশন' 'স্ট্যাম্প' ইত্যাদি উচ্চারণানুগ বানান এখন স্থান পেয়ে গেছে। এই হরফকে আমরা স্বাগত জানাব।

বাংলা বর্ণমালা আর প্রমিত বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালা নিয়ে এই আলোচনার শেষে বাংলা উচ্চারণে আছে এমন ধ্বনিগুলির একটি তালিকা দিচ্ছি। যে-সব ধ্বনি নিয়ে দ্বিধা আছে সেগুলো তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি। বহুজনের আলোচনায় এই তালিকার দোষত্রুটির স্খালন হয়ে ক্রমে বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালার নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত হবে বলে আশা করি।

বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালা:—

অ আ ই উ এ অ্যা ও অঁ আঁ ইঁ উঁ এঁ অ্যাঁ ওঁ

ই্ উ্ এ্ ও্

ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ

ঙ ঞ ণ ন ম য র ল ব শ ষ স হ

ং ঃ ৎ ড় ঢ (জ্ঞ) হ্ণ হ্ন হ্ম হ্র/হ্য হ্ল হ্ব ফ জ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই। চার্লস্ এ. ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী।
'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান', গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলা অভিধান

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষা ও সাহিত্য কিছুদুব অগ্রসর হবাব পর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে অভিধানের। যখন সকল শব্দ ও শব্দের বিভিন্ন অর্থ মনে বাখা সম্ভব ছিল না তখনই অভিধান বা শব্দকোষের প্রয়োজন দেখা দেয়। জানা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড শত বছর পূর্বে চীন দেশে প্রথম অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে। ভারতেও বহু প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত শব্দকোষ প্রচলিত ছিল। ঐ কালেব সর্বোৎকৃষ্ট অভিধানটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল বলে ধরা যেতে পারে। কারণ শব্দকোষের শ্রেষ্ঠ সংকলক অমরসিংহ ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত অভিধানের স্থান ছিল উচ্চে। পাঠতালিকাব অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিধান। ছন্দ, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের মত অভিধানও গুরুত্ব পেত শিক্ষাক্রমের মধ্যে। সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনের একটি বিশেষ রীতি ছিল। শব্দগুলিকে পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ এই তিনভাবে ভাগ করা হত। ছাত্রদের কর্তব্য ছিল এই শব্দগুলি মুখস্থ করে তাদেব বৈশিষ্ট্য মনে রাখা। তখন শব্দের ব্যাখ্যা-মূলক অর্থ দেবাব রীতি ছিল না। দেওয়া হত শব্দের যতগুলি সম্ভব প্রতিশব্দ। এই প্রতিশব্দ ব্যবহার করেই শব্দেব অর্থ বোঝানো যাবে, এই-ই ছিল অভিধান-কারের আশা। একটি প্রতিশব্দ না জানলেও হয়তো অন্য একটি পরিচিত শব্দ থেকে মূল শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। ধরা যাক, 'মৃগ' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে 'কুরঙ্গ', 'হরিণ', এখানে 'কুরঙ্গ' শব্দটি ছাত্রের জানা না থাকলেও 'হরিণ' শব্দের সাহায্যে 'মৃগ' শব্দের অর্থের আভাস পেতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলা যেতে পারে পোর্তুগীজ পাদ্রীদের রচিত শব্দকোষ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত হল আস্সুম্পসাও-এর বাংলা-পোর্তুগীজ অভিধান। তারপরে এল ইংরেজ আমল। স্বভাবতই তখন থেকে বাংলা-ইংরেজী, ইংরেজী-বাংলা এই দুই ধরণের অভিধানের প্রাধান্য দেখা যায়। সঙ্কলনের কাজ যাঁরা আরম্ভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আপজন, ফরস্টার, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণ। প্রথম পর্বের খাঁটি বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তাঁর সঙ্কলিত 'বঙ্গভাষাভিধান' প্রকাশ করেছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮১৭ সালে। এর পূর্বে যে সব অভিধান সঙ্কলনের প্রচেষ্টা দেখা যায় তাদের মধ্যে ভারতীয়দের ইংরাজী এবং ইংরেজদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট অনুভূত হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে প্রথম বাংলা অভিধান রচনার কৃতিত্ব শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরী দাবী করতে পারেন। তিনি পঁচিশ বছরের একক প্রচেষ্টায় প্রায় আশি হাজার শব্দ সম্বলিত বাংলা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন। কেরীর অভিধান বাংলা ভাষায় ডঃ জনসনের অভিধানের স্থান গ্রহণ করতে

পারে। ডঃ জনসনের ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্য এমনই সুখ্যাত ছিল যে কয়েকজন প্রকাশক তাঁকে দিয়ে একটি অভিধান সঙ্কলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সময় ইংরাজী ভাষার বানানে এবং শব্দার্থ ব্যাখ্যায় এমনই হট্টগোল চলছিল যে ডঃ জনসনের মতো ব্যক্তিত্ব এই বিশৃঙ্খলা দূর করতে পারেন বলেই তাদের বিশ্বাস হয়েছিল। তাঁর উপরে এই আস্থা ডঃ জনসন প্রমাণিত করতে পেরেছিলেন। প্রায় একশ বছর যাবৎ ডঃ স্যামুয়েল জনসনের অভিধান লেখক-পাঠক ও প্রকাশকের নিকট নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত ছিল।

অবশ্য অর্থব্যাখ্যায়, শব্দসংগ্রহে এবং আরও নানাক্ষেত্রে জনসন ব্যক্তিগত রুচির উপরই নির্ভর করেছেন বেশি। অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করবার সময় তিনি বেছে নিয়েছেন কেবল সেইসব শব্দ যেগুলি সভ্য সমাজে প্রচলিত ছিল। অর্থের ব্যাখ্যাতেও জনসন নিজস্ব বাতিকের প্রাধান্য দিয়েছেন অনেকস্থানে। যেমন– 'ওট' (Oat) শব্দের অর্থ তিনি লিখেছেন "Food for horse in England, and food for men in Scotland " স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে চিরন্তন কলহ এই শব্দার্থের মধ্যে ছায়াপাত করেছে। তাছাড়া নিজের জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাও তাঁকে বার বার প্রভাবান্বিত করেছে। তাই 'Patriotism'-এর শব্দার্থ জনসন লিখলেন 'শয়তানের শেষ আশ্রয়'। কিন্তু আধুনিক কালে সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য অভিধানকে হতে হবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অন্তর্ভুক্তির জন্য শব্দ নির্বাচনে, অর্থের ব্যাখ্যায় আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে থেকে মুক্তমনে অভিধান সঙ্কলন করা বর্তমান কালের স্বীকৃত রীতি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনসনের অভিধানের প্রয়োজনীয়তা যদিও এখনো আছে তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত সমাজে তাঁর অভিধানের ব্যবহার ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসতে লাগল।

বাংলা ভাষায় কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধান অনেকটা ডঃ জনসনের অভিধানের স্থান গ্রহণ করতে পারে। কারণ কেরী ছিলেন তখনকার দিনের প্রচলিত সবগুলি ভাষাতেই সুপণ্ডিত। এই জ্ঞান তাঁকে শব্দের বানান, অর্থ ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে দিয়েছিল মতামত দেবার অধিকার। আশি হাজার শব্দের এই বিপুলায়তন অভিধান সেদিন কল্পনা করাও ছিল দুঃসাধ্য। ১৮২৫ সালের পূর্বে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসীতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে অভিধানের জন্য শব্দ নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাই বাংলা-সংস্কৃত ও ফার্সী পাণ্ডুলিপি থেকেও শব্দচয়ন করেছেন। কথ্য ভাষার শব্দ তিনি গ্রহণ করেছেন অসঙ্কোচে। যেমন, ব্যঞ্জনাময় শব্দ 'শীতরি' (শীতের অরি) তিনি গ্রহণ করেছেন শীতবস্ত্রের পরিবর্তে। তাছাড়া প্রত্যয়, উপসর্গ প্রভৃতি যোগ করে বহু নতুন শব্দ এনেছেন তাঁর অভিধানে। মূল শব্দ 'উপাসনা' থেকেই কেরী রচনা করেছেন সত্তরটি উপশব্দ। তাছাড়া সংস্কৃত অভিধান থেকে এমন সব শব্দ কেরী গ্রহণ করেছেন যাদের আজও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা চলে ; যেমন-- মলঘ্ন-- detergent ; অবট– sinus ; আজ্ঞাপত্র– warrant ; ডাকপত্র– summons । অবশ্য শব্দসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবণতা সর্বদা সুখকর হয়নি। যেমন, 'পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ'--পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়াচাড়া করতে যে ক্ষুদ্র পেশীটি কাজ করে তার নাম।

শব্দসঙ্কলনের এই রীতি সকলের পছন্দ হয়নি। ইয়ংবেঙ্গল দলভুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁর সঙ্কলিত অভিধানে (১৮২৭) কেরীর পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেরী শুধু একটি প্রথম শ্রেণীর অভিধান রচয়িতা হিসেবেই আমাদের মনে থাকবেন না, অভিধান-মুদ্রণোপযোগী ছোট হরফ ঢালাই করবার অসামান্য

কৃতিত্বের জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কেরীর পর থেকে আরও বহু অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে। এদের অনেকগুলির তালিকা সঙ্কলন করেছেন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। এইসব অভিধানে প্রায়ই নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস একটি নতুনত্ব এনেছেন বাংলা শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে। কেউ কেউ শব্দের অর্থ বোঝাতে প্রয়োগ বিষয়ক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু শব্দ অন্তর্ভুক্তির নীতি, অর্থব্যাখ্যার রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুনত্ব বড় একটা দেখা যায় না। এক ধরনের নতুন অভিধানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল 'এনসাইক্লোপিডিক' অভিধান অর্থাৎ অভিধান ও কোষগ্রন্থ দুই মলাটের মধ্যে একসঙ্গে উপস্থিত করা। এই জাতীয় অভিধানের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখনীয় সুবলচন্দ্র মিত্র ও আশুতোষ দেবের অভিধান দুটি। বাংলাভাষায় ছোট কোষগ্রন্থের অভাব আছে বলেই এই জাতীয় অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বৃহৎ আকারের জন্য সর্বদা ব্যবহারের ততটা উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র প্রথম সংস্করণে অভিধান ও কোষগ্রন্থের সম্মিলন দেখা যায়। সেখানে অবশ্য কোষগ্রন্থের বিষয়গুলি পৃথক করে সন্নিবেশিত করা হয়নি। সব শব্দই বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত।

আমাদের অভিধানের তালিকা থেকে যে বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল বাঙালির প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ খুবই কম। ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান পাওয়া যত সহজ, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি কাছের ভাষাগুলির বিষয়ে অভিধান তেমন সহজলভ্য নয়। বিদেশী ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার অভিধান তো দুষ্প্রাপ্য। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে ফারসী ভাষার প্রাধান্য ছিল। তাই ফারসী-বাংলা এবং বাংলা-ফারসী কয়েকটি অভিধান পাওয়া যায়। আর একটি বাংলা-তিব্বতী অভিধানের কথা উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে কর্মরত সরকারী কর্মীদের ব্যবহারের জন্য এটি সঙ্কলন করেছিলেন এক বাঙালী পণ্ডিত ১৮২৪ সাল নাগাদ।

পাঠকের আগ্রহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ যে অভিধানকে কত পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য করতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্শনারি'। এই প্রামাণ্য অভিধান সঙ্কলনে প্রায় আটশত স্বেচ্ছাকর্মী বিনা পারিশ্রমিকে শব্দের উৎপত্তি এবং শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত সঙ্কলনে সহায়তা করেছেন। তাঁরা যেসব টুকরো কাগজে মতামত সম্পাদককে জানিয়েছিলেন সে সব কাগজের মোট ওজন ছিল দু টনের বেশি। অভিধান-সঙ্কলনে জনসাধারণের কাছ থেকে একপ সহায়তার দৃষ্টান্ত আর নেই বললেই চলে।

প্রথমপর্বে আমাদের অভিধানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর যে প্রাধান্য ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধানই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি প্রামাণিক খাঁটি বাংলা অভিধান সঙ্কলন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত অভিধানের কথা মনে রেখেও এ কথা বলতে হয়। কেন একটি আদর্শ অভিধান সঙ্কলিত হয়নি তার কারণ আমরা পরে বিবৃত করতে চেষ্টা করব। এখন দেখা যাক অভিধান থেকে পাঠক যা পেতে চান তা পাওয়া যায় কিনা। সাধারণ পাঠক অভিধান ব্যবহার করেন মূলত চারটি কারণে : (১) শব্দের ব্যুৎপত্তি ; (২) শব্দার্থের ব্যাখ্যা ; (৩) সঠিক বানান ; (৪) উচ্চারণ।

এই চারটির মধ্যে সাধারণ পাঠক শব্দার্থ এবং বানান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আগ্রহী। শব্দের

ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁরাই অনুসন্ধিৎসু যাঁরা ভাষা নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করতে চান। শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করবার মত কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি নিয়ে এখন পর্যন্ত বিশদ ও স্বীকৃত আলোচনা হয়নি। যতদূর জানা যায় এ বিষয়ে দুটি মাত্র অভিধান উচ্চারণ নির্দেশ করতে এগিয়ে এসেছে কিন্তু তাদের অবলম্বিত পদ্ধতিও বিচারসাপেক্ষ।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পর থেকেই আমরা ইংরেজী অভিধানের সঙ্গে পরিচিত। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ আমাদের ইংরেজী অভিধান ব্যবহার করতে হত। কিন্তু বাংলা থেকে বাংলা অভিধান সঙ্কলনে আমরা ইংরেজী অভিধানের আদর্শ গ্রহণ করতে পারিনি। বিশেষ করে শব্দের অর্থবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। বাংলা অভিধান এখনো 'অমরকোষের' আদর্শ অনুসরণ করে আসছে বলা চলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে বলে মনে করি।

ধরা যাক 'সুন্দর' কথাটি। এর অর্থ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দিয়েছেন:

"মনোহর, সুরূপা, রমণীয়"। সংসদ অভিধান অর্থ দিয়েছে —"সুদৃশ্য, শোভন, রূপবান, মনোহর"। আবদুল ওদুদ 'সুন্দর'-এর অর্থ দিয়েছেন এই: "স্বরূপ, রুচির, মনোহর"।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা 'সুন্দর'-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাই না। হতে পারে, 'সুন্দর' কথাটির ব্যঞ্জনা বাংলা ভাষায় সঙ্কীর্ণতর। শব্দটি যখন প্রথম অভিধানে স্থান পেয়েছিল তখন তার অর্থ ছিল সীমিত। এখন তার প্রয়োগ হয়েছে ব্যাপকতর। এই ব্যাপকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইংরেজী অভিধানে। অক্সফোর্ড কন্‌সাইজ অভিধান 'বিউটিফুল' শব্দের অর্থ দিয়েছে এই " delighting the eye or ear, gratifying any taste; morally or intellectually impressive, charming or satisfactory." ওয়েবস্টারস্ কলেজিয়েট অভিধানের অর্থ এইরূপ "having qualities of beauty of that sensuous or aesthetic pleasure "

সৌন্দর্য যে কী, তার কতকগুলি দিক আছে এবং সৌন্দর্যের উপলব্ধি যে শুধু চোখ দিয়ে হয় না, কান দিয়ে এবং হৃদয় দিয়েও যে করা যায়, তা ইংরেজী অভিধানের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হল। ইংরেজী ব্যাখ্যা থেকে sensuous, aesthetic, intellectual, moral ইত্যাদি সকল প্রকার সৌন্দর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আর একটি সুপরিচিত শব্দ 'উপন্যাস'। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই শব্দটি অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের অভিধানে 'উপন্যাস' শব্দের ব্যাখ্যা থেকে বোঝবার উপায় নেই 'উপন্যাস' শব্দের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী। কেরী তার অভিধানে (১৮২৫) এর অর্থ দিয়েছেন ' A tale or story, an entertaining story." ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হটন তাঁর বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে প্রায় একই অর্থ দিয়েছেন। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। কেরীর আমলে আধুনিক অর্থে কোনো উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে বা বিদেশী সাহিত্যে ছিল না। এখন উপন্যাস শাখাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। অথচ বাংলা অভিধানে এই নতুন শাখার প্রাধান্যের কথা প্রতিফলিত হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস উপন্যাসকে বলেছেন, "কাল্পনিক উপাখ্যান; উপকথা; কল্পিত গদ্যকাব্য।" উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত প্রভৃতির নাম। কোনো বাংলা উপন্যাসের নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে বাঙালী পাঠকের নিকটে উপস্থিত করা হয়নি। কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যে উপন্যাস হিসাবে চলতে পারে। কিন্তু এখন? জ্ঞানেন্দ্রমোহন অবশ্য পরে চেম্বার্স থেকে নভেলের সংজ্ঞা তুলে নিয়ে একালীন অর্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে বর্তমানকালে সুপ্রযুক্ত

নয় উপন্যাসের এমন নয়টি সংজ্ঞা দিয়ে দশম অর্থে লিখেছেন, "চমৎকারজনক সাংসারিক ঘটনামূলক গদ্যগ্রন্থ ও নভেল।" এই প্রাসঙ্গিক অর্থটিই সর্বপ্রথম দেওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য অভিধানে উপন্যাসের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, রূপকথা ইত্যাদিও উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে।

অন্যদিকে দেখা যায় কন্‌সাইজ অক্‌সফোর্ড অভিধানে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই: "Fictitious prose narrative of book length portraying characters and actions credibly representative of real life in continuous plot." অর্থাৎ, উপন্যাস এমন একটি ধারাবাহিক কাহিনী, যার দৈর্ঘ্য একটি পৃথক বই হবার উপযোগী। এই কাহিনী লেখা হবে গদ্যে, বাস্তব জীবনের কথা নিয়ে। কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিবর্তন ঘটবে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব চরিত্রের। এইসব চরিত্রের বিকাশ ঘটছে কতকগুলি জীবনসম্পৃক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের অভিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সমাজজীবনে 'বিবাহ' শব্দটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই শব্দের অর্থ বিভিন্ন অভিধানে যা দেওয়া হয়েছে তা হল এই বাংলার দুটি বড় অভিধানে 'বিবাহ' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে—"দশবিধ সংস্কারান্তর্গত সংস্কার বিশেষ, পরিণয়, বহন বা স্বীকার, দারপরিগ্রহ, উদ্বাহ, পাণিপীড়া" ইত্যাদি। এতগুলি শব্দ বসানো সত্ত্বেও বিবাহের অর্থ যে কী, তা বোঝা যায় না। বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে থাকে আইনের স্বীকৃতি। বাংলা অভিধানের অর্থে সমাজ, ধর্ম ও আইনের স্বীকৃতি নেই। র‍্যান্ডম হাউস অভিধানে (একখণ্ডে) বিবাহের অর্থটি দেখলেই আমাদের অভিধানের দৈন্য ধরা পড়বে—

"Marriage: the social institution under which a man and a woman establish their decision to live as husband and wife by legal commitments, religious ceremonies etc."–

আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশে নতুন উদ্যমে যে সব অভিধান সঙ্কলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শব্দার্থ সংজ্ঞার আরো নতুনত্ব দেখতে পাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হয়নি। ঢাকার 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' 'বিবাহ' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে "দারপরিগ্রহ; পরিণয, পাণিগ্রহণ।"

শব্দের বানান, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে আমরা এখানে বিশেষরূপে আলোচনা করতে চাই না। অভিধানে বানানরীতি হওয়া উচিত পুরাতনপন্থী। বানান সম্বন্ধে প্রস্তাব, যে প্রস্তাব সুপ্রচলিত হয়নি তা গ্রহণ করা উচিত হবে না। কারণ তাহলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বানান নিয়ে অহেতুক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর পর্যন্ত যে বানান পদ্ধতি প্রচলিত আছে মোটামুটি অভিধানে তাই-ই মেনে চলা উচিত।

তাহলে বর্তমানে অভিধান থেকে আমরা বিশেষরূপে দুটি জিনিসের প্রত্যাশা করি। একটি হল শব্দার্থের সংজ্ঞা, অন্যটি প্রচলিত বানান। শব্দার্থের সংজ্ঞা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি শব্দের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাকারকে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১২শ খন্ড, পৃ ৫৩৩)।

সংজ্ঞা যদি যথাযথরূপে রচিত না হয় এবং শব্দের অর্থ মনের উপর যদি ছাপ ফেলতে না পারে, তাহলে সাহিত্যপাঠের কিংবা বিষয়মূল্যসূচক গ্রন্থপাঠের মূল্য হ্রাস পায়। অভিধান তো শুধু

একশ্রেণীর হলেই পাঠকের প্রয়োজন মেটে না। শিশু কিশোর ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক পাঠকদের জন্য শব্দার্থ-সংজ্ঞাও একটু তফাৎ হওয়া দরকার। কারণ অল্পবয়সে যে সংজ্ঞা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায় পরবর্তী জীবনে মনে সেটাই গাঁথা থাকে, সেইজন্য শিশু ও কিশোরের ব্যবহারোপযোগী অভিধানের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেমন, প্রচলিত অভিধানে 'ঔষধের' সংজ্ঞা এই: ''রোগের প্রতিকারক বা প্রতিষেধক দ্রব্য।''

ছোটদের জন্য এই সংজ্ঞাটিকে আরেকটু সহজতর করে লেখা যেতে পারে—''অসুখ ভালো হবার জন্য, অথবা যাতে না হতে পারে তার জন্য যে সব বড়ি, পাউডার, মিক্‌শ্চার চিকিৎসক খেতে দেন: ওষুধ''।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান থেকে 'নমস্কার' ও 'প্রণাম' শব্দ দুটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন। ছোটদের জন্য সহজ করে কি এইভাবে লেখা যায় না?

'নমস্কার'—''দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন; সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশের জন্য নমস্কার করা হয়। দেখা হলে এবং বিদায়ের সময় নমস্কার করা ভদ্রতা''।—

'প্রণাম'—''নত হয়ে অথবা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকাশ। হাত দিয়ে কিংবা মাথা দিয়ে গুরুজনের পা স্পর্শ করে সম্মান দেখানো।''—

সমকালীন সমাজে অভিধান বা অভিধানকার কেউই উপযুক্ত সম্মানলাভ করেন না। 'অমরকোষের' রচয়িতা অমরসিংহকে রাজা নবরত্নের অন্যতম সভ্য হিসেবে সম্মানিত করেছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে থেকে কিছু সম্মানলাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ অভিধানকারই পৃষ্ঠার ভিত্তিতে পাওনাদেওনার চুক্তিতে আবদ্ধ। তাদের রয়্যালটি নেই, সুতরাং অভিধানের সঙ্গে সঙ্কলয়িতাদের নিবিড় যোগ বড় একটা থাকে না। এখন আমাদের যত অভিধান সঙ্কলিত হচ্ছে তার অধিকাংশের মূলেই আছে একক প্রচেষ্টা। একক প্রচেষ্টার অভিধানে নানা ভুল ভ্রান্তি এবং একদেশদর্শিতার দোষ স্পর্শ করবার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা নিয়মিত অর্থের সরবরাহ। অক্‌স্‌ফোর্ড অভিধান সম্পূর্ণ হয়েছিল দীর্ঘ ৭৫ বছরের প্রচেষ্টায়। প্রামাণিক অভিধান করতে হলে সময়ের কথা ভাবা চলবে না। সঙ্কলক যতক্ষণ সন্তোষ লাভ না করেন ততক্ষণ তাঁকে কাজ করে যেতে দিতেই হবে। যেমন ধরা যাক, অক্‌স্‌ফোর্ড অভিধানের 'সেট' শব্দটির অর্থ লিখতে সময় লেগেছিল সর্বমোট প্রায় ৮০ ঘণ্টা। শুধু তো সময় নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান। শব্দার্থ লিখতে বসে অভিধানকার গবেষণা করতে পারেন না। সেটা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে অভিধানের কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুনিরপেক্ষ যেসব শব্দ তাদের জন্য অভিধান-সঙ্কলকের বিশেষ কোনো কোষগ্রন্থের সহায়তা ততটা আবশ্যক নাও হতে পারে। কিন্তু বস্তু ও প্রাণীজগৎ বিষয়ক শব্দের জন্য উপযুক্ত কোষগ্রন্থের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজন। আবার পুরনো দৃষ্টান্তে ফিরে যাওয়া যাক: 'মৃগ', 'কুরঙ্গ', 'হরিণ' শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য কী তা প্রচলিত অভিধানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃত 'মৃগপক্ষীশাস্ত্র' নামে একটি বই আছে যাতে এদের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে। আবার, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোনো শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হলে সহায়তা করবে অটলবিহারী ঘোষ সঙ্কলিত 'তন্ত্রাভিধান'। বইটি নির্ভরযোগ্য, কারণ অটলবিহারী ছিলেন স্যার জন উড্‌রফ-এর তন্ত্রচর্চার ঘনিষ্ঠ সহচর। বাংলায় এ জাতীয় কোষগ্রন্থের দৈন্য প্রামাণ্য অভিধান সঙ্কলকের বড় অন্তরায়।

আরেকটি বড় প্রশ্ন—বিভিন্ন শ্রেণীর অভিধানে কোন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কোন শব্দ

করা হবে না—এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করেন এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষরূপে সহায়তা করতে পারেন। পুঁথিগত বিষয়ের ওপর গবেষণা না করে গবেষকরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে কোন বয়সের লোক কোন শব্দ ব্যবহার করে থাকে তা তালিকাবদ্ধ করলে অভিধানকার বিশেষরূপে উপকৃত হবে। কেউ যদি ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক বা গল্পের বই লিখতে চান—তাহলে কোন কোন শব্দ তাদের পক্ষে উপযোগী হবে সেটা নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে অনুমান করে নিতে হয়। সে অনুমান অনেক সময়ই যথার্থ হয় না। কিন্তু এই বয়সের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে ক্ষেত্রসমীক্ষার গবেষকরা যদি তালিকা তৈরী করেন তাহলে রচনার মান যেমন উন্নত হবে শিক্ষাও তেমনি হবে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে যুক্ত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাইকেল ওয়েস্টেব সঙ্কলিত এইরকম একটি service list of words-কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীবনের সকল বিভাগের চিন্তাভাবনা প্রকাশ কববার মতো শব্দ ভাষায থাকা চাই এবং অভিধানেও সেইসব শব্দের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যদি প্রয়োজনীয শব্দ আমাদের ভাষায় না থাকে তাহলে সেইসব শব্দ অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে অন্যভাষা থেকে শব্দগ্রহণেব এই রীতি বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ফাবসী, ইংরেজী, পোর্তুগীজ, ফবাসী প্রভৃতি অনেক ভাষার অনেক শব্দই বাংলায় প্রবেশ কবে সাধাবণ পাঠকের কাছে আত্মপবিচয হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখন দেখা যায় বহু শব্দ আমরা বিদেশী ভাষা থেকে নিয়ে কথাবার্তায় এমনকী লেখাতেও ব্যবহাব কবি কিন্তু অভিধানে তাদের হদিশ মেলে না। শত শত ইংরেজী শব্দ, যাদের বাংলা প্রতিশব্দ নেই, অপরিহার্য হলেও তারা আমাদের প্রচলিত অভিধানে স্থান পায়নি। নিচে আমরা কয়েকটি শব্দেব তালিকা দিলাম—অ্যাকাউন্টেন্ট; অ্যাসেম্বলি; এয়ারকন্ডিশন; অ্যালবাম; একর; বোনাস; ব্রেড, বেসিন; ব্লেড; বেবি; করপোবেশন; কার; কাউন্সিল; ফেস্টুন; ফ্যামিলি, ফিশফ্রাই; ফেয়ার; ফুড; ফার্স্ট; হোম; হাউস; হাট; হেক্টর; ইঞ্জেকশন; লাঞ্চ; লঞ্চ; ল্যাবরেটরি; মীটার; অপারেশন; পেশেন্ট; পার্ক; পাওয়ার; শ্যাম্পু; স্নো; সারভেন্ট; স্টাফ; সোফা; সুইচ; টীচার; থার্ড; ট্র্যাকটর; ইউনিভাসিটি; এক্স-রে।

এরূপ শত শত ইংবেজী শব্দ আমরা ব্যবহার করি কিন্তু অভিধানে স্থান পায়নি। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন কোন ভাষা থেকে এটি এসেছে, এর প্রকৃত রূপ ও বানান কী। এইজনাই আমাদের প্রতিটি অভিধানই অসম্পূর্ণ। ইংবেজী ভাষায কি কি ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে তার অভিধান আছে; কিন্তু যে সব ইংরেজী শব্দ বাঙালীর জীবনে সর্বদা ব্যবহৃত হয় তার কোনো তালিকা নেই। থাকলে অভিধান-সঙ্কলকের পক্ষে সুবিধা হত। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে যিনি অভিধান সঙ্কলন করেন তিনি সম্পৃক্ত শব্দগুলি সম্বন্ধে উদাসীন। যেমন—'ডিনার' শব্দটি আছে কিন্তু 'ব্রেকফাস্ট' ও 'লাঞ্চ' শব্দদুটি অনুপস্থিত। মূল কথা হল কাংলা অভিধান একটি আরেকটির সামান্য অদলবদল করে নকলমাত্র। এইজন্যই নতুন শব্দ অভিধানে বড় একটা যোগ করা হয় না।

ইংরেজী শব্দ ছাড়া বাঙালী মুসলমান সমাজে এমন অনেক শব্দ প্রচলিত আছে যারা বাংলা অভিধানে স্থান পায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানী শব্দের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তিও দেখা যায়। যেমন আরবী শব্দ 'খালা' অর্থ একটি অভিধানে দেওয়া হয়েছে 'মাসীমা'; আর একটি অভিধানে 'খালা'-র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'মেসোমশাই'।

এছাড়া গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে অসংখ্য শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অভিধানে স্থান পায়নি। এখানে আঞ্চলিক শব্দের কথা বলা হচ্ছে না, যে সব শব্দ সাধারণত সব অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয় এরকম শব্দের কথাই বলা হচ্ছে।

শুধু যে প্রচলিত শব্দই অভিধানকার অন্তর্ভুক্তির জন্য বিচার করবেন তা নয়, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাধরনের নতুন শব্দ সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। যেমন ধরা যাক, মেয়েদের পূর্বে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হত—কুমারী, সধবা এবং বিধবা। এখন আরেক শ্রেণীর নারী সমাজে বাস করে, যারা হল 'ডিভোর্সী'। এই শ্রেণীর জন্য সহজেই একটি বাংলা শব্দ অভিধানে স্থান পেতে পারে।

বাংলা অভিধান সঙ্কলনে কেউ কেউ উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবে এবং বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কী ধরনের অভিধান সঙ্কলন করা সম্ভব তা বিবেচনা না করায় তাদের সাফল্য অনিশ্চিত হয়েছে। নতুন কিছু করার দিকেই উদ্যোক্তাদের ঝোঁক দেখা যায় বেশি। সাধারণ প্রকাশকের দ্বারা উন্নতমানের আধুনিক বাংলা অভিধান সঙ্কলন করা সঠিক কাজ। প্রধান বাধা দীর্ঘসময় এবং উপযুক্ত অর্থের সরবরাহ। এজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তারও আগে চাই একটি পূর্ণাঙ্গ এবং আধুনিক কালের উপযোগী অভিধানের জন্য অভাববোধ যা শিক্ষিত লোকের মনে একটি আদর্শ অভিধান সঙ্কলনের জন্য সক্রিয় আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলা অভিধানে সংকট

মনিরুজ্জামান

শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সন্ধান এবং শব্দ সংকলন মানুষের একটি অন্যতম প্রাচীন অভ্যাস। লেখ্য ভাষা ব্যবহারের ইতিহাসে তা চিরকালই নতুন মাইলস্টোনের সূচক। জানা যায়, অভিধানের কথা মানুষ হোমারের কাল থেকেই চিন্তা করে আসছে। ইলিয়াড-ওডেসির দুর্বোধ্য ও বিশেষ ধরনের শব্দাবলীর সংকলন দিয়ে হয়তো এর শুরু। আমাদের এই উপমহাদেশে প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বাদ দিলেও অমরসিংহের বয়স কি কম? আর চীন দেশেরও খ্যাতি এদিক থেকে বেশ প্রাচীন। মোট কথা, ভাষা শেখার জন্য, প্রতিশব্দ জানার জন্য এবং বানান ও শব্দরূপ বোঝার জন্য অভিধানের আবশ্যকতা যুগে যুগেই মানুষ অনুভব করেছে এবং এই চিন্তা থেকেই সে শব্দের বা শব্দরাশির আভিধানিক গড়ন আর অ-আভিধানিক বা অভিধান-অতিরিক্ত সত্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার মত সমস্যারও মুখোমুখি হয়েছে। অভিধান মানুষের বহু শতাব্দীর ভাষাব্যবহারের জ্ঞান ও অভিকৌশলের চিহ্নসমূহের ঐতিহাসিক ধারক। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে অভিধানে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের পরিচয় থাকলেও বর্তমান সময়ের শব্দকে সে কখনও স্পর্শ করতে বা গ্রহণ করতে পারে না। অভিধানের শব্দ সকল সময়ই ঐতিহাসিক, অসমকালীন, মৃত। তাই অভিধান পরবর্তী সময়ের অভিধানের অপেক্ষা করে বা সংস্করণকে অবধারিত করে। যেমন বৈদিক 'রোদসী' পর্যন্ত এসে সে থেমে থাকে না, অভিধান রাবীন্দ্রিক বা নজরুলীয় 'ক্রন্দসী'র দাবীসমূহও মেটাতে এগিয়ে যায় ('কাঁদে শোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে')।

অভিধানে অভিধানে শব্দের পরিচয় বা অর্থের মধ্যে কালের এবং সংস্কৃতির স্রোতসমূহের নানা ছাপ লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। এর একটি ধ্রুব উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে 'খুন' শব্দ নিয়ে সাহিত্যিক খুনাখুনির ঘটনা। ইংরেজী সাহিত্যেও এর নানা উদাহরণ পাওয়া যায়। 'স্টেলার জন্মদিনে' শীর্ষক এক কবিতায় জোনাথন সুইফ্‌ট্ এক বিখ্যাত চরণ সৃষ্টি করেছিলেন-'Stella is no Chicken'. পরবর্তীকালে এই শব্দের ব্যবহার বিষয়ে একজন সংকলক জরিপভিত্তিক তথ্য দিলেন যে, 'Call a Lady "a chicken" and ten to one she is angry. Tell her she is "no Chicken", and twenty to one she is still angrier.' 'চিকেন' বলে আহ্বান করাতে এক ভদ্রলোককে জেলে পুরতে চেয়েছিল এক তরুণী। কিন্তু আদালতে ভদ্রলোকটি নিজের সাফাই গেয়ে যখন বললেন, 'আমি তো শুধু হে নবীনা ('Hello, Chicken') বলেছি, অভিধান আমার সাক্ষী।' তখন বিচারক এক পুরনো জীর্ণ ছোট ওয়েবস্টার (অভিধান) খুঁজে পেতে দেখলেন, হ্যাঁ, 'চিকেন' মানে অনেক কিছুই, তবে ভদ্রলোকের অর্থটাও রয়েছে তো,- ' a young

woman'। মামলার ফল কি হয়েছিল আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু ছোট ওয়েবস্টার সংস্করণ আর ওয়েবস্টার IDEAL -এর তৃতীয় নব সংস্করণ কি একই কথা বলেছিল?

অভিধানের সংকট তো শুরু হয় এমনি করেই। (তু 'সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চেটো'- ঘনরাম)।

অভিধানের প্রধান লক্ষ্য অর্থ না শব্দ, বলা মুশকিল। কোন অভিধানে শব্দসংখ্যা কত এটা যেমন গুরুত্বের, তেমনি কোথায় অর্থ বা প্রতিশব্দ বেশী এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু প্রত্যেক অভিধানেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, সঙ্কটের প্রশ্নটি দেখা দেয় সেখানেই। দু'একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক।

বাংলা বানানে মুশকিল, মুষকিল ও মুসকিল (মুস্কিল) এই তিন-চার রীতিই দেখা যায়। চলন্তিকা-সংসদে শুধু প্রথম (শ-কার) বানানটিই দেখা যায়; ব্যবহারিক কোষ (ওদুদ)ও ব্যবহারিক অভিধানে (বা/এ) শ কার, স-কার এবং সংযুক্ত স্ক বানানও ব্যবহারিত হয়েছে, জ্ঞানেন্দ্রমোহনে ষ-কার দেখা যায়। সেখানে প্রথমে স-যুক্ত, পরে ষ-যুক্ত ও শেষে শ-যুক্ত বানান পরপর দেখানো হয়েছে, ব্যুৎপত্তিস্থলে ষ-এর ব্যবহার গৃহীত হয়েছে।

শব্দের ভুক্তির ক্ষেত্রে এই সমস্যার প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। ধরা যাক 'কয়তুন' শব্দটি। এটিও বিদেশী (তুর্কী) শব্দ। ঢাকা নবসিংদী এলাকায় (আদিয়াবাদ উপান্তীয় উপভাষায় বিশেষতঃ) এর উচ্চারণ 'কায়তন'। এর কাছাকাছি দুটো শব্দ আছে, যথা—মাছ ধরার পাকানো সুতো-'কর' ইং Cord। এবং সাধারণত কোমরে বা তাগায় ব্যবহৃত কালো রেশমী সুতো 'কার'। কোমরে ব্যবহৃত যে কোনও সুতোকে আবার 'বৈট্রা' (< বট + ইয়া) ও বলা হয়। অন্যান্য নাম চট্টগ্রামে 'কুনসি' এবং 'কদ্‌দুন' (আভিধানিক), নোয়াখালীতে 'মাঞ্জার কমার, কবার, বা কয়মার' রাজশাহী-মুর্শিদাবাদে 'কার' (< কাবি < কালি), চব্বিশ পরগণায় 'কাঁয়তি,' কাঁইতি ইত্যাদি। বিভিন্ন উপভাষায় এর নানারূপ ও নানা প্রতিশব্দ থাকলেও তার একটি সাধারণ পরিচিতি সর্বত্রই বর্তমান। কিন্তু অভিধানে 'কয়তুন'-জাত কোনও শব্দ ভুক্ত হয়নি কোথাও। সম্ভবত ভদ্র সংস্কৃতির সাথে এর মিল না থাকাই এর কারণ। সংস্কৃতির সংকট অভিধানে (ভাষার ভান্ডারস্থলে) সংক্রামিত হয়েছে এই ক্ষেত্রে।

আবার শব্দ ভুক্ত হলেও সমস্যার শেষ হয় না। এ প্রসঙ্গে আরও দু'একটি বিষয়ের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বাংলা একাডেমীর অভিধানে ('ব্যবহারিক') শব্দ যেভাবে ভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য অভিধানে যেভাবে সাজানো আছে, তার পার্থক্যের কারণে 'শব্দের' পরিচিতি কি রূপ নেয় এখানে তা বোঝা যাবে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ 'সপক্ষ' শব্দটি নেবো।

(১) **সংসদ অভিধান ঃ**

সপক্ষ ১-বিণ. পক্ষযুক্ত, ডানাওয়ালা। [সং সহ + পক্ষ]। বিঃ তা।

সপক্ষ ২-বিণ. এক পক্ষাবলম্বী; অনুকূল। [সং. সমান + পক্ষ]। বিঃ তা।

(২) **ব্যবহারিক শব্দকোষ ঃ**

সপক্ষ-[বহুব্রী] ণ. পাখাওয়ালা, ডানাবিশিষ্ট, একই দলভুক্ত, সমর্থক। (বিপ. বিপক্ষ)। সপক্ষীয়-ণ. নিজের পক্ষ।

(৩) **ব্যবহারিক অভিধান ঃ**

সপক্ষ-বিণ. নিজের পক্ষ সমর্থনকারী, পক্ষাবলম্বী (তিনি সব সময়ই তাহার

সপক্ষ)। ২ বিণ. ডানাওয়ালা (সপক্ষপাখি)। বিপ. বিপক্ষ।

সপক্ষতা-১ বি, পক্ষপাতিত্ব, পক্ষাবলম্বন। ২ বি. শাখার সহিত বিদ্যমানতা। [স]

আমরা লক্ষ্য করতে পারি, 'সংসদ' ও 'বাংলা একাডেমী' যেখানে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করছে, 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (২নং) সেখানে অর্থ ও পদ পরিচয়ে প্রাধান্য দিচ্ছে। শব্দের অন্যান্য রূপ নির্দেশেও তার লক্ষ্য। আবার ব্যুৎপত্তি নির্দেশে বাংলা একাডেমী (৩নং)-এর নীতি [স.] অপেক্ষা সংসদের ধরণটি স্পষ্ট ও বিবৃতিমূলক। শব্দের মূলের সাথে অর্থের সম্পর্ককে সেখানে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে। একাডেমী শব্দের 'ব্যবহার' (বন্ধনীতে) দেখিয়েছেন কিন্তু শব্দটির তৎসম মূলের প্রতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ব্যতীত আব কোনও তথ্য আমরা পাই না। এবং অনেক ক্ষেত্রে এই [স.] এর উল্লেখটুকুরও কার্পণ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন বকুনি, বাওটা, বাউলি, উদক, উদাত্ত, বেত, রিঠা ইত্যাদি অজস্র শব্দে। সেখানে মূল (root)- এর বা শব্দের শ্রেণীগত পরিচয়টি একেবারেই উহ্য থেকেছে।

শব্দের ভুক্তিতে আরও কয়েক প্রকার জটিলতা লক্ষ্য করা যায় অভিধানের সংকলন-প্রণালীর ভিন্নতার কারণে। এই ভিন্নতা বিশেষ শব্দে বা শব্দের প্রকৃতিতে ও ব্যবহার নির্দেশে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হবে তার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যবহারিক অভিধানটি থেকে আমরা তা নির্দেশ করতে পারি। এই অভিধানে ভুক্ত শব্দের অভাব, ব্যুৎপত্তির অভাব, ব্যুৎপত্তি নিশ্চয়তার অভাব, অপ্রচলিত শব্দের ভুক্তি, প্রচলিত অভিধানের অনুসরণ ক্ষেত্রে অসমনীতি, বানান-ভেদ বা বিতর্ক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা থেকে সমস্যাটি স্পষ্ট হতে পারে।

ক. যে শব্দ ভুক্ত হয়নি

ইদানীং কিছু শব্দ নতুন ব্যবহারে প্রচল হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ জাতিনাম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। অভিধানে সনাতন শব্দগুলির পাশে এ সবের ভুক্তি থাকা আবশ্যক। যেমন অসমীয়া, অহমিয়া অভিধানে চলে এসেছে। কিন্তু উড়িয়া, ওড়িয়া শব্দের পাশে ওড়িশা ও ওড়িশি শব্দ এখনও দেখা যায় না। ভরতনাট্যমের পাশে এখন ওড়িশি নৃত্যের কথা আসে। তাছাড়া 'উড়িয়া ভাষা' শব্দটি অপার্থক বিধায় 'ওড়িশি ভাষা' (যেমন আসামী ভাষা স্থলে অহমিয়া বা অহমীয়া ভাষা) বলাই উচিত।

কিছু শব্দে প্রাদেশিক চরিত্রের সম্প্রসার ঘটেছে। কাবাডি বা কবাডি শব্দটি যেমন। তেমনি 'বটুয়া' আগে ছোট মোটা শনের থলে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। এটিও মূলত হিন্দুস্থানী শব্দ (হিন্দী, ওড়িশি প্রভৃতি)। পূর্ব বাংলায় বহুস্থানে কোমরের সুতাকে 'বৈট্টা' বা 'বৈট্টা সুতা' বলে। এর উৎপত্তিমূলে 'বট' শব্দটি সংস্কৃতজ। এই শব্দ অথবা 'বট' শব্দের প্রত্যয়ান্তক কোনওরূপ অভিধানে নেই, এমনকি 'বট' শব্দভুক্তিতে 'শণ (সূত্র)' অর্থটিও দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারে সনাতন অভিধানগুলিতেও সুস্পষ্টতা নেই। বাংলাদেশে শব্দটি অপরিচিত নয়, অতএব এটি থাকা উচিত। ব্যবহারিক অভিধানে (বা/এ) বহু অপ্রচলিত শব্দ ও তার ব্যুৎপত্তি, প্রাদেশিক শব্দ [আইন্ডা, কাইট, কাতি, কুক, কেশেল, বীরখন্ডী, নাইয়র, মরিয়াদ] ইত্যাদি আছে, সেইদিক থেকে এই শব্দটিরও ভুক্তি কাম্য।

এই অভিধানে 'বগল' অর্থে 'কাঁখতলি' গৃহীত হলেও স্বতন্ত্র ভুক্তি নেই। কিন্তু কাঁখতলি এবং

কাঁখতলী শব্দভুক্তি আছে। এই বিভ্রান্তি বিদূরণ আবশ্যক। তবে একেবারেই অ-ভুক্ত আর কয়েকটি শব্দ হচ্ছে, সন্ধিনী [অকাল দুগ্ধা গোবী], নাসীর [অগ্রগামী সৈন্য], নির্মন্থ্য [অরণি] এবং এইরূপ নীরেন্দ্র, নাহিরাজি, থাপন, থালকুড়ি [থানকুঁড়ির সাথে], ছ্যাঁচড়া [যথা, 'বিশাল কড়ায় ছ্যাঁচড়া চেপেছে'-সঞ্জয়; জ্ঞানেন্দ্রমোহনে 'ছেঁচড়া' ভুক্তশব্দের ৪র্থ অর্থ: 'মৎস্য ও বিবিধ শাক সব্জী মিশ্রিত ব্যঞ্জন বিঃ, ইহাতে তেলের ভাগ বেশী থাকায় সচরাচর তেলের তরকারীও বলা হয়'।]. গুণ (চটের থলি অর্থে লেখা হয়;-এটি প্রাকৃত শব্দ কিন্তু অভিধানে আছে [গোণী স], এবং একই সাথে ইংরেজী gunny শব্দের সাথে সম্পর্কিত বলেও ইঙ্গিত করা আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দু'টো শব্দকে আলাদা আলাদা ভুক্ত করেছেন এবং পারজিটার সাহেব ১৯২৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকাব সপ্তম খন্ডে ৩৫১ পৃষ্ঠায় 'গুন' বানানকে erroneous বলে নির্দেশ করেছিলেন) ইত্যাদি।

খ. যে সব শব্দে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ হয়নি অথবা নিশ্চয়তার অভাব

শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন এই জন্য যে নচেৎ এর বানান ও ব্যবহার নিয়ে সংকট দেখা দিতে পারে। এনামুল হক সাহেব দেখিয়েছেন, বানান-বৈষম্যের দরুণ 'বিদেশীয়গণ শিক্ষা করিতে পারেন না' এবং শ্রীনাথ সেন মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কথিত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, ব্যুৎপত্তি বানানকে নিশ্চয়তা দেয়'।

কিন্তু সংকটেব মূলই সেখানে। 'বানান' শব্দটির বানান নিয়ে পণ্ডিতগণেব মধ্যে মতভেদ আছে। এখনও অনেকে 'বাণান' লেখেন যেহেতু 'বর্ণন' কথাটি শুদ্ধ ও সংস্কৃত। কিন্তু 'বানান' শব্দটিতে 'ণ' (মূর্ধন্য ণ) না থাকাব কারণ ব্যবহারিক অভিধানে পাওয়া যায় না, যদিও একে সংস্কৃতমূল বা তৎসম শব্দই বলা হয়েছে। সংস্কৃতের 'ণ' প্রাকৃত স্তরেই দন্ত-নরূপ পায় এবং 'বন্নান' শব্দটি সৃষ্টি হয়। 'বানান' আসলে এই 'বন্নান' জাত প্রাকৃত রূপ। এইরূপে অভিধানে আক্রা, কাইট, কুড়বা প্রভৃতি শব্দ অর্ধ তৎসম; কেউর, গুণ, কাঞ্চা প্রভৃতি প্রাকৃতজাত এবং [স] চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ব্যুৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের (যেমন হয়েছে অঙ্ক, অঙ্কুট, অঙ্কুর, অংগুলি, অংস প্রভৃতি কিংবা আশা, আশ্রম কিংবা একর, কবিবাজ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের ক্ষেত্রে) শ্রেণীপরিচয় বা ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু যখন দেখি 'এক' শব্দের ক্ষেত্রে ফার্সী [য়ক্], 'এঁটো' শব্দ মূলে তারকা চিহ্নিত [* অন্টিকা], 'দেড়' শব্দ মূলে সংস্কৃত [দ্ব্যর্ধ] ইত্যাদি তখন ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর দেওয়া ব্যুৎপত্তি বা তাঁর আলোচনা বিষয়ে হতচকিত হতে হয়। 'ঘুষ' সংস্কৃত শব্দ হিসাবে অর্থ হয় 'বধ করা', অপার্থ, 'প্রতিকূলতা বন্ধ করা'। আলোচ্য অভিধানে এইশব্দে শুধু সংস্কৃত মূল দেখানো হয়েছে। মূল অর্থ ধারণা করা এখানে সম্ভব নয়। তেমনি 'দ্ব্যর্ধ' শব্দটিও সংস্কৃত বটে, কিন্তু সংস্কৃত রূপের র্ধ >ড় এই পরিবর্ত বোঝা এখানে সম্ভব নয়।- অশোকলিপির [দিঅর] শব্দের পূর্বেই যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, এটা বোঝা যায়। সুকুমার সেন 'দ্ব্যর্ধ' গ্রহণ করেননি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন সম্ভাব্য দুটি সূত্র দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও 'দ্ব্যর্ধ' গ্রহণ করেননি। ডঃ শহীদুল্লাহ্ এই শব্দ গ্রহণ করেন বা কল্পনা করেন এবং তার বিবর্তন ইতিহাস ভিন্নভাবে বর্ণনা করে দেখান।

গ. দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক মূল শব্দের পরিচয়-ভ্রান্তি

কয়েকটি শব্দের উৎসমূল ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ইদানীং কিছু বিতর্ক দেখা দিচ্ছে, সেগুলির কয়েকটি সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা যায়। নীল, খন্দ, দড়ি, কাউয়া (কাক), কাবাডি. পান্ডু, মামা, মামড়ি

প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে সেগুলি খুব পরিচিত। অভিধানে সংস্কৃত শব্দ হিসাবে আছে নীল, দড়ি, কাউয়া, পাণ্ডু; হিন্দী শব্দ হিসাবে আছে কাবাড়ি, মামা। এছাড়া খন্দ শব্দটিকে বলা হয়েছে ফারসী (এবং 'ফসল' এই অর্থে সংস্কৃত) ও 'মামড়ি' শব্দটি সম্পর্কে ব্যবহারিকে কিছু বলা নেই তবে সংসদে 'প্রশ্নচিহ্ন'(?) এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে 'মাড়' < 'মন্ড' জাত অথবা 'মর্ম্মর' জাত শব্দ বলে ইঙ্গিত আছে। মোট কথা, এই শব্দগুলির উৎস নিয়ে হেঁয়ালি আছে।

আমরা জানি 'নীল' ওই বর্ণ (রং) শব্দটি আরবী এবং দ্রাবিড় ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী কিংবা প্রত্ন-সেমীয় ভাষার সাথে দ্রাবিড়ি ভাষার সংযোগের কথা এখন জানা যাচ্ছে। দ্রাবিড় ভাষায় প্রায় হাজার শব্দের মধ্যে শুধু প্রভাবজাতরূপ নয়, ঐক্য লক্ষ্য করেছিলেন ফরাসী পাদ্রী ফাদার লাহরী। ড. রজেটও প্রায় অনুরূপ শব্দের পারস্পরিক অনুকরণ (mimation) লক্ষ্য করেন। পি. এম. আবদুর রহমান মালায়ালম ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় ৩০০০ তিন হাজার আরবী শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পান। আদালত, নজর, মুনসিফ, চালান, আসল, আমীন, বাজী, হাজার, সনদ প্রভৃতি তো আছেই, গোপীয়ম (গায়বী), তাপম (তৌবা) ঔরাসম (আওরাৎ), ওইপথ (ওয়াফৎ), দ্রাবিয়স (দিরহাম), বাক্কী (বাকী), কলয়ুক (হলক) প্রভৃতিও আছে। এমনকি 'তাকওয়া' অর্থে ভক্তি, এবং 'আরাম' বা 'ইরম' এর উল্টো 'রাম' শব্দ মূল ধরে জ্বরজারি বা অসুস্থতা অর্থে এরা শব্দ তৈরী করে নিয়েছে বা প্রচলিত শব্দের নতুন অর্থারোপ করেছে, যথাক্রমে 'ভক্তি', 'মারুক' ইত্যাদি। 'সমুদ্র' অর্থে আ. 'বাহারূ'র স্থানীয় উচ্চারণ 'পাড়াব'।

একই ভাবে আরবী নীল্ একাধিক দ্রাবিড় ভাষায় নীঃলা রূপে ব্যবহৃত হয। সংস্কৃত নীল (এবং নীলকান্তমণি, নীলকণ্ঠ, নীলমণি, নীললোহিত, নীলকমল ইত্যাদি) শব্দটি যে বরণ করে নেওয়া শব্দ নয় (যথা বীর নীল, নীলাচল ইত্যাদি) তার নিশ্চয়তা কি? অন্ততঃ দ্রাবিড় সূত্রটি এক্ষেত্রে যে নতুন চিন্তার উদ্রেক করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এইভাবে দড়ি < মালতো, দওড়া। কাউয়া (প্রচলিত হিন্দি, কৌয়া, অথবা স.কাক + বাং.উয়া = কাকুয়া > কাউয়া) < দ্রাবিড়. কাক্কো, আরবী. qaqa: (উল্লেখ্য, প্রান্তীয় দ্রাবিড়েরা আজও কাককে 'কাআটি' বলে)। কবাডি (প্রচলিত < হি. কবড্ডী) < তামিল ও কানাড়া, ক'আটি বা কবাটি। খন্দ <মালপাহাড়িয়া, (জাতিনাম; অনেকের মতে ইংরেজ প্রদত্ত নাম), তবে এই নামে একটি আদি জনগোষ্ঠীও রয়েছে (অস্ট্রিক) এবং পুরুলিয়ায় 'খোন্ড' নামে একটি দ্রাবিড়বংশীয় জনপদের অস্তিত্ব বর্তমান। অনুরূপ অপর শব্দ 'পাণ্ডু'। কোলবর্গীয় ভাষায় পান্ডৌ অর্থ 'হলুদ' বা 'ধূসর'। এই শব্দজাত পোড়েত্তো >বাং, পন্ডিত হওয়া বিচিত্র নয়। আত্মীয় শব্দ বাবা, মামা, কাকা, কাকী ইত্যাদি কৃতঋণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

অথচ মউ(খালা), মগড়ু (স্বামী), পুয়া (পিলা), কোড়া (কোলের সন্তান), খোআ (খোকা), খুই (খুকী), ডাংরী (গাই) প্রভৃতি শব্দ কোল-মুন্ডা ভাষায় দেখা যায়, তেমনি, কাকী, কাকা দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এমনকি গৃহপালিত পশু-পাখিরও বহু নাম যথা-ময়ূর (কোল), কুরা (মালতো ইঃ কো-ও-ড়ি, অর্থ মুরগী), বিলাই (< বিলাল; দ্রাবিড়জ মান্দলা উপভাষা, অর্থ 'বিড়াল'), এবং স্ত্রী অর্থে মাঙ্-কি = মাগী (মালতো), নাঙ্ = লাঙ্ (খুমী), লাঙ্গল (ঐ)। তেমনি খাদ্য ও ফলের মধ্যে পটল, পনশ (দ্রাবিড়), উপাসনাক্ষেত্রে পূজা (দ্রাবিড়), আবাসস্থল পুরী (পুরম, দ্রাবিড়) প্রভৃতিও বিশেষ লক্ষণীয়। এদেশে গৃহস্থরা স্বচ্ছল ও স্বনির্ভর ছিল বিধায় গ্রামে ফেরী করে পানগুয়া বা তেল বিক্রি করা পছন্দ করতো না। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়জাতির তামিল ও তেলুগুরা এইরূপ বাণিজ্য

করতো, এজন্য তাদের নাম হয় যথাক্রমে তাম্বলি ও তিলি। বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায় পণরি বা পণ্যবিক্রেতাদের কোনও আদর ছিল না। মধ্যযুগে বাংলাদেশে এই 'তিলি-তামলি' ও 'বারুই'দের অস্তিত্ব সাধারণ হয়ে ওঠে। সুহৃদকুমার ভৌমিক এদের তামিল-তেলেঙ্গানা দেশাগত বলে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব দৃষ্টে আমাদের অভিধানে উক্ত শব্দসমূহ ও সমরূপ অন্যান্য শব্দের ভুক্তি ও তার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নতুন চিন্তার সংযোগ ঘটবে, আমরা এ প্রত্যাশা করি। বাংলা একাডেমীর ও সমতুল্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় সমাগত। লাঙল, তাম্বূল, গাজর, বরোজ, বারুই, পাটন বা পাটনা প্রভৃতি শব্দ মূল-নির্দেশ ক্ষেত্রে সনাতন ধারণা নিয়ে অভিধানে স্থান করে আছে। প্রাচীন সংস্কৃত বা সংস্কৃত আদর্শিক শব্দসংকলন সমূহই এজন্য দায়ী। আমাদের প্রতিবেশী ভাষাগুলি সম্পর্কে, অর্থাৎ অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনী ভাষা বংশগুলি সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট ধারণাই অভিধানে এই অশনি সংকেতেব কারণ ('পরিশিষ্ট' অংশ দ্রষ্টব্য)।

ঘ. নামশব্দ নির্দেশ

অভিধানে আরও বিশেষ ধবণের সমস্যা আছে। স্থান ও জাতি বিষয়ক শব্দেব ক্ষেত্রে নির্বাচনেব কোনও সীমা নেই। ফলে হয়তো 'ব্রহ্মদেশ' থাকে, কিন্তু 'রোসাঙ্গ' বা 'রেঙ্গুন' থাকে না। অথচ বাংলা সাহিত্যে এসব শব্দ বহুবার এসেছে। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে রেঙ্গুন একটি বড় অধ্যায়। বহু বাঙালী পরিবারের ভাগ্যেব সাথে মহাযুদ্ধোত্তরকালে রেঙ্গুন জড়িয়ে ছিল। চট্টগামে 'রোয়াইঙ্গা' (< রোসাঙ্গ < রোসাং < ম্রোহ্যং) সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই রয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক নিজেই অন্যত্র এই শব্দটির মূল নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন রেঙ্গুনের স্থানীয় নাম 'দাগোন', উচ্চারণভেদে 'ইয়াঙ্গন' ('দ্বন্দ্বের শেষ')। সেই শব্দ ভেঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে 'রেঙ্গুন'। দক্ষিণ ভারত, মধ্য এশিয়া ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলেব বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ব্রহ্মদেশে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। মোন, কাবেন ও অন্যান্য জাতির সেই ইতিহাস এই শব্দে নিহিত। বাংলায় 'দাগণভূএগ' (নোয়াখালী -ফেনীর একটি থানার নাম) এ প্রসঙ্গে তুলনীয়।

একইভাবে **'মনক্ষেমের'**, **'ভোট-চীনা'** প্রভৃতি শব্দও অভিধানে অনুপস্থিত। আবার জাতি নাম হিসেবে কযাধু, কাওরা, ককচৌহান, আহীর, পান্ড্য প্রভৃতি নাম থাকলেও খেরোয়াঁল, হড় (হেরো), গন্ড, পান্ডু প্রভৃতি জাতি নামেব উল্লেখ নেই এবং 'মাল' শব্দের মূল সংস্কৃত দেখানো হযেছে, কেঁযো বা কাইয়াঁ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। দ্রাবিড়ীয় মাল (Mala), মালতো, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি এমনকি মেদিনীপুর, বীরভূমের কাক-মারা প্রভৃতি জাতি (আমাদের প্রতিবেশী); এরা কখনও স্বজাতির নাম আর্যদেব থেকে গ্রহণ করেনি, এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আলোচ্য অভিধানে একইভাবে 'বর্ণ' থাকলেও বর্ণাত্মক শ্রেণীর উল্লেখ নেই, তাই একবর্ণ, সমবর্ণ প্রভৃতি শব্দ ও অবর্ণ, সবর্ণ, বাহ্যবর্ণ, পঞ্চমবর্ণ প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'সংকর' থাকলেও সংকরের যে শ্রেণীভাগ ছিল তার উল্লেখ নেই, উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর প্রভৃতি এখন পারিভাষিক বা চিহ্নিত শব্দ হিসাবেই গণ্য হওয়া উচিত। 'কায়স্থ' বা 'কায়েত' শব্দেরও জাতি পাঁতি নির্দেশিত হওয়া আবশ্যক।

ঙ. দেশী শব্দ

অভিধানে অজ্ঞাত (দেশী), বাংলা (বাং.), প্রাদেশিক (প্রা.) মূল শব্দগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে

বিভ্রান্তিজনক। কিল, কুড়াল, খেঁকশিয়াল, খোট্টাই, খুঁটিনাটি, খচখচ, খুট, গন্ডারী (পাখি বিশেষ), ডাঁশা প্রভৃতি দেশী শব্দ। ওপরে (আগে) কাওরা, কবাডি, কায়েত, কাক, বিরাই প্রভৃতি শব্দ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে। অভিধানে প্রাদেশিক শব্দ হিসাবে দেখানো হয় উল ঝলুল বা উলুরি-ঝুলুরি, মেকুর (বিড়াল), বাট (এক কিতা জমি), বাইদ (বাদা জমি), গেঁতো (দীর্ঘসূত্রী), গাবুর (গাভুর) ইত্যাদি এবং বাংলা শব্দের উদাহরণ কড়া, কুয়াশা (কুয়াসা নয়, যদিও সমার্থক), কুক (কুক দেওয়া), গতে প্রভৃতি। ডিবা (কৌটা), তিলি (জাতি), তেলুগু (ভাষা) প্রভৃতি হয় হিন্দি অথবা সংস্কৃত বলা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও লাহিড়ীতে 'বারুই' এর বুৎপত্তি যথাক্রমে [স. বারুজীবী] এবং [স. বারকী] অথচ এসবই আর্য ভাষা বহির্ভূত। দেশী নামে শব্দসমূহের আসল পরিচয় অনুসন্ধান করাই হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ তামিল কানাড়া প্রভৃতিতে তৎসম তদ্ভব শব্দভাগসমূহ সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখা হয়। কানাড়াতে তৎসম-এর পরিবর্তে দু'টো শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা সংস্কৃতসম ও সমসংস্কৃত। এদের তাৎপর্য ভিন্ন। তামিলেও তৎসম ও তদ্ভবকে একটা মূল শ্রেণীবদ্ধ করে তার নাম দেওয়া হয় 'ভাটিভাষা' অর্থাৎ উত্তরাগত ভাষা। এই ভাষায় শব্দের ভাগ নিম্নরূপ, যথা ইয়ারচোল (বা স্থানীয়), তিরিচোল (বা সাহিত্যিক এবং প্রাচীন ও পূর্বঋণ), তিচাইচোল (বা সীমানা ও প্রান্ত-সংযোগী ভাষা) এবং ভাটাচোল (বা উত্তরের ভাষা)। অধিকাংশ ভাগের উপভাগও রয়েছে। ভাটাচোলও দুই প্রকার—তৎসম ও তদ্ভব। তারা এই শব্দই ব্যবহাব কবে। কিন্তু শব্দগত ধারণা, বিশেষতঃ নিজস্ব শব্দভান্ডার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। (দ্রষ্টব্য মনিরুজ্জামান ১৯৯৫)। বাংলাভাষায় এই সচেতনতার বড়ই অভাব। মূল বাংলাভাষাই অভিধানে অবহেলিত, এরা অন্ত্যজ ভাষা, অজ্ঞাতমূল, বর্জিতরূপ, প্রাদেশিক ইত্যাদি মাত্র। এই শব্দগুলি জাতে উঠবে কবে?

পরিশিষ্ট

কয়েকটি শব্দ : ঐতিহাসিক পরিস্থিতিমূলে

পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এখন তার শব্দাবলীর ঐতিহাসিক তথ্য জানা আর অসম্ভব কিছু নয়। এই উপমহাদেশে যে সব ভাষা প্রধান বলে গণ্য তাদের বিষয়েও বহু পন্ডিত (যেমন, টারনার, গ্রীয়ারসন, বীম্‌স্, ইমেন্যু, মেয়ারহোফার, কর্নেল যূলে ও বার্নেল, হবসন-জনসন প্রভৃতি) বহু তথ্য রেখে গেছেন। বাংলা ভাষা নিয়েও কেরী-ফরস্টার-পারজিটার-আপজন্ প্রভৃতি বা বাঙালীদের মধ্যে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর থেকে শুরু করে আধুনিক কালে হরিচরণ-জ্ঞানেন্দ্রমোহন-শহীদুল্লাহ সুকুমার সেন প্রভৃতি নানা জনের বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তবু শব্দ এলাকার বহু সমস্যা এখনও জট পাকিয়ে আছে, সে সবের আশু সমাধান প্রয়োজন। - - নবীনগরের নীলমাধব সেন পুনায় (পুণে) বসে সংস্কৃত অভিধান সম্পাদনায় যুক্ত থাকার মাঝে মাঝে বাংলা শব্দ নিয়েও কিছু কিছু কাজ করেছেন। এইভাবে আরও কেউ কেউ এখানে সেখানে অল্প বিস্তর নানা আলোচনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসব তথ্য একত্র করাব কাজ এখন বাকী। আগামী প্রজন্মের গবেষকগণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর কি? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি বর্তমান লেখক এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ভাষাবিদ রিচার্ড স্পাহ্‌র ব্যুৎপত্তি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তার দুচারটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে যে জিনিষটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল, সেখানে যে সব শব্দ স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই সংস্কৃতজাত বা 'তৎসম'। এই তৎসম-শব্দগুলিকে তদ্ভব-শব্দরাজি থেকে পৃথক করেই দেখানো হয়। ইদানীং 'তৎসম'-শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে দ্রাবিড়-ভারতে ও নানাস্থানে ভিন্ন মত পোষণের কথা শোনা যাচ্ছে। তেমনি আবার তদ্ভবের প্রসঙ্গেও পণ্ডিতগণের মনে নানা সংশয় দেখা দিচ্ছে। এ সবের একটা প্রধান কারণ হল এই যে, 'ভারতীয় শব্দ' এখন সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দ বলে পরিচিত হয়ে উঠলেও সংস্কৃত শব্দেব আগেও বহু শব্দ ছিল এবং সে সব শব্দ সমগ্রভারত আর্যীকরণের বহুপূর্বেই নানাভাবে প্রচলন লাভ করেছিল; সেসব শব্দের এখন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। কিন্তু 'তদ্ভব' আকারে রক্ষিত বহু শব্দের পেছনে অন্য ইতিহাসও গুপ্ত থাকা সম্ভব বলে ধারণা জাগে। এই ধারণা অমূলক নয়। এই কথা 'দেশী' শব্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমাদের আজ জানা নেই, হয়ত জানা সম্ভবও নয়, কবে থেকে এই 'দেশী' শব্দগুলি প্রচলিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি শব্দ বিশারদগণ 'শব্দ-পরিবার' (ওয়ার্ড-ফ্যামিলি), 'এশীয়শব্দ' (এশিয়াটিক ওয়ার্ডস) প্রভৃতি তত্ত্ব জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান বা প্রয়াসের ফলে কিছু কিছু নতুন তথ্যও আমাদের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছে। এটা শুভ লক্ষণ বৈ কি।

বর্তমান আলোচনা অত বিশদ ব্যাপাব নিয়ে নয়। আমরা এখানে কৃতঋণ শব্দের দু'একটা দিক বা তার বিবরণ উল্লেখ করবো মাত্র।

ভাষা-সংযোগের ফলেই ভাষায় শব্দ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নতুন শব্দ প্রবেশ লাভ করে। অবশ্য তার নানারকম প্রক্রিয়া থাকে। যাই হোক, আমাদেব শুধু দেখা দরকার এই প্রবেশী শব্দের কখনও কোনও প্রমাণ ছিল কিনা। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন বলেন বাংলা ভাষার সাথে মুন্ডা ভাষার বহু শব্দের গঠনগত ও ব্যাকরণগত মিল আছে, তখন বুঝি বাংলা ভাষাভাষীদের ইতিহাসের একটা পর্বে মুন্ডা ভাষাভাষীরাই নানা পরিবর্তন এবং আর্যীকরণের প্রক্রিযাব মধ্য দিয়ে বঙ্গভূমি এলাকায় বর্তমান পরিস্থিতিতে উপনীত হযেছে। এই কারণে বাংলাভাষা-দেহের উপবিকাঠামোতে বা স্তরে আর্য ভাষার মোটা প্রলেপ থাকলেও ভেতরের আস্তবণটি মুন্ডাচিত্রে পূর্ণ। কিন্তু সমস্যা সেখানেও। কারণ একক মুন্ডাপ্রভাবকে বা এককভাবে মুন্ডাভাষাব অবতলীয় অবস্থানকে মানা চলে না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, এমনকি সম্প্রতিকালেব এম. এইচ. ক্লেইমনের যুক্তিও একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। এসব নিয়ে যত দিন যাবে তত আলোচনাও বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। যাই হোক, আমাদের বক্তব্য ছিল যে আযভাষার সাথে দেশীয় ভাষাব সংযোগ ভারতেব সকল এলাকার ভাষাসমৃদ্ধির হেতু হলেও দেশীভাষাগুলিব মধ্যে যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটেনি, সেকথা মেনে নেওয়া চলে না। অতএব, এশীয় ভাষা হিসাবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানীয় ভাষার মধ্যে লেনদেন ঘটেছিল অনুমান করা যেতে পারে। এই যুক্তির সপক্ষে দু'একটা শব্দকে এখানে উপস্থাপিত করলে সমস্যাটির একটি চেহারা বোঝা যাবে।

ধরা যাক বাংলা 'লাঙল' শব্দটি। কৃষি সভ্যতার শব্দ। এটি কিন্তু একটি সন্দেহজনক কৃতঋণ শব্দ। এবং এর সূত্রটি সম্ভবত অস্ট্রিক। শব্দটি যে আর্যশব্দ হল তার কারণ 'প্রভাব' কিংবা সমধর্মীভাষা থেকে 'পুনঃঋণগ্রহণ' (ভাষা-সংযোগ)। একইরকম ঘটনা ঘটে থাকবে পানের সমার্থ শব্দ 'তাম্বূল'-এর ব্যাপারেও। শব্দটি প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে চর্যাপদে পাওয়া যায়। অবশ্য চর্যাপদে (নাসিক্য + ব্যঞ্জন) সংযুক্তশব্দ নেই এবং লিখিত রূপটি হল-'তাঁবুল'। সুকুমার সেন এই শব্দের একটি মধ্যযুগীয় রূপ পেয়েছেন-তাঁমুল্ল। এটি চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। টারনার সাহেব তাঁর

অভিধানে এর মূলরূপ 'তাম্বুলিকা'-র পূর্বভারতীয় ব্যবহারী রূপ বলে মনে করেছেন এই শব্দটিকে। কিন্তু বাংলা অভিধানের মতে এটি তদ্ভব শব্দ।

'তাম্বুল'-এর সাথে আর একটি পূর্বদেশজ শব্দের প্রাসঙ্গিক যোগের কথা বলে প্রসঙ্গটি শেষ করতে চাই। পান যেখানে হয়, তার নাম 'বরোজ'। এর মূল শব্দটিও কৃতঋণশব্দ। শব্দটি অবশ্যই অস্ট্রিকভাষা থেকে সরাসরি এসেছে। অথচ আববী ভাষায় 'বুর্জ'-এর সাথে এর মিল ষোল আনা। যেমন ফার্সি, 'গাজর', প্রাকৃত 'গজ্জর'-এবং সংস্কৃত 'গর্জরম্'-এর মধ্যে মিল খুবই জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যাই হোক, নানা অভিধানে এতৎসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ 'বরোজ' বা 'বরজ'-এর আরও যে ক'টি শব্দ দেখি সেগুলি হচ্ছে,— বরু, বারই, বারুজীবিন, বারুই, বারু, বরজা প্রভৃতি। এই এত বৈচিত্র্য বা শব্দরূপের এই ভিন্নতা আসলে প্রাচ্য দেশীয় ভাষা-বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ মাত্র। বহুভাষাবিদ ডঃ স্পাহ্‌র আমাকে জানিয়েছেন এবং আমাদের যৌথ প্রবন্ধে ('তথ্যসূত্র' দ্রষ্টব্য) আমরা বলেছি যে এই শব্দগুলি একই সূত্র থেকে আগত এবং বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে প্রবিষ্ট বা ঋণকৃত। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ভাষাতত্ত্বের এ এক বিচিত্র সমস্যা। এই বাংলাশব্দগুলিকে একটি 'শব্দ-পরিবার' যদি ভাবা যায়, তাহলেও গোড়ায় গিয়ে দেখবো পানের আবাদ-ই হচ্ছে এই শব্দের বিস্তারের হেতু।

কৃষিসভ্যতার কাছে আবারও আমাদের এই ঋণ!

বাংলা বানানের ভূত-ভবিষ্যৎ

সুভাষ ভট্টাচার্য

বাংলা বানান সমস্যার সেকাল ও একাল

মুদ্রণযন্ত্র উদ্‌ভাবিত হওয়ার আগে দীর্ঘকাল ধরে বাংলায যাবতীয় গ্রন্থাদি হাতে-লেখা পুঁথিতে ধরে রাখা ছিল। এবং বলাবাহুল্য সেসব পুঁথিতে যে-বানান অনুসবণ করা হত তাতে একদিকে যেমন লিপিকরের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও রুচির প্রতিফলন দেখা যেত, অন্যদিকে তেমনি সেই সময়ের বানান রীতিরও আঁচ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থদুখানিব পুঁথিতে যে-বানান পাই তাতে বহু শব্দকে প্রায় চেনাই যায় না। ইস্বর, মহেস্বব, সিদ্ধ, স্ত্রীষ্টী, প্রীথুবি, পাত্তী, জানীআঁ, ভাঙ্গীল, জোজন, জৌবন, স্বাস্তী প্রভৃতি বানানেব দেখা প্রাযই মেলে।· লক্ষ করবার বিষয় এই যে কোনো কোনো শব্দের বানানে বিভিন্নতাও ছিল। এইসব বানানেব মধ্যে উচ্চারণকে অনুসরণের একটা প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। আবাব উচ্চারণেব মধ্যে ব্যক্তিভেদে এবং অঞ্চলভেদে যে পার্থক্য অনিবার্য তারও প্রতিফলন মাঝেমাঝেই বানানে এসে পড়ে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই প্রথম বাংলা বানানকে কিছুটা নিয়মে বাঁধবার একটা সচেতন চেষ্টা দেখা গেছে। হ্যালহেডেব ব্যাকরণ ছাপার প্রয়োজনে পঞ্চানন কর্মকার ও উইলকিনস যখন বাংলা বর্ণমালার টাইপ ছাঁচে ঢালেন তখন থেকেই বাংলা বানানে কিছুটা সুস্থিতি আসে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে বানানে বিশৃঙ্খলা পুরোপুরি চলে গেল। বিশৃঙ্খলা যথেষ্টই বইল তখনও। উনিশ শতকেব প্রথমার্ধের বাংলা বানান অনেকটাই অনিরূপিত ছিল। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কেরির 'ইতিহাসমালা' ও 'কথোপকথন' প্রভৃতি বইযে ওপস্থিত, রখ্যা, যুর্ধ, পরুস্কার, রোদোন, কারোণ এইসব বানান দেখতে পাই। এমনকী 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচাব নক্সা'-য বহু তৎসম শব্দেব ভুল রূপ বা ভুল বানান দেখতে পাওয়া যাবে—সাহার্য্য, সমভ্যারে, কিম্বা, সম্বৎসর এসব বানান যথেষ্টই চালু ছিল। অসংস্কৃত পদের বানানেও বিভ্রান্তি ছিল—মায়্যা (মেয়ে), মদ্যে (মধ্যে), টীফিন, উলট্যা (উলটিয়া)। বিদেশী শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকরণের কোনো নির্ধারিত চেহারা ছিল না। ডেবিড হের (Da..d Hare) প্রতিবর্ণীকরণে যদি-বা কিছুটা উচ্চারণানুগত্যের নমুনা থাকে, সুপ্রেমকোর্ট ‘ বানানে সেকথা বলা যাবে না নিশ্চয়।

এমনকী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে রামমোহন রায় পর্যন্তও বানানে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা কিছুমাত্র কম ছিল না। উইলিয়াম কেরির মধ্যে বানান বিষয়ে যে সচেতনতা, সতর্কতা ও চিন্তার

পরিচয় পাওয়া যায়, রামমোহনে ততটা যেন ছিল না।[৩] এও বিস্ময়কর। কেননা বাংলা ভাষার, বিশেষত বাংলা গদ্যের, অগ্রগতিতে রামমোহনের ভূমিকা কারও অজানা নয়। এই সময়টা পেরিয়ে এসে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত লেখকদের গদ্যরচনা দেখলে বোঝা যায় যে বানান তখন অনেকটাই নিরূপিত হয়ে গেছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা বানান মোটামুটিভাবে একটা শক্ত জমিতে দাঁড়াতে পেরেছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিলতা, বিভিন্নতা এবং অসংগতি তখন ছিল না। এই সময়সীমাটাকে মোটামুটি ষাট-সত্তর বছর ধরে নিয়ে দেখানো যেতে পারে তখনকার বানানের বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন ছিল।

এই সময়ে প্রথমত, সমস্ত তৎসম শব্দ প্রায় হুবহু সংস্কৃতের নিয়মে বান্‌ান করা হত। তফাত এই যে সংস্কৃত শব্দ নাগরী লিপিতে লেখা হত আর বাংলা শব্দ বাংলা লিপিতে। আর যা তফাত তা হল ত্‌ এবং ৎ এর। সংস্কৃতে যা ভর্ত্‌সনা বাংলায় তা ভর্ৎসনা, সংস্কৃতে যা কৃত্‌, তাই বাংলা কৃৎ। তখনকার সমস্ত তৎসম শব্দের মধ্যের ও শেষের বিসর্গ বজায় থাকত। বাংলায় বিসর্গ বর্জনের প্রশ্নই ছিল না—ইতস্ততঃ, অংশতঃ, আপাততঃ। তৎসম শব্দে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব তখন রীতিমতো প্রচলিত ছিল। আজ আমরা জানি এই দ্বিত্ব বর্জনের বিকল্প ব্যবস্থা সংস্কৃত ব্যাকরণেই আছে। তবু সেকালে ওই দ্বিত্ব বর্জিত হত না—পূর্ব্ব, কার্য্য, মূর্চ্ছা, কর্ত্তৃকারক, আর্য্য, অর্দ্ধ, বর্দ্ধমান। তৎসম শব্দের ভিতরে ও শেষে হস্‌চিহ্নও বজায় রাখা হত সংস্কৃত নিয়ম মেনেই—পৃথক্‌, সম্রাট্‌, বিরাট্‌, ষড়্‌যন্ত্র, হনুমান্‌, শ্রীমান্‌। দ্বিতীয়ত, তদ্‌ভব শব্দে ব্যুৎপত্তিগত বানানই ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। অশীতি থেকে আশী, হস্তী থেকে হাতী, কুম্ভীর থেকে কুমীর, স্বর্ণ থেকে সোণা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, দেশী, তদ্‌ভব এবং অন্যান্য অসংস্কৃত শব্দে দীর্ঘ-ঈ এবং দীর্ঘ-ঊ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। মাটী, পাল্কী, ইংরাজী, রেশমী, পূব, পাখী, বাড়ী, দেরী, তৈয়ারী/ তৈরী, ঊনিশ, খুসী/ খুশী, সূতা, একটী, নজীর প্রভৃতি বানান লক্ষ করবার মতো। চতুর্থত, প্রায় সমস্ত অসংস্কৃত এমনকী বিদেশী শব্দেও ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান প্রয়োগের একটা প্রবণতাও এই সময়ের বানানরীতির বৈশিষ্ট্য। মেথরাণী, কেরাণী, চাকরাণী, ফাষ্ট ক্লাস, ষ্টোর, গভর্ণর/ গবর্ণর ইত্যাদি বানান তারই প্রমাণ। এইসব বানানে কোথাও কোথাও অযৌক্তিকতা ও অসংগতির অভিযোগ নিশ্চয় তোলা যায়। তবে একটা ব্যাপার বলতেই হবে। আজ চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বানানে যে বিভ্রান্তিকর বিভিন্নতা দেখি সেকালে তা মোটেই ছিল না। তখন যেতো/ যেত, করব/ করবো/ কোরবো এই রকমের বিভিন্নতা সম্ভব ছিল না। সাধুভাষার ক্রিয়াপদেব বানান একরকম নিরূপিতই হয়ে গিয়েছিল—যাইত, করিব, করিতেছিল, গিয়াছে এসব ক্রিয়ারূপের অন্য কোনো বানান বড়ো একটা দেখা যেত না।

বানান সংস্কারের উদ্যোগ এবং অতঃপর

সাধুভাষায় শব্দের বানানের একটা নিরূপিত চেহারা এসে গিয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই। আগেই বলেছি যে নিরূপিত হয়ে গেলেও তখনকার বানানও সর্ব্বৈব সংগত বা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু সেসব অসংগতি নিয়ে প্রতিবাদ বা উচ্চকিত সমালোচনাও তেমন শোনা যায়নি। গোল বাধল যখন বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ক্রমশ মৌখিক বাক্‌রীতি বাংলা গদ্যরীতিতে তার জায়গা করে নিতে শুরু করল। সাধু গদ্যের পাশাপাশি এসে গেল চলিত গদ্য যা

প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্ট কথ্য ভাষারই লিখিত রূপ। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় চলিত রীতি বাঙালির সাহিত্যে বেশ ভালোরকম প্রাধান্য পেতে শুরু করল। আর তার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে প্রচুর তদ্‌ভব, দেশী ও প্রতিবেশী ভাষার অতৎসম শব্দ সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেল। অথচ এইসব 'নবাগত' শব্দের বানান তখন নিরূপিত হয়ে যায়নি। উনিশ শতকে যেসব অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হত সেগুলোর বানান সেযুগের প্রথা বা সংস্কার অনুসারেই লেখা হত। অর্থাৎ দীর্ঘ-ঈ, দীর্ঘ-ঊ, মূর্ধন্য-ণ, মূর্ধন্য-ষ ইত্যাদি দিয়েই বেশির ভাগ অতৎসম শব্দের বানান লেখা হত। এখনও কি তাই অব্যাহত থাকবে? ভাষা যত মৌখিক রীতির কাছাকাছি আসবে ততই এসব প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেবে। এই শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে বানান নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায় এবং কিছুকালের মধ্যেই বিতর্কের তীব্রতা নানান সমস্যারও সৃষ্টি করতে থাকে। ত্রিশের দশকে গঠিত হয় বানান-সংস্কার সমিতি।[৪] ইতিমধ্যে যে পরিভাষা সমিতি গঠিত ছিল তাকেই প্রসারিত করে রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে বানান-সংস্কার সমিতি গঠন করা হল। সেকালের প্রায় সমস্ত পণ্ডিত ও ভাষাভাবুকই এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি লেখক ও পণ্ডিতের আলোচনার ফল পাওয়া গেল ১৯৩৬ সালের ৩১ মার্চ। প্রকাশিত হল ওই বানান সমিতির নিয়মাবলি। এখানে বানান-সংস্কার সমিতির সমস্ত নিয়মের বিবৃতি বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল দেখাব বানান-সংস্কার সমিতি বানান সমস্যার কোন দিকগুলোকে ধরবার চেষ্টা করেছে এবং তার ফলে বানান সমস্যার কোনো উল্লেখযোগ্য সুরাহা হয়েছিল কিনা।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি তখনকার বানান সমস্যার প্রায় সবগুলো দিককেই ধরবার চেষ্টা করেছে। তৎসম শব্দে রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের প্রশ্ন, বিসর্গান্ত পদের প্রশ্ন এবং হস্‌চিহ্নের প্রশ্ন সমিতির সুপারিশে অবহেলিত হয়নি। তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দে ই ঈ উ ঊ এর প্রশ্ন অনর্থক মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ-এর প্রশ্ন শ ষ স -এর প্রশ্ন এ সবই সেখানে যথোচিত গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে। তাই যদি হয় তবে আজও সমস্যা কেন এত? এখানেই আমরা অনিবার্যভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতির সুপারিশের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে চলে আসছি। রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন করে, তৎসম শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জন করে বানান সমিতি যেমন বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে ধরবার চেষ্টা করেছিল, তেমনি হসন্ত তৎসম শব্দের শেষে হস্‌চিহ্নকে বজায় রেখে খানিকটা পিছুও হটেছে বলতে হবে। বাংলাভাষায় ত্বক, দিক, সম্রাট, বিরাট প্রভৃতি শব্দের হস্‌চিহ্ন বর্জনের একটা প্রবণতা এসে গিয়েছিল তখনই। অসংস্কৃত শব্দে শ ষ স-এর কোনটি লেখা হবে সে সম্পর্কে সমিতির বিধান সমস্যার সুরাহা করতে পারেনি। তদ্‌ভব শব্দে মূল সংস্কৃতে কোনটি ছিল সেই অনুসারে লিখতে হবে এই ছিল বিধান। বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও তাই। এতে সমস্যা যে থেকেই গেল তা পরে দেখব আমরা। তাছাড়া তদ্‌ভব শব্দে হ্রস্ব-ই/ দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব-উ/ দীর্ঘ-ঊ দেবার বিকল্প ব্যবস্থাও কিছু সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি নিঃসন্দেহে কিছু সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল। যদিও কিছু সমস্যা থেকেও গিয়েছিল, তবু ওই সমিতির একটা বড়ো কৃতিত্ব এই যে পরবর্তী সময়ে বাংলা বানান সমস্যার সমাধানে যাঁরাই এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সবাইকেই কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতির সুপারিশ ও নিয়মগুলোকে সামনে রেখে আলোচনা করতে দেখি। লক্ষণীয় যে আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধানগুলিও পরিশিষ্টে ১৯৩৬ সালের ওই সুপারিশ বা নিয়মগুলিকেই বিবৃত করছে। এতেই বোঝা যায় সব সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও ওই সমিতি কতখানি সমীহ ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি কিছু-কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে নতুন নতুন সমস্যা তৈরিও হয়েছে। আমাদের এখন দেখতে হবে আজকের বানান সমস্যাটা ঠিক কী রকম।

আজকের বানানসমস্যার স্বরূপ

আজকের সমস্যাগুলোকে প্রথমেই দুইভাগে ভাগ করে ফেলা যায়, তৎসম শব্দের বানানের সমস্যা এবং অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, প্রতিবেশী ভাষার শব্দ ও বিদেশী ভাষার শব্দের বানানের সমস্যা। কারও কারও মনে হতে পারে যে তৎসম শব্দের বানানে তেমন সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাবে যে সমস্যা কিছু-কিছু ওই এলাকাতেও রয়েছে। সেগুলো এইরকম—(ক) বিসর্গের প্রশ্ন, (খ) হস্‌চিহ্নের প্রশ্ন, (গ) একই শব্দের দুটি বানান থাকলে তার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার প্রশ্ন, (ঘ) অনুস্বার ও ঙ-র প্রশ্ন, (ঙ) ইন্-ভাগান্ত শব্দের সমস্যা, (চ) যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা সংগত কিনা সেই প্রশ্ন। তদ্ভব শব্দ, প্রতিবেশী ভাষার শব্দ এবং বিদেশী শব্দের এলাকাতেও সমস্যার কিছু কমতি নেই। বরং সমস্যা এখানেই বেশি। যে সমস্ত সমস্যা এক সময় তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল অথচ এখন আদৌ তীব্র নয়, আমরা সেইসব সমস্যা আপাতত বিবেচনা করছি না। কিন্তু এখনও অন্তত চার-পাঁচটি প্রশ্নের সুরাহা করা যায়নি। (ক) সাধারণভাবে অতৎসম শব্দে, বিশেষত দেশী, তদ্ভব বা প্রতিবেশী ভাষার শব্দে হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ স্বীকৃত হলেও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে, ভাষাবাচক শব্দে এবং দেশবাচক বিশেষণে অনেকেই দীর্ঘ-ঈকার ব্যবহারের পক্ষপাতী। (খ) অতৎসম শব্দে ঙ এবং অনুস্বারের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেওয়া উচিত সে প্রশ্নও আছে। (গ) ক্রিয়াপদের বানানেও মতভেদ দেখা যায়। (ঘ) বিদেশী শব্দের বানানে মূলের উচ্চারণ অনুসরণ করব, না কি বাংলায় যেভাবে শব্দটি উচ্চারিত হয় তাকে অনুসরণ করব? এই প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোথায় শ এবং কোথায় স লেখা হবে? বিদেশী শব্দেও কি দীর্ঘ-ঈ/ দীর্ঘ-উ অব্যবহার্য? (ঙ) অতৎসম শব্দে যুক্তাক্ষর কি বর্জনীয়?

সংক্ষেপে এইগুলোই আজকের বাংলা বানানের প্রধান সমস্যা। বিতর্ক এগুলোকে ঘিরেই। সন্দেহ নেই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাহিত্য সংসদ বাংলা বানানে একরূপতা আনতে বা বিতর্কের এলাকাগুলোকে সংকীর্ণ করে আনতে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাতে কাজ যথেষ্টই এগিয়েছে। একথা বলতেই হবে যে বিতর্কের সম্পূর্ণ নিরসন করা না গেলেও বানানে জটিলতা ও বিতর্ক কমিয়ে আনা যে সম্ভব এইসব প্রতিষ্ঠানের আলোচনার ফলে সেই আশার সঞ্চার হয়েছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র মজুমদার, ক্ষুদিরাম দাস, পবিত্র সরকার, রমেন ভট্টাচার্য, অরুণ সেন প্রভৃতি ভাষাভাবুকের বানানচর্চারও উল্লেখ করতে হয়। এইসব প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা মনে রেখেই এবার আমরা দেখব আজকের এই সমস্যাগুলোর কোনো সমাধানসূত্র বার করা যায় কি না।

তৎসম শব্দের বানানসমস্যা

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি বিচার্য তা বিকল্প বানানের। একটি শব্দের দুটি বিকল্প বানান থাকলে কোনটি গ্রহণীয় বা সাধারণভাবে ব্যবহার্য সেই প্রশ্ন সচরাচর আলোচিত হয় না। কিন্তু প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরিক্ষ/ অন্তরীক্ষ, দারিদ্র/ দারিদ্র্য, সূচি/ সূচী, শ্রেণি/ শ্রেণী, সূরি/ সূরী, বেদি/ বেদী, তরি/ তরী, কিশলয়/ কিসলয়, নিশ্বাস/ নিঃশ্বাস, ধরনি/ ধরণী, নিস্পৃহ/ নিঃস্পৃহ এইসব শব্দের কোন বানানটি গ্রহণীয় এ প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়। এই যেসব বানানজোড় এদের মধ্যে হ্রস্ব ই/ দীর্ঘ-ঈ-যুক্ত শব্দগুলির দীর্ঘ-ঈ যুক্ত বানানই বেশি প্রচলিত, দন্ত্য-স ও তালব্য-শয়ের মধ্যে তালব্য-শ বেশি প্রচলিত, বিসর্গযুক্ত বানানের তুলনায় বিসর্গহীন বানান বর্তমানে বেশি প্রচলিত। তিন বা দুই শ বিকল্প হলে তালব্য-শ গৃহীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং যেহেতু কিসলয় বানানের চেয়ে কিশলয় বেশি প্রচলিত, তাই এক্ষত্রে সমস্যা নেই। বেদি, তরি, পদবি, সূচি, সূরি, শ্রেণি, অন্তরিক্ষ, ধরণি, অবনি এইসব শব্দের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় বেদী, তরী, সূচী, সূরী, শ্রেণী, অন্তরীক্ষ, ধরণী, অবনী এই বানানই প্রচলিত। অবশ্য সূচি, সূরি ইতিমধ্যে বেশ প্রচলিত হয়েছে এবং বেদি ও তরি কেউ কেউ লিখছেন। শঙ্খ ঘোষের আশঙ্কা এইসব শব্দকে ই-কারের চেহারায় নিয়ে যাবার ফলে আমবা নতুন কোনো বিশৃঙ্খলায় পৌঁছব না তো?[৫] এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেবার নয়। তবে যেহেতু অসংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-ই কারের প্রচলন এখন শুরু হয়ে গেছে সেইজন্য সংস্কৃত শব্দেও হ্রস্ব-ই কারের বিকল্প বিধান থাকলে তাকে স্বাগত জানানোই স্বাভাবিক।[৬] তাছাড়া কোনো-কোনো শব্দে হ্রস্ব-ই কারই এখন চালু হয়ে গেছে—যেমন উত্তরসূরি, সূচিপত্র। তাই যুক্তির দিক থেকে হ্রস্ব-ই কারের দাবিই জোরালো মনে হয়। একই যুক্তিতে দারিদ্র/ দারিদ্র্য, পাশ্চাত্য/ পাশ্চাত্ত্য এইসব শব্দে প্রথম বানানই গ্রহণীয় মনে করি। যদিও একথা মানতেই হবে যে বাংলা বানানের আলোচনায় এগুলো তেমন তীব্র সমস্যা তৈরি করে না।

তৎসম শব্দে হস্‌চিহ্ন ও বিসর্গের প্রশ্ন দুটিকে একসঙ্গে বিবেচনা করাই সুবিধাজনক। মণীন্দ্রকুমার ঘোষের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও একথা আজ মানতেই হবে যে শব্দের শেষের হস্‌চিহ্ন ও বিসর্গ প্রায় বর্জিত হয়ে গেছে। বিশেষত, প্রথমত, আপাতত, চক্ষু, জ্যোতি, সদ্য, মন, প্রাত, যশ .এইরকম শব্দগুলোকে এখন বিসর্গহীনভাবেই লেখা হয়। অনুরূপভাবে, বিরাট, সম্রাট, হনুমান, ভগবান, শ্রীমান, পৃথক, মহান, বুদ্ধিমান, বিপদ, আপদ, শক্তিমান, জ্ঞানবান এইরকম অজস্র হসন্ত শব্দকে এখন হস্‌বিহীন বানানেই লেখা হয়। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। কেউ কেউ নিশ্চয় উপরোক্ত শব্দগুলোতে বিসর্গ বা হস্‌চিহ্ন দেওয়ারই পক্ষপাতী। তবে একথা তর্কাতীত যে এঁদের সংখ্যা খুবই ক্ষীণ। কোনো এক বা দুই ব্যক্তির ইচ্ছায় নিশ্চয় এটা ঘটেনি। ধীরে ধীরে বাংলায় এই অন্ত্যবিসর্গ ও অন্ত্য হস্‌চিহ্ন খসে গেছে। ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতার ফলেই তা হয়েছে।

কিন্তু শব্দের ভিতরের হস্‌চিহ্ন ও বিসর্গ বর্জনের কথা প্রায় কেউই বলেন না। বাগ্‌দেবী, বাগ্‌ধারা, বাক্‌যুদ্ধ, বাক্‌স্বাধীনতা, বাঙ্‌ময়, দিক্‌চক্রবাল, দিক্‌পতি, হস্‌চিহ্ন, পঙ্‌ক্তি এইসব শব্দে হস্‌চিহ্ন বর্জিত হচ্ছে না। তেমনি, ধনুঃশর, প্রাতঃকৃত্য, মনঃক্ষুণ্ণ, অন্তঃকরণ, অতঃপর, মনঃকষ্ট, মনঃসহযোগ, অন্তঃপুর, প্রাতঃকাল, জ্যোতিঃপুঞ্জ, পয়ঃপ্রণালী, প্রাতঃস্মরণীয় প্রভৃতি শব্দের ভিতরের বিসর্গ বর্জনেরও প্রশ্ন নেই। তবে, সন্ধির নিয়মে যেখানে শব্দের ভিতরের বিসর্গ ও, র, শ প্রভৃতি রূপ পায় সেখানে কখনো-কখনো সংশয় দেখা দেয়। অর্থাৎ যত সহজে আমরা মনোযোগ, মনোনিবেশ, তপোবন, সদ্যোজাত, মনোবল, প্রাতরাশ, শিরোধার্য লিখছি, তত সহজে ছন্দোলিপি,

ছন্দোরূপ লেখা যাচ্ছে কি? আমরা লক্ষ করি যে যেসব শব্দ সমাসবদ্ধ বা সন্ধিবদ্ধভাবেই বাংলায় এসেছে সেগুলোর বেলায় বিসর্গ বা তার রূপান্তর বাংলাতেও চলে এসেছে। কিন্তু যেসব শব্দ পৃথক শব্দ হিসাবে বাংলায় এসেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বিসর্গের নিয়ম সর্বত্র পালিত হয় না। তাই ছন্দলিপি, ছন্দরূপ এভাবেও বাংলায় লেখা চলতে পারে। কিছু শব্দ বাংলামতে গঠিত হয়ে প্রচলিত হয়ে গেছে। যেমন মনান্তর, মনমরা, মনমাঝি। অবশ্য মনমরা ও মনমাঝি এই দুটি শব্দের দ্বিতীয় অংশ তৎসম নয়।

যুক্তাক্ষরযুক্ত তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা সংগত কি না এও এক প্রশ্ন। একথা ঠিক যে বানান সংস্কারের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি কেউই বড়ো-একটা তোলেন না। তবু মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নটি বেশ বড়ো হয়ে দেখা দেয়: উদ্বেগ/উদ্‌বেগ, বাগ্‌বিধি/বাগ্বিধি, দিগ্‌বলয়/দিগ্বলয়, দিগ্‌বিদিক/ দিগ্বিদিক, উদ্‌ধৃতি/ উদ্ধৃতি, পরাঙ্‌মুখ/পরাঙ্মুখ, পশ্চাদ্‌গামী/পশ্চাদ্গামী, খড়্‌গ/খড়্গ-- এইসব শব্দে একদা যুক্তাক্ষরযুক্ত বানানই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন ক্রমে যুক্তাক্ষর ভেঙেও লেখা হচ্ছে। ওভাবে লেখা কি অসংগত? প্রথমেই একথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এসব শব্দে যুক্তাক্ষর ভেঙে হস্‌চিহ্নযুক্ত বানান লেখা সংস্কৃতেও অলভ্য নয়।[1] অন্যদিকে মনিয়ের-উইলিযামস-এর অভিধানে এসব শব্দ যুক্তাক্ষর সহ মুদ্রিত রয়েছে। আমরা এখানে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত বোধহয় নিতে পারি। প্রথমত, উদ্(উৎ), সদ্(সৎ), দিক্ বা দিগ্, বাক্ বা বাগ্, এইসব উপসর্গ ও শব্দ প্রথম পদে বসে অন্য শব্দের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলে আমরা নিষ্পন্ন শব্দটিকে দুভাবেই লিখতে পারি। অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা অসংগত হবে না এক্ষেত্রে। এইভাবে, লিখতে পারি উদ্‌বেগ, উদ্‌গ্রীব, উদ্‌ধৃতি, উদ্‌বেল, উদ্‌বোধন, উদ্‌বাস্তু, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌যাপন, উদ্‌গত, উদ্‌গম। একইভাবে লেখা যাবে সদ্‌বংশ, সদ্‌ভাব, সদ্‌ব্যবহার, সদ্‌গতি, সদ্‌গুণ, সদ্‌বুদ্ধি। লেখা যাবে বাগ্‌ধারা, বাগ্‌দেবী, বাগ্‌বিধি, বাগ্‌বিস্তার, বাগ্‌যুদ্ধ। লেখা যাবে দিগ্‌বিদিক, দিগ্‌বসনা, দিগ্‌বিজয়, দিগ্‌ভ্রান্ত, দিগ্‌বধূ, দিগ্‌বালিকা। এসব ক্ষেত্রে হস্‌চিহ্ন কোনো মতেই বর্জন করা চলে না। দ্বিতীয়ত, নীতিগতভাবে একথা মেনে নেব যে যে-সমস্ত তৎসম শব্দ আমরা যুক্তাক্ষরসহই পেয়েছি সেগুলিকে ভেঙে লিখব না। ব্যাকরণগত দিক থেকে দণ্ড আর দণ্‌ড, মুক্তি আর মুক্‌তি, শক্তি আর শক্‌তি যদিও একই, তবু যেকোনো বা সব শব্দকে ভেঙে লেখা উচিতও নয় সম্ভবও নয়। কেননা, সহ্য, ঊহ্য, আহ্বান, দক্ষ, পক্ষ, বিদ্বান, বিদ্যা, সদ্য প্রভৃতি শব্দকে ভেঙে লিখতে গেলে তাদের চেহারাও শুধু বদলে যাবে না, নতুন একটা বিশৃঙ্খলার দরজাও বোধহয় খুলে যাবে। সহ্‌য (সহ্য), দক্‌ষ (দক্ষ), বিদ্‌বান (বিদ্বান), সদ্‌য (সদ্য) এসব বানানে চেনা শব্দগুলো সম্পূর্ণ অচেনা চেহারা নিয়ে হাজির হবে।

সবশেষে, ইন্-ভাগান্ত শব্দের বানান। অদ্যাবধি এই একটি ক্ষেত্রে কোনো সমাধানসূত্রই বেরিয়ে আসেনি। যাও-বা এসেছে তা নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। একথা সর্বজনবিদিত যে ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বাংলায় পৃথক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হলে প্রথমার এক বচনের রূপটি নেওয়া হয়। এইভাবে, গুণিন্ শব্দের গুণী, প্রাণিন্ শব্দের প্রাণী, কর্মিন শব্দের কর্মী, প্রতিদ্বন্দ্বিন্ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামিন্ শব্দের স্বামী, হস্তিন্ শব্দের হস্তী এইসব রূপ বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। তবে সন্ধিতে বা সমাসে বা প্রত্যয়ের বেলায় শব্দটির প্রাতিপদিক রূপটি নিয়ে তার সঙ্গে অন্য শব্দ বা প্রত্যয় যোগ করার রেওয়াজ দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল। এবং প্রাতিপদিক রূপটি যেহেতু ন্ পদে মূল শব্দরূপ অর্থাৎ প্রাণি, হস্তি, পক্ষি, গুণি, কর্মি, প্রতিদ্বন্দ্বি ইত্যাদি, তাই সন্ধিবদ্ধ, বা সমাসবদ্ধ বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলোতে হ্রস্ব ইকার থাকে। হস্তিশাবক, হস্তিমূর্খ, পক্ষিশাবক, স্বামিসেবা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৃতিত্ব, প্রতিযোগিতা,

কর্মিবৃন্দ, প্রাণিবিদ্যা। এই নিয়ম দীর্ঘকাল চললেও এখন প্রশ্ন উঠেছে-- কৃতী/কৃতিত্ব, প্রতিযোগী/প্রতিযোগিগণ, কর্মচারী/কর্মচারিবৃন্দ এই অসমতা কি চলতেই থাকবে? একটা বিষয়ে সম্ভবত তেমন মতভেদ নেই। সেটা এই যে ইন্‌ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে বাংলা বিভক্তিচিহ্ন যোগ হলে প্রাতিপাদক রূপের সঙ্গে যোগ করার প্রয়োজন নেই-- প্রতিযোগীদের, কর্মীরা, কর্মচারীরা। ইন্‌ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে সমাস হলে সংস্কৃত নিয়মে প্রথম পদটি অর্থাৎ ইন্‌ভাগান্ত শব্দটির প্রাতিপদিক রূপ অর্থাৎ হ্রস্ব ই কারান্ত রূপ গ্রহণ করার পক্ষপাতী একালেরও কেউ কেউ।[৮] অর্থাৎ যখন দুটি শব্দকে পৃথকভাবে লিখছি তখন একরকম, সমাস হলে অন্যরকম। পরবর্তিকাল, পরবর্তী সময়ে। এই অসুবিধা কাটাবার জন্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রস্তাব করেছিলেন যে ইন্‌ভাগান্ত শব্দগুলিকে যখন পৃথক শব্দ হিসাবে বাংলায় ব্যবহার করা হবে তখনও প্রাতিপদিক রূপটিকেই যদি নিই তাহলে সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়ে কোনো বিভিন্নতা দেখা দেবে না। অর্থাৎ পৃথক শব্দ হলে লিখব- পরবর্তি, গুণি, কর্মচারি, কৃতি, প্রতিযোগি, প্রতিদ্বন্দ্বি, প্রাণি, হস্তি ইত্যাদি। তাহলে সমাসে বা প্রত্যয় যোগ হলে এদের বানানে কোনো পরিবর্তন হবে না। পরবর্তিকাল, গুণিগণ, কর্মচারিবৃন্দ, কৃতিত্ব, প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। অর্থাৎ একবার দীর্ঘ-ঈ একবার হ্রস্বই এই দ্বৈধের দোলায় পাঠক-লেখককে আর দুলতে হবে না। মনে রাখতে হবে যে এতে ব্যাকরণ মার খাবে না। প্রাতিপদিক রূপটি আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকেই নিতে চাইছি। এই প্রস্তাব উপস্থিত আমাদের একমাত্র সমাধান বলে মনে হয়। কেবল দীর্ঘপ্রচলিত বানানকে বদলাতে হচ্ছে এটাই একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তো প্রচলনের গায়ে হাত পড়ছে। অনেক বানানই তো আমরা বদলাবার কথা বলছি। সংস্কার বা সমতা বিধান করতে গেলে কোথাও কোথাও প্রচলিত বানান বদলাবার প্রস্তাব করতে হতেই পারে। দীর্ঘ-প্রচলিত জিনিষ, ষ্টেশন, ষ্টোর, গভর্ণব, বাড়ী, কুমীর, কারিগরী, গরীব, চুণ, সরবত/ সরবৎ, কোম্পানী, কৈফিয়ৎ, ধাড়ী, বাঙালী--এইরকম অজস্র এমন বানান আমরা বদলে নিয়েছি বা বদলাতে চাচ্ছি যেগুলো অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেগুলোকে বদলাতে চাচ্ছি কেননা সেগুলোকে আমরা অসংগত মনে করছি, অযৌক্তিক মনে করছি। কিংবা বানানের সমতা বিধানের জন্য বা সরলতা সাধনের জন্য আগের বানান পালটে নতুন বানানের সপক্ষতা করছি। তাই যদি হয়, তা হলে ইন্‌ভাগান্ত শব্দের মূল শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত, না করে হ্রস্ব ইকারান্ত করে নিলে-- এবং সেও ওই সংস্কৃত নিয়মেই-- সমস্যার সমাধানের একটা পথ যদি পাওয়া যায় তবে তা করতে বাধা কোথায়?

তৎসম শব্দে ঙ এবং অনুস্বারের মধ্যে কোনটিকে নেব এই প্রশ্ন এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেখানে এই দুটি বৈকল্পিক, সেখানে অনুস্বার, এবং যেখানে বিকল্পের বিধান নেই, সেখানে নিয়ম অনুসারে অনুস্বার কিংবা ঙ-এই সূত্রই মেনে নেওয়া ভালো।

তদ্ভব ও দেশী শব্দের বানান

সন্দেহ নেই যে তদ্ভব ও দেশজ শব্দের বানান নিয়েই বিতর্ক ও সংশয় বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতি ই/ঈ এবং উ/ঊ, এই দুটি ক্ষেত্রে বিকল্পের বিধান রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাধারণভাবে হস্‌চিহ্ন বর্জন করেছিলেন, মূর্ধন্য ণ ও মূর্ধন্য ষ বর্জন করার সাহসও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ-ষ-স এর বেলায় মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ বা স হবে এই বিধান দিয়ে সদস্যরা তাঁদের দ্বিধা স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন। কেননা, কোথাও উচ্চারণ অনুসারে ই/উ, কোথাও শুধু ব্যুৎপত্তিকে অনুসরণ করার নির্দেশ, আবার কোথাও-বা এই দুইয়ের যে-কোনোটি, অর্থাৎ বিকল্পব্যবস্থা। হস্‌চিহ্ন আর মূর্ধন্য-ণ এখন কোনো সমস্যা নয়। এগুলোকে স্বচ্ছন্দে

আলোচনার বাইরে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা এখনও বিস্তর আছে। বিতর্কের এলাকাটা এখানে খুব সংকীর্ণ নয়। শ-য-স-এর সমস্যাই প্রথমে ধরি। এখানে ব্যুৎপত্তির যুক্তিটাকেই বড়ো করে দেখা হয়ে থাকে সাধারণত। আর সেই কারণেই বাংলার স্বাভাবিক শিস্ধ্বনির বর্ণরূপ শ-কে বানানের সর্বত্র নিয়ে আসার কথা ভাবি না আমরা। এ কথা সত্যি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তির যুক্তি এতই জোরালো এবং মূল শব্দ ও তার তদ্ভব রূপের সন্নিধি এতই স্পষ্ট যে মূলে ষ ব. স থাকলে চট করে তাকে শ করা কঠিন। ষণ্ড থেকে ষাঁড় এবং দস্যু থেকে দস্যি এমনি দুটি দৃষ্টান্ত। আবার যেসব দেশজ শব্দে ব্যুৎপত্তির দোহাই চলে না, ব্যুৎপত্তিটাই যেখানে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট, সেখানেও তো তালব্য-শ এর প্রবেশ অবাধ নয়। উসকে দেওয়া, চুপসানো এইসব শব্দে তালব্য-শ কি স্বাভাবিক হত না? একালের ভাষাভাবুকদের কেউ কেউ আমাদের বানান সমস্যার এই দিকটি বেশ ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন।[৯]

একথা সত্যি যে দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বানানে দীর্ঘ-ঈ ও দীর্ঘ ঊ লেখার প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। তবে এখনও দীর্ঘ-ঈ/দীর্ঘ-ঊ কতকগুলো ক্ষেত্রে জমি ছাড়ছে না। বিশেষত মূল শব্দের আদ্য বর্ণে দীর্ঘস্বরচিহ্ন থাকলে তার তদ্ভব রূপটিতেও দীর্ঘস্বরচিহ্ন বজায় রাখার একটা ঝোঁক লক্ষ করি। ভূতুড়ে, হীরে, সূচ, নীলা প্রভৃতি শব্দের প্রথম বর্ণে দীর্ঘস্বরচিহ্ন এখনও হ্রস্বস্বরচিহ্নের প্রবল প্রতিস্পর্ধী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য তার মানে এ নয় যে অনুরূপ সব ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। চুন (চূর্ণ), সুতো (সূত্র), পুব (পূর্ব) প্রভৃতি বানানও তো দাঁড়িয়ে গেছে। উপরে যেসব উদাহরণ দেখালাম তার মধ্যে ভূতুড়ে শব্দটি কিছুকাল ধরেই বানান-আলোচকদের বেশ ব্যস্ত রেখেছে। পবিত্র সরকার এই শব্দটিকে অন্যান্য শব্দের চেয়ে একটু আলাদা রাখতে চান। কেননা এখানে তৎসম 'ভূত' শব্দের সঙ্গে একটি বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। তাই 'ভূতুড়ে'কে 'ভুতুড়ে' লেখা উচিত কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।' এইরকম শব্দের আরও উদাহরণ-- ধূর্তামি, দূতালি, পূজারি। আমাদের মতে এইসব শব্দের গোড়ার তৎসম অংশ এতই স্পষ্ট যে চট করে তার দীর্ঘস্বরচিহ্নকে বদলে হ্রস্বস্বরচিহ্ন করতে না যাওয়াই ভালো। এসব শব্দের বানানকে সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বানান নিয়ে তৃতীয় যে প্রশ্ন প্রায়ই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তা হল বানানে ঐ/অই এবং ঔ/অউ এর কোনটি লেখা হবে তা নিয়ে সংশয়। পইতে, ছুই, কই, দই, খই, সই, পইপই প্রভৃতি বানান চালু হয়ে গেছে। কতকগুলির ক্ষেত্রে দুটি বানান সমান প্রচলিত। যেমন বইঠা/বৈঠা, বউ/বৌ। আবার কতকগুলি শব্দের বানানে ঔকার প্রায় অব্যতিক্রমী। যেমন চৌকো, পৌনে, চৌতাল, দৌড়, কৌটো, চৌচির, চৌরাস্তা, চৌমাথা, ভৌ ভৌ, মৌরি, বৌভাত, চৌথ, চৌখস। একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ করবার মতো এই যে ঐ এর বদলে অই যত সহজে আমাদের অভ্যাসের মধ্যে আসছে, তত সহজে ঔ এর বদলে অউ কিন্তু আসছে না। সে যাই হোক, পরেশচন্দ্র মজুমদারের পরামর্শ এক্ষেত্রে গ্রহণীয় বলেই মনে হয়। তাঁর মতে এক সিলেবলের শব্দে অই ও অউ বানান এবং একাধিক সিলেবলের শব্দে ঐ ও ঔ বানান রাখা গেলে ভালো হয়।[১১] এইভাবে মউ, কিন্তু মৌমাছি, মৌচাক। যেসব শব্দে অউ/অই বানান চালু হয়ে গেছে সেগুলোকে সেইভাবেই রাখা যেতে পারে। থই থই লেখা হবে, থৈ থৈ নয়। খই লেখা হবে, খৈ নয়। বউ লেখা হবে, বৌ নয়। দই লেখা হবে, দৈ নয়। অন্যত্র লেখা হবে চৌতাল, পৌঁছানো, দৌড়ানো, মৌরলা, কৌটো। সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়লে তার চেহারা বদলে যাবে, যদি পরেশচন্দ্র মজুমদারের মত মেনে নিতে হয়। বউ অথচ বৌদি, মউ অথচ মৌচাক। এর বিকল্প হতে পারে দুটি—এক, সর্বত্রই অই, অউ বানান করা, যেমন পবিত্র সরকার বলেছেন।[১২] এবং দুই, এই ধরনের সমস্ত শব্দকে তাদের পুরনো ঐকার ও ঔকারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই দ্বিতীয় বিকল্প

এখন একরকম অসম্ভব, আর প্রথম বিকল্প সুকঠিন। তাই আপাতত পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতই গ্রহণীয় মনে হয়। দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বানানে চতুর্থ বড়ো বিতর্ক হল জাতি ভাষা ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে দীর্ঘ-ঈকার দেওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে। সাধারণভাবে এই জাতীয় শব্দে দীর্ঘস্বরচিহ্ন অনেকটাই বর্জিত হয়ে গেলেও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে এবং ভাষা ও জাতিবাচক শব্দে এখনও অনেকেই দীর্ঘস্বরচিহ্নের পক্ষপাতী। এই অনেকের মধ্যে আছেন ক্ষুদিরাম দাস।[১৩] তিনি ভেড়ী, পাগলী, মাসী, শাশুড়ী প্রভৃতি বানানের পক্ষপাতী। অধ্যাপক দাস বিশেষণেও দীর্ঘস্বরচিহ্ন রাখতে চান-- জাহাজী, চালানী, পণ্ডিতী।[১৪] অনেক দিন আগে এই ধবনের একটা প্রস্তাব ছিল রাজশেখর বসুরও। তিনি খুশি (বিশেষ্য) ও খুশী (বিশেষণ) এই প্রস্তাব করেছিলেন। খুশি শব্দটি অবশ্য দেশজ নয়। তবু আমবা এটির উল্লেখ করলাম। কিন্তু দেশজ বা তদ্ভব শব্দের বেলায় বিশেষণে ও স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ-ঈকার দেবার ব্যাপারটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। স্ত্রীলিঙ্গ হলেই দীর্ঘস্বরচিহ্ন দিতে হবে এমন যুক্তি কেন হাজির করা হয় বোঝা শক্ত। সংস্কৃতেও কি সর্বত্র তা হয়? বিশেষণের জন্যই বা পৃথক বানানের ব্যবস্থা কেন হবে? যুক্তি বরং হ্রস্বস্বরচিহ্নেরই পক্ষে। এই যুক্তি মেনে নিয়ে এবং বর্তমানের প্রবণতা স্বীকার করে নিয়ে আমরা বাঘিনি, মাসি, পিসি, পেতনি, গিন্নি, তাঁতিনি প্রভৃতি বানান লেখার পক্ষপাতী। যেসব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে সেগুলিকে এই আলোচনায় আনিনি আমরা। অসংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এখন বর্জিত হয়ে গেছে। তাই উপস্থিত সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম না।

বিদেশী শব্দের বানান

আরবি-ফারসি ভাষা থেকে বহু শব্দ বাংলায় এসেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ইংরেজি ফরাসি ওলন্দাজ পোর্তুগিজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষা থেকেও বিস্তর শব্দ বাংলায় এসেছে। এইসব শব্দের বানান কেমন হবে সেও এক বিতর্কিত বিষয়। মনে রাখতে হবে যে সমস্ত বিদেশী শব্দকে এক ছাঁচে ফেলে বিচার করা যাবে না। বাংলায় বহু বিদেশী শব্দ রূপান্তরিত বা বঙ্গীকৃত হয়েছে। ইসকুল, টেবিল, গুদাম, গেলাশ, জিনিস-- এগুলো রূপান্তরিত বিদেশী শব্দ। আবার স্কুল, কবুল, খোয়াব, বেনজির, ইসলাম, টাইপ, লাইন, ট্রেন, ফুটবল-- এগুলো সরাসরি বিদেশী শব্দ, প্রায় অবিকৃত। কিন্তু কী সমস্যা বিদেশী শব্দের বানানের? বলা যেতে পারে দেশজ বা তদ্ভব শব্দের বানান নিয়ে যেসব সমস্যার কথা বলেছি আমরা, এইসব বিদেশী শব্দের বানান নিয়েও ঠিক সেই সমস্যাই রয়েছে-- দীর্ঘস্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে কি না, শ-ষ-স-এর কোনটি ব্যবহৃত হবে, অন্তঃস্থ-য ব্যবহৃত হবে কিনা ইত্যাদি। তবে কোনো সন্দেহ নেই বিদেশী শব্দের বানানের প্রধান দুটি সমস্যা দীর্ঘস্বরচিহ্নের সমস্যা এবং শ-ষ-স-এর সমস্যা। বিদেশী শব্দের বানানের ব্যাপারটা অনেকাংশেই তদ্ভব বা দেশজ শব্দের বানানেরই অনুরূপ হওয়ার কথা। অর্থাৎ সমস্ত অতৎসম শব্দের বানানের একই নীতি হওয়ার কথা। একদা ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি বিদেশী শব্দের বানানের জন্য যেসব নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি বাতিল হয়ে গেছে। ওই সমিতি স্থির করেছিলেন (দ্র ১৪ নম্বর নিয়ম) যে মূল শব্দে বিবৃত অ (Cut এর u) থাকলে আদ্য অক্ষরে আ এবং শব্দের মধ্যে অ লেখা হবে-- সার্কস, রেডিয়ম, ফোকস। আমরা সকলেই জানি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায়নি। এখন লেখা হয় সার্কাস, রেডিয়াম, ফোকাস। সমিতির ১৬ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছিল যে মূল শব্দের উচ্চারণে দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-উ থাকলে বাংলা বানানেও দীর্ঘ স্বরচিহ্ন রাখা বিধেয়-- সীল (seal), ঈস্ট (east), স্পূল (Spool)। ২০ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছিল যে মূল

শব্দের উচ্চারণ অনুসারে বাংলায় s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে — খাস, আসল, জিনিস, শরবত, শহর, পেনশন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পরে ছয়টি দশক কেটে গেছে। একথা বলে না দিলেও চলে যে দীর্ঘ স্বরচিহ্নের সিদ্ধান্ত তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, ১৪ নম্বর নিয়মটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এবং শ ষ স-এর প্রশ্নে আজও, এত দিন পরেও, আমরা খুব বেশিদূর এগোতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-সম্পর্কিত ভিত্তিপত্রে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথাই বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে বিদেশী শব্দে বাংলা উচ্চারণ অনুসারে শ বা স হবে। পরিষ্কার বলা হয়েছিল— 'আরবি বা ফারসি-মূল শব্দের মূলে যে স-ই থাক না কেন, তার বাংলা বানানে বাংলা উচ্চারণের শ হবে।' যেমন মাশুল, কশুর, হিশেব, শাদা।[১৫] এই সুপারিশ খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাংলা আকাদেমির চূড়ান্ত সুপারিশপত্রে সমিতি একটু যেন পিছিয়ে এসেছেন। নতুন এই সুপারিশপত্রে বলা হয়েছে— 'আরবি-ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে মূলে যে-বানানই থাকুক না কেন, সর্বত্রই তালব্য শ রাখা হবে, এ প্রস্তাব সংগত মনে হয়নি।[১৬] এখানে বলা হল যে ফারসি, সাবান, সাদা প্রভৃতি শব্দে তালব্য-শ বাঞ্ছনীয় নয়। এই লেখকও ওই সুপারিশপত্রে প্রকাশিত মতামতের অন্যতম অংশীদার। এটা স্বীকার করেও এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে— উপরের উল্লিখিত ওইসব শব্দে তালব্য-শ কেন হবে না? সে কি কেবল প্রচলনকে আঘাত করতে চাই না বলে? তা যদি হয়, তবে তো অনুরূপ বহু শব্দের বেলাতেও একই প্রশ্ন উঠে পড়বে। বহু শব্দের বানানই তো প্রচলনকে অগ্রাহ্য করেই বদলে দেওয়া হয়েছে। আমরা দীর্ঘ-প্রচলিত সহরকে শহর করেছি, সরবতকে শরবত করেছি। তা হলে এক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছি কেন? পবিত্র সরকার বলেছেন যে আরবি-ফারসি শব্দ আমাদের ভাষার পুরোনো ঋণ। দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হতে হতে আমাদের মুখে এদের উচ্চারণ কিছুটা বদলে গেছে। বলা উচিত এইসব শব্দ একরকম বঙ্গীকৃত হয়েছে। তাই এইসব শব্দের প্রচলিত উচ্চারণকেই অনুসরণ করা উচিত।[১৭] তাঁর মতে যা লিখব তাতে 'সাধারণ বাংলা উচ্চারণের মোটামুটি যথাযথ প্রতিফলন' থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন যে এইসব শব্দ লেখারও দীর্ঘ রীতি তৈরি হয়ে গেছে। তবে কি সেই দীর্ঘ রীতিটিকেই মান্য করতে হবে? এখানে কিন্তু একটা স্ববিরোধ উঁকি দিচ্ছে। যদি বাংলা মতের উচ্চারণকে মানতে হয় তাহলে কুরশি, শৌখিন, শয়তান, শাস্ত্রি, শরিক, শাবেক, শাবাশ, শাবান, শাদা, শরকার, শর্দি, শাহেব, শরদার, জিনিশ, শওকি প্রভৃতি বানান লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। আবার যদি দীর্ঘ-প্রচলিত রীতির কথাই বলি তাহলে এর প্রত্যেকটিতেই দন্ত্য-স লেখার দাবি উঠবে।

আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যে-নিয়মেই করা হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সম্ভব। কিন্তু শহর লিখব, শরবত লিখব, শানাই লিখব, গেলাশ লিখব, শৌখিনেও আপত্তি নেই, অথচ শাদা, শাবান, শাহেব, জিনিশে আপত্তি করব— এই দুমুখো নীতির কারণ বুঝতে পারি না আমরা। সন্দেহ নেই এভাবে বাংলা উচ্চারণ অনুসারে লিখতে গেলে বেশ কিছু শব্দের চেহারা বদলে যাবে। সেটাই কি আপত্তির আসল কারণ? না কি অভ্যাস আর সংস্কার আমাদের বাধা দিচ্ছে? বোধ হয় দুইই। তবু সংস্কারকদের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এবং এমন এক সিদ্ধান্ত যাতে দুমুখো নীতির বা double standard -এর অভিযোগ উঠবে না। ১৩২২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে আশি বছর আগে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাঙ্গালা শব্দকোষে এমন অনেক বিদেশী শব্দ তালব্য শ দিয়ে লেখা হয়েছিল যেগুলির উচ্চারণে তালব্য শ থাকলেও সেখানে দন্ত্য স লেখাই দস্তুর ছিল। তিনি লিখেছেন— শতরঞ্চ, শরাব, শনাক্ত, শরদি/শর্দি, শহর, শৌখিন, পারশী, শানাই, শাদা, শিক,

শাবাশ। অবশ্য কোনো কোনো শব্দে তিনি বিকল্প হিসেবে দন্ত্য স-কেও রেখেছিলেন। যোগেশচন্দ্র যা পেরেছেন আশি বছর আগে, আমরা আজও তা পারব না কেন?

একথা বিশেষভাবেই বলে নেওয়া দরকার যে, সর্বত্র তালব্য-শ লেখার প্রস্তাব আমরা করছি না। আমরা কেবল সেইসব বিদেশী শব্দে তালব্য-শ লিখতে চাই যেগুলির উচ্চারণে তালব্য-শ আছে। বলা বাহুল্য আমরা ইসলাম, মসলিন, বিসমিল্লা, হিস্‌সা, মুসলিম, কিসমত, মসনদ--এসব শব্দে দন্ত্য-স লেখারই পক্ষপাতী, যেহেতু বাংলায় এগুলির উচ্চারণে তালব্য-শ আসে না।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি বিদেশী শব্দে হ্রস্বস্বরচিহ্ন লেখার অভ্যাস সর্বজনীন না হলেও দীর্ঘস্বরচিহ্নের তুলনায় নিশ্চয় বেশি জনপ্রিয়। এবং বাংলায় যেহেতু দীর্ঘস্বর সাধারণভাবে উচ্চারিত হয় না, তাই বিদেশী শব্দের বানানে হ্রস্বস্বরচিহ্ন লেখাই সংগত। বিশেষ কারণ থাকলে, অর্থাৎ কোনো শব্দের মূল উচ্চারণটি নির্দেশ করার প্রয়োজন ঘটলে তবেই দীর্ঘস্বরচিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।

আরও কিছু সমস্যার কথা

বানান-সংস্কারের আলোচনায় একটি সমস্যা সচরাচর আমল পায় না, অথচ সমস্যাটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অতৎসম শব্দে যুক্তাক্ষর কোথায় ব্যবহৃত হবে, কোথায় হবে না-- এ নিয়ে তেমন আলোচনা দেখি না আমরা। কিন্তু শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় যেগুলির বানান যুক্তাক্ষরযুক্ত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। বলা বাহুল্য এইসব শব্দের মধ্যে রয়েছে দেশজ শব্দ, তদ্‌ভব শব্দ, বিদেশী শব্দ এবং প্রতিবেশী শব্দ অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে পাওয়া শব্দ। একথা সবাই জানেন যে শব্দের উচ্চারণে পরপর দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তবেই সেই শব্দের বানানে যুক্তাক্ষর আসতে পারে। কিন্তু বহু শব্দের উচ্চারণে পরপর দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকা সত্ত্বেও বানানে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয় না। এখানেই সমস্যা। অর্থাৎ কোথাও যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। চরকা, মোগলাই, দরবার, পাগলামি-- এসব শব্দ কোনোদিনই চর্কা, মোগ্লাই, দর্বার, পাগ্লামি এভাবে লেখা হয়নি। অথচ, বোম্বাই, বস্তা, হেস্তনেস্ত, দরখাস্ত, ভণ্ডুল, লাইসেন্স, লণ্ঠন, শনাক্ত-- এসব শব্দ তো বরাবরই যুক্তাক্ষরে লেখা হয়ে আসছে। আবার এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো আগে যুক্তাক্ষরে লেখা হত, এখন আলাদা করে লেখা হয়। দর্জি, উল্টো, পাল্কি, ঝর্না, তল্পি, উল্কি-- এসব শব্দের এখনকার বানান যথাক্রমে দরজি, উলটো, পালকি, ঝরনা, তলপি, উলকি। এসব শব্দের পুরোনো বানান অর্থাৎ যুক্তাক্ষরযুক্ত বানান অবশ্য পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়নি। কেউ কেউ এখনও ওই বানান লেখেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কিছু শব্দে যুক্তাক্ষর দেওয়াই রীতি, কিছু শব্দে কখনোই যুক্তাক্ষর ছিল না, কিছু শব্দে আগে যুক্তাক্ষর ছিল কিন্তু এখন ক্রমে আলাদা করে লেখার চল হয়েছে। এই ব্যাপারে কোনো সূত্র বা নিয়মের কথা বলা যায় না। তবে নানান ধরনের শব্দ চোখের সামনে রেখে আমরা যা দেখতে পাই তা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করতে পারে। আমরা লক্ষ করি যে কতকগুলো ব্যঞ্জনগুচ্ছকে যুক্তাক্ষর দিয়ে লেখার প্রবণতা দেখা যায়-- ক্ + ক (অক্কা, মক্কা, ফক্কি), ক্ + ত (পোক্ত, শনাক্ত, মক্তব), ক্ + স (অক্সিজেন), ন্ + ঠ (লণ্ঠন), ন্ + ড (গণ্ডা ভণ্ডুল, লণ্ডন, আণ্ডা), ন্ + দ (অলিন্দ, বান্দা, হিন্দি), ম্ + ব (গম্বুজ, বোম্বাই, নভেম্বর), ন্ + ন (গিন্নি, কান্না, শিন্নি), ন্ + স (লেন্স, লাইসেন্স), র্ + দ (গর্দান, ফর্দ, উর্দু), স্ + ত (শস্তা, মস্ত, মস্তান, খাস্তা, বস্তা)। পরপর একই ব্যঞ্জনে যুক্তাক্ষরের আরও উদাহরণ-- মদ্দা, মোকদ্দমা, গচ্চা, সাচ্চা, কাচ্চাবাচ্চা ; দজ্জাল ; লাট্টু, খাট্টু, পাট্টা ; আড্ডা, গাড্ডা ইত্যাদি। অতএব এইসব ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর বজায় রাখাই মনে হয় উচিত হবে। কিছু ব্যতিক্রমের জায়গা নিশ্চয় থেকে যাবে।

তাতে সূত্র সন্ধানে বাধা হবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে ত্রিশ বছর আগে 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমিতাভ চৌধুরী এবং মণীন্দ্রকুমার ঘোষের বিতর্ক স্মরণ করা যেতে পারে।[৮] দ্বিতীয়ত, বাংলা ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। এখনকার সংস্কারকরা সাধারণভাবে ঊর্ধ্বকমার পক্ষপাতী নন- হ'ল হ'ত ক'বে এইসব বানানের বিরোধী তাঁরা। আমরাও মনে করি যে সাধারণভাবে ঊর্ধ্বকমার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কখনো কখনো সংশয় এড়াতে ঊর্ধ্বকমা দেবারও দরকার হতে পারে। অভিধানে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার সময় প্রায়ই ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করে ক্রিয়াপদের অসমাপিকা রূপটিকে সেই ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান রূপ থেকে পৃথক করা দরকার হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ নিই। একই বাক্যে বা বাক্যাংশে করে (করিয়া) এবং করে (করছে অর্থে) থাকলে প্রথমটিকে ক'রে লিখে সংশয় এড়ানো যায়। সেখানে সম্পূর্ণ বাক্য লিখে প্রয়োগ দেখানোর সুযোগ থাকে না, সেখানে ঊর্ধ্বকমা দরকার হতেই পারে।

তৃতীয়ত, অসংস্কৃত শব্দে ঋকার ব্যবহার না করাই ভাল। বাংলায় ঋ স্বরধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় না। ঋ বাংলায় ব্যঞ্জন রি-র মতো উচ্চারিত হয়। তাই ঋ না লিখে র-ফলা + হ্রস্বই লেখাই উচিত-- ব্রিটিশ, খ্রিস্টান। চতুর্থত, অসংস্কৃত শব্দে সাধারণভাবে খণ্ড ৎ না লেখাই উচিত। কেবল ধ্বন্যাত্মক শব্দে খণ্ড ৎ থাকতে পারে-- কিসমত, মতলব, খতবা, কাতলা, নহবত, শরবত। কিন্তু ধপাৎ, কচাৎ, সড়াৎ। পঞ্চমত, ক্রিয়াপদে কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ওকার লেখা চলতে পারে-- কোরো, নিয়ো, খেয়ো, দেখো।

শেষ কথা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য-সংসদ প্রভৃতি সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা বানান সংস্কারের জন্য এবং বানানে সরলতা বিধানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি কয়েকজন ভাষাভাবুক ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বাংলা বানান নিয়ে কাজ করে চলেছেন। সবারই উদ্দেশ্য বাংলা বানানে অসংগতি ও জটিলতা দূর করে তাকে একটা শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং এমন কিছু সূত্র বা নিয়ম তৈরি করা যা সকলের না হলেও বহু লোকের কাছে মান্যতা পাবে। আমরা লক্ষ করছি যে বানানে বিতর্কিত বিষয়ের এলাকা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, যদিও খুব তাড়াতাড়ি সব বিতর্কের অবসান ঘটে যাবে এমন কথা বলা যাবে না। একথা মনে রাখতেই হবে যে, বাংলা বানানে একই নিয়ম সম্ভব নয়। মূর্ধন্য-ণ, মূর্ধন্য-ষ, দীর্ঘ স্বরচিহ্ন, ঋকার প্রভৃতি তৎসম শব্দে থাকবে, কিন্তু অতৎসম শব্দে থাকবে না। কোনো কোনো অতৎসম শব্দে দন্ত্য স থাকবে, তবে বহু অতৎসম শব্দে তালব্য শ লেখা হবে। এইভাবে তৎসম ও অতৎসম শব্দের জন্য ভিন্ন নিয়ম অনিবার্য। কিন্তু তাই বলে কোথাও প্রচলনের উপর জোর দেব, কোথাও ব্যুৎপত্তির কথা বলব, আবার কোথাও এ-দুটির কোনোটিকেই গুরুত্ব না দিয়ে অন্য কোনো যুক্তি হাজির করব এই ব্যাপারটা বাংলা বানানের সংস্কারের কাজটিকে পিছিয়ে দিতে পারে। সূত্র বা নিয়ম রচনা করার সময় সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।